বাংলা উপন্যাসে পল্লীসমাজ

ড. ব্রততী ঘোষরায়

পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা-৭০০০০৯

BANGLA UPANYASHE PALLI SAMAJ
by Dr. Bratati Ghosh Roy.

প্রথম প্রকাশ :
১৬ই আষাঢ় ১৪০২ বঙ্গাব্দ

প্রকাশক :
দিলীপকুমার ঘোষরায়
পুঁথি প্রকাশনার পক্ষে
পি ৪০ বাঙ্গুর অ্যাভেনিউ, ব্লক বি
কলকাতা-৫৫

কম্পিউটার কম্পোজ :
মৃন্ময়
২১২ বাঙ্গুর অ্যাভেনিউ. বি-ব্লক
কলকাতা-৫৫

মুদ্রণ :
গুপ্ত প্রেস
৩৭। ৭ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা

পূজনীয় আচার্যদেব

ড. হরিপদ চক্রবর্তী

শ্রীচরণেষু

ভূমিকা

অধ্যাপিকা ব্রততী ঘোষরায় দীর্ঘকাল রায়গঞ্জ মহাবিদ্যালয়ে বাংলা সাহিত্যে অধ্যাপনা করছেন। তাঁর 'বাংলা উপন্যাসে পল্লীসমাজ' গবেষণার সঙ্গে আমি যুক্ত ছিলাম। পঞ্চাশ কি একশ বছরের সময়-ব্যবধানে সমাজ পাল্টায়, পল্লীসমাজও। সঙ্গে সঙ্গে উপন্যাসের চরিত্রের ধরন-ধারণ। সেসব দিকে ব্রততী খুব গভীর দৃষ্টিক্ষেপ করেননি। তবে বাংলা উপন্যাসের মধ্য দিয়ে পল্লীসমাজের পরিবর্তনের একটা মোটা দাগের চেহারা হাতের মুঠোয় পাওয়াও কম কথা নয়।

ব্রততী রায়গঞ্জের বাসিন্দা। কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ থাকলে নির্দেশ-উপদেশ অনুযায়ী নিবন্ধের ঘষা-মাজার কাজে যে সুবিধা হয়, এক্ষেত্রে সে সুবিধা ছিল না।

তবু তিনি যথাসাধ্য সমাজতত্ত্ব অর্থনীতির নিরিখে পল্লীসমাজের বাস্তব পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করেছেন এবং রচনাভঙ্গিও যুক্তিসিদ্ধ ও সাবলীল।

পি ৬১ কালিন্দী হাউজিং স্কীম
কলকাতা—৮৯
দূরভাষ : ৩৪-৬৭৯৩

রবীন্দ্র গুপ্ত
১লা জুলাই '৯৫

নিবেদন

বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপনা সূত্রে একটি বিষয় আমার কাছে গবেষণাযোগ্য মনে হয়েছে। এখনকার বাংলা উপন্যাস মূলত শহর-নির্ভর — কলকাতা কেন্দ্রিক বলাই ভাল। কিন্তু অতীতে এমনটি ছিল না। বরং শহরে শিক্ষিত লেখকেরা পল্লীসমাজের দিকেই দৃষ্টি ঘোরাতেন।

বঙ্কিমচন্দ্র থেকে তারাশঙ্কর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পর্যন্ত বাংলা উপন্যাসের যে উচ্চাবর্চ অগ্রগতি, তার মধ্যে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, বঙ্কিমচন্দ্রের পল্লীসমাজ থেকে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজ অনেকটা ভিন্ন। উপন্যাসে বর্ণিত তাঁদের পল্লীসমাজের বৈচিত্র্য ও পার্থক্য লক্ষ্য করার মত।

আলোচ্য সন্দর্ভে 'বাংলা উপন্যাসে পল্লীসমাজ' ৮টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র রমেশচন্দ্র, তারকনাথ গঙ্গো, রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজেই সন্দর্ভের বিশ্লেষণ সীমাবদ্ধ। তবে শরৎপরবর্ত্তী ঔপন্যাসিকেরাও নিজেদের মত করে পল্লীসমাজের ছবি এঁকেছেন। তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস অবলম্বনে তাঁদের দেখা পল্লীসমাজ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। সন্দর্ভটি অন্য আকারে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি. এইচ. ডি ডিগ্রী (আর্টস) অর্জন করে। আমার নির্দেশক ছিলেন ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের রিডার ড. রবীন্দ্র গুপ্ত। তাঁর সস্নেহ উপদেশ ও সাহায্য আমার কাজটিকে ত্বরান্বিত ও সুসম্পন্ন করেছে। এই প্রসঙ্গে প্রাক্তন বিদ্যাসাগর অধ্যাপক ড. ক্ষেত্র গুপ্তকে আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাই। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন প্রফেসার ও কলাবিভাগের ডীন ড. হরিপদ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের স্নেহ ও প্রেরণা ছাড়া এ কাজ সম্পন্ন হত না।

কৃতজ্ঞতা জানাই বঙ্গীয়সাহিত্য পরিষৎ ও রায়গঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রতি। আমার স্বর্গত পিতা যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ও মা শুক্লাচক্রবর্ত্তী নিরন্তর গবেষণা কাজে আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন।

আমার স্বামী রায়গঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক দিলীপকুমার ঘোষরায়, কন্যা অনন্যার অনুকূলতা আমার পরিশ্রমের পথ সুগম করেছে।

গ্রন্থপঞ্জী তৈরিতে ও অন্য কাজে সহযোগিতা করেছে ভগ্নী বর্ণনা, তার স্বামী বিপ্লব চক্রবর্ত্তী ও ভাগিনেয় বিপ্লব মজুমদার।

অতিদ্রুত ছাপানোর কাজ করেছেন 'মৃন্ময়' কর্মীবৃন্দ। তবে মুদ্রণ প্রমাদের জন্য আমি দায়ী। কলকাতা থেকে অনেক দূরে রায়গঞ্জে থাকার জন্য ঠিকমত প্রুফ দেখার কাজ করা যায়নি, সেজন্য পূর্বাহ্নেই পাঠকদের কাছে মার্জনা চেয়ে রাখছি।

১লা জুলাই '৯৫
'বনতোষিণী'
কলেজ পাড়া
রায়গঞ্জ। উত্তর দিনাজপুর।

বিনীত
ব্রততী ঘোষরায়

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায় ঃ
পল্লীবাংলার সমাজ প্রাক্-ব্রিটিশ যুগ; চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরে ১-৩০

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ
পল্লীসমাজ বিষয়ে শিক্ষিত শহরবাসীর সচেতনতা— বিভিন্ন সভাসমিতি — আলোচনা—প্রবন্ধ ৩১-৪২

তৃতীয় অধ্যায় ঃ
উপন্যাস পূর্ব কথা সাহিত্যে পল্লীসমাজ— সাময়িকপত্র, নকশা, আখ্যান ইত্যাদি ৪৩-১০২

চতুর্থ অধ্যায় ঃ
বঙ্কিমচন্দ্র—রমেশচন্দ্র—তারকনাথ / পল্লীসমাজ—সামন্ত সম্পর্ক ১০৩-১৬৭

পঞ্চম অধ্যায় ঃ
রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস ১৬৮-২০২

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ
শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে পল্লীসমাজ ২০৩-২৫৩

উপসংহার ঃ ২৫৪-৩০৪

গ্রন্থপঞ্জী ঃ ৩০৫-৩০৬

প্রথম অধ্যায়

পল্লী বাংলার সমাজ প্রাক্-ব্রিটিশযুগে; চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরে

স্বয়ং সম্পূর্ণ গ্রামই ছিল প্রাক্ ব্রিটিশ ভারতীয় সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য। গ্রামীণ জনসাধারণের বৃহত্তম অংশ ছিল কৃষক। গ্রামের পঞ্চায়েত ছিল পল্লীসমাজের প্রতিনিধি। গ্রামের জমির মালিকানা প্রকৃতপক্ষে পঞ্চায়েতের হাতে ন্যস্ত ছিল।[১] স্যার চার্লস মেটকাফে মন্তব্য করেছিলেন—"গ্রামগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রজাতন্ত্ররূপে বিরাজ করত। জীবন ধারণের জন্য যা প্রয়োজন তার প্রায় সবকিছুই তারা নিজেরা সংগ্রহ করতে পারতো। বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ তাদের বিশেষ প্রয়োজন হত না। .....একের পর এক রাজবংশ এসেছে এবং লোপ পেয়েছে, এক বিপ্লবের পর এসেছে আর এক, বিপ্লব, হিন্দু পাঠান, মোগল, মারাঠা, শিখ, ইংরাজ সবাই ক্রমান্বয়ে প্রভুত্ব করেছে কিন্তু গ্রামীণ সমাজ মূলত এইরকমই থেকে গেছে"[২] কার্ল মার্ক্স এই অপরিবর্তনীয় সামাজিক পরিস্থিতির সুস্পষ্ট বর্ণনা দিয়েছেন ঃ এই সব ক্ষুদ্র এবং অতিশয় প্রাচীন ভারতীয় সম্প্রদায়গুলি যার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল সে হল ভূমির ওপর সর্বসাধারণের স্বত্ত্ব, কৃষি এবং কারিগরি শিল্পের সংমিশ্রণ এবং অপরিবর্তনীয় শ্রমবিভাগ।....এই সব স্বয়ং সম্পূর্ণ গ্রামীণ সম্প্রদায় যদি ঘটনাচক্রে লোপ পায় তবে সেই জায়গাতেই একই নামে তার পুনরাবির্ভাব ঘটে। ....রাজনৈতিক জগতের আলোড়ন সমাজের আর্থিক ব্যবস্থার কাঠামোর ওপর স্বল্পতম প্রভাব ও বিস্তার করতে পারে না।"...[৩]

প্রাক্ ব্রিটিশ গ্রাম সমাজের একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল জাত প্রথা। এই প্রথার কঠোর বিধি অনুসারে মানুষের বৃত্তি আগে থেকে নির্ধারিত করে রাখত। প্রাকৃতিক নিয়মের মতো অপ্রতিরোধ্য জাতব্যবস্থার ফলে মানুষের বৃত্তিও হয়ে দাঁড়ায় বংশানুক্রমিক।

১. এ. আর. দেশাই; ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সামাজিক পটভূমি, পৃ. ৭-৮।
২. সূত্র— ঐ পৃ. ৭।
৩. কার্ল মার্ক্স—ভারতের বৃটিশ শাসন, ১৮৫৩, New York Tribune, সংখ্যা ৩৮০৪।

ইংরেজদের আগমনের পূর্বে বহির্বিশ্বের সঙ্গে গ্রামগুলি খুব সামান্য সামাজিক আর্থিক বা আত্মিক বিনিময় হত। যানবাহন ব্যবস্থাও ছিল অত্যন্ত অনুন্নত। মেলা, তীর্থযাত্রা বা বিবাহ ইত্যাদি উপলক্ষে গরুর গাড়িতে বা নৌকাতে অল্প সময়ের জন্য গ্রামবাসী গ্রাম ছেড়ে বাইরে যেত। পল্লীবাসীদের অনুষ্ঠানগুলি ছিল সাদাসিধে ধরনের যাত্রা, কথকতা উপলক্ষে ধর্মীয় সভা। ধর্মীয় আলোড়নের সময় নতুন ধর্মের প্রবর্তকরা বা পুরানো ধর্মের নতুন ভাষ্যকাররা গ্রাম গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছেন। ধর্মীয় প্রচারের ফলে গ্রামবাসীরা কখনও হিন্দুধর্ম কখনও বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে। যে গ্রামগুলি বৈষ্ণব প্রধান ছিল তা শৈব প্রধান গ্রামে পরিণত হয়। ধর্মীয় পরিবর্তনের ফলে গ্রামবাসীদের মধ্যে মৌলিক চেতনার কোন পরিবর্তন ঘটতে দেখা যায়নি। পল্লীবাসী নিজেকে হিন্দু বা বৌদ্ধ বলে মনে করত, কিন্তু নিজেকে ভারতীয় বলে মনে করার মত কোন ভাবনা আসেনি তাদের। অর্থাৎ চেতনাটা ছিল ধর্মীয় মতাদর্শজনিত ঐক্যের চেতনা, রাজনৈতিক আর্থিক একতার নয়।[৪]

সামাগ্রিকভাবে বাংলার পল্লীসমাজ সারা ভারতবর্ষেরই অনুরূপ ছিল। প্রাক্ পলাশীযুগে (১৭০০-১৭৫৭ খ্রীঃ) পরপর পাঁচজন নবাব বাংলার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করেছেন, যথা মুর্শিদকুলি খাঁ, সুজাউদ্দিন খাঁ, সরফরাজ খাঁ, আলীবর্দ্দী খাঁ এবং সিরাজদ্দৌলা।[৫] আর্থ-সামাজিক ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে আলোচ্য সময়ের বাংলার রাষ্ট্র কাঠামো এবং রাজনৈতিক ইতিহাসের রূপরেখা উপস্থাপন এখানে সম্ভব নয়। এ সময়ের পল্লীসমাজের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে উল্লেখ করা যেতে পারে মাত্র— (১) ধর্মীয় জীবন (২) দাস ব্যবস্থা ও জাতি ভেদ প্রথা (৩) সমাজে নারীর অবস্থা (৪) গ্রাম ভিত্তিক কৃষি ও শিল্প (৫) শিক্ষা ব্যবস্থা ইত্যাদি।

ধর্মীয় জীবন ঃ

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে ধর্মীয় ও পার্থিব জীবন ছিল স্বতন্ত্র। সারা ভারতবর্ষের ন্যায় বাংলা দেশে হিন্দু ও ইসলামের এক সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ধর্ম ও সংস্কৃতি এক এবং অচ্ছেদ্য। হিন্দুদের ধর্মীয় চেতনাকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়— বৈষ্ণব, শাক্ত ও শৈব। আদিবাসী ও সাঁওতালরা ছিল স্বতন্ত্র গোষ্ঠী।[৬] শ্রীচৈতন্য (১৪৮৬-১৫৩৩) যে সামাজিক আন্দোলন সৃষ্টি করেছিলেন এ সময়েও বাংলার গ্রামবাসীদের মধ্যে তার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। শ্রীচৈতন্য বর্ণাশ্রম প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিলেন। বাংলার অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি

৪. এ. আর. দেশাই ঐ পৃ. ১৯।
৫. প্রাক্ পলাশী বাংলা, ১৯৮২, সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায় পৃ. ১।
৬. প্রাক্-পলাশী বাংলা ঐ পৃ. ১১৬।

বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ ও প্রচার করেছিলেন যেমন, বিষ্ণুপুরের রাজা গোপাল সিংহ এবং তাঁর পুত্র চৈতন্য সিংহ বৈষ্ণব ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বাংলাদেশের বহু জমিদার ও ধনী ব্যক্তি বৈষ্ণব ধর্মের সমর্থক ছিলেন। এরই প্রভাব গিয়ে পড়ে বাংলার একতৃতীয়াংশ হিন্দুদের ওপর, যারা বৈষ্ণ ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন।

তবুও দুই তৃতীয়াংশ বাঙালী ছিল হিন্দু। গ্রামবাসীদের মূর্তিপূজা ও ধর্মশাস্ত্রে বিশ্বাস ছিল। লোকেরা ব্রাহ্মণ পুরোহিতের মাধ্যমে পূজার্চ্চনা, মৃত্যুর পর অন্ত্যেষ্টি ও শ্রাদ্ধ এবং ঈশ্বর, পরলোক ও পুনর্জন্মে বিশ্বাস করত। তাছাড়া স্বর্গ-নরক, কর্মফল, ঈশ্বর ও ব্রাহ্মণে ভক্তি, ভাগ্যের ওপর নির্ভরতা বাংলার গ্রামবাসীদের ধর্মজীবনের সঙ্গে যুক্ত ছিল। 'বামমার্গ সাধন পদ্ধতি' বা কুলাচার পূর্ব বাংলা, গৌড় এবং দক্ষিণ রাঢ়ে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল।[৭] হিন্দুদের এক বিরাট অংশ ছিল শিবের উপাসক। নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা বেশীরভাগটা ছিলেন শিবের ভক্ত। পশ্চিমবঙ্গের চেয়ে পূর্ববঙ্গের ঘরে ঘরে শিব ছিল অনেক বেশি জনপ্রিয়। এই শিব ব্রাহ্মণ্য ধর্মের শিব নন, ভূতপ্রেতের সঙ্গী শ্মশানবাসী। ফাল্গুনমাসে শিবরাত্রির দিনে বা চৈত্রমাসে গাজন ও শিব পূজা হত। পূর্ববাংলার গ্রামে গ্রামে শিব পূজা, গাজন, চড়ক জাতীয় উৎসব ছিল খুব জনপ্রিয়।[৮] বাংলার হিন্দুদের মধ্যে অনেক আদিবাসী ও সাঁওতাল গ্রামে বাস করে। সাঁওতালদের গৃহেও গ্রাম দেবতার পূজার প্রচলন ছিল। গ্রাম দেবতার বাসস্থান গাছ, গৃহদেবতার গৃহকোণ। সাঁওতালরা পূর্ব পুরুষের আত্মা, ভূত প্রেত ও শয়তানে বিশ্বাস করে। দেবতার পূজায় মুরগী, ছাগল, গরু বলি দেওয়া হত। পূজাতে নাচ গান মাংস খাওয়া ও মদ্যপান চলত।

বাংলার মুসলমানদের ধর্মীয় জীবন কোরাণ ও হাদিস দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল। মুসলমাদনের ধর্মের পাঁচটি প্রধান দিক হল ইমান, রোজা, হজ্ব ও যাকাত। গ্রামের কৃষক ও শ্রমিকের রোজা রাখা সম্ভব হত না। ধনী মুসলমানরা গরীব দুঃখীদের দান করত, মক্কা মদিনার তীর্থস্থানগুলি পরিদর্শন করার সুযোগ পেত। দরিদ্র গ্রামবাসীদের পক্ষে তীর্থকরা সম্ভব হত না। হিন্দুদের পুরোহিতের মত মুসলমানদের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবন মৌলভি ও মোল্লাদের দ্বারা পরিচালিত হত। সারা বাংলার গ্রামে গ্রামে অসংখ্য পীরের দরগার উল্লেখ দেখা যায়। গ্রামবাসীরা হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে পীরের কাছে মানত করত এবং শিরণী দেওয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল। দ্রঃ পীরসাহিত্য হিন্দু ও মুসলমানরা দীর্ঘকাল একই দেশে পাশাপাশি বাসকরার ফলে একে অন্যের ধর্ম জীবনের ওপর প্রভাব বিস্তার

৭. তপন রায়চৌধুরী। 'বেঙ্গল আণ্ডার আকবর এণ্ড জাহাঙ্গীর', কলকাতা, ১৯৫৩, পৃ. ১৩২।

৮. ডব্লিউ. ডব্লিউ. হান্টার 'এ্যানালস অব রুরাল বেঙ্গল' ১ম খণ্ড ১৮৮৩, পৃ. ৯৯-১৩৩ দ্রঃ গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু বাংলার লৌকিক দেবতা।

করে। বিশেষত গ্রামাঞ্চলে এক মিশ্র সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। আরঙ্গজেবের পুত্র বাংলার শাসক আজিমুশশান (১৬৯৭-১৭১২) বাংলাদেশে 'থাকাকালীন গেরুয়া পরতেন এবং হোলি উৎসবে যোগদান করতেন। এবং আলিবর্দ্দীর জামাতা নওয়াজেস সৈয়দ আহমদ এবং দৌহিত্র সিরাজ হোলি উৎসবে অংশগ্রহণ করতেন।[৯] হিন্দুরাজারা যেমন বিষ্ণুপুরের মল্লরাজার মহরম উৎসবের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। সাধারণ গ্রামবাসী মুসলমানদের মধ্যে সামাজিক কাজকর্ম, বিবাহ ইত্যাদিতে হিন্দুদের আচার আচরণের প্রভাব লক্ষ্য করা যেত। শুভকাজে শঙ্খ ও সানাই শোনা যেত।

বাংলার হিন্দু মুসলমান জনসাধারণ মূলত গ্রাম্যবাসীদের দুই জীবন স্তরের মধ্যে এক সাধারণ ঐক্য সূত্র অনেক গবেষক লক্ষ্য করেছেন।[১০] এটি হল বাঙালীর নিজস্ব বাঙালীয়ানা। এই অভিন্ন "বাঙালীয়ানার উৎস হল প্রাক্-হিন্দু এবং প্রাক্-মুসলিম যুগের বাংলার জীবনদর্শন, রীতিনীতি, সংস্কার, জীবনযাপন পদ্ধতি, উৎসব এবং নানারকম লৌকিক আচার অনুষ্ঠান।[১১]

দাস ব্যবস্থা ও জাতিভেদ প্রথা ঃ

প্রাক্ বৃটিশ যুগের বাংলায় হিন্দু ও মুসলমান সমাজে দাস ব্যবস্থার অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। ধর্ম ও জাতিভেদ প্রথা অনেক কঠোর ছিল। জাত যাবার ভয় 'ডেমোক্লিসের তরবারির' মত সব সময় লম্বমান।[১২] বাংলার দাস প্রথা ইউরোপের মত নিষ্ঠুর রূপে ছিল না। এটি bonded Labour বা নথিবদ্ধ বেগার শ্রমিকের প্রকৃতির ছিল।[১৩] ইউরোপের ক্রীতদাসদের বিয়ে করা, সন্তান পালন করা ও স্বাধীনভাবে ঘোরা ফেরার স্বাধীনতা ছিল না। বাংলার গ্রামে গ্রামে যাদের দাসদাসী করে নেওয়া হত তারা চুক্তিমত টাকা ফেরৎ দিলে অনেক সময় স্বাধীনতা ফিরে পেত ।[১৪] বাংলার গ্রামের দরিদ্র হিন্দু মুসলমান পিতামাতার গরুবাছুর বেচার মত শিশু ও কিশোর বয়স্ক পুত্র-কন্যা, এমনকি স্ত্রী ও নিজেকে বিক্রি করত। চন্দনগর, হুগলী, চুঁচুড়া, শ্রীরামপুর ও কলকাতায় ক্রীতদাস ক্রয় বিক্রয়ের বাজার বসত। বাংলার জমিদার ও অভিজাত ব্যক্তিরা ভৃত্য ও দাস রাখত। এ সময় বাংলার

৯. করম আলি— মুজাফ্ফর নামা, 'বেঙ্গল নবাবস ইং অনুঃ যদুনাথ সরকার। পৃ. ৪৯- ৫০।
১০. বিনয়কুমার সরকার—কৃষ্ণনগর কলেজ শতবার্ষিক সংখ্যা, ১৯৪৮, পৃ. ১৭-২৪।
১১. বিনয়কুমার সরকার— ঐ
১২. হান্টার— 'দি আনালস অব রুর‍্যাল বেঙ্গল' ১ম খণ্ড, পৃ ১৩৯।
১৩. হান্টার, ঐ. পৃ. ২৩২-৩৩।
১৪. সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়— ঐ পৃ. ২৭।

গ্রাম থেকে পশ্চিম ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়া ও আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে বিভিন্ন উপনিবেশে ক্রীতদাস চালান যেত।[১৫] এই সময় বাংলার হিন্দু সমাজে বর্ণ ছিল প্রধানত দুটি—ব্রাহ্মণ ও শূদ্র। চতুবর্ণের মাঝে দুটি স্তর ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—বাংলার হিন্দু সমাজে পাওয়া যায় না। সব মিলিয়ে ছত্রিশ জাতির অস্তিত্ব ছিল।[১৬] অনেক সমাজবিজ্ঞানী মার্কসীয় দর্শনের শ্রেণী ও ভারতের বর্ণ প্রথাকে অভিন্ন বলে ধরে নিয়েছেন।[১৭] বাংলার সমাজ কাঠামোর আলোচনা প্রসঙ্গে অনেকে পিরামিডাকৃতি সমাজের উল্লেখ করেছেন।[১৮] পিরামিডে শীর্ষে ছিলেন নবাব এবং শেষস্তরে কৃষক, কারিগর, হস্তশিল্পী, সাধারণ সৈনিক এবং অন্যান্য শ্রমজীবী মানুষ সহ বাংলার বিশাল জন গোষ্ঠী। উভয়ের মাঝে ভূস্বামী, বনিক, মহাজন প্রভৃতি অভিজাতরা।

বাংলা হিন্দুসমাজে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ছিল শূদ্র। শূদ্ররা অধিকাংশই ছিল পল্লীবাসী। এদেরকে আবার উত্তম সঙ্কর জলচল শূদ্র, জল অচল শূদ্র এবং অন্ত্যজ অস্পৃশ্য শূদ্রে ভাগ করা হয়। বৈদ্য, কায়স্থ এবং নবশাখরা ছিল উত্তম সঙ্কর। নবশাখরা হল গোপ, মালী, তাম্বলী, তাঁতী, শাঁখারী, কাসারী, কর্মকার, নাপিত ইত্যাদি। জল অচল শূদ্ররা হল কৈবর্ত, মাহিষ্য, আগুরি, বারুই, মোদক, তেলি, কলু, জেলে, ধোপা, প্রভৃতি। সবার নীচে ছিল যুগী, চণ্ডাল নমঃশূদ্র, মুচি, হাড়ি ডোম, বাউরি বাগদি প্রভৃতি জাতি। এসময় কৌলিন্য প্রথা থেকে পারিবারিক ও বৈবাহিক ক্ষেত্রে নানা বিকৃতি ও জটিলতা সৃষ্টি হয়। নিম্নজাতির মানুষদের মধ্যে এই সমস্যা ছিল না। স্ট্যাভোরিনাস লিখেছেন অন্য বর্ণ অপেক্ষা ব্রাহ্মণদের মধ্যে কুলীন প্রথার কঠোরতা ও কুফল বেশি দেখা গিয়েছিল।[১৯] পশুপালন, শিকার, লাঠিয়ালি ইত্যাদি বৃত্তিধারী ছিল। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে বিশেষ করে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে তুলনায় বাংলায় বর্ণ ও জাতিপ্রথা অনেকখানি শিথিল ছিল। তবুও উচ্চবর্ণের শ্রেণীর লোকেরা সুপরিকল্পিতভাবে নিজেদের পবিত্রতা ও অপরিহার্যতার কথা প্রতিষ্ঠিত করতেন। কর্মফল, ভাগ্যনির্ভরতা ও জন্মান্তরবাদ প্রচারের ফলে নিম্নবর্ণের মানুষদের বিশেষত অজ্ঞ কুসংস্কারাচ্ছন্ন পল্লীবাসীদের মধ্যে সমাজ গঠনের উৎসাহ না হয়ে জাতিভেদ প্রথা সামাজিক

১৫. সুধীরকুমার মিত্র, 'হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গ সমাজ' ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৩। ১৯২২।
১৬. হান্টার ঐ ১ম খণ্ড পৃ. ১১-১১২।
১৭. নির্মলকুমার বোস— 'কালচার এণ্ড সোসাইটি ইন ইণ্ডিয়া' পৃ. ২৩৯, বোম্বাই, ১৯৬৭।
১৮. নিমাই সাধন বসু 'মুঘল আমলে বাংলার জমিদার' বেতার ভাষণ, ১৯৮১।
১৯. স্ট্যাভোরিনাস, ভয়েজ টু দি ইস্ট ইণ্ডিজ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪০। ইং অনুবাদ উইলকক ১৯৭৩।

অবিচার, অসাম্য ও অত্যাচারের মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়। হান্টারের মতে অতিরিক্ত উৎপাদনে অনীহা এবং জাতি ভিত্তিক বাঙালী সমাজে বর্ণে বর্ণে, জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষ ও অবজ্ঞা অর্থাৎ পারস্পরিক সহযোগিতার অভাব সমাজ প্রগতির দুয়ার রুদ্ধ করে দেয়।[২০]

নারীর অবস্থা ঃ

কোন সভ্যতার মানদণ্ড নির্ধারিত হতে পারে নারীজাতির প্রতি সেই জাতির দৃষ্টিভঙ্গী ও ব্যবহারের মাধ্যমে। এ যুগের বাঙালী নারীজাতি সম্বন্ধে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমপূর্ণ ব্যবহার করত না। গোলাম হোসেন ও ভেরেলস্ট উল্লেখ করেছেন পুরুষরা স্ত্রী জাতির ওপর কর্তৃত্ব করত। হিন্দু ও মুসলমান মহিলাদের জন্য পর্দা ও অন্দরমহলের ব্যবস্থা ছিল।[২১] নারীজাতির বিশেষতঃ পল্লী অঞ্চলে স্বাধীন অস্তিত্ব স্বীকার করা হ'ত না। ক্রীতদাসের মত নারীদের এক প্রভুর কাছ থেকে অন্য প্রভুর কাছে চালান করা হ'ত। হিন্দুনারীদের পিতা বা স্বামীর সম্পত্তিতে অধিকার ছিল না। মুসলমান মহিলাদের পিতা ও স্বামীর সম্পত্তিতে অধিকার ছিল। তাদের বিধবা বিবাহে বাধা না থাকলেও অতিতুচ্ছ কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটত। বাংলার হিন্দু নারীদের জীবন বড় দুঃখের বলে কবি ভারতচন্দ্র লিখেছেন। অথচ সংসারের বহু মানুষ ও বহু কাজের ভার তাদের বহন করতে হ'ত।[২২] পক্ষান্তরে আলেকজাণ্ডার ডাও উল্লেখ করেছেন— 'ভারতে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক নারীজাতিকে পবিত্র মনে করত। সৈনিকরা হত্যা ও ধ্বংসের মধ্যে মহিলাদের স্পর্শ করত না।[২৩] এ যুগে নাটোরের রাণীভবানী, কবি আনন্দময়ী, জিন্নাতুন্নেসা বেগম এবং অন্যান্য কয়েকজন অসাধারণ মহিলা ছিলেন। তবে সমাজে বিশেষত পল্লী সমাজে এঁদের প্রভাব গভীর ছিল না।

হিন্দু ও মুসলমান সমাজে শিশু বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। এটা পল্লীসমাজে ব্যাপক দেখা যেত। অল্পবয়সেই মহিলারা বৃদ্ধা হয়ে যেতেন। মুসলমানেরা একাধিক পত্নী গ্রহণ করতেন। অভিজাত ও উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে সাধারণত বহুবিবাহের উদাহরণ দেখা যায়। বিধবা-বিবাহ ও আত্মীয়ের সঙ্গে বিবাহ হিন্দু সমাজে নিষিদ্ধ ছিল। রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র এবং বিদেশীদের লেখায়, সতীদাহ

২০. হান্টার ঐ প্রথম খণ্ড পৃ. ১৩৮।

২১. গোলাম গোসেন, দি সিয়ার মুতাক্ষরীণ, ইং অনুবাদ মঁশিয়ে রেমণ্ড, ১৯০২, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা; ১৯১। ভেরেলস্ট এইচ. এভিউ অব দি রাইজ, প্রগ্রেস এণ্ড প্রেজেন্ট স্টেট অব' ইংলিশ গভর্ণমেন্ট ইন বেঙ্গল, ১৭৭২, পৃ. ১৩৮।

২২. ভারতচন্দ্র, রায়গুনাকর গ্রন্থাবলী বসুমতী সং পৃ. ২২২, ২২৯।

২৩. ডাও, আলেকজাণ্ডার, দি হিস্ট্রি অব হিন্দুস্তান, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৫। ১৭৭০

প্রথার উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৭৪৩ খ্রীঃ ইংরেজদের কাশিম বাজারের কুঠির সামনেই একজন বিধবা সতী হন।[২৪] ঢাকার মহারাজ রাজবল্লভ সেন বাংলায় বিধবা বিবাহ প্রচলনের প্রচেষ্টা করেছিলেন। বাংলার পণ্ডিতদের একাংশ বিধবা বিবাহে সম্মতি দিয়েছিলেন কিন্তু রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নেতৃত্বে নবদ্বীপের পণ্ডিতরা বিধবা বিবাহে আপত্তি জানালেন। রানী ভবানী হিন্দু বিধবাদের জীবনের কঠোরতা হ্রাসের চেষ্টা করেন। তাঁর সংস্কার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় কৃষ্ণচন্দ্র সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন—"...একদশী তিথিতে দুঃখিনী বিধবাদিগের পক্ষে উপবাসের অনুকম্পা বিধান, তাহাদের অশেষ ক্লেশকর 'বৈধব্য যন্ত্রণা বিমোচন' অথবা 'সহমরণ' এবং বহু বিবাহ ও 'বাল্য পরিণয় প্রথা' অপনয়ন প্রভৃতি অত্যাবশ্যক বিষয়ে প্রবৃত্ত না হইয়া কেবল এই তিথিতে, এই মাসে, এই বারে এই দ্রব্য ভক্ষণে নিষেধ ইত্যাদি যৎসামান্য বিষয়েই ব্যাপৃত থাকিতেন।"[২৫]

কৃষি ও শিল্প :

গঙ্গা ও পদ্মার পলিমাটি দিয়ে গড়া গ্রামে গ্রামে কৃষিকাজই ছিল মানুষের প্রধান অবলম্বন। আলেকজাণ্ডার ডাও লিখেছেন— "প্রকৃতি যেন বাংলাকে নিজহাতে কৃষি ও কৃষি কাজের জন্য প্রস্তুত করেছেন। কৃষির উপযোগী সবকিছু বাংলায় আছে।"[২৬] ধান, গম, রবিশস্য প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হত। গ্রামের কৃষকরা উদয়াস্ত পরিশ্রম করে বাংলাকে আক্ষরিক অর্থে সোনার বাংলা করে রেখেছিল। তার সাক্ষ্য বহন করছে সমসাময়িক সাহিত্য, বিদেশীকের রচনা ও অন্যান্য সূত্র।

উৎপাদন পদ্ধতি ও পরিমাণে বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। ভূমিবন্দোবস্তের ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন দেখা যায় না। মুর্শিদকুলী খাঁ পতিত জমি চাষের আওতায় আনার চেষ্টা করেছেন। কিছু সরকারী ঋণের ব্যবস্থা করেছিলেন। দুর্ভিক্ষের সময় তিনি কৃষকদের খাজনা মুকুব করে দিতেন। মারাঠা আক্রমণের পর আলিবর্দী বাংলার বিধ্বস্ত গ্রাম ও কৃষি গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। জমিদাররা ছিল রায়তদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। এ সময় বাংলায় খাদ্যশস্যে ঘাটতি দেখা দেয়। ১৭১১ খ্রীঃ দুর্ভিক্ষে কয়েক হাজার লোক মারা যায়।[২৭] কৃষির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল গ্রামীণ শিল্প। হস্ত হস্তশিল্পীরা পছন্দমত পণ্য উৎপাদন করত এবং ইচ্ছামত দামে বিক্রি করত। কুটির শিল্পের ক্ষেত্রে কারিগর, বণিক, মহাজন বা দালালদের

২৪. ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী, ঐ, পৃ. ২৪।
২৫. রায়, কর্ত্তিকেয়চন্দ্র; 'ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিত' কলকাতা ১৯৩২, পৃ. ৫৩-৫৪।
২৬. ডাও— ঐ ১ম খণ্ড পৃ. ১৩৬।
২৭. ডায়েরি এণ্ড কন্সালটেশন বুক, ১৭১১।

কাছ থেকে আগাম নিত এবং নির্দিষ্ট সময়ে ও দামে পণ্য যোগান দিত। বস্ত্র শিল্পে ঢাকার তাঁতীদের নাম জগৎ বিখ্যাত। তাঁরা অতি সূক্ষ্ম মসলিন তৈরী করত। পল্লীবাসীদের চাহিদা অনুযায়ী লবন থেকে শুরু করে সমস্ত প্রয়োজনীয় পণ্য উৎপাদিত হত। বাংলার কৃষিপণ্য ইউরোপে রপ্তানি হত না। চাল, চিনি, ডাল নীল, লংকা প্রভৃতি ভারতের অন্যান্য প্রদেশে এবং এশিয়ার দেশগুলিতে কিছু কিছু রপ্তানী করা হত। পল্লীবাসীরা বস্ত্রবয়নে কিভাবে লিপ্ত থাকত, তা নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি থেকে সুস্পষ্ট হয়—"বাংলার প্রতিটি গ্রামের পুরুষ, নারী ও শিশুরা বস্ত্রবয়নে নিযুক্ত থাকত। এ যুগের পর্যটকদের বিবরণে দেখা যায় শহর ছেড়ে গ্রামের দিকে পা বাড়ালেই চোখে পড়ত গ্রামের লোক— পুরুষ, নারী, শিশু নির্বিশেষে—সুতাকাটা বা বয়নে নিযুক্ত। তবে এ যুগে বাংলার তাঁতীদের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য তেমন ছিল না। বরং বলা যায় ওরা ছিল বেশ গরীব। ওরমেও এরকম অভিমত ব্যক্ত করেছেন। মহাজন, দালাল ও রাজকর্মচারীদের দ্বারা ওরা নিগৃহীত ও শোষিত হত।" (সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রাক্-পলাশী বাংলা, ১৯৮২, পৃ. ৩৮)

শিক্ষা ব্যবস্থা ঃ

১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের এ্যাডাম রিপোর্টে বাংলা ও বিহারে এক লক্ষেরও বেশি স্কুলের কথা জানা যায়। ১৮০২ সনে বর্ধমানের ম্যাজিস্ট্রেট বলেন ঐ সময়ে বর্ধমানে এমন কোন গ্রাম ছিল না যেখানে স্কুল নেই।[২৮] বাংলাদেশে গ্রামীণ পাঠশালা ব্যবস্থা নবাবী আমলে গড়ে উঠেছিল। নবাবরা বিদ্যানুরাগী ছিলেন। প্রাক্-পলাশী যুগে নবাব, জমিদার এবং অভিজাতরা বিদ্যালয়, ছাত্র ও শিক্ষকদের জন্য নিষ্কর জমি দান করতেন। নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র নিজের জমিদারির মধ্যে সংস্কৃত চতুষ্পাঠী ও টোল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। জমিদারির বাইরেও তিনি শিক্ষায় উৎসাহও সাহায্য দিতেন। বর্ধমানের রাজা কীর্তিচাঁদ ও তিলকচাঁদ, বীরভূমে আসাদুল্লাহ ও বদিউজ্জমান খানের পরিবার, নাটোর রমাকান্ত ও তাঁর স্ত্রী রাণী ভবানী, বিষ্ণুপুরের মল্লরাজা গোপাল সিংহ ও চৈতন্য সিংহ এবং রাজনগরের রাজবল্লভ সেন বিদ্যোৎসাহী ছিলেন।

একথা অনস্বীকার্য তখন কোন সুশৃঙ্খল শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল না। গ্রামে গ্রামে তিন ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন দেখা যায়। এক. হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রদের জন্য মিশ্র প্রাথমিক শিক্ষার জন্য পাঠশালা ও তোলবাখানা। দুই. মুসলমান ছাত্রদের জন্য মক্তব ও মাদ্রাসা এবং তিন. হিন্দু ছাত্রদের সংস্কৃত শিক্ষার জন্য চতুষ্পাঠী ও টোল।

২৮. জে. সি. কে. পিটারসন, 'বর্ধমান ডিস্ট্রিক গেজেটিয়ার, (১৯১০) পৃ. ১৭২-১৭৪।

গ্রামবাংলার শতকরা আশি ভাগ হিন্দুমুসলমান ছাত্রের শিক্ষার সমাপ্তি হত পাঠশালা ও তোলবা খানায়। পাঁচবছর বয়সে পাঠশালায় পাঠশুরু হত এবং দশ এগার বছরে শিক্ষার সমাপ্তি ঘটত। আট বছর পূর্ণ না হলে অভিভাবকরা হিন্দু বালিকাদের পাঠশালায় পাঠাতো না। মুসলমান বালিকারা গ্রাম্য পাঠশালায় পড়তে আসত না। অভিজাত মুসলমান পরিবারের কন্যাদের গৃহ শিক্ষকের কাছে পাঠের ব্যবস্থা করা হত। সাধারণত ব্রাহ্মণ বা কায়স্থ বর্গের ব্যক্তিরা পাঠশালায় গুরু হবার দায়িত্ব পেতেন।[২৯] চাষবাসের হিসাব, ব্যবসা-বাণিজ্য, জমিদারির হিসাব রাখা ইত্যাদি সামাজিক প্রয়োজনে কিছু কিছু অঙ্ক শেখানো হত। বাংলাদেশে মুখে মুখে অঙ্ক শেখানোর রীতি শুভঙ্করের (ভৃগুরাম দাস) আগে থেকেই প্রচলিত ছিল।[৩০] অক্ষর পরিচিতি পড়া ও লেখা শেখান হত পাঠশালায়। মুদ্রিত বই বা শ্লেট ছিল না। তালপাতায়, কলাপাতা, বা বালিতে আঙুল দিয়ে, বা মাটিতে খড়ি দিয়ে লেখার প্রচলন ছিল। বাংলা পাঠশালা ছাড়া 'তোলবা খানায়' হিন্দু মুসলমান ছাত্রদেরা আরবী, ফারসী এবং বাংলা শেখানো হ'ত। বাড়িতে বাংলা রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত পুরাণের বাংলা অনুবাদ পাঠ এবং কথকতা, পাঁচালী, পল্লীগাথা ও গীতিকাব্য শোনার প্রচলন ছিল। অক্ষর পরিচিতি পড়া ও লেখা শেখানো হত পাঠশালায়। মুদ্রিত বই বা, শ্লেট ছিল না। তালপাতায়, কলাপাতা, বা বালিতে আঙ‍ুল দিয়ে, বা মাটিতে খড়ি দিয়ে লেখার প্রচলন ছিল। বাংলা পাঠশালা ছাড়া তোলবা খানায় হিন্দু-মুসলমান ছাত্রদের আরবী, ফারসী এবং বাংলা শেখানো হ'ত। বাড়িতে বাংলা রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত পুরাণের বাংলা অনুবাদ পাঠ এবং কথকতা, পাঁচালী, পল্লীগাথা ও গীতিকাব্য শোনার প্রচলন ছিল। সুফী, দরবেশ, ফকির, ব্রাহ্মণ ঠাকুর, বৈষ্ণব সহজিয়া, আউল, বাউল প্রভৃতি গ্রামে গ্রামে ধর্ম, নৈতিকতা, ইহলোক, পরলোক সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন।

বাংলার মধ্য ও পূর্বাঞ্চল ছিল মুসলমান প্রধান. পশ্চিমাঞ্চল হিন্দু-প্রধান। কয়েকটি মুসলমান প্রধান গ্রাম নিয়ে আমির ও ধনী মুসলমানদের বদান্যতায় মাদ্রাসা মুসলমান বালকদের জন্য গড়ে উঠত। এইগুলিতে ছাত্রদের আরবী, উর্দু, ও ফারসী বর্ণমালা লিখতে পড়তে শেখানে হত, প্রাথমিক অঙ্ক শেখানো হ'ত এবং ইসলামী ধর্ম শাস্ত্রের প্রাথমিক পরিচয় করিয়ে দেওয়া হত। ছাত্ররা তালপাতা, কলাপাতা ছাড়া দেশী কাগজে, দেশী কালিতে খাগ ও কঞ্চির কলম দিয়ে লিখত।

বাংলার হিন্দু জমিদাররা সংস্কৃত শিক্ষার জন্য টোল ও চতুষ্পাঠী স্থাপন করতেন। ছাত্ররা শিক্ষকদের সঙ্গে বাস করত। শিক্ষকদের অনেকেই ছিলেন

২৯. ক্রফার্ড ঃ "স্কেচেস অব দি হিন্দুস"— ২য় খণ্ড ১৭৯০, পৃ. ১২-১৩।
৩০. প্রাক্ পলাশী বাংলা, সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়, কলকাতা, ১৯৮২, পৃ. ১০৭

জাগতিক সুখ-দুঃখ ও অন্যান্য ব্যাপারে উদাসীন। রাজকার্যে বাংলাভাষা ব্যবহৃত হত না। ত্রিপুরা, কোচবিহার এবং আসামে বাংলা ভাষার ব্যবহার দেখা যায়। দলিল, দস্তাবেজ চিঠি, বৈষ্ণব সাহিত্যে বাংলা গদ্য লেখার প্রচলন থাকলেও এ সময় বাংলা গদ্য সাহিত্য উচ্চভাব প্রকাশের ক্ষমতা অর্জন করেনি।[৩১]

বাঙালীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ঃ

বাঙালীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও নৈতিক মান সম্বন্ধে বিদেশীরা তেমন উচ্চ মনোভাব পোষণ করতেন না। ক্লাইভ একটি চিঠিতে হিন্দু মুসলমান উভয় শ্রেণীর বাঙালীকে 'অলস, বিলাসী, অজ্ঞ এবং কাপুরুষ' বলেছেন।[৩২] ল্যুক স্ক্র্যাফটন উল্লেখ করেছেন— "আনুগত্য ও দেশপ্রেম বাঙালীর অজানা। অথচ এ দুটি গুণই মানুষের যা কিছু মহৎ এবং শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির পেছনে অনুপ্রেরণা হিসাবে কাজ করে। বাঙালীরা অনুগত থাকে ততক্ষণ যতক্ষণ তাদের মনে ভয় থাকে; ভয়ের সঙ্গে আনুগত্যও উঠে যায়। টাকা এখানে 'শক্তির উৎস, কারণ সৈন্যরা টাকা ছাড়া আর কোন বন্ধন স্বীকার করে না। সুতরাং যার যত টাকা সে তত শক্তিশালী।"[৩৩] গোলাম হোসেনের মতে বাংলার জমিদাররা প্রভাবশালী এবং বিদ্রোহপ্রবণ। কিন্তু রাষ্ট্র বিপ্লব সাধারণ গ্রামবাসীকে একেবারেই স্পর্শ করত না। কার হাতে ক্ষমতা গেল বা কোন শাসক ক্ষমতাচ্যুত হলেন এসব নিয়ে বাংলার কৃষক, শ্রমিক, ব্যবসায়ী, কারিগর মাথা ঘামাত না। গোলাম হোসেন উল্লেখ করেছেন— 'এরা নেহাতই ভীরু, নিরীহ, কাপুরুষ ও গোবেচারা; ভয়ে আনত ভাবে জীবন কাটাত যে টাকা দেয়' তারই কাছে আত্মসমর্পণ করে।[৩৪] এমনকি ওয়ারেন হেস্টিংস লিখেছেন— "সারা উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে একমাত্র মারাঠাদের মধ্যে ঐক্যের বন্ধন আছে। অন্য কোনো জাতির মধ্যে নেই।"[৩৫] বিদেশীদের পর্যবেক্ষণের মধ্যে কিছুটা অতিশয়োক্তি থাকলেও বলা যায় কোন সাধারণ আদর্শ বাঙালীকে ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ করতে পারেনি। গ্রামগঞ্জের সাধারণ মানুষ রাজনৈতিক বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল। ব্যক্তি স্বার্থ, লোভ, বিশৃঙ্খলা, ষড়যন্ত্র সব কিছুর সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছে পলাশীর প্রান্তরে।

পলাশীর প্রান্তরে বাংলার স্বাধীনতা—সূর্যাস্তের পর বাংলার গ্রামীণ সমাজে নতুন পরিবর্তনের গতি সঞ্চারিত হয়। পরিবর্তনের গতি ছিল খুবই মন্থর। বিনয়

৩১. দীনেশচন্দ্র সেন, 'বৃহৎবঙ্গ', ১৯৩৫, ২য় খণ্ড, পৃ. ১১১১-১১১২।
৩২. ফরেস্ট, লাইফ অব ক্লাইভ'-২য় খণ্ড, পৃ. ১২০। ৩০ শে ডিসেম্বর, ১৭৫৮।
৩৩. স্ক্র্যাফটন ল্যুক—রিফ্লেকশনস ইন দি গভর্ণমেন্ট অব ইন্দোস্তান, ১৭৬৩। পৃ. ৩০।
৩৪. 'সিয়ার' ২য় খণ্ড, পৃ. ৭।
৩৫. ওয়ারেন হেস্টিংস, মেমোয়ার্স (১৭৮৬) পৃ. ৮৯।

ঘোষের ভাষায়—"পরিবর্তনের স্রোত যত দ্রুত নাগরিক সমাজে প্রবাহিত হয়, গ্রাম্য সমাজে তা হয় না। নাগরিক সমাজ গতিশীল জীবনের ঘাত প্রতিঘাত, দ্বন্দ্ব-বিরোধের শব্দ-প্রতিশব্দে মুখর, কিন্তু গ্রাম্য সমাজ গ্রাম্য রাত্রির মতো স্থির শান্ত ও অচঞ্চল।.......বাংলাদেশের গ্রাম্য সমাজের এই শান্ত স্থির অচঞ্চলতা শতাব্দীর পর শতাব্দী অক্ষুণ্ণ ছিল।"[৩৬] ১৭৬৫ সালে সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্ আলম ইংরেজ কোম্পানিকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ান নিযুক্ত করে ফরমান দিলেন। ফলে সুবে বাংলার রাজস্ব আদায়ের ভারও ইংরেজরা পেল। এ সময় থেকে ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন পর্যন্ত প্রায় আঠাশ বছর ধরে বাংলার জমিদারদের সম্বন্ধে বিদেশীদের ধারণা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ইংরেজ শাসকদের একাধিক রিপোর্টে "নির্বোধ, উচ্ছৃঙ্খল বিলাসী অমিতব্যয়ী স্বেচ্ছাধারী নিষ্ঠুর স্বার্থপর ডাকাত পোষক —এগুলি হল জমিদারদের বিশেষণ। এই জমিদার শ্রেণীর হাতে ইংরেজ শাসকরা বাংলার গ্রাম্য সমাজের সমস্ত দায়িত্ব অর্পণ করে নিশ্চিন্ত হলেন।"[৩৭] চিরদিনের বিলাসী চরিত্র এবং শৈথিল্যের জন্য অধিকাংশ জমিদাররা নির্দিষ্ট দিনে সরকারকে রাজস্ব দিতে পারেনি। জমিদাররা এবং কৃষকরা ইংরেজদের কৌশলে শোচনীয় দুরবস্থায় পড়েছিল। ১৭৭০ সালের দুর্ভিক্ষের ফলে বাংলার গ্রামগুলি প্রায় শ্মশানে পরিণত হয়। দুর্ভিক্ষের পরে দেখা যায় বাংলার কৃষকদের প্রায় এক তৃতীয়াংশ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে এবং পুরানো জমিদাররা ধ্বংসের মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়। বাংলার জমিদাররা রাজস্ব পরিশোধের ব্যাপারে সূর্যাস্ত আইনের মত কঠিন ব্যবস্থা মেনে চলতে অভ্যস্ত ছিলেন না। অসংখ্য জমিদারী নিলামে বিক্রি হয়ে গেল। শহরের বণিকশ্রেণী শহরে ও গ্রামে সম্পত্তি ক্রয়- করতে থাকেন। নাগরিক বিলাসিতায় অভ্যস্ত জমিদারদের গ্রামের সঙ্গে কোন নাড়ির যোগ ছিল না।

জাস্টিস জজ ক্যাম্বেল (১ জুন, ১৮৬৪) উল্লেখ করেছেন—"........তিনি (জমিদার) নিজে চাষতো করেনই না, চাষের উন্নতির জন্য কোন নতুন উন্নত কলাকৌশলও প্রয়োগ করতে প্রয়াসী হন না।.....তিনি শুধু চাষীদের নিজেদের খরচে চাষ করার অনুমতি দেন এবং খাজনা ও অন্যান্য যা-কিছু তাঁর নিজের পাওনা তা কড়া গণ্ডায় আদায় করেন, যতটা পারেন বেশি করে আদায় করার চেষ্টা করেন।" এভাবে সমসাময়িক মিশনারী, রাজকর্মচারী ও সাময়িক পত্র-পত্রিকায় একটি সাধারণ বক্তব্য ছিল যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে চাষীর সর্বনাশ হয়েছে, চাষের অবনতি হয়েছে এবং পল্লী ও পল্লীসমাজ ধ্বংসের পথে এগিয়ে

৩৬. বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা, ১৯৭০, কলকাতা; পৃ. ২ বিনয় ঘোষ।
৩৭. ঐ পৃ. ১৮।

গেছে। রেভারেণ্ড আলেকজাণ্ডার ডাও এবং বিশ জন মিশনারী (১৮৭৫ খ্রীঃ) কৃষকদের সঙ্গে জমিদারদের সম্পর্ক বর্ণনা করেছেন—"জমিদাররা চাষীদের সঙ্গে ব্যবহার করেন ঠিক প্রজাদের মতো নয়, কতকটা ক্রীতদাসের মতো। তাঁরা নিজেদের রাজামহারাজাদের মতো মনে করেন। প্রজাদের কাছে খাজনাদি যা তাঁদের ন্যায্য পাওনা, তার চেয়ে অনেক বেশি তাঁরা কৌশলে আদায় করে এবং বিনা পারিশ্রমিকে, নিজের নানা রকমের কাজে প্রজাদের খাটিয়ে নেন। তা ছাড়া অত্যাচার যে কত রকমের করেন তা বলে শেষ করা যায় না।"[৩৮] জমিদাররা গ্রামের চাষীদের ওপর কত রকম নির্দয় শারীরিক অত্যাচার করত তার ১৮ দফা তালিকা প্রকাশ করেন। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'। এই পত্রিকা থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন সমাজবিজ্ঞানী বিজয় ঘোষ।[৩৯]

১। দণ্ডাঘাত ও বেত্রাঘাত। ২। চর্মপাদুকা প্রহার। ৩। বংশ কাষ্ঠাদি দ্বারা রক্ষঃস্থল দলন। ৪। ঘাঘরা দিয়ে কর্ণ ও নাসিকা মর্দন। ৫। ভূমিতে নাসিকা ঘর্ষণ। ৬। পিঠে দুই হাত মোড়া দিয়ে বেঁধে বংশদণ্ড দিয়ে মোচড় দেওয়া। ৭। গায়ে বিছুটি দেওয়া। ৮। হাত পা শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা। ৯। কানধরে দৌড় করানো। ১০। কাঁটা দিয়ে হাত দলন করা। দু'খানা কাঠের বা খারির একদিক বেঁধে তার মধ্যে হাত রেখে মর্দন করা। এই যন্ত্রটির নাম 'কাটা' ১১। গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড রোদে ইঁটের উপর পা ফাঁক করে দুহাতে ইট দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখা। ১২। প্রবল শীতের সময় জলে চোবানো। ১৩। গোণ্ডী বদ্ধ করে জলমগ্ন করা। ১৪। গাছে বা অন্যত্র বেঁধে টান দেওয়া। ১৫। ভাদ্র আশ্বিন মাসে ধানের গোলায় পুরে রাখা। ১৬। চুনের ঘরে বন্ধ করে রাখা। ১৭। কারারুদ্ধ করে উপবাসী রাখা। ১৮। ঘরের মধ্যে বন্ধ করে লঙ্কা মরীচের ধোঁয়া দেওয়া।

গ্রাম্য মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ঃ

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর বাংলার অর্থপিশাচ স্বার্থপর হৃদয়হীন জমিদাররা ইংরেজদের রাজস্বের ঠিকাদারে পরিণত হয়েছিলেন। এঁদের অধীনে অসংখ্য উপঠিকাদার বা মধ্যস্বত্ত্বভোগী মধ্যশ্রেণীর বিকাশ গ্রাম সমাজে এক বিরাট অভিশাপ রূপে দেখা দেয়। নির্দিষ্ট দেয় ভূমিরাজস্ব এবং জমির অর্থনৈতিক খাজনার মধ্যে ব্যবধানের জন্য এই অস্বাস্থ্যকর উপসামন্ততন্ত্রের সৃষ্টি হয়। বাখরগঞ্জ জেলায় একটি মাত্র ভূসম্পত্তিতে জমিদার এবং কৃষকদের মধ্যে একজনের অধীনে আর একজন করে ত্রিশজন মধ্যস্বত্ত্বভোগীর অস্তিত্ব দেখা যায়। এই সব মধ্যস্বত্ত্বভোগী ও জমিদারদের আয়ের উৎস ছিল হতভাগ্য কৃষকদের খাজনা। মধ্যস্বত্ত্বভোগীদের

৩৮. The Zemindary Setlement of Bengal (*ZSB*) Cal, 1879, app. iv.
৩৯. বিনয় ঘোষ, বাংলায় সামাজিক ইতিহাসের ধারা ১৯৭০, কলকাতা, পৃ. ২৩-২৪।

শোষণ ও অত্যাচারের অসংখ্য হৃদয়হীন বর্ণনা সমসাময়িক পত্রিকায় আলোচিত হয়েছে। বিনয় ঘোষ তাঁর 'বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা'য় এগুলি উদ্ধৃত করেছেন। 'সংবাদ প্রভাকর' অগ্রহায়ণ ১২৯৯ সংখ্যায় উল্লেখ করেছে— "গভর্ণমেন্টের নিয়মিত রাজস্ব প্রদান করিয়া কেবল জমিদারেরাই ভূমির উৎপন্নের লাভাংশ ভোগ করিয়া থাকেন এমত নহে, জমিদার দিগের অধীনে যে সমস্ত তালুকদার ও পত্তনিদার, ইজারাদার প্রভৃতি আছেন, তাঁহারা কৃষকের শ্রমোৎপাদিত দ্রব্যাদির প্রতি আপনাপন সুখসেবা ও সংসার যাত্রা নির্বাহ করণের সম্যক নির্ভর করিয়া থাকেন অর্থাৎ কৃষকদিগের আপনাপন শ্রমার্জ্জিত ধন দিয়া এই সকল লোকের ও পুষ্টিবর্ধন করিতে হয়।"

ইংরেজ বিচার ব্যবস্থার বিকাশের ফলে পল্লীসমাজে এক নতুন শ্রেণীর উৎপত্তি হয়। এঁদেরকে মামলা বিশারদ বা দালাল বলা যায়।.....ইঁহারা তীর্থের কাকের ন্যায় আদালতের পার্শ্বে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং নির্বোধ লোক দেখিলেই কিঞ্চিৎ লাভ করিবার চেষ্টায় থাকে। মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে, জাল মকর্দ্দমা প্রস্তুত করিতে, উকীল, সাক্ষী প্রভৃতি বন্দোবস্ত করিতে ইহারা বড় পটু। ইহারা একজনের পক্ষ লইয়া অপরের সর্বনাশ করে, আবার সুযোগ পাইলে প্রথম ব্যক্তির সর্বনাশের চেষ্টা পায়।[৪০]

নীলচাষ ও নীলকরদের অত্যাচার ঃ

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর ইংরেজরা বাংলার গ্রামে গ্রামে বাণিজ্যিক কৃষি প্রবর্তনের উদ্যোগ শুরু করে। খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিবর্তে তাঁরা নীল, আফিম, পাট প্রভৃতি বাণিজ্য ফসল বাংলার মাটিতে দরিদ্র চাষী মজুরের সুলভ মজুরীতে উৎপন্ন করে ইংল্যাণ্ড ও অন্যত্র রপ্তানি করে, প্রচুর মুনাফা অর্জন করা সম্ভব— এ সত্যটি ইংরেজ ব্যবসায়ীরা উপলব্ধি করে। আফিম, পাট, এবং চা উৎপাদন করে এই সব ব্যবসায়ীরা প্রচুর মুনাফা অর্জন করতেন। বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে নীলকর সাহেবরা শুধু ব্যবসায়ী হিসেবে নয়, অত্যাচারী জমিদার রূপেও আবির্ভূত হয়েছিলেন। ১৭৭০ থেকে ১৭৮০ সালের মধ্যে যে নীলচাষ শুরু হয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম চতুর্থাংশের মধ্যে তা ব্যাপক বিস্তার লাভ করে। বাংলার এমন কোন জেলা নেই যেখানে নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের কথা ভয়াবহ জনকাহিনীতে পরিণত হয়নি। ১৭৯৫-৯৬ থেকে ১৮০৪-৫ সালে বার্ষিক চব্বিশ হাজার থেকে বাষট্টি হাজার মণ নীল উৎপন্ন হয়। চাষীদের থেকে কম দামে নীল ক্রয় করে তিন চারগুণ বেশী দামে লণ্ডনের বাজারে বিক্রয় করা হত। ১৮১৯ থেকে ১৮২৭ সালের মধ্যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ৪৫ লক্ষ টাকা মুনাফা অর্জন

৪০. বিনয় ঘোষ, সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজ চিত্র ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৯৭-৯৮।

করে।[৪১] 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকায় (২ বৈশাখ, ১২৬৯) নীলকর মরে সাহেবের অত্যাচারের রোমাঞ্চকর বিবরণ প্রকাশ করে। এই দুরাত্মা, নির্দয়, নিষ্ঠুর মরে সাহেবের জন্য "প্রজাদিগের নির্বাসন, ভ্রূণহত্যা, স্ত্রীহত্যা, বাল্যহত্যা, বলাৎকার, জালকারিতা প্রভৃতি" শিরোনাম ব্যবহার করা হয়। বিনয় ঘোষ বলেছেন—"মনে হয় সারা পৃথিবীর স্বেচ্ছাচারিতায় ইতিহাসে বাংলাদেশের নীলকর সাহেবরা যেন শীর্ষস্থান অধিকার করে আছেন।"[৪২]

গ্রামীণ শিল্পের অবনতি ঃ

প্রাক্-পলাশী যুগে বাংলার কৃষি ও শিল্প ছিল অবিচ্ছিন্ন। ব্যবহারগত মূল্যের উপরই প্রধানত হস্তশিল্পী ও কারিগরদের ভাগ্য গড়ে উঠেছিল। নবাব ও রাজাদের দরবারের পৃষ্ঠপোষকতা তাদের অস্তিত্বকে রক্ষা করত। বিনিময় অর্থনীতির আবির্ভাবে অভিজাত শ্রেণীর রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গির দ্রুত পরিবর্তন দেখা দেয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে গ্রাম্য অভিজাত শ্রেণীরা বেশীরভাগ শহরের দালাল-বেনিয়ান-দেওয়ান শ্রেণীর লোক ছিলেন। তাঁদের অনুপার্জিত আয়ে এই সব City Capitalisht (কার্ল মাকর্স এর ভাষায়) বিদেশী জিনিষের প্রতি আকৃষ্ট হলেন। বিদেশী কারখানায় প্রস্তুত শিল্পের উৎপাদিত পণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দেশীয় শিল্পের পরাজয়, পুরাতন শহরগুলিতে জনসংখ্যা হ্রাস এবং নতুন নতুন শহরের উদ্ভব ও লোক সংখ্যা বৃদ্ধি, বিদেশী দ্রব্যের চাকচিক্যের প্রতি অনুরাগ কারণগুলি বাংলার হস্তশিল্প ও কারিগরদের অবনতির প্রধান কারণ বলা যায়।

পরবর্তীকালে (১৮৫৪-১৮৬০ সাল) ব্রিটিশ কোম্পানীগুলি কর্তৃক ভারতে রেলপথ স্থাপন দেশীয় শিল্পের পত্তন ত্বরান্বিত করে। রেলপথ প্রবর্তন এবং অর্ন্তবাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যের বিকাশ বাণিজ্যিক শস্যের ক্ষেত্রে বিশেষিকরণ ঘটিয়েছে। কৃষক সমাজ গ্রামীণ কারিগর ও তাঁতী প্রভৃতিদের শিল্পদ্রব্য থেকে বঞ্চিত হয়। বন্দর ও রাস্তাঘাট ও যানবাহন ব্যবস্থার দ্রুত প্রসার ঘটলে বিদেশী পণ্য ভারতীয় গ্রাম ও শহরের বাজার দখল করতে থাকে। আর ভারতীয় কাঁচামাল রপ্তানি হতে থাকে বিদেশে। "অবিস্মরণীয় কাল থেকে দুনিয়ার সূতিমালের বৃহৎ কারখানা ভারতবর্ষ এবার ভেসে গেল ইংরেজী টুইস্ট ও সূতীবস্ত্রে। ভারতের নিজস্ব উৎপন্নকে ইংলণ্ড থেকে বহিষ্কৃত করা বা কেবল অতি কঠোর শর্তে প্রবেশানুমতি দেবার পর ব্রিটিশ কারখানা-মাল অল্প এবং নামমাত্র

৪১. John Phlipps · A series of the Principal Products of Bengal, cal-1832, পৃ. ৫৯।

৪২. বিনয় ঘোষ ঃ ঐ পৃ. ৩৭।

শুল্ক প্লাবিত হতে থাকল। ভারতে যার ফলে তার একদা অতো বিখ্যাত সূতীবস্ত্রের ধ্বংস"[৪৩]

পল্লীসমাজের রূপান্তর ঃ

নতুন সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা বণিকসুলভ মনোভাব, বিনিময় প্রথার উদ্ভব, অবাধ বাণিজ্য, প্রতিযোগিতামূলক বাজার, টাকার বিচারে মর্যাদার তারতম্য—এককথায় সামন্ত সমাজ থেকে ধনতান্ত্রিক সমাজে যাত্রাপথে পল্লীসমাজের এক মৌলিক রূপান্তর ঘটে। ভারতের সমাজ জীবনে অনধিকার প্রবেশ করে ব্রিটিশরা চরকা ও তাঁত ধ্বংস করেছেন। সার্কস এর ভাষায় 'It was the British intruder who broke up the Indian handloom and destroyed the spining wheel"[৪৪] বিট্রিশরা তাঁদের অজ্ঞাতসারেই একটা বড় রকমের সামাজিক বিপ্লবের সূচনা করেছিলেন।

ব্রিটিশ নীতির ফলে গ্রামগুলি ক্রমশই অর্থবর্হির্ভূত ক্ষেত্র (Non Monetised sector) থেকে অর্থ অন্তর্ভুক্ত ক্ষেত্রে রূপান্তরিত হতে থাকে। টাকাসর্বস্ব মানসিকতার সৃষ্টি হতে থাকে। ফলে গ্রামসমাজের প্রয়োজনভিত্তিক অর্থনীতির বনিয়াদ ভেঙে যায়। বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবেও টাকার গুরুত্ব বৃদ্ধি পেলে দৃশ্য বস্তুর পরিবর্তে অদৃশ্য টাকার মূলধনের যখন আর কোন 'বাধা' রইল না তখন বিত্তশালী মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিরও বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়ে গেল। গ্রামের দরিদ্র সাধারণ মানুষরা ধীরে এবং পরোক্ষে এই প্রভাব থেকে মুক্তি পেল না। এশিয়া তথা ভারতীয় ও বাংলা গ্রামীণ সমাজের অচলতা ও স্থিতিশীলতা ব্রিটিশ শাসন ও শোষণ নীতির ফলে ভেঙে গেল। বিনিময় ভিত্তিক (Exchange Economy) অর্থনীতির স্বাভাবিক গতি হওয়া উচিত ছিল যন্ত্রচালিত শিল্পের বিকাশ। ঔপনিবেশিক স্বার্থে রূপান্তরের এই পথের গতি রুদ্ধ হল। প্রারম্ভিক পর্যায়ে লুণ্ঠন ও বাণিজ্য পুঁজি প্রসারেই ইংরেজদের নজর ছিল বেশী। তবে ব্রিটিশ আমলের বিনিময় ভিত্তিক অর্থনীতি গ্রামীণ সমাজের ভিত পর্যন্ত সজোরে নাড়া দিল।

প্রাচীন ঐতিহ্য, প্রথা রীতিনীতি, বদ্ধমূল ধারণা তথা গ্রামীণ জাতিভেদ, কুল বর্ণগত সংস্কার, ধর্ম ও শাস্ত্রগত সংস্কার প্রভৃতি সামাজিক অচলতা ও কূপমণ্ডুকতাকে সহজে ধ্বংস করতে দেয় না। তবুও উনবিংশ শতাব্দীতে সামাজিক

৪৩. এ সম্বন্ধে বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য— R.P. Dutt 'India Today' Manisha, Cal, 1986 Edn. এবং এন. কে. সিংহ, দি ইকনমিক হিস্ট্রি অব বেঙ্গল, তিন খণ্ড, কলকাতা—১৯৫৬-১৯৭০।

৪৪. প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধ, মার্কস এঙ্গেলস, বাংলা সং ১৯৭০, পৃ. ২৯।

গতিশীলতার একটি বিশেষ ধরনের প্রকৃতি লক্ষ্য করা যায়। 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকায় উল্লেখ আছে (২০ জৈষ্ঠ, ১২৭৫)। বিদ্যাদান কার্যের প্রাচুর্য, বাণিজ্যের উন্নতি ও রেলওয়ের সৃষ্টি এই তিনটিই পল্লীগ্রামের অবস্থার পরিবর্তনের প্রাধান কারণ।"[৪৫]

গ্রামের কৃষক-ক্ষেত মজুরেরা দলে দলে শহরে এসে দিনমজুর বা গৃহভৃত্যের জীবিকা গ্রহণ করেছেন, কারু শিল্পীরা কারখানার মজুরে রূপান্তরিত হয়েছেন। গ্রামীণ মধ্যস্বত্বভোগীরা কেউ কেউ শহরে চাকরি বা ব্যবসা শুরু করেছেন। কিন্তু যারা শহর মুখী হয়েছেন তাঁদের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ শহরবাসী হওয়া সম্ভব হয়নি (total urbanization)। আবার শহরে এসে দিনমজুর বা গৃহভৃত্য হ'লেন তাঁরাও সম্পূর্ণ সর্বহারা বা proletarianised হননি। বিনয় ঘোষের ভাষায়— "শহরবাসী প্রায় সকল শ্রেণীর লোকের এক পা ছিল গ্রামে, এক পা ছিল শহরে।"[৪৬] শহুরে চাকরীজীবি ও ব্যবসায়ীরা নাগরিক জীবনের প্রতিষ্ঠা, বিলাসিতা, শিক্ষাদীক্ষা ও সুখ স্বাচ্ছন্দের জন্য গ্রামের অনুপার্জিত আয়ের উপর নির্ভর করতেন। পক্ষান্তরে দিনমজুর, গৃহভৃত্য, কারখানা মজুর বা ছোট ব্যবসায়ীদের পক্ষে আর্থিক কারণেই স্থায়ী শহরবাসী হওয়া সম্ভব ছিল না। অথচ এঁদের মাধ্যমেই ধীরলয়ে আধুনিক চিন্তা ও নাগরিক জীবনের অনুপ্রবেশ ঘটেছে পল্লীসমাজে। বাংলার জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগী বিরাট-খুদে জমিদার গোষ্ঠী, বাংলার কৃষকও কারুশিল্পী, শহরের বাঁতা গ্রামে বহন করে নিয়ে গিয়েছেন। "এমনকি গ্রামের দরিদ্র কৃষক-ক্ষেতমজুর যাঁরা শহরে এসে দিনমজুর বা গৃহভৃত্য হয়েছেন, তাঁরাও গ্রামে ফিরে গিয়ে শহুরে জীবনের কত রূপ কথাই না গ্রামবাসীদের কাছে বর্ণনা করেছেন।"[৪৭]

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার পল্লীসমাজে যে পরিবর্তন সূচিত হয় তার সূত্রপাত ঘটেছিল নাগরিক সমাজে। এ সময় বাঙালীর ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাজনৈতিক চেতনা, স্বদেশপ্রেম প্রভৃতি ক্ষেত্রে যে সকল উন্নতি বাঙালীকে গৌরবের আসনে উন্নতি করেছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতে তার সম্ভাবনা দেখা যায়নি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরবর্তীকালে বাংলার সমাজে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখা দেয় তার আমরা মোটামুটি কয়েকটি উল্লেখ করতে পারি ঃ ১। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন ও প্রসার, ২। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব ৩। ধর্মীয় সংস্কার ৪। একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথার লোপ ৫। বৃত্তিভিত্তিক জাতির মধ্যে ঐক্য,

৪৫. বিনয় ঘোষ কর্তৃক উদ্ধৃত ঐ পৃ. ৪৩।

৪৬. সাময়িক পত্রে বাংলায় সমাজ চিত্র, বিনয় ঘোষ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২১৩ এবং বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা— ঐ পৃ. ৫০।

৪৭. বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা—ঐ. পৃ. ৪৯।

৬। আমোদ উৎসব ৭। নিষ্ঠুর ধর্মীয় ও সামাজিক প্রথা, স্ত্রীশিক্ষা। ৯। স্ত্রীজাতির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী,' ১০। দাসত্ব প্রথার উচ্ছেদ, ১১। বাঙ্গালী মুসলমান ও ইংরেজি শিক্ষা ইত্যাদি।

প্রাক্-পলাশী যুগেই খ্রীষ্টান মিশনারিদের উদ্যোগে 'ওল্ড চ্যারিটি স্কুল' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইংরেজী শিক্ষার সূত্রপাত হয় (১৭৪২ খ্রীঃ)। আনুমানিক ১৮০০ খ্রীঃ কলকাতার ভবানীপুরে জগমোহন বসু একটি এবং মধ্য কলকাতায় ড্রামন্ড সাহেব ধর্মতলা একাডেমী প্রতিষ্ঠা করেন।[৪৮] একই সময়ে শ্রীরামপুরে জশুয়া মার্শম্যান, উইলিয়াম কেরী এবং উইলিয়ম ওয়ার্ড বিদ্যালয়, একটি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন। উইলিয়ম কেরীর চেষ্টায় হুগলী, দিনাজপুর এবং যশোহর জেলায়ও বিদ্যালয় স্থাপিত হয়।[৪৯] প্রথম দিকে ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ও উদ্দেশ্য উল্লেখ্য করা যায় ঃ (ক) এদেশে খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচার, (খ) ইংরেজদের সঙ্গে ব্যবসাবাণিজ্য করা, এবং তাঁদের অধীনে চাকুরী লাভ, (গ) ব্যক্তিগত উদ্যোগে, এবং তাঁদের অধীনে চাকুরী লাভ, (গ) ব্যক্তিগত উদ্যোগে ইংরেজ শাসকদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন, (ঘ) ইংরেজ প্রশাসন পরিচালনায় সাহায্য করার জন্য দেশীয় করণিক অন্যান্য শ্রেণীর উদ্ভব, (ঙ) নগর কলকাতাকে কেন্দ্র করে শহরাঞ্চলে শিক্ষার প্রবর্তন। সুতরাং পল্লীগ্রামে ইংরেজী শিক্ষার প্রশ্ন তখনও আসেনি। ১৮১৭ খ্রীঃ কলকাতা বুক সোসাইটি ও হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা, ১৮১৮-২১ খ্রীঃ শ্রীরামপুর কলেজ স্থাপন, ১৮১৮ খ্রীঃ কলকাতার পাঠশালার উন্নতিকল্পে 'কলকাতা স্কুল সোসাইটি' স্থাপন, ১৮২২ খ্রীঃ রামমোহন রায় স্থাপিত ইংরেজী স্কুল, ডেভিড হেয়ার এবং জি, এ টার্নবুগের ইংরেজী স্কুল, লর্ড বিশপের ১২০ খ্রীঃ প্রতিষ্ঠিত কলেজ, প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে মিশনারী ও রাধাকান্তদের, কালীশঙ্কর ঘোষাল, রসময় দত্ত প্রমুখ ব্যক্তিদের অর্থানুকুল্যে, রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর ও অন্যান্যদের উৎসাহে বাংলা তথা ভারতবর্ষে জ্ঞান-বিজ্ঞান সহ ইংরেজী শিক্ষা প্রসার লাভ করতে থাকে প্রধানত নাগরিক সমাজে। কলকাতার বাইরে ও ইংরেজী শিক্ষার প্রতি অনুরাগ দেখা যায়। আন্দুল, চনক, পানিহাটি, সুখচর, বরাহনগর, শ্রীরামপুর, টাকী, বারাসত, বর্ধমান, চন্দননগর, শান্তিপুর, মুর্শিদাবাদ, কৃষ্ণনগর, ঢাকা প্রভৃতি শহরেও মফঃস্বলে স্কুল স্থাপনের সংবাদ পাওয়া যায়।[৫০] নতুন স্কুল

৪৮. J.J. Hecht · The Domestic Servant class in eighteenth Century England (London 1956) – বিনয় ঘোষ কর্তৃক উদ্ধৃত।

৪৯. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত ও সম্পাদিত—সংবাদপত্রে 'সেকালের কথা', ১ম খণ্ড, পৃ. ৪১।

৫০. রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস। আধুনিক যুগ, ২য় সং ১৩৮১, পৃ. ১১৮, ৩য় খণ্ড।

স্থাপনে বাঙালীদের মধ্যে বিশেষ উৎসাহের সঞ্চার হয়েছিল। এমনকি পল্লীবাসীরাও স্কুলের বাড়ী তৈরী করে দিত। হরিপাল গ্রামের ৮৩ জন বাসিন্দা মাসিক চার আনা থেকে ছয় টাকা পর্যন্ত স্কুলের জন্য চাঁদা দিত।[৫১]

ইংরেজী শিক্ষার প্রভাব ঃ

শুধু খ্রীষ্টান ধর্ম প্রসার বা কেরাণীকুল তৈরীর জন্যই ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন হয়নি। এই শিক্ষা নিয়ে এসেছে ইউরোপীয় চিন্তাভাবনা, জ্ঞান বিজ্ঞানের যুক্তিনিষ্ঠ অনুশীলন এবং কর্মশক্তির নব নব উদ্দীপনা। 'সুধাকর' নামে একটি বাংলা পত্রিকায় ১৮৩৬ খ্রীঃ ৭ সেপ্টেম্বর সংখ্যায় গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপনও ইংরেজী শিক্ষা প্রসারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। "......যে বিদ্যা শিক্ষাতে লোকের অন্ধকার দুর হইয়া রাজশাসনাদিতে নৈপুণ্য জন্মে তারদেশ ব্যাপিয়া সেই বিদ্যার বীজ রোপন করাই ধার্ম্মিক দয়ালু রাজার উচিত কর্ম্ম....কিন্তু গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপন না করিলেও তাহা দূর হইবেক না।"[৫২] সে যুগের ছাত্রদের চারিত্রিক দৃঢ়তা ও স্বাধীন চিন্তা ভাবনা সমগ্র দেশে নতুন যুগের সূচনা করে। হিন্দু কলেজের শিক্ষক লুই হেনরি ভিভিয়ান ডিরোজিও শাসন ও সমাজ সংস্কার থেকে আরম্ভ করে অদৃষ্টবাদ, ব্যক্তি স্বাধীনতা, ঈশ্বরের থেকে আরম্ভ করে অদৃষ্টবাদ, ব্যক্তি স্বাধীনতা, ঈশ্বরের অস্তিত্ব, প্রতিমাপূজা, পুরোহিত সম্প্রদায়, পাপপুণ্য স্বদেশপ্রেম স্ত্রীশিক্ষা প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ে স্বাধীন যুক্তিবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত সর্বপ্রকার সংস্কার মুক্ত, নির্ভীক ও স্বাধীন চিন্তা করতে ও মতামত প্রকাশে ছাত্রদের উৎসাহ দিতেন। ১৮৩০ সালে ফ্রান্সে যে বিদ্রোহ হয় কালীপ্রসাদ ঘোষের নেতৃত্বে কলকাতা টাউন হলে দু'শ ছাত্র মিলিত হয়ে উৎসব করে। সবমিলে হিন্দু কলেজের ছাত্ররা সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে প্রগতিশীল উদার মত পোষণ করতেন। নব্যবঙ্গের দল বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতিও অনুরাগী ছিলেন।[৫৩] ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও ভূদেব মুখোপাধ্যায় সরকারী সহায়তায় বঙ্গ বিদ্যালয়গুলির অনেক উন্নতি করেন।

একান্নবর্তী পরিবার প্রথার লোপ ঃ

ইংরেজী শিক্ষার প্রসার, শহরে ব্যবসায় ও চাকরীর সৃষ্টি, কারখানায় শিক্ষা মজুর হওয়ার সুযোগ বৃদ্ধি সর্বোপরি পুরাতন প্রথা ও আচার আচরণের প্রতি

৫১. রমেশচন্দ্র মজুমদার— ঐ পৃ. ১২৪।
৫২. ঐ পৃ ১২১।
৫৩. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়— 'সংবাদপত্রে সকলের কথা' ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩১। রমেশচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক উদ্ধৃত।

অনীহা অর্থাৎ দৃষ্টিভঙ্গিগত মানসিক পরিবর্তন ধীরে ধীরে একান্নবর্ত্তী পরিবারগুলিকে ভাঙতে শুরু করে। শহরের ব্যয় বহুল বিলাসী জীবনযাত্রার— আকর্ষণ, সুরাপান ইত্যাদি মাদকদ্রব্য ব্যবহার, ব্যভিচারের প্রসার, ব্রাহ্মণত্ব ও পণ্ডিত্যে দম্ভকারীদের পতন, অর্থাৎ নাগরিক ব্যক্তি স্বতন্ত্র্যবোধ গ্রাম সমাজে অনুপ্রবেশের ফলে এবং আর্থিক স্বনির্ভরতার জন্যই গ্রাম্য সমাজের অপরিহার্য অঙ্গ একান্নবর্ত্তী পরিবার ধ্বংস হয়ে যায়।

নিষ্ঠুর ধর্মীয় ও সামাজিক প্রথা এবং তার প্রতিকার ঃ

দৈবশক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাস মানুষেরর স্বাভাবিক বিচার বুদ্ধি ও মানবিকতাবোধকে ধ্বংস করে দেয়। শত শত বৎসর ধরে বিভীষিকাময় সতীদাহ প্রথার অস্তিত্ব এই সত্যকেই প্রতিষ্ঠা করে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সমাজে অনেক কুসংস্কার বিরাজ করত যেমন গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন, রথের তলায় আত্মবলিদান, কুষ্ঠরোগীকে জীবন্ত কবর দান, চড়কপূজায় বাণবিদ্ধ করে মৃত্যুবরণ, শিশুকন্যা হত্যা, শাস্ত্রীয় নরবলি ইত্যাদি। পাদ্রী ওয়ার্ড সাহেব তাঁর বিখ্যাত View of the History, Literature and Religion of the Hindus" Vol II, BK III 3rd ed (1817) বইতে উল্লেখ করেছেন— বর্ধমানের নিকট যোগাদ্যা দেবীর মন্দির, মুর্শিদাবাদের কিরীটকণায় কালীমন্দির, কাটোয়ার নিকট শ্রীরামপুর তারা মন্দির, গুপ্তিপাড়ার সুমরু গ্রামে, নদীয়ার ব্রাহ্মণীতলার দুর্গামন্দির এবং তমলুকের বর্গভীমার মন্দিরে নরবলি হত।[৫৪] ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত সংবাদ পত্রে সেকালের কথায় 'সমাচার দর্পণ' (জুন ১৮২২), 'বঙ্গদূত' পত্রিকা (৪ জুলাই, ১৮২৯) ১৮৩৭, ২১ জানুয়ারী 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকা থেকে রোমহর্ষক নরবলির উদাহরণ দিয়েছেন। এমনকি হান্টার সাহেব ও ছোটনাগপুরের কমিশনার ড্যাল্টন সাহেবের তথ্য থেকে জানা যায় ১৮৬৪ থেকে ১৮৬৬ সালে ও নরবলির ঘটনা ঘটেছে। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার প্রসারে এবং বিদেশী শাসনের কড়াকড়িতে বিংশ শতাব্দীতে নরবলি প্রথা সম্ভবত এক রকম উঠে গেছে বললেই চলে।[৫৫] বাংলার চড়ক পূজা ছিল আরও একটি বীভৎস অনুষ্ঠান। চড়কের সন্ন্যাসীরা সাধারণত দুলে, বাগদী, হাড়ি, কাওরা ইত্যাদি জাতের হত। আলেকজাণ্ডার ডাও উল্লেখ করেছেন ঃ It is proper to state that Brahmins, Kshatriyas and vaisyas do not take any active part in the celebration of the rites

৫৪. রমেশচন্দ্র মজুমদার ঐ পৃ. ১৩৬।

৫৫ অমিতাভ মুখোপাধ্যায়— উনিশ শতকের সমাজ ও সংস্কৃতি, ১৯৭১ কর্তৃক উদ্ধৃত পৃ. ৮৬।

peculiar to this festival. Most of them, however, contribute largely towards the expenes of it, and contenance the whole of the procedings as applauding spectators.[৫৬] হুতোম প্যাঁচার নকশায় কলকাতায় চড়কের বর্ণনা দিয়েছেন।[৫৭] ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সংবাদপত্রে' সেকালের কথা'য় 'জ্ঞানান্বেষণ পত্রিকা' (২৭ এপ্রিল, ১৮৩৩), 'সমাচার দর্পণ' (২১ এপ্রিল, ১৮২৭), (২৬ এপ্রিল, ১৮২৭), (২২ এপ্রিল, ১৮৩৭) প্রভৃতি সংবাদপত্র থেকে চড়কপূজার বীভৎস অনুষ্ঠানগুলির ফলে সন্ন্যাসীদের মৃত্যু, কুৎসিত সঙ সাজা, জ্বলন্ত আগুণের উপর দোলা, বাণফোঁড়া, আগুন নিয়ে নাচ, প্রভৃতির বর্ণনা পাওয়া যায়। ১৮৫৪ খ্রীঃ ৫ই মে তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' (পৃ-৪) জনৈক রামকমল মজুমদারের পত্রে চড়কের ধনী ব্যক্তিদের আনুকূল্যের উল্লেখ আছে।[৫৮] চড়ক পূজার বীভৎস অনুষ্ঠানগুলি দূর করার জন্য ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি একটা আন্দোলন গড়ে ওঠে এবং সরকারও হস্তক্ষেপ করতে এগিয়ে আসেন। ১৮৬৬ খ্রীঃ ১৫ মার্চ বীডন সাহেব এক সরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে চড়ক ঘোরা, বাণফোঁড়া প্রভৃতি নৃশংস অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। এরপর ধীরে ধীরে চড়কের নৃশংস অনুষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়। বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, কৌলীন্য প্রথা, সতীদাহ প্রথা প্রভৃতি কুপ্রথাগুলি ধর্মের নামে আমাদের সমাজকে পঙ্গু করে রেখেছিল। 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকায় (২৩ এপ্রিল, ১৮৩৬ খৃঃ) বহুবিবাহকারী কুলীনদের তালিকায় ২৭ জন কুলীনের ৮১৮টি বিবাহের সংবাদ পাওয়া যায়। স্বয়ং বিদ্যাসাগর ১৮৭১ খ্রীঃ প্রকাশিত 'বহুবিবাহ—প্রথম পুস্তকে' হুগলী জেলার কুলীনদের যে তালিকা দিয়েছিলেন তাতে ৭৬ টি গ্রামে ১৩৩জন কুলীনের ২১৫১ জন পত্নী ছিলেন অর্থাৎ গড়ে প্রত্যেকের ঘরে ১৬ টিরও বেশী।[৫৯] গ্রামে ও শহরে এই চরণের বহু উদাহরণ সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় আছে। এই বহুবিবাহের কালটা ছিল সতীদাহের যুগ।

"শঙ্খ" ও "আঙ্গিরস" সংহিতার মতে মানুষের গায়ে লোমের সংখ্যা অর্থাৎ সাড়ে তিনকোটি পরিমিত বৎসর কাল সহমৃতা স্ত্রী স্বর্গে বাস করিবে এবং অপ্সরা গণের স্তুতি লাভ করিয়া অনন্তকাল স্বামীর সঙ্গে ক্রীড়ার আনন্দ লাভ করিবে। স্বামী যদি ব্রহ্মঘ্ন, কৃতঘ্ন বা সুরাপায়ী হন তথাপি স্ত্রী সহমৃতা হইলে তাহার সর্বপাপ বিনষ্ট হইবে"।[৬০] ১৭৯৯ খ্রীঃ নদীয়ার এক কুলীন ব্রাহ্মণের ২২ জন স্ত্রী

৫৬. অমিতাভ মুখোপাধ্যায়— ঐ পৃ. ৯১।
৫৭. Alexander Duff. India and India Missions, 1839 pp. 246-265.
৫৮. হুতোম—(কালীপ্রসন্ন সিংহ), হুতোম প্যাঁচার নকশা, সাহিত্য পরিষদ সং ১৯৫৭।
৫৯. অমিতাভ মুখোপাধ্যায়— ঐ পৃ. ৭৯।
৬০. বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী (সাহিত্য পরিষৎ সং) সমাজ , ১৩৪৫ সন।

তাঁর সঙ্গে সহমৃতা হয়। একই সময়ে শ্রীরামপুরের নিকটবর্তী সুকচরা গ্রামে একজন মৃতব্রাহ্মণের ৪০টি পত্নীর মধ্যে জীবিত ১৮ জনই সহমৃতা হন। কলকাতার চারদিকে (১৮০৪ খ্রীঃ) তিনশত বিধবা সহমৃতা হন। ১৮১২ খৃঃ কাশিমবাজারের তালিকা পাওয়া গেছে। ব্রাহ্মণ কায়স্থ থেকে আরম্ভ করে কামার, কুমার, তেলী, ছুতার, ধোপা, নাপিত প্রভৃতি সবজাতির বিধবা ছিলেন এবং তাদের বয়স ১৬ থেকে ৬০ বৎসর।[৬১] ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের Calcutta Review পত্রিকায় রেভারেণ্ড লঙ্ উল্লেখ করেছেন— "A kulin of Santipur Chandra Bandyopadhyay was killed here 30 Years ago. he was married to 100 wives .....eight of his wives performed settle on his funeral pyre"[৬২] এরকম অসংখ্য সতীদাহের বীভৎস বিবরণ পাওয়া যায়।

১৮১৫ খ্রীঃ রামমোহন যে আত্মীয় সভা স্থাপন করেন তাতে জাতিভেদ, বাল্য বৈধব্য, বহুবিবাহ, সতীদাহ প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা হ'ত। ১৮৫৭ খৃঃ তাঁরপুত্র রমাপ্রসাদ রায় ব্যবস্থাপক সভা থেকে আইন প্রণয়ন করে বহু বিবাহ নিরোধের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। ১৮৬৬ খ্রীঃ ১৯শে মার্চ বিদ্যাসাগরের নেতৃত্বে ছোটলাট স্যার সিসিল বীডনের কাছে প্রায় ২১০০০ লোকেব স্বাক্ষরিত আবেদন পত্রে বহুবিবাহ নিরোধের জন্য চেষ্টা করা হয়। স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে বর্ধমান ও নদীয়ার মহারাজা, ভূকৈলাসের রাজা, উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বিদ্যাসাগর, শম্ভুনাথ পণ্ডিত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক, দ্বারকানাথ মিত্র প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহে সরকারী ব্যাস্ততা ও গোঁড়া হিন্দুদের বিরোধিতায় আবেদন মঞ্জুর হয়নি। শিক্ষার প্রসার ও অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের ফলে বহুবিবাহ প্রথা বন্ধ হয়ে যায়।

পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালীরা সংস্কার মুক্ত হয়ে মিশনারীদের সঙ্গে যৌথভাবে সতীদাহ নিবারণের জন্য সরকারের কাছে আবেদন করেন। রামমোহন রায় ও তাঁর সহযোগীগণও এই নিষ্ঠুর প্রথা নিরোধের জন্য আবেদন করেন। স্বয়ং রামমোহন সতীপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন এমন কি শ্মশানঘাটে গিয়ে সহমরণ প্রার্থী বিধবাদের নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেন।[৬৩] অবশেষে লর্ড বেন্টিঙ্ক ১৮২৯ খ্রীঃ ৪ ডিসেম্বর এক আইন পাশ করে সতীদাহ প্রথা দণ্ডনীয় ঘোষণা করেন।

---

৬১. রমেশচন্দ্র মজুমদার, ঐ, পৃ. ৩৩৯।

৬২. Education and Social Amelioration of Women in Pre-Mutiny India. কালীকিঙ্কর দত্ত, ৩য় অধ্যায় পৃ. ৬৩-১২৬, এবং Appendix I-III. রমেশচন্দ্র মজুমদার কর্ত্তৃক উদ্ধৃত— ঐ পৃ. ৩৪০।

৬৩. The Calcutta Reveiw. 1846. Vol-VI.

১৮৫৪ সালের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়' কয়েকটি প্রবন্ধ লিখে বিদ্যাসাগর প্রথম বিধবাবিবাহের পক্ষে আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। সঙ্গে সঙ্গে বাংলার শিক্ষিত সমাজ আলোড়ন সৃষ্টি হয়। কালীকৃষ্ণ মিত্রও কৃষ্ণনগরে আন্দোলন শুরু করেন। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে বিদ্যাসাগর 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' নামে পুস্তিকা প্রকাশ করেন। গোঁড়া হিন্দু প্রাচীনপন্থীরা বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে ৩০টি পুস্তিকা রচনা করেন। বিদ্যাসগর বিধবা বিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তিকাটি রচনা করেন (অক্টোবর, ১৮৫৫)। বিদ্যাসাগরের সঙ্গী ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বারকানাথ মিত্র, অক্ষয়কুমার দত্ত, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, প্যারীচাঁদ সরকার, কালীকৃষ্ণ মিত্র, দক্ষিণারঞ্জন মুখার্জী, রাজা প্রতাপচন্দ্র ও রাজা ঈশ্বরচন্দ্র প্রমুখ বিশিষ্ট নাগরিকগণ। বহু আন্দোলনের ফলে ১৮৫৬ খ্রীঃ ২৬শে জুলাই বিধবাবিবাহ আইন পাশ হয় (Act XV of 1856) । নাগরিক সমাজের সঙ্গে সঙ্গে এইসব সমাজ সংস্কারমূলক আন্দোলনে গ্রামীণ সমাজেও পরিবর্তন দেখা যায়।

ধর্মীয় সংস্কার ঃ

হিন্দুধর্মের আচার বিচার পৌত্তলিকতা প্রভৃতির বিরোধিতা করে রামমোহন ব্রাহ্মসমাজ (১৮২৮, ২০ শে আগষ্ট স্থাপন করেন। ১৮৩০ খ্রীঃ ২৩ শে জানুয়ারী ব্রাহ্মসমাজের নিজস্ব ভবনের দ্বারোঘাটন হয়। মন্দিরে উপাসনার পদ্ধতি সম্বন্ধে রামমোহন একটি দলিলে নির্দেশ দেন—"..... কোন সাম্প্রদায়িক নামে তাঁহার উপসনা হইতে পারিবে না। যে কোন ব্যক্তি শ্রদ্ধার সহিত উপসনা করিতে আসিবেন তাঁহারই জন্য জাতি, ধর্ম, সম্প্রদায়, সামাজিক পদ নির্বিশেষে মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত থাকিবে।.....যাহাতে সকল সম্প্রদায়ভুক্ত লোকের মধ্যে ঐক্যবন্ধন দৃঢ়ীভূত হয়, এখানে সেই প্রকার উপদেশ বক্তৃতা, প্রার্থনা, ও সঙ্গীত হইবে,"[৬৪] রামমোহন বিলাত যাত্রার পর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ ব্রাহ্মসমাজের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ধর্মাদর্শ সমালোচনা বর্তমান নিবন্ধের উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু ব্রাহ্মধর্মের আবির্ভাবে বাংলার সমাজে অনেক প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনার সৃষ্টি হয়েছিল। বিধবাবিবাহ, স্ত্রী জাতির শিক্ষা ও স্বাধীনতা, শ্রমিকদের শিক্ষা ও মানসিক উন্নতি, সুরাপান নিবারণ ইত্যাদি সমাজ সংস্কারমূলক বিষয়ে ব্রাহ্মরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। দুর্ভিক্ষে সাহায্য সমিতি গঠন ম্যালেরিয়ার প্রতিকার ও প্রশাসনের চেষ্টা প্রভৃতি ব্রাহ্মসমাজের কর্মসূচী ভুক্ত হয়। অপর পক্ষে আদিবাসী ও অস্পৃশ্য জাতির লোকেরা দলে দলে খ্রীষ্টান সমাজে বিনা বেতনে

৬৪. রমেশচন্দ্র মজুমদার, ঐ পৃ. ৩৪০।

বিদ্যালয়ে পড়তে পারত, বিনা খরচে চিকিৎসার সুযোগ পেত , বিনামূল্যে খাদ্য বস্ত্রও পেত।[৬৫] ব্রাহ্মধর্মের প্রভাব মূলত নাগরিক সমাজে ব্যস্ত ছিল, আর খ্রীষ্টান ধর্ম রাজানুগ্রহে পল্লীসমাজেও প্রসারিত হয়।

সমসাময়িককালে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব (গদাধর চট্টোপাধ্যায়) ১৮৩৬-১৮৮৬, হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান ঘটালেন দক্ষিণেশ্বরে। সর্ব ধর্ম সমন্বয়, ভক্তি ও জীবসেবা ছিল তাঁর, প্রদান উপদেশ। তাঁর ধর্ম্মমত স্বামী বিবেকানন্দ (নরেন্দ্রনাথ দত্ত) সারা পৃথিবীতে প্রচার করেন। উৎপীড়িত, অসহায় ভারতবাসী জনসাধারণের দুঃখ, দুর্দশা, দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, ধর্মান্ধতা, কুসংস্কার, ধনীর বিলাস-ব্যসন, অসংখ্য জাতপাতের অস্তিত্ব বিবেকানন্দকে ব্যথিত করে। মানবসেবায় আত্মনিয়োগ করে মূর্খ, দরিদ্র ভারতবাসীর শিক্ষা ও অন্নসংস্থানের স্বপ্ন দেখেছিলেন বিকেকানন্দ। পল্লীসমাজের মূর্খ দরিদ্র মানুষের কাছে এসব দার্শনিক চিন্তার কোন প্রভাব পড়েনি। তবে ধর্ম অনেক গণতান্ত্রিক সহজ সরল হয়ে যায়। এবং বিবেকানন্দের দেশপ্রেম ও সেবাধর্ম পরবর্তী কালে স্বাধীনতা সংগ্রামে বিপ্লবীদের অনুপ্রাণিত করেছে।

বৃত্তিভিত্তিক জাতির ঐক্য ঃ

ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার যাকে বৃত্তিভিত্তিক জাতির ঐক্য আখ্যা দিয়েছেন তা আসলে নাগরিক সমাজে খেটে খাওয়া মানুষের আর্থিক অনটন ও অন্যান্য কারণে ক্ষোভের প্রকাশ। এই সব মুটেমজুর ধোপারা অধিকাংশই অন্নের সন্ধানে গ্রাম থেকে শহরে এসে বাস করতে থাকেন। সমসাময়িক পত্রিকায় কয়েকটি ধর্মঘটের উল্লেখ আছে। (ক) ১৮৫৯ সনের জুন মাসে গোপ ও মোদকদের ধর্ম্মঘট। (খ) গো শকট, মুটের ধর্মঘট[৬৬] এবং (গ) ধোপার ধর্মঘট।[৬৭] এইভাবে পাল্কীবাহক, নৌকার মাঝি, এবং মজুরদের আরও ধর্মঘটের কথা জানা যায়।

আমোদ উৎসব ঃ

বাঙালীরা যে সব আমোদ উৎসবে যোগদান করত তার মধ্যে দুর্গাপূজা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ষোড়শ শতাব্দীতে দুর্গাপূজা লোকপ্রিয় অনুষ্ঠানে পরিণত

৬৫. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজারামমোহন রায় (সাহিত্য সাধক চরিত মালা) (১৩৫৩ সন)।

৬৬. রমেশচন্দ্র মজুমদার— ঐ পৃ. ১৯১।

৬৭. বিনয় ঘোষ— সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র ১ম খণ্ড পৃ. ৪৬৯-৭০।

হয়েছিল।[৬৮] দুর্গাপূজায় শহর ও গ্রামের মানুষরা আমোদ উৎসবে মেতে উঠত। গ্রামের অনেক জমিদার ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এই সময় নিজ গ্রামে গিয়ে উৎসবের আয়োজন করতেন। বলা বাহুল্য শহরাঞ্চলে ধূপধাম হ'ত অনেক বেশী। তৎকালীন সাময়িক পত্রিকাগুলিতে এর বিবরণ পাওয়া যায়। ১৮২৬ সনের ১২ই অক্টোবর তারিখের Government Gazette পত্রিকায় পূজার ব্যয়বহুল উৎসবের বিবরণ আছে। মেম ও সাহেবরা সঙ্গীত, টিফিন, ডিনার ও সুরাপানের লোভে উৎসবে যোগদান করেন।[৬৯] বাইজী নাচ, যাত্রা, পাঁচালীগান, কবিগান ইত্যাদি ছিল আমোদ প্রমোদের অঙ্গ।

পল্লীগ্রামে পূজা ক্রমশ বারোয়ারী উৎসবের রূপ পরিগ্রহ করে। বারোয়ারী সম্বন্ধে তখনকার লোকেরা ভাল ধারণা পোষণ করতেন না। সমসাময়কি সংবাদপত্রে এর প্রতিফলন দেখা যায়। ২৯ আষাঢ়, ১২৯৩ 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকায় উল্লেখ করা হয়েছে ঃ '... আজকালকার বারোয়ারীতে বিশুদ্ধ আনন্দলাভ করা যায় না। প্রায়ই মদ বেশ্যা ইত্যাদি লইয়া বারয়ারীর পাণ্ডাদিগের আমোদ প্রমোদ হয়।.... "যাহাদের কোন সঙ্গতি নাই, এমন কোন সামর্থ্য নাই, যাহাতে স্বীয় ভরণ-পোষণের উপায় করিতে পারে, চৌর্য্যবৃত্তি যাহাদের অভ্যস্থ, দেশে গ্রামে প্রায়ই সাহাদের অত্যাচারের কথা শুনিতে পাওয়া যায় এই প্রকার লোকেই বারোয়ারীর গন্ধ পাইয়া নাচিয়া উঠে, পাণ্ডা সাজিয়া চাঁদা আদায়ের জন্য গ্রামের লোকের উপর উৎপীড়ন করে কাহারও চাঁদা দিবার সামর্থ্য না থাকিলে ঘরের ঘটিবাটী ঝাড়ের বাঁশ কাড়িয়া লইয়া যায়।.....

"বারয়ারী নির্বোধ ও অপরিণামদর্শী ব্যক্তিদিগের উৎসন্ন যাইবার হেতু। পল্লীগ্রামে জোরজবরদস্ত করিয়াও আশানুরূপ চাঁদা উঠেনা, প্রায়ই একটি যাত্রার খরচ যোগাইবার সংস্থান হওয়া কোন কোন স্থানে ভার হইয়া উঠে, কিন্তু বারয়ারীর আদায়ের আগে খরচের ব্যবস্থা।..... "এই সকল কথাই আমরা পল্লীগ্রামের বারয়ারীর সম্বন্ধে বলিলাম। শহরের বারয়ারীতে লোকের উপর উৎপীড়ন হয় না বটে কিন্তু সেখানেও পাপের স্রোত বন্ধ নাই। মদ ও বেশ্যার কাণ্ডটা শহরেই কিছু বাড়াবাড়ী। যে আমোদের সঙ্গে মদ ও গণিকার সম্বন্ধ রহিল তাহাতে আমরা আমাদের মধ্যে গণ্য করি না"।[৭০]

এছাড়া রাসের মেলা কালীপূজা, গাজি সাহেবের মেলা, সরস্বতী পূজা, রথের মেলা ইত্যাদি উপলক্ষে আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা ছিল। দীনেন্দ্রকুমার রায় তাঁর

৬৮. ঐ. ৩য় খণ্ড পৃ. ৫১-৫২।

৬৯. ঐ. পৃ. ৫২-৫৩।

৭০. রমেশচন্দ্র মজুমদার— বাংলাদেশের ইতিহাস, ২য় খণ্ড। বিনয় ঘোষ- সংবাদপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ১ম খণ্ড। পৃ. ৫১০-৫১১।

পল্লীচিত্র, পল্লীবৈচিত্র্য বইতে পল্লীগ্রামের দুর্গোৎসব, কালীপূজা, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, দোলযাত্রা প্রভৃতি ধর্মভিত্তিক অনুষ্ঠানের উল্লেখ পাওয়া যায়।"[১] সুকুমার সেন বলেছেন ঃ "উনবিংশ শতাব্দী কিংবা তারও আগে থেকে পশ্চিমবঙ্গে একরকম সর্বজনীন কালীপূজা চলে এসেছিল তা হল রক্ষাকালী পূজা। এ কালীপূজা নয়। এ কালী পূজা এখন ধীরে ধীরে সর্বজনীন দূর্গাপূজা বা সরস্বতী পূজার রূপ নিচ্ছে। সুতরাং দীনেন্দ্রকুমার যে বর্ণনা দিয়েছেন তার যথেষ্ট ঐতিহাসিক মূল্য আছে।"[৭২]

স্ত্রী শিক্ষা ও স্ত্রী জাতির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী প্রাক্-পলাশী যুগে ঃ

স্ত্রীজাতির অবস্থা ও তাঁদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী মোটেও সুখকর ছিল না। ইংরেজী শিক্ষার প্রসার, নবজাগরণের যুগে প্রগতিশীল চিন্তা চেতনার আলোকে নারীজাতির দুঃখ দুর্দশা, ও তাঁদের শিক্ষাদীক্ষার প্রতি শিক্ষিত নাগরিকদের দৃষ্টি পড়ে। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ১১ নভেম্বর 'সংবাদ ভাস্কর' সম্পাদকীয়তে ধনী অবস্থাপন্ন স্ত্রীলোকদের বর্ণনা দিয়ে বলা হয়েছে—"....স্ত্রীলোকেরা প্রাতঃস্নান ও পূজানুষ্ঠান, জপ, যজ্ঞ, ব্রাহ্মণ ভোজনাদি না করাইয়া জল গ্রহণ করেন না।"[৭৩] সাধারণ স্ত্রীলোকদের অবস্থা এরকম ভালো ছিল না। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন রায় বাংলাদেশের স্ত্রীজাতির অবস্থার যে বর্ণনা করেছে সংক্ষেপে তা নিম্নরূপ ঃ

"দেখ কি পর্য্যন্ত দুঃখ, অপমান, তিরস্কার, যাতনা, তাহারা কেবল ধর্মভয়ে সহ্য করে। অনেক কুলীন কন্যারই বিবাহের পর যাবজ্জীবনের মধ্যে দুই চারিবার স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ হয়, তথাপি ঐ সকল স্ত্রীলোকের মধ্যে অনেকেই পিতৃগৃহে বা ভ্রাতৃগৃহে নানা দুঃখ সহ্যপূর্ব্বক থাকিয়াও যাবজ্জীবন ধর্ম নির্বাহ করেন।....আর সাধারণ গৃহস্থের বাটীতে স্ত্রীলোক কি দুঃখ না পায়? বিবাহের সময় স্ত্রীকে অর্দ্ধাঙ্গিনী বলিয়া স্বীকার করেন কিন্তু তাহাদের সহিত পশুর অধম ব্যবহার করেন।...."[৭৪] যাদের স্বামী দুই বা তিন স্ত্রী নিয়ে সংসার করতেন তাদের অবস্থা ছিল আরও শোচনীয়। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ১৪ই মার্চ 'সমাচার দর্পণে' শান্তিপুর নিবাসিনী স্বাক্ষরিত চিঠিতে প্রশ্ন করা হয় স্ত্রীলোকেরা উপপতি গ্রহণ করলে কুল

৭১. The days of John Company. Selections from Calcutta Gazettee 1824-1832 complied and Ed by Anil Chandra Das Gupta pp. 155-6.

৭২. বিনয় ঘোষ সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০৯-১১।

৭৩. পল্লীচিত্র, দ্বিতীয় মুদ্রণ শ্রাবণ ১৩৯৯, আনন্দ সং পল্লীবৈচিত্র, আনন্দ সং মুদ্রণ আশ্বিন ১৩৯৬।

৭৪. সুকুমার সেন, পল্লী বৈচিত্রের পরিচয়, দীনেন্দ্রকুমার রায়ের বইয়ের পরিচয় আনন্দম সং ১৩৯৬।

নষ্ট হয় কিন্তু বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বৈশ্যালয়ে গিয়ে উপপত্নী ভোগ করেন তাতে কুল নষ্ট হয় না পুরুষরা একাধিক বিবাহ করলে ধর্ম নষ্ট হয় না, অথচ শাস্ত্র সম্মত হওয়া সত্ত্বেও বিধবাদের পুনরায় বিবাহ দেওয়া যাবে না কেন। এরই এক সপ্তাহ পর একই পত্রিকায় চুঁচুড়া নিবাসী স্ত্রীগণের পত্রে পুরুষদের মত স্ত্রীলোকদের বিদ্যাশিক্ষার সুযোগ কেন হবে না জানতে চাওয়া হয়। ১০। ১২ বৎসর বয়সে স্ত্রীলোকের বিবাহ হচ্ছে। পাত্র নির্বাচনে তাঁদের কোন অধিকার নেই। যাঁরা টাকার বিনিময়ে স্বামী হন স্ত্রী তাঁদের ক্রীত সম্পত্তির মধ্যে গণ্য হন।[৭৫]

ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত ও আধুনিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ ব্যক্তিগণ স্ত্রীজাতির উন্নতি কল্পে অগ্রসর হন। শাস্ত্রজ্ঞ বাঙ্গালী পণ্ডিতদের একাংশও সমাজ সংস্কার বিষয়ে অগ্রণী হয়েছিলেন। রমেশচন্দ্র মজুমদারের ভাষায় ঃ 'ইহার পূর্বে (উনবিংশ শতাব্দী) পাঁচ ছয় শত বৎসরের মধ্যে স্ত্রীজাতির দূরবস্থা সম্বন্ধে এরূপ বেদনাবোধ বা প্রতিকারের চেষ্টা করা হইয়াছে এমন কোন প্রমাণ নাই।"[৭৬] এই ক্ষেত্রেও প্রথম উদ্যোগ এসেছিল খ্রীষ্টান মিশনারীদের পক্ষ থেকে। ১৮১৯ খ্রীঃ তাঁরা Calcutta female juvenileSociety দ্বারা দেশীয় বালিকাদের স্কুলে বাগদী, বৈরাগী, বেদে এবং গণিকাদের কন্যাদের পড়াবার ব্যবস্থা করেন। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ড থেকে আগতা মিস্ কুক, মহারাজ সুখময় রায়ের পুত্র বৈদ্যনাথ রায়ের দান, ১৮২২ খ্রীঃ গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার প্রণীত 'স্ত্রী শিক্ষা বিধায়ক' পুস্তক প্রভৃতি প্রথম দিকে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে সহায়তা করেছে।

গ্রামাঞ্চলে প্রথম বারাসতে বালিকা বিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৪৯ সনে বহু বিরোধিতা ও নির্যাতন সহ্য করে কয়েকজন নব্যপন্থী বারাসতে বিদ্যালয়টি স্থাপন করেন।[৭৭] ১৮৫৮ সনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর গভর্ণর হ্যালিডে সাহেবের অনুমতি নিয়ে বর্ধমান, হুগলী প্রভৃতি স্থানে কয়েকটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে বিদ্যাসাগবের নাম চিরস্মরণীয়। বাংলার নারীদের অবরোধ প্রথা দূরীকরণের ইতিহাসে ১৮৬২ সনের ১৩ই এপ্রিল একটি উল্লেখযোগ্য দিন। ঐ দিন কেশবচন্দ্র সেন আত্মীয় পরিজনের সমস্ত বাধা অতিক্রম করে পনের বছরের স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাসায় অভিষেক উৎসবে যোগদান করেন।[৭৮] ব্রাহ্ম সমাজের চেষ্টায় স্ত্রীশিক্ষা বালিকা, বধু, প্রবীণা সকলের মধ্যে

৭৫. বিনয় ঘোষ— ঐ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৩৪-৩৫।

৭৬. সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক নিবর্তকের দ্বিতীয় সংবাদ। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়. রামমোহন রায় পৃ. ৭৪-৭৫ রমেশচন্দ্র মজুমদার—বাংলাদেশের ইতিহাস ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩১৪-১৫।

৭৭. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়— সংবাদপত্রে সেকালের কথা ২য় খণ্ড পৃ. ১৮৬-৮৭।

৭৮. রমেশচন্দ্র মজুমদার— বাংলা দেশের ইতিহাস, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩১৯।

প্রসারিত হয়। 'অন্তঃপুর স্ত্রী শিক্ষার' সভায় চেষ্টায় স্ত্রীশিক্ষা ঢাকা, রাজশাহী, পাবনা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। ১৮৪৯ সনের ৭ই মে বেথুন সাহেব কর্তৃক হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন বাংলাদেশে স্ত্রীশিক্ষার ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা। কয়েকজন ব্রাহ্ম নেতার উদ্যোগেই ১৮৮৭ সনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েরা পরীক্ষা দেবার অধিকার পায়। একই সঙ্গে নারীর বহুমুখী প্রতিভার প্রকাশও হয় ধীরে ধীরে। ১৮৫৫-৫৬ সনে সংবাদ প্রভাকরে কয়েকজন মহিলার কবিতা প্রকাশিত হয়। 'রাস সুন্দরীর আত্মকথা' নামক পুস্তকে হিন্দু রমণীর বিদ্যাচর্চার পরিচয় পাওয়া যায়। স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে ও সমাজ সেবায় ভগিনী নিবেদিতার নাম উল্লেখযোগ্য।

১৮৯০ সনে কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশনে স্বর্ণকুমারী দেবী ও কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় প্রতিনিধিরূপে যোগদান করেন। শ্রীমতী অ্যানি বেসান্ত How India Wrought for freedom নামক পুস্তকে উল্লেখ করেছেন কাদম্বিনী দেবী সাধারণ অধিবেশনে সভাপতিকে ধন্যবাদ দেবার প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং এই সর্বপ্রথম একজন মহিলা কংগ্রেস-মঞ্চে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিলেন।[৭৯]

স্ত্রীশিক্ষা ও নারীজাতির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় মূলত নাগরিক সমাজেই সীমাবদ্ধ ছিল। পল্লীসমাজে মুষ্টিমেয় বিদ্যানুরাগীর চেষ্টায় স্ত্রীশিক্ষা ও তাঁদের প্রতি উদার মনোভাব প্রসারিত হয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ও দ্বিতীয় দশকে যখন স্বাধীনতা আন্দোলনে মহিলারাও অগ্রণী হন, সেই সময়েই গ্রামে গ্রামে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার হয় এবং নারীজাতির মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

দাসত্বপ্রথার উচ্ছেদ ঃ

ঊনবিংশ শতাব্দীতে কলকাতার সাহেবরা বহু দাসের মালিক ছিল এবং দাসদের উপর অনেক অত্যাচার করত। এই সব দাসেরা নফর, বর্কাদার, পাঙখাটানা, মেথর প্রভৃতি কার্যের সঙ্গে যুক্ত থাকত। সাহেবদের মৃত্যু হলে তাঁদের উত্তর পুরুষরা ক্রীতদাস লাভ করত। প্রকাশ্যে পণ্যের ন্যায় দাসদাসী ক্রয় বিক্রয় হ'ত। কারণে অকারণে এদের ওপর অমানবিক অকথ্য অত্যাচার চলত। সারাদিন পরিশ্রমের পর অনেক দাসকে রাত্রিতে খাঁচায় থাকতে হ'ত। একজন ওলন্দাজ মহিলার রচনা থেকে জানা যায় ক্রীতদাসীদের নির্মমভাবে প্রহার করা হ'ত এবং পরিবারের লোক জনের সামনে উলঙ্গ করে শীতকালে ঠাণ্ডা জল ঢালা হত।[৮০]

ইংল্যাণ্ডে দাস প্রথার লোপ হলে এদেশেও দাসব্যবস্থা বন্ধের দাবি ওঠে। ১৭৮৯ খ্রীঃ দাস চালান দেওয়া (Indenture System) নিষিদ্ধ হয়। ১৮৬০ সনে

৭৯. The Calcutta Review. 1855. p 79.
৮০. বিনয় ঘোষ— ঐ ৪র্থ খণ্ড পৃ. ৫২৩-২৫।

ভারতীয় পিনাল কোডে দাস ব্যবসায় দণ্ডনীয় অপরাধ বলে ঘোষিত হয়। গ্রামের হতভাগ্যদের একটি অভিশাপ দূরীভূত হ'ল।

ইংরেজী শিক্ষার প্রভাব ও আধুনিক চিন্তাচেতনা পল্লীসমাজে অনুপ্রবেশ ঘটেছে অনেক পরে। প্রধানত হিন্দু নাগরিক সমাজের নূতন ভাবনার তরঙ্গ পল্লীসমাজে বিচ্ছুরিত হয়েছে। গোঁড়া হিন্দুরা নতুন দৃষ্টিভঙ্গীকে মেনে নিতে না পারলেও তাকে প্রতিহত করতে পারেননি। বাংলার মুসলমান সমাজ ছিল আরও রক্ষণশীল। ধর্মান্ধতা ও কুসংস্কারে আবদ্ধ মুসলমান সমাজ ইংরেজী শিক্ষা থেকে শত হস্ত দূরে থাকতেন। মুসলমান সমাজের দারিদ্র্য এর অন্যতম কারণ। নতুন জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগীরা অধিকাংশই ছিল হিন্দু। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে পাঁচখানি পত্রিকার সম্পাদক ও মালিক ছিলেন মুসলমান। ১৮৯০ সনে 'সুধাকর' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন রেয়াজউদ্দিন আহমদ। হিন্দু গোঁড়ামির মত মুসলমান গোঁড়ামিই ছিল এর প্রধান বৈশিষ্ট্য।[৮৩] ১৮৮৬ সনে ময়মনসিংহের টাঙ্গাইল থেকে মৌলবি আব্দুল হামিদখান 'আহমদি' পত্রিকার মাধ্যমে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে প্রীতি স্থাপনে সচেষ্ট হন।[৮৪] আলিগড়ের সৈয়দ আহমদ মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক চিন্তার সূত্রপাত ঘটান। কিন্তু মুসলমান নেতারা স্বতন্ত্র জাতীয়তার দিকেই মুসলমানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে থাকেন।[৮৫]

---

৮১. রমেশচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক উদ্ধৃত ঐ পৃ. ৩৩৮।

৮২. অমলকুমার চট্টোপাধ্যায় ঃ Slavery in India চতুর্থ পরিচ্ছেদ পৃ. ৫৪-৫৭। রমেশচন্দ্র মজুমদার—ঐ কর্তৃক উদ্ধৃত পৃ. ৩৫০-৩৫২।

৮৩. রমেশচন্দ্র মজুমদার ঐ পৃ. ৪৮৭।

৮৪. ঐ, পৃ. ৫৩৯।

৮৫. ঐ, পৃ. ৫৩৯।

উৎস নির্দেশ

১। কার্লমার্কস— ভারতে বৃটিশ শাসন, ১৮৫৩ New York Tribune, সংখ্যা ৩৮০৪।

২। সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়— প্রাক পলাশী বাংলা, ১৯৮২, কলকাতা।

৩। তপন রায়চৌধুরী— 'বেঙ্গল আণ্ডার আকবর এণ্ড জাহাঙ্গীর, কলকাতা, ১৯৫৩, পৃ. ১৩২।

৪। ডব্লিউ. ডব্লিউ. হান্টার—এ্যানালস অব রুর‍্যাল বেঙ্গল, ১ম খণ্ড, ১৮৮৩।

৫। করম আলি— মুজাফর নামা; বেঙ্গল নবাবস্ ইং অনুঃ যদুনাথ সরকার, পৃ. ৪৯-৫০।

৬। বিনয়কুমার সরকার—কৃষ্ণনগর কলেজ শতবার্ষিক, সংখ্যা ১৯৪৮, পৃ. ১৪-২৪।

৭। সুধীরকুমার মিত্র, হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ, ১ম খণ্ড, ১৯২২, পৃ. ২৮৩।

৮। নির্মলকুমার বোস— 'কালচার এণ্ড সোসাইটি ইন ইণ্ডিয়া', বোম্বাই, ১৯৬৭, পৃ. ২৩৯।

৯। নিমাই সাধন বসু— মুঘল আমলে বাংলার জমিদার বেতার ভাষণ, ১৯৮১।

১০। স্ট্যাভোরিনাস— ভয়েজ টু দি ইস্ট ইণ্ডিজ, ইং, অনুবাদ উইল কক ১৯৭৩, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪০।

১১। গোলাম হোসেন— দি সিয়ার মুতাক্ষরীন, ইং অনুবাদ মঁশিয়ে রেমণ্ড ১৯০২, ২য় খণ্ড পৃ. ১৯১।

১২। ভেরেলস্ট, এইচ—এ ভিউ অব দি রাইস্ত, প্রগ্রেস এণ্ড প্রেজেন্ট স্টেট অব ইংলিশ গভর্ণমেন্ট ইন বেঙ্গল, ১৭৭২, পৃ. ১৩৮।

১৩। আলেকজাণ্ডার ডাও— দি হিস্ট্রি অব হিন্দুস্তান। ২য় খণ্ড, ১৭৭০, পৃ. ১৭৭০।

১৪। রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র—গ্রন্থাবলী বসুমতী সং পৃ. ২৪, ২২২, ২২৯।

১৫। কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায়— 'ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিত', কলকাতা ১৯৩২, পৃ. ৫৩-৫৪।

১৬। ডায়েরী এণ্ড কন্সালটেশন বুক; ১৭১১।

১৭। জে, সি, কে পিটারসন— 'বর্ধমান ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার ১৯১০, পৃ. ১৭২-১৭৪।

১৮। ক্রফার্ড— "স্কেচেস অব দি হিন্দুস", ১৭৯০, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২-১৩।

১৯। দীনেশচন্দ্র সেন, 'বৃহৎবঙ্গ', ১৯৩৫. ২য় খণ্ড, পৃ. ১১১১-১১১২।
২০। স্ক্র্যাপ্‌টন ল্যুক— রিফ্লেকশনস অন দি গভর্ণমেন্ট অব হিন্দুস্তান, ১৭৬৩, পৃ. ৩০।
২১। ওয়ারেন হেস্টিংস— মেসোয়ার্ম, ১৭৮৬, পৃ. ৮৯।
২২। বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা, বিনয় ঘোষ, কলকাতা, ১৯৭০।
২৩। The zemindary settlement of Bengal Cal. 1879, app. IV.
২৪। Johen Phlipps : A Servcies of the Principal products of bengal : No-1 In.igo : Cal-1832 Ch II, Table XXIV. 59.
২৫। মার্কস এঙ্গেলস— প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধ, বাংলা সং ১৯৭১, পৃ. ২৯।
২৬। বিনয় ঘোষ— সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজ চিত্র, চারখণ্ড।
২৭। J. J. Hecht : The Domestic Servant class in righteenth Century England. London. 1956.
২৮। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়— 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' ১ম খণ্ড, ২য় খণ্ড।
২৯। রমেশচন্দ্র মজুমদার—বাংলাদেশের ইতিহাস (আধুনিক যুগ) ২য় সং ১৩৮১, ৩য় খণ্ড।
৩০। অমিতাভ মুখোপাধ্যায়— উনিশ শতকের সমাজ ও সংস্কৃতি, ১৩৭১।
৩১। Alexander Duff : India and India Missions. 1839.
৩২। হুতোম—(কালীপ্রসন্ন সিংহ), হুতোম প্যাঁচার নকশা, সাহিত্য পরিষৎ সং ১৯৫৭।
৩৩। বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী (সাহিত্য পরিষৎ), সমাজ ১৩৪৫ সন।
৩৪। Education and Social Amelioration of Women in Pre-Mutury India, কালীকিঙ্কর দত্ত ৩য় অধ্যায়, পৃ. ৬৩-১২৬।
৩৫। The Calcutta Reveiw. 1846. Vol VI.
৩৬। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজা রামমোহন রায় (সাহিত্য সাধক চরিত মালা), ১৩৫৩ সন।
৩৬। The Days of John Company. Selection from Calcutta Gazettee 1824-1832. complied rd. by Anil chandra Das Gupta pp 155-6.
৩৭। দীনেন্দ্রকুমার রায়— ২য় মুদ্রণ শ্রাবণ, ১৩৯৯, আনন্দ সং পল্লীচিত্র
৩৮। ঐ— পল্লীচিত্র
৩৯। The Calcutta Review. 1855. p-79.
৪০। অমলকুমার চট্টোপাধ্যায়—Slaaery in India. চতুর্থ পরিচ্ছেদ পৃ. ৫৪-৫৭।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পল্লীসমাজ বিষয়ে শিক্ষিত শহরবাসীর সচেতনতা

বিভিন্ন সভাসমিতি আলোচনা প্রবন্ধ :

উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে বাঙালী তার যাবতীয় মধ্যযুগীয় জড়ত্ব ও অন্ধ জীবন চেতনা ছিন্ন করে। শিক্ষা সাহিত্য সমাজ ধর্ম রাজনীতি সর্ববিধ ক্ষেত্র নবজাগরণের মুক্ত উদার আলোয় জেগে উঠতে শুরু করে। বাঙালীর এই নবজাগরণের মহার্ঘ প্রাপ্তি জগৎজীবন সম্পর্কে তার সচেতনতা এবং আত্মসচেতনতা বা নিজ ব্যক্তি বোধের স্ফুরণ। আত্মবিস্মৃত জাতি আত্মশক্তির পরিচয় পেয়ে আত্মমর্যাদাবোধে থেকেই নির্মাণ হয় নবযুগের জাতীয় চেতনা তথা স্বদেশ চিন্তার ভিত্তি প্রস্তরটি । স্বদেশ ও স্বজনকে জানবার সুগভীর আগ্রহ তার সমস্যা, পীড়া আর্তি কিম্বা দুর্গতি বা বিনষ্টি সম্বন্ধে শিক্ষিত বাঙালী তার সচেতন অনুসন্ধানী দৃষ্টির আলোকপাতে সব উদ্‌ঘাটিত করতে চেয়েছিল সর্বসমক্ষে।

বলাবাহুল্য উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর নবজাগরণ ঘটেছিল। বাঙালী সমাজের নবজাগরণ ঘটেছিল বাঙালী সমাজের নারায়ণকে কেন্দ্র করে। নাগরিক শিক্ষিত সমাজই দেশের নানাবিধ সমস্যা সম্পর্কে ভাবিত হয়। বস্তুত সেই অন্ধকার যুগ মুহূর্তে সতীদাহ নিবারণ থেকে শুরু করে ইংরাজী শিক্ষা, নারী শিক্ষা, বিধবাবিবাহ, কৌলিন্য প্রথার তথা বহু বিবাহের কিম্বা বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধতা মুলক আন্দোলনই নতুন গণচেতনার প্রধান বাহক ছিল। সমাজ ও জাতি সেই নির্মাণের যুগে একান্তভাবে পল্লীসমাজ সম্পর্কিত পৃথক ভাবনার বিশেষ গুরুত্ববোধ সম্পূর্ণভাবে সঞ্চারিত হয়নি। ব্রিটিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও তার পূর্ব্বকালীন কিছু অর্থনীতির সংস্থাপনার ফলে বাংলার গ্রাম অবক্ষয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল ঠিকই, এবং বাঙালী সমাজজীবন অনিবার্যভাবে দ্রুত নগর কেন্দ্রিকতায় চলে যাচ্ছিল। কিন্তু গ্রামের ভাঙন ছিল ধীর। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে অল্পে অল্পে এর ক্ষয় হচ্ছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে ও সর্বসমক্ষে এর অবক্ষয়ের রূপটি পরিদৃশ্যমান না হলেও ক্ষয়ের রূপ ধরা পড়েছিল চিন্তাশীল ব্যক্তিদের চোখে।

স্বদেশ ও সমাজ বলতে গ্রামময় বঙ্গ ভূ-ভাগই বাঙালীর চোখের সামনে এসে দাঁড়াত। উনবিংশ শতাব্দীতে কলকাতাই ছিল দেশের মূল নাগরিক সভ্যতার একমাত্র পীঠস্থান। অভিনব ও নতুন জীবনযাপন নিয়ে কলকাতা সাধারণ বাঙালীর কাছে প্রবল কৌতূহল উদ্রেককর ও আকর্ষণীয় অথচ বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতই প্রতিভাত হত এবং একথাও ঠিক, সচেতন আধুনিক শিক্ষিত সমাজ ও মনন কলকাতা থেকেই ভূমিষ্ঠ হয়েছিল। আধুনিক জীবনবোধ গ্রহণ ও ধারণ করেছিল সুখ্যাত কলকাতার শিক্ষিত সমাজ। কলকাতা ব্যতীত অবশিষ্ট বাংলাদেশ মূলত যা গ্রামকেন্দ্রিক আধুনিক সমাজসচেতন শিক্ষিত ও বিদগ্ধ ব্যক্তিরা, মনীষিরা বাঙালীর সমাজজীবন বলতে সেই গ্রামভিত্তিক সমাজজীবনের ভাবনাকেও যুক্ত করেছেন। গোটা বাঙালী সমাজেব প্রাচীন সংস্কার ও কুসংস্কার মুক্তিই এঁদের আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য হলেও পল্লীগ্রাম সম্বন্ধেও তাঁরা গভীরভাবে ভেবেছেন।

ভারতবর্ষে সভায় বসে সকলে সমান অধিকার আলোচনা ও কর্মধাবা নির্ণয়ের পদ্ধতি সুপ্রাচীনকালে বৌদ্ধ সংঘে শুরু হয়েছিল। তারও আগে প্রাচীনতর যুগ ধর্মশাস্ত্র আলোচনার খোলাখুলি সভা এখানে প্রচলিত ছিল। তবে উনবিংশ শতাব্দীতে যে সভা সমিতি ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষিত বাঙালী তার দেশ সম্বন্ধীয় বিভিন্ন চেতনা প্রকট করেছে বা নিজস্ব অভিমত ও প্রচারধর্মী বক্তব্য পেশ করে গঠনমূলক কাজের প্রচলন করেছে তার মূলে ছিল ইংরেজ প্রভাব। ইংরেজদের অনুসরণে কলকাতায় শিক্ষিত সমাজ নতুন প্রণালীর নতুন স্বাদ ও উদ্দেশ্যবাহী আধুনিক সভাসমিতির পত্তন ঘটিয়েছিল। এই সভাসমিতিগুলি মোটামুটি ধর্মসভা, সাহিত্যসভা ও অর্থনীতি রাজনীতি বিষয়ক—এই ত্রিধারায় সংঘটিত হ'ত।

১৮১৫ খৃষ্টাব্দে রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত 'আত্মীয় সভা'ই হল তৎকালীন সংবাদ পত্রের বিবরণ অনুযায়ী প্রথম এই ধরনের সভা। তবে এটি ছিল প্রধানত ধর্ম সম্বন্ধীয় সভা। তৎকালীন শিক্ষিত বাঙালী সমাজের পল্লীসম্বন্ধীয় সচেতনতার উল্লেখযোগ্য প্রকাশ লক্ষ্য করা যাচ্ছে ১৮২০ খৃষ্টাব্দে বাংলা গদ্য সাহিত্যের প্রথম চর্চাকারীদের অন্যতম উইলিয়ম কেরী কর্তৃক লেডি হেস্টিংস এর আনুকূল্যে প্রতিষ্ঠিত Agri-Horticultural Society of India নামক প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপে। উইলিয়াম কেরী ছাড়াও এই প্রতিষ্ঠানে ছিলেন রাজা বৈদ্যনাথ রায়, রামকমল সেন প্রমুখ বিদগ্ধজন। কৃষির উন্নতির জন্য এই সোসাইটি পুরস্কার দিত। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে জলধর নামক চাষীকে বাঁধাকপির জন্য পদক ও ৪০ টাকা, পুরস্কার দেওয়া হয়। সংবাদটি তাৎপর্যপূর্ণ। পল্লীর সঙ্গে কৃষি ও কৃষকের সম্বন্ধ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বাংলাদেশ গ্রামময় ও কৃষিভিত্তিক তাই সচেতন যে কোন ব্যক্তির পল্লী সম্পর্কে ভাবনায় বাংলা পল্লীর কৃষিব্যবস্থা ও কৃষিজীবী মানুষের কথা অনিবার্যভাবে এসে যায়। সেদিক থেকে এগ্রি হর্টিকালচারাল সোসাইটির এই উদ্যোগ পল্লীসমাজের প্রতি গঠনমূলক চিন্তাভাবনার প্রতিফলক।

একথা ঠিক উনবিংশ শতাব্দীতে নবজাগরণের প্রধান লক্ষণ আত্মজাগরণের সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশের হিতচিন্তা। সেই হিত-চিন্তার সঙ্গে ওতপ্রোত যুক্ত হয়ে গিয়েছিল পল্লীবাংলার কৃষিজীবন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কুফলে বাংলার গ্রামীণ অর্থনীতির বিনষ্টি এবং কৃষকের সমূহ সর্বনাশ বিশেষত তাদের প্রতি জমিদার মহাজনদের অত্যাচারের নির্মম সত্য বিবরণ দিয়েছিলেন মনীষী অক্ষয়কুমার দত্ত 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় 'পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদিগের দুরবস্থা' (১৮৫০ খৃঃ) শীর্ষক ধারাবাহিক রচনায়। প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী বিনয় ঘোষের মতে 'পল্লীগ্রামের প্রজাদের দুরবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় বাংলার গ্রাম সমাজের এই ধ্বংসের চিত্রই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। বর্ণনার মধ্যে অর্থনীতিক পশ্চাদভূমির বিশ্লেষণ করা হয়নি বটে..... কিন্তু ধ্বংসের চিত্রটিকে অত্যন্ত জীবন্ত করে নিখুঁতভাবে তুলে ধরা হয়েছে। গ্রামসমাজের এরকম বাস্তব চিত্র সেকালের বর্ণনাতে নিতান্তই দুর্লভ।" এই রচনায় লেখক প্রথমেই লিখেছেন 'ভূমিই আমাদের মূলধন, এবং কৃষকেরাই আমাদের প্রতিপালক। অথচ পল্লীগ্রামের এই কৃষকদের ওপর ভূস্বামী এবং নায়েব গোমস্তা সরকার প্রভৃতি আমলাদের যে কি ভয়াবহ শোষণ, অত্যাচার ও অকথ্য জুলুম চলে তারই মর্মন্তুদ জীবন্ত বর্ণনা দিয়েছেন লেখক। জমিদার রাজস্ব আদায় ছাড়াও বাটা বাটার বৃদ্ধি, বৃদ্ধির বৃদ্ধি, আগমনী পার্বনী, হিসাবাণী প্রভৃতি "অশেষ প্রসার উপলক্ষ্য করিয়া ক্রমাগতই প্রজা নিপীড়ন করতেন। ভূস্বামীর গৃহের নানা প্রকার উৎসব অনুষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহ করতে হ'ত প্রজাকে। 'ইহা মাঙ্গণ বলিয়া প্রসিদ্ধ।" আবার দরিদ্র প্রজাদেরকে নিজস্ব উৎসব অনুষ্ঠানে ও ভূস্বামীদের "শুল্কোদান" করতে হ'ত। প্রজারা চুরি ডাকাতি-কলহ-বিবাদ ভ্রূণহত্যা ইত্যাদি কুকর্ম করলে তার বিচার করে কর আদায় চলত। এই রচনায় লেখক জমিদারের কর্মচারীদের জুলুম সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন— জমিদারদের "নিয়োজিত ব্যাঘ্রসম নিষ্ঠুর স্বভাব কর্মচারীদিগের কঠোর হস্তে" প্রজাদের এত নিপীড়ন চলত যে "তাহাদের কর্ণকুহরে গোমস্তা ও নায়েব শব্দ বজ্র নির্ঘোষের ন্যায় ভয়ানক" বোধ হত। পল্লীগ্রামের সাধারণ প্রজাদের "জমিদার, পত্তনিদার, ইজারাদার ও দরইজারাদার এই চারি প্রভুর লোভানলে আহুতি দান করিতে হয়".... এছাড়া ফৌজদারি উপদ্রব, অর্থাৎ থানা-পুলিশ দারোগার অত্যাচার ছিল সমান ভীতিজনক। প্রবন্ধকার লিখেছেন 'পঞ্চমবর্ষীয় বালক ও থানা ও দারোগার প্রসঙ্গ শুনিয়া সভয়ে মাতৃক্রোড়ে গিয়া বিলীন হয়'। গ্রামের সুদখোর মহাজনদের শোষণেরও নিষ্ঠুর বাস্তব সত্য রূপায়িত হয়েছে এই অসাধারণ প্রবন্ধে। "মহাজন সংজ্ঞক বিষদ বৈদ্যের" হাতে একবার গিয়ে পড়লে তার আর রেহাই থাকত না। মূলধনের দিন দিন বৃদ্ধি সে ধনে প্রাণে শেষ হত।

সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৩৭ ১৯৬৩ সংস্করণ।

তাই প্রবন্ধকার বাংলার গ্রামের উৎপীড়িত দুর্ভাগা কৃষক কুলের প্রতি গভীর সমবেদনায় লিখেছেন যে তারা—"রজনীতে নায়েব, দারোগা গোমস্তা, নালিশ, দণ্ড, এই সকলই স্বপ্ন দেখে। সর্বসন্তাপ-নাশিকা নিদ্রা ও তাহাদের উদ্বেগ দূরীকরণে সমর্থ নহে।'

প্রবন্ধের দ্বিতীয় কিস্তিতে লেখক জানিয়েছেন এই নিষ্ঠুর ও বিবেকহীন ভূস্বামীরা প্রজাদের স্থাবর অস্থাবর সমপত্তির সঙ্গে সঙ্গে তাদের শরীর ও কায়িক পরিশ্রমকে নিজস্ব ভোগ অধিকারের বিষয় বলে গ্রহণ করতে দ্বিধা করতেন না। প্রত্যেকের জীবিকার ভাগ জমিদারকে দিতে হত। কৃষক ছাড়াও গোয়ালা, জেলে, নাপিত, কামার, চর্মকার, বাহক, বাদক—সর্বপ্রকার শ্রমজীবী সাধারণ প্রজারা ছিল জমিদারের "ক্রীতদাস তুল্য শুধু নয়, ক্রীতদাসকেও এরূপ দাসত্ব করিতে হয় না" চূড়ান্ত আর্থিক শোষণ ছাড়াও তৎকালীন পল্লীসমাজে জমিদার, ভূস্বামীগণ কর্তৃক প্রজাদের ওপর নিষ্ঠুর শারীরিক অত্যাচারের আঠারো দফার একটি দীর্ঘ তালিকায় "দণ্ডাঘাত ও বেত্রাঘাত থেকে শুরু করে চর্ম পাদুকা প্রহার, খাপরা দিয়ে নাসিকা-কর্ণ মর্দন, গায়ে বিছুটি দেওয়া, কান ধরে দৌড় করানো, গ্রীষ্মের রৌদ্রে দাঁড় করিয়ে পিঠের ও হাতের ওপর ইট চাপানো, শীতে জলে ডোবানো, চুনের ঘরে বন্দী করে রাখা, কারারুদ্ধ করে উপোসে রাখা, ঘরের মধ্যে লঙ্কা মরীচের ধোঁয়া দেওয়া প্রভৃতি আরও অনেক নিষ্ঠুর শাস্তিদানের কথা আছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে ইংরেজ আমলে দেশে নীলচাষের সূত্রপাত হয়। বিদেশী সাহেবরা নীল চাষের ফলাও ব্যবসা করে বাংলার উর্বর ফসল ক্ষেত্রগুলি বিপুলভাবে করায়ত্ত করে। এই নীলকর সাহেবদের দৌরাত্ম্য, ঔদ্ধত্য ও অত্যাচার বাংলার গ্রামীণ জীবনকে তথা কৃষ্টি শিল্পকে একেবারে বিপর্যস্ত করে ফেলে। বাংলার সামাজিক ইতিহাস রচনাকারীর কথায়......নীলকর সাহেবরা বাংলার গ্রামাঞ্চলে শুধু ব্যবসায়ী রূপে নয়, এক অভিনব অত্যাচারী জমিদার রূপেও বিরাজ করতেন....." শাসকদের প্রতিভূ তাই দেশীয় জমিদারদের চেয়ে তাদের প্রতাপ ছিল শতগুণ বেশী। এমন কি দেশীয় প্রতিপত্তিশালী জমিদারেরা ও নীলকর সাহেবদের ভয় না পেয়ে চলেনি। গ্রাম বাংলার জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছিল এরা। এদের অত্যাচারে জ্বলন্ত সত্য বিবৃত হয়েছে "তত্ত্ববোধিনীর এই প্রবন্ধে। প্রবন্ধকারের ভাষায় দুর্বৃত্ত নীলকরদের ব্যবহার পূর্বোক্ত জমিদারদের অত্যাচারের চেয়েও ভয়ঙ্কর। তারা স্বল্প দাদন দিয়ে উৎকৃষ্ট চাষের জমিতে নীল বুনতে বাধ্য করে, নীল চাষে জমির উৎপাদিকাশক্তি নষ্ট হতে থাকে। এছাড়া নীলের ন্যায্য মূল্য কখনও প্রজারা পায় না, অথচ এই ব্যবসা করে নীলকরেরা প্রভুত মুনাফা লোটে। নিজের জমিতে খাদ্যশস্য উৎপাদনের অধিকার ও প্রজাদের

বিনয় ঘোষ— বাংলা সামাজিক ইতিহাসের ধারা পৃ. ৩১।

থাকত না। এছাড়া ছিল নীলকর সাহেবের কর্মচারীদের শোষণ। তাদের সেলামি, প্রণামী ইত্যাদি জুগিয়ে প্রজারা সর্বস্বান্ত হয়ে যেত। প্রবন্ধ রচয়িতা তত্ত্ববোধিনীর অগ্রহায়ণ ১৭৭২ শকাব্দ ৮৮ সংখ্যায় রচনার তৃতীয় কিস্তিতে নীলকর—অত্যাচার বিবরণ দিতে গিয়ে নিজের গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে লিখেছেন ঃ 'ভূ-স্বামীদিগেরই বিষম অত্যাচারের বিবরণ পাঠ কবিলে বিস্ময়াপন্ন ও ব্যাকুলিত চিত্ত হইতে হয়, কিন্তু এক্ষণে চতুর্দ্দিক হইতে এই কথাই শ্রুত হওয়া যাইতেছে যে, নীলকরদিগের অত্যাচার তদপেক্ষা ভয়ানক; তাহাদের দৌরাত্ম্যে প্রজাকুল নির্মূল হইবার উপক্রম হইয়াছে।'' পল্লীগ্রামে সাহেবদের এই অত্যাচারে বাধা দিবার উপায় চাষীদের ছিল না। হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকার সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ ও অমৃতবাজার পত্রিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক শিশির কুমার ঘোষ প্রমুখ বাঙালী নীল চাষীদের ওপর অত্যাচারের কথা সর্বসাধারণের এবং সরকারের নিকট উপস্থাপন করেন। সাহিত্যিক দীনবন্ধু মিত্র 'নীলদর্পণ' নাটকে নীলকরদের অত্যাচারের চিত্র এঁকেছেন তাতে লোকে এত উত্তেজিত হ'ত যে স্বয়ং বিদ্যাসাগর নীলকরের ভূমিকায় অভিনেতার উদ্দেশ্যে পায়ের চটি ছুঁড়ে মেরেছিলেন। অনেক স্থানে জমিদার নীলচাষীদের রক্ষা করতে চেষ্টা করতেন। এক কথায় জমিদার কৃষকসহ সমস্ত পল্লীসমাজই অর্ধ শতাব্দীব্যাপী নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল ১৮৫৯-৬০ সনে। ১৮৬০ সনের ১৯ শে মে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকায় মন্তব্য করা হয়—'...গ্রামের পর গ্রাম জ্বালান হইয়াছে, পুরুষদের ধরিয়া নিয়াছে, স্ত্রীলোকদের চরম লাঞ্ছনা করিয়াছে, ঘরের সঞ্চিত শস্য নষ্ট করা হইয়াছে.......।''

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পরিচালকরা ছিলেন শিক্ষিত সমাজের নাগরিক। কিন্তু দেখা গেছে বঙ্গপল্লীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা বিচারে এ পত্রিকা বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছে। নাগরিক জনসমাজের প্রতিনিধি এই পত্রিকা গ্রাম ও গ্রামবাসীর দুঃখ বেদনাকে সততই সর্ব সমক্ষে উদ্‌ঘাটিত করার প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদক শুধু কলকাতার উন্নতিকেই বাংলার সার্বিক উন্নতির প্রতিচ্ছবি মনে করেননি। গ্রামের যে ক্রমাবনতি ঘটছে এ বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন হয়ে তিনি লিখেছেন ঃ ''কিন্তু যে সমস্ত লোক বঙ্গদেশের অন্তবর্ত্তী সত্ত পল্লীগ্রামস্থ মনুষ্যের অবস্থা অনুসন্ধান করিয়া দেখে এবং যাহারা মধ্যে মধ্যে তাহাদিগের সহিত কথোপকথন করিয়া নানা প্রকার দুঃখের বার্তা শ্রবণ করে তাহারা আর কখনই বলিতে পারে না যে, এক্ষণে বঙ্গরাজ্যের বিশেষ দুর্দ্দশা ভিন্ন কোন অংশে ইহারা উন্নতি হইয়াছে।'' (বঙ্গদেশের বর্ত্তমান অবস্থা, শ্রাবণ ১৭৭৮ শক, সূত্র ঃ সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র। দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৬৩ সং পৃ.৪৪)

বাংলাদেশের ইতিহাস— রমেশচন্দ্র মজুমদার ৩য় খণ্ড ২য় সং পৃ. ৭৪। ঐ পৃ. ৭৫।

ইয়ংবেঙ্গল দলের মুখপাত্র 'স্পেকটেটর' পত্রিকার মধ্য দিয়ে শিক্ষিত নবচেতনা সম্পন্ন বাঙালীর আধুনিক সমাজ সচেতনতা প্রকট হয়েছিল। বলাবাহুল্য এই সমাজ চৈতন্যে বাংলার পল্লীগ্রাম একটি মুখ্য ভূমিকায় ছিল। পল্লীগ্রামের সাধারণ প্রজা, কৃষিজীবী সম্প্রদায় যে জমিদার মহাজন—আইন আদালত-পুলিশ-দারোগার কি নিদারুণ অন্যায় অত্যাচার ও অবিচার জুলুমের অসহায় শিকারে পরিণত হয়েছিল সে সত্য সর্বসমক্ষে উদ্‌ঘাটনে এই পত্রিকার শিক্ষিত নাগরিক পরিচালক মণ্ডলী সচেতন প্রচেষ্টা চালিয়ে ছিলেন বিভিন্ন পাঠকের পত্রাদি প্রকাশ, ধারাবাহিকভাবে কৃষিজীবীর ওপর অত্যাচারের বিবরণ বিবৃতকরা, পাঠকের মতামত উদ্ধারের মাধ্যমে। 'রাইয়ত' শীর্ষক ধারাবাহিক রচনাটি সে সময়ের গ্রামবাংলার এক প্রত্যক্ষ সমাজ চিত্র রূপ। স্পেকটেটর-এর ১৮৪২, ১লা নভেম্বর ১২ সংখ্যা, ১৫ই ডিসেম্বর ১৮৪২, ১৪ সংখ্যায় ধারাবাহিক জনৈক পত্র প্রেরকের বিবরণে হুগলির দরিদ্র মুসলমান প্রজা সিয়াজানের কাহিনীর মাধ্যমে জানানো হয়েছে "গ্রামের জমিদার ও তালুকদারেরা জমি সংক্রান্ত বিবিধ আইনের ফাঁক খুঁজে কিভাবে অসহায় প্রজাদের উপর নির্যাতন করেন।" মিয়াজান এদেশের পল্লীর শত শত দরিদ্র প্রজারই প্রতিরূপ। জমিদারের খাজনা বৃদ্ধির দুরভিসন্ধির ষড়যন্ত্রে, অত্যাচারের সহস্র কলা কৌশলে, কত অজানা অপরাধে যে নিরীহ প্রজা জমিদারের কাছারিও উৎপীড়িত হয়, পুলিশের অত্যাচার, হাজতবাস ভোগ করে, যাদের বিরুদ্ধে জমিদার থেকে শুরু করে জমিদারের ক্ষুদ্রতম কর্মচারী, থানার দারোগা কালেক্টর, জেলখানার রক্ষী সকলেই নির্মম নিষ্ঠুর। মিয়াজান সেই অসহায় প্রজাদেরই এক প্রতিনিধি।

"বঙ্গদেশীয় রাইয়তদিগের অবস্থা দেখিয়া অনেকের মনে দুঃখ উপস্থিত হয়.... (১লা নভেম্বর, ১৮৪৩, ২য় খণ্ড, ৩৭ সংখ্যা) এরকমভাবে পত্র শুরু করে একই পত্রিকায় বাংলার সাধারণ পল্লীগ্রামের প্রজাদের দুঃখ চিত্র তুলে ধরেছেন এক পাঠক। তিনি লিখেছেন ঃ "জমিদারদের দৌরাত্মেই প্রজাগণকে দুঃখ ভোগ করিতে হয়। লর্ড কর্ণওয়ালিশ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কালীন জমিদারদিগকে ক্ষমতা প্রদান করাতেই তাহাদের রাইয়তদিগের উপর দৌরাত্ম্য করণের পন্থা হয়।" পত্র লেখক স্পষ্ট দেখিয়েছেন আইন অনুযায়ী কাজ হয় না। "জমিদারদের দৌরাত্ম্য নিবারণার্থ ও প্রজাগণের দুঃখ মোচনার্থ ১৭৯৩ সালের ১২।১৩।১৪।১৫।১৬ ধারাতে যে উপায় করিয়াছেন তাহা প্রায় মফঃস্বলের ভূমধ্যকারীরা মান্য করেন না অর্থাৎ তদুনসারে কার্য হয় না।" অতঃপর এই দুরবস্থা নিবারণার্থে তিনি সরাসরি ভারতবর্ষের গভর্ণমেন্টের কাছে প্রতিকার দাবী করেছেন ঃ '.....অতএব প্রজাগণের দুঃখ দেখিয়া সভ্য গভর্ণমেন্টের নিশ্চেষ্ট থাকা উচিত হয় না যাহাতে প্রজার ক্লেশ দূর হয় তাহা করা কর্তব্য কিন্তু এখানকার সভ্যতা নামমাত্র তদ্দারা ফল কিছুই হয় না।"

সামাজিক বিবিধ সমস্যা বিষয়ে স্বাধীন মতামত আলোচনা, কথোপোকথনের মাধ্যমে প্রকাশ করার আন্তরিক চেষ্টা ও আগ্রহ উনবিংশ শতাব্দীর আধুনিক শিক্ষিত নগরবাসীর পক্ষ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। এরকম একটি সভা 'এতদ্দেশীয় কথোপকথনার্থক সাপ্তাহিক সভা'র একটি বিবরণ পাওয়া যাচ্ছে দি বেঙ্গল স্পেকটেটর পত্রিকার ১৭ এপ্রিল ১৮৪৩, ২য় খণ্ড, ১১ সংখ্যায়। (সূত্র ঃ বিনয় ঘোষ ঃ সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র, খণ্ড-৬ সং ১৯৮৩, পৃ. ৮৩) এই সভায় হরচন্দ্র লাহিড়ী জমি বিক্রয় সম্বন্ধে নতুন আইনের ক্ষতি ও অসুবিধার কথা বক্তৃতায় প্রকাশ করেন, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় হিন্দু ও মুসলমান রাজত্বের তুলনায় ইংরেজ রাজত্বে জমিতে সাধারণ প্রজাদের অধিকার না থাকার কথা তীব্র ভাষায় সমালোচনা করেন। "হিন্দুদের রাজত্বকালে সামান্য প্রজাদের ভূমিতে স্বত্ব ছিল, ইংলন্ডীয়েরা এতদ্দেশাধিকারী হইয়া অবধি প্রজাদের স্বত্ব উচ্ছিন্ন করিয়া জমীদারদের অধিকার সৃষ্টি করিয়াছেন কিন্তু ইহার যুক্তিও ন্যায় বিরুদ্ধ।" শ্যামাচরণ সেন বক্তৃতায় বঙ্গদেশীয় রাইয়তদের দুঃখ দুর্দ্দশার তিনটি দিকের কথা উল্লেখ করে বলেন ঃ "বঙ্গদেশীয় রাইয়তেরা তিন প্রকারে যন্ত্রণা ভোগ করে ঃ ১। ভূম্যধিকারিয়া তাহাদের প্রতি নিগ্রহ করেন ২। নিকটস্থ ধনী মহাশয়রা দৌরাত্ম্য করেন। ৩। তাহারা নিজের অজ্ঞতা দ্বারাও দুঃখ পায়।"

এই সভাতে প্রস্তাব আনা হয় যে, "এক্ষণে জমিদার ও রায়তদের মধ্যে মধ্যবর্তী লোক থাকাতে রায়তেরা জমিদার হইতে কিরূপ অন্তরে আছে তদ্বিষয়ের অবিবেচনার্থে এক কমিটি নিযুক্ত হউক। পুত্রবৎ প্রজাপালনের প্রাচীন রীতি সংস্থাপনার্থে এবং জমিদার ও প্রজা উভয়ের মঙ্গল নিমিত্ত ঐ কমিটি জমিদার ও রায়তদের অবস্থার প্রমাণ সংগ্রহ করুন যেহেতু তাহা হইলে ভারতবর্ষের নানাবিধ প্রচুর ধন প্রসবের যে ক্ষমতা আছে তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইতে পারিবেক।"

১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ২০শে এপ্রিল বাঙালী শিক্ষিত নব্য সম্প্রদায়ের উদ্যোগে 'বেঙ্গল ইণ্ডিয়া সোসাইটি গঠিত হয় এবং এখানে সভ্যরা ইংলণ্ডীয় বাজার আইনের অবিরোধে চালিত, আইন সকল মান্য করত ভারতবর্ষের মঙ্গল চেষ্টা করিবেন" স্থির হয়। (সূত্র ঃ ঐ স্পেক্টেটর ২৪ জুলাই ১৮৪৩। দ্বিতীয় খণ্ড ২৪ সংখ্যা) উপরোক্ত সূত্রে জানা যায় যে দেশের 'ভূমিকৃষকদিগের অবস্থা বিষয়ক কিছু প্রশ্ন এই সভা উত্থাপন করে। রায়তদের অবস্থা সম্পর্কিত তথা রায়তদের জমি ও মালিকানার বিভিন্ন তথ্য, তাদের চাষের বিভিন্ন সর্ত্তাদি, জমিদারের সঙ্গে সম্পর্ক, তাদের আহার, বাসস্থান, বেতন বা আয়, ফসল উৎপাদন এবং ভাগ সম্পর্কিত যে ত্রিশটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় সেগুলি এই প্রত্রিকা উদ্ধৃত করেছে।

বাংলাদেশে প্রথম কলকাতা শহরেই আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার সূচনা হয়। স্কুল কলেজ গড়ে ওঠে। নারী শিক্ষার ক্ষেত্রেও তাই শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে পার্শ্ববর্তী

গ্রামাঞ্চলেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার মানসিকতা দেশের মনীষীবৃন্দের এবং শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনেও দেখা গেল। স্বয়ং বিদ্যাসাগর বাংলার গ্রামাঞ্চলে বহু বিদ্যালয় পত্তন করেন। এদেশে শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে বিদ্যাসাগর যে পরিকল্পনা করেন তার মূল সুরটি হল বাংলাভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধি। বারাণসী সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ব্যালান্টাইন ২৯, আগষ্ট ১৮৫৩ একটি রিপোর্ট শিক্ষা সংসদে পেশ করেন। বিদ্যাসাগর ব্যালান্টাইনের রিপোর্ট আলোচনা করে ৭ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৩ নিজস্ব পরিকল্পনা সংসদের নিকট প্রেরণ করেন। (সূত্র ঃ বিনয় ঘোষ, বিদ্যাসাগব ও বাঙালীসমাজ প্রথম ওরিয়েন্ট লংম্যান সং ১৯৭৩, পৃ. ১৭৭)। রিপোর্টের তিনি সুস্পষ্ট বলেন ঃ 'জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার আমাদের প্রথম প্রয়োজন।' নর্মাল স্কুল, চারটি জেলায় মডেল স্কুল ও বাংলার পাঠশালা একত্রে তত্ত্বাবধানের তিন বছর পর বিদ্যাসাগর তাঁর রিপোর্টে লেখেন ঃ "যখন এই কাজ আরম্ভ করা হয় তখন অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন যে গ্রামের লোকেরা মডেল স্কুলের মর্ম বুঝতে পারবে না। কিন্তু স্কুলের সাফল্য সেই সন্দেহ দূর করেছে। যে সব গ্রামে স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেই সব গ্রামের ও তার আশপাশের গ্রামবাসীরা স্কুলগুলিকে আর্শীবাদ বলে মনে করেন..." (সূত্র ঃ ঐ পৃ. ২০৯, General Report on Public Instruction 1857-58 App. 'A' 178-80) । ১৮৪৮ ও ১৮৫৬ সালে বাংলা ভাষায় অনুশীলন সম্পর্কে রাজনারায়ণ বসু দুটি বক্তৃতা দেন। মেদিনীপুরের এই দুটি ভাষণে বাংলার পল্লীবাসীদের উন্নতি বিকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করা হয়েছিল। (সূত্র ঃ ঐ পৃ. ১৯৬)। বাংলা ভাষায় শিক্ষা প্রদানের উপযোগিতা প্রসঙ্গে রাজনারায়ণ বসু বলেন ঃ "....শিক্ষা প্রদান দ্বারা পল্লী গ্রামস্থ লোকের কত মহোপকার সাধন হইবেক তাহা বর্ণনাতীত। বিবেচনা করিয়া দেখুন এক্ষণে পল্লীগ্রামে কত অত্যাচার, কত দৌরাত্ম্য, কত প্রবঞ্চনা, কত শঠতাচরণ ও কত পরস্পর অবিশ্বাস প্রবল রহিয়াছে। পল্লীগ্রামস্থ লোকেরা বিদ্যাভ্যাস করিলে তাহাদিগের মনোযোগ হইবেক, তাহাদিকের দুষ্কর্মে প্রবৃত্তির হ্রাস হইবে, তাহারা রাজপ্রদত্ত স্বকীয় ক্ষমতা সকল বিজ্ঞাত হইয়া আপনাদিগের যথার্থ স্বত্ব ও অধিকার রক্ষা করিতে এক্ষণাপেক্ষা অধিক ক্ষমতাবান হইবে, ও ভূস্বামী ও রাজকর্মচারি দিগের দ্বারা তাহাদিগের পীড়িত ও প্রবঞ্চিত হইবার সম্ভাবনা অনেক পরিমাণে দূরীকৃত হইবে। পরন্তু তাহারা জ্ঞাত হইবে যে কেবল ভূমিকর্ষণ ও বাণিজ্য করিবার জন্য মনুষ্য এখানে জন্মগ্রহণ করে নাই, মনুষ্যের বুদ্ধি বৃত্তি ও ধর্ম প্রবৃত্তি আছে যাহার মার্জ্জন ও প্রতি তাঁহার সুখ অনেক অংশে নির্ভর করে।..." এভাবে শিক্ষিত বাঙালী পল্লীবাসীদের কথা চিন্তা করেছেন। "বিদ্যাসাগর নভেম্বর ১৮৫৭ থেকে মে ১৮৫৮ এই কয় মাসের মধ্যে ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন, হুগলী জেলায় ২০টি, বর্ধমান জেলায় ১১টি, মেদিনীপুরে ৩টি, নদীয়ায় একটি বিদ্যালয়গুলির জন্য মাসিক খরচ হতো

৮৪৫ টাকা, ছাত্রীসংখ্যা ছিল ১৩০০। (সূত্র ঃ ঐ পৃ. ২২৩, Edu. Con. 5 August 1858 No. 16) যাঁদের ঐকান্তিক চেষ্টায় শিক্ষা সংস্কৃতির আলোক ধীরে ধীরে শহর থেকে গ্রামের দিকে বিচ্ছুরিত হয় বিদ্যাসাগর নিঃসন্দেহে তাঁদের অন্যতম।

'তত্ত্ববোধিনী সভার উদ্যোগে বংশবাটী গ্রামে ১৮ই বৈশাখ ১৭৬৫ শতকে 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা' নামে ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এ প্রসঙ্গে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ১ আশ্বিন ১৭৬৫ শক ২ সংখ্যায় মনীষী অক্ষয়কুমার দত্তের একটি বিবরণ দেওয়া হয়। গ্রামে শিক্ষা বিস্তারের জন্য তাঁর সুগভীর আগ্রহের কথা সেখানে প্রকাশিত হয়েছে। অক্ষয়কুমারের বক্তব্য এরকম ছিল যে, কলকাতায় বঙ্গভাষায় বিভিন্ন বিদ্যা শিক্ষার জন্য নানা উদ্যোগ লক্ষ্য করে "দেশ হিতৈষি ব্যক্তি আহ্লাদে পরিপূর্ণ হয়েন'..... কিন্তু "পরক্ষণেই তিনি পল্লীগ্রামের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া অত্যন্ত ক্ষোভযুক্ত হয়েন।....এক দিকে তিনি দৃষ্টি করেন বিদ্যা অতি উজ্জ্বল বেশে দ্রুত বেগে আগমণ পূর্বক লোকের মনোরঞ্জন করিতেছেন, অন্যদিকে অজ্ঞানের পরাক্রমে লোকের অন্তঃকরণ জড়তায় আচ্ছন্ন হইতেছে।"

অক্ষয়কুমার দত্তের মত প্রগতিশীল চিন্তাবিদের চোখে কলকাতার জীবন চেতনার তুলনায় পল্লীগ্রামের অশিক্ষা-কুশিক্ষা ভরা পরিবেশ সত্য রূপেই ধরা পড়েছিল—"....অন্যদিকে গ্রামবাসিরা দলাদলি দ্বেষাদ্বেষি করত; একতার বিচ্ছেদ পূর্বক দেশের হিতকল্পে অনুরাগ শূন্য রহিয়াছেন।"

গ্রামে শিক্ষা বিস্তারের জন্য আন্তরিক আগ্রহ একাধিকবার এই পত্রিকায় ব্যক্ত হয়েছে। গ্রামের সমস্ত মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে নিজ নিজ গ্রামে বিদ্যালয় গড়ে তোলার জন্য অনুনয় ও পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে পত্রিকার পক্ষ থেকে। "এক্ষণে আমাদের দেশের যেরূপ অবস্থা তাহাতে গ্রামস্থ লোকেরা ঐক্য হইয়া স্বীয় স্বীয় গ্রামে বিদ্যালয় সংস্থাপন না করিলে অপর সাধারণ সকলের বিদ্যালয় সম্পন্ন হওয়া সুকঠিন।"

পত্রিকার চৈত্র ১৭৭৪ শক / ১১৬ সংখ্যায় 'নিবাধই গ্রামস্থ বিদ্যালয়' শীর্ষক আলোচনায় আরো জানানো হয়েছে বারাসাত জেলার নিবাধই গ্রামে সে সময় একটি আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপনের সংবাদ। বিদ্যালয়ে একটি 'ক্ষুদ্র পুস্তকালয়'ও ছিল। উক্ত নিবন্ধেই সেই গ্রামে প্রতিষ্ঠিত একটি বালিকা বিদ্যালয়ের সংবাদ দিতে গিয়ে নিবন্ধকার জানিয়েছেন—'অন্য অন্য স্থানে বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপন উপলক্ষ্যে যেরূপ বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত হইয়াছিল, নিবাধই গ্রামে এ বিষয়ে সেরূপ কলহ ঘটনা হয় নাই।" নারী শিক্ষা প্রচলন গ্রামে সাধারণত যে প্রতিকূলতা সৃষ্টি হয়, এই গ্রামে তা না থাকায় নিবন্ধক অবশ্যই তৃপ্তি সহকারে সেই সংবাদও পরিবেশন করেছেন— 'যাহারা আপন আপন পরিবারস্থ বালিকাদিগকে তথায় প্রেরণ করেন, অন্যে তাঁহারদের প্রতি তদৃশ বিদ্বেষ প্রকাশ করেন না। অপর

কোন গ্রামস্থ লোকদিগের এরূপ অকুটিলভাব দৃষ্টি করা যায় না।" সংবাদের শেষে বিদ্যালয়ের অর্থাভাবের সমস্যাটিও লেখক স্পষ্টই প্রকাশ করেছেন।

এই সব আলোচনা, প্রবন্ধ-নিবন্ধ বা সভাসমিতির বক্তব্য থেকে স্পষ্টই এই সত্যটি বেরিয়ে আসে যে, তৎকালীন কলকাতা কেন্দ্রিক নবশিক্ষিত বাঙালী নগর জীবনের নানাবিধ সমস্যা বিচিত্র ঘটনাবলীর সঙ্গে তার চেতনাকে যুক্ত করেও গ্রামবাংলা সম্বন্ধে ও গভীর আগ্রহী ছিল।

মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁর স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস (১৮৮৫) গ্রন্থে স্বদেশ চেতনার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত করেছিলেন পল্লীচেতনাকে। তিনি জানতেন "ভারতবর্ষ পল্লীপ্রধান...। তাই তিনি গ্রামীণ শাসন ব্যবস্থা ও প্রাথমিক শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। শিক্ষাদীক্ষা, শান্তি-শৃঙ্খলা, ধর্মকর্ম প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ের ভাব অর্পিত হবে গ্রামবাসীদের উপর। দেশের শাসক শ্রেণী ব্যক্তিরা তার তত্ত্বাবধান করবেন মাত্র।" (সূত্র ঃ রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ চিন্তা, ড. শ্রীমন্তকুমার জানা, ১৯৮৬, পৃ. ৪৭) অর্থাৎ গ্রাম পঞ্চায়েত ব্যবস্থার বিশেষ গুরুত্ব ও স্বনির্ভরতা দানের বাস্তব পরিকল্পনা ঊনবিংশ শতাব্দীর এই বিশিষ্ট মনীষী ভেবেছিলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর আরও এক বাঙালী মনীষা ও প্রতিভাধর পুরুষ সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের চেতনায় দেশভক্তির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী যুক্ত ছিল পল্লীবাংলার জীবন ও সমাজের প্রতি সুগভীর সহানুভূতি। সমকালীন নগরকেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবীদের রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রতি বঙ্কিমের আস্থা ছিল না। তিনি চেয়েছিলেন সুস্পষ্ট ও মঙ্গলময় আদর্শের পথে সমাজ উন্নয়ন। তিনি গ্রাম বলতে শুধু বাগ-বাগিচা পথঘাট বুঝতেন না; গ্রামের মানুষ ও তার জীবন সম্পর্কে ঘনিষ্ঠ সংযোগে না থাকা বাস্তবতাশূন্য তৎকালীন রাজনীতিবিদদের তিনি প্রবল সমালোচনা করেছেন। দীনবন্ধু জীবনী ও সাহিত্য সমালোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমের 'এই জীবনে জীবন যোগ করা' ভাবনা বলিষ্ঠ কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে। তাঁর মতে বাঙালী লেখকেরা "অনেকেই ... দেশের মঙ্গলার্থ লেখেন, কিন্তু দেশের অবস্থা কিছুই জানেন না।..... কেহবা অতিরিক্ত দুই চারিখানি পল্লীগ্রাম, বা দুই একটা ক্ষুদ্র নগর দেখিয়াছেন, কিন্তু সে বুঝি কেবল পথঘাট, বাগান-বাগিচা, হাটবাজার। লোকের সঙ্গে মিলেন নাই। দেশ সম্বন্ধীয় তাহাদের যে জ্ঞান তাহা সচরাচর সংবাদপত্র হইতে প্রাপ্ত।.....এমন বলিতেছি না যে কোনো বাঙালী লেখক গ্রাম্যপ্রদেশে ভ্রমণ করেন নাই। অনেকে করিয়াছেন, কিন্তু লোকের সঙ্গে মিশিয়াছেন কি? না মিশিলে যাহা জানিয়াছেন তাহার মূল্য কি?" (সূত্র ঃ ঐ 'রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ চিন্তা' পৃ. ১৬১)

পল্লীবাংলার কৃষক সমাজের যে দুর্গতি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে ঘণীভূত হয়ে ওঠে দেশের সেই শোষিত কৃষককুল সম্পর্কে বঙ্কিমের গভীর বেদনা ও সহানুভূতি সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে তাঁর বিবিধ প্রবন্ধ গ্রন্থের অন্তর্গত

"বঙ্গদেশের কৃষক (দেশের শ্রীবৃদ্ধি) শীর্ষক দীর্ঘ প্রবন্ধে বঙ্কিমের পূর্ণ বিশ্বাস ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ নিম্নশ্রেণীর দেশবাসীর মঙ্গল না হলে দেশের মঙ্গল নেই। বাংলাদেশের শতকরা নিরানব্বই জন লোক দরিদ্র ও কৃষিজীবী; জমিদারের শোষিত প্রজা। দেশের অর্থভোগ করে জমিদার—মহাজন-রাজা-বণিক আর যারা শষ্য উৎপাদন করে তারা বিরুদ্ধ পরিবেশে চরম অভাব অনটন ও কষ্টে কালাতিপাত করে। দেশের শ্রীবৃদ্ধি হলেও শ্রীবৃদ্ধি নেই। "কেবল কৃষকের শ্রীবৃদ্ধি নাই। এমত শ্রীবৃদ্ধির জন্য যে জয়ধ্বনি তুলিতে চাহে তুলুক, আমি তুলিব না। " (বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্গদেশের কৃষক দেশের শ্রীবৃদ্ধি।) 'হাসিমি শেখ' আর 'রামা কৈবর্ত' হিন্দু মুসলিম মিলিত বঙ্গপল্লীর যে শ্রমজীবী সমাজ, সেই অখণ্ড সমাজের অর্থনৈতিক উন্নতি চেতনা সুস্পষ্টভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখায় ব্যক্ত হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্র লোক শিক্ষার ওপরেও প্রধানভাবে আলোকপাত করেছেন। কেননা সাধারণ লোকের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার না হলে দেশের উন্নতি সম্ভব নয়। তিনি লোকশিক্ষার কাজে আত্মনিয়োগের জন্য দেশের শিক্ষিত সমাজকে অগ্রসর হতে আহ্বান জানালেন। বড় বড় সভাকক্ষে বক্তৃতার মাধ্যমে তিনি তাঁর বক্তব্য রাখেননি। কিন্তু তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধ রচনা ইত্যাদিতে নিজস্ব অভিমতটি জোরালোভাবে ফুটে উঠেছে। শিক্ষা যেহেতু মানুষের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ ঘটায়, তাকে কর্মক্ষম, দায়িত্বশীল ও ন্যায়নিষ্ঠ করে তোলে। তাই চাই লোক শিক্ষার ব্যাপক বিস্তার। এ দেশের গ্রাম সমাজের কোটি কোটি নিরক্ষর আপামর কৃষক সাধারণের শিক্ষা সম্বন্ধে দেশের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় নিশ্চেষ্ট ও উদাসীন হওয়ায় বঙ্কিমের ক্ষোভ ছিল, তাই বাংলার উন্নতি না হওয়ার মূল যে লোকশিক্ষার অভাবে সে কথা জানাতে দ্বিধা করেননি।...... যাহারা বাঙ্গালার নানাবিধ উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত, তাঁহারা লোক শিক্ষার কথা মনে করেন না,.... সুশিক্ষিত যাহা বুঝেন, অশিক্ষিতকে ডাকিয়া কিছু কিছু বুঝাইলে লোক শিক্ষিত হয়। (বিবিধ প্রবন্ধ, লোকহিত)।

রবীন্দ্রনাথের ও স্বদেশ চেতনার মুখ্য আশ্রয় পল্লী সংগঠন ও জনশিক্ষা। প্রতিভার উন্মেষকাল থেকেই তিনি বারংবার বলেছেন যেহেতু ভারতবর্ষ পল্লী প্রধান—পল্লীর মানুষের সঙ্গে হৃদয়ের যোগে তাদের অবস্থা জেনে কর্মে প্রবৃত্ত হতে হবে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে কবির এই সমাজ চেতনা নানা প্রবন্ধ-নিবন্ধ লেখালেখির মধ্য দিয়ে উৎসারিত হয়। কংগ্রেসী নেতাদের ইংরেজ দরবারের আবেদন নিবেদনের সময় কবি 'হাতে কলমে' প্রবন্ধে (ভারতী, ১২৯১ আশ্বিন) লিখেছিলেন, দেশের মানুষের সঙ্গে মিশে তাদের 'হাতেকলমে' উন্নতির চেষ্টা করলেই যথার্থ দেশের উন্নতি। এরপর 'স্বদেশী সমাজ' (১৯০৫) এবং আরও বহু প্রবন্ধে পল্লীসমাজ বিষয়ে কবির গভীর সচেতনতা ও দিক নির্দেশের স্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছে। কবি বঙ্কিমচন্দ্রের মতই মনে করেছেন, যথার্থ আন্তরিকতার

সঙ্গে জনকল্যাণকর কাজে শিক্ষিত ব্যক্তিদের আত্মনিয়োগ করতে হবে। দেশের অধিক সংখ্যক সাধারণ মানুষ শিক্ষিত না হলে দেশের উন্নতি হবে না। সেইজন্য কবি শিলাইদহে নিজস্ব জমিদারীতে এবং শান্তিনিকেতনে লোকশিক্ষা ও গ্রামোন্নয়ন ব্রতী হন। তাঁর নিজের স্বীকৃতি ঃ "আমি দেশের কাজের মধ্যে একটি কাজকেই শ্রেষ্ঠ বলে মেনে নিয়েছিলুম—জনসাধারণকে আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠা দেবার শিক্ষা দেব বলে এতকাল ধরে আমার সমস্ত সামর্থ্য দিয়েছি।" (রাশিয়ার চিঠি, তৃতীয় পত্র) শ্রীনিকেতনে বর্ষামঙ্গল, হলকর্ষণ ও বৃক্ষরোপণ উৎসবগুলিও কবির পল্লীচেতনার প্রকাশ। 'অরণ্য দেবতা'য় (১৩৪৫) মানুষের সর্বগ্রাসী লোভ থেকে অরণ্য সম্পদকে রক্ষা করার সমস্যা কবিকে পীড়িত করেছে। আর অরণ্যই পল্লীর প্রাণ, মানুষেরও প্রাণ। শ্রীনিকেতন থেকে পার্শ্ববর্তী গ্রামের মানুষদের মধ্যে যেমন ফলমূল, শাক-সব্জির বীজ ও চারাগাছ বন্টন করা হতো। যিনি পুত্র ও জামাতাকে কৃষি বিজ্ঞান শেখাবার জন্য বিদেশে পাঠান, শ্রীনিকেতনে কৃষি গবেষণাগার বসান, সমবায়িক চাষের উদ্যোগ গ্রহণ করেন, দেশের 'শুষ্ক তপ্ত দগ্ধ মাটির'র জন্য শিক্ষিত মানুষের সমস্ত "ভাবের সমারোহ", সমস্ত 'জ্ঞানের সঞ্চয়' দান করার আহ্বান জানান সেই কবিই তো পল্লীবাসী কৃষকদের পরমাত্মীয়, পরাধনী ভারতে 'সবুজ বিপ্লব' আন্দোলনের প্রথম ভগীরথ। কৃষি, পল্লীসমাজও মানব সমাজ এর সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য কবি কণ্ঠে বিজ্ঞান দীক্ষার ফলিত প্রকাশ— "আজ শুধু একলা চাষীর চাষ করিবার দিন নাই, আজ তাহাদের সঙ্গে বিদ্বানকে বৈজ্ঞানিককে যোগ দিতে হইবে....বিজ্ঞান মানুষকে মহাশক্তি দিয়েছে। সেই শক্তি যখন সমস্ত সমাজের হয়ে কাজ করবে তখনই সত্যযুগ আসিবে" (সূত্র ঃ ড. ক্ষুদিরাম দাস, রবীন্দ্র-চিত্তে বিজ্ঞানের সক্রিয় পদক্ষেপ)।

কলকাতা নগরে বাইবে পল্লীগ্রামের যে বিপুল কৃষিভিত্তিক সাধারণ জনসমাজ বাংলা দেশের মূল প্রধান সত্তা হয়ে বিরাজ করছে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে নানাবিধ কারণ এবং সর্বোপরি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কুফলে তার সমৃদ্ধরূপ ক্রমশ বিনষ্ট হয়ে যায়, সেই হতশ্রী, অনগ্রসর, দুঃখী পল্লীবাংলার সাধারণ জীবন ও সমাজের দুরবস্থার প্রতি সচেতন দৃষ্টিপাত করেছিলেন উনবিংশ শতাব্দীব রেনেসাঁর আলোপ্রাপ্ত নবশিক্ষিত বাঙালী।

তৃতীয় অধ্যায়

উপন্যাস পূর্ব বাংলা কথা সাহিত্য পল্লীসমাজ

(সাময়িক পত্র, নক্সা, আখ্যান ইত্যাদি)

সমাজ গতিশীল। শিল্প-সাহিত্যও গতিশীল। সমাজ পরিবর্তনের বাঁকে বাঁকে সাহিত্য-শিল্পের নূতন নতুন অধ্যায় গড়ে ওঠে। উপন্যাস আধুনিক সমাজ-জীবন নির্ভর নতুন সাহিত্য শাখা।

পাশ্চাত্য সাহিত্যে শিল্প বিপ্লবোত্তর অর্থনৈতিক অবস্থা ও মানসিক পরিবর্তন জাত, সামাজিক পরিস্থিতি, পরিবর্তিত জটিল মানসিকতা উপন্যাস সৃষ্টির উপযুক্ত পটভূমি রচনা করেছিল। বাংলাদেশে উপন্যাস নামক বস্তুধর্মী জীবনমুখী সাহিত্য শাখার উদ্ভব ঘটেছে উনবিংশ শতাব্দীতে। এদেশে ইংরেজ আগমনের পব তাদের শাসনে শোষণে প্রাচীন বাংলার গ্রাম নির্ভর অর্থনৈতিক কাঠামো সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়, সামাজিক বনিয়াদেও ঘুন ধরে। ইংরেজের সৃষ্ট ঔপনিবেশিক অর্থ কাঠামো বাংলা উপন্যাস রচনার উপযুক্ত বাতাবরণ দ্রুত গড়ে তুলেছিল। ইংরেজ শাসক-প্রবর্তিত অর্থনীতি এদেশে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ও কলকাতা নগরকেন্দ্রিক নব সভ্যতা সংস্কৃতি সৃষ্টি করেছিল। ইংরেজী শিক্ষিত পরিশীলিত মধ্যবিত্তের নাগরিক চেতনাতেই বাংলা উপন্যাসের প্রথম প্রহর সূচিত হয়েছিল।

বাংলা সাহিত্যে সার্থক উপন্যাসের সূচনা ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র রচিত দুর্গেশনন্দিনীকে দিয়ে। কিন্তু বাংলা উপন্যাসের খসড়া প্রস্তুত হচ্ছিল অনেক পূর্ব থেকে। উপন্যাসের উৎস সন্ধান করতে গিয়ে মধ্যযুগীয় মঙ্গল-কাব্য, নাথসাহিত্য, ইসলামী ঐতিহ্যের রোমান্স আখ্যান, ময়মনসিংহ গীতিকা ইত্যাদির মধ্যে অভিজ্ঞ সমালোচকরা পূর্বসূত্র খুঁজেছেন।[১] মধ্যযুগকে উপন্যাস সৃষ্টির যোগ্য বীজ-ক্ষেত্ররূপে গ্রহণ না করে, উনবিংশ শতককেই বাংলা উপন্যাস সৃষ্টির যথার্থ পরিবেশ-পটভূমি রূপে গ্রহণ করা হয়েছে।

কলকাতা বাংলার মুল অর্থনৈতিক কেন্দ্র হয়ে ওঠার ফলে সমস্ত বাংলাদেশই যেন কলকাতা নগরাভিমুখী হয়ে পড়ে। চির প্রচলিত অনড় অটল গ্রামীণ বাংলার

১. বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসেব ধারা, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ৭ সংস্করণ, ১৯৮৪ প্রথম অধ্যায়।

সংস্কার ও শাসনের শক্ত অবরোধ ছিন্ন করে বাঙ্গালী এক নতুন মিশ্র সমাজ-সংস্কৃতি গড়ে তোলে। এই নগর সংস্কৃতি থেকেই বাংলা উপন্যাসের সৃষ্টিচেতনা এসেছে। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে সংবাদ পত্রের আখ্যানধর্মী সংবাদে, কৌতুক ব্যঙ্গময় সমাজ চিন্তামূলক নক্‌শা জাতীয় রচনায়, নীতিগর্ভ আখ্যানে আধুনিক বাংলা উপন্যাসের প্রস্তুতি গড়ে উঠেছে।

উপন্যাস যেহেতু প্রত্যক্ষদৃষ্ট মানবজীবনের শিল্পময় রূপ সেহেতু উপন্যাসে বাস্তব যুগচিত্র বিশ্বাসযোগ্যভাবে পটভূমিরূপে থাকবে। চরিত্রগুলির যেমন বাস্তবজীবন ভিত্তি থাকবে, তেমনি তার অন্তর্জীবন ও উপন্যাসের আধুনিক দৃষ্টিপাতে বিশ্লেষণের মর্যাদা পাবে। উপন্যাসের প্রধান বস্তু অবশ্যই এর গল্প রস।

'The only reason for the existence of a novel is that it does attempt to represent life'[২] এবং 'The story and novel, the idea and the, are the needle and the thread,......'[৩]

সমকালীন জীবনের ছায়া 'দুর্গেশনন্দিনী'তে পড়েনি। কিন্তু তৎপূর্বে রচিত বাংলা গদ্যের নক্‌শায়, ব্যঙ্গাত্মক রচনায়-আখ্যান সমকালীন যুগ ও মানুষকেই গ্রহণ করেছেন বাঙ্গালী লেখকেরা। বাংলা উপন্যাসের প্রাক্-পর্বের গদ্য রচনাগুলিকে আমরা কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করতে পারি—

১. সাময়িক পত্রে পরিবেশিত বিভিন্ন কৌতুহলোদ্দীপক সংবাদ (১৮১৮ খ্রীঃ) থেকে, এবং রস রচনা।

২. ব্যঙ্গাত্মক সমাজ-কৌতুক মূলক নক্‌শা।

৩. নীতি-গর্ভ আখ্যান।

নগর কলকাতার শিক্ষিত মার্জিত সম্প্রদায়ের লেখনি নিঃসৃত এইসব সাহিত্য কর্মগুলিতে মুখ্য স্থান নিয়েছে অবশ্যই মহানগরী কলকাতার সমকালীন সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় পরিবেশ এবং নগর কলকাতার সঙ্গে যুক্ত নরনারী। সেই সঙ্গে গ্রামবাংলার সমাজজীনের বিচিত্র অভিব্যক্তিও কোন কোন বাঙ্গালী লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁদের লেখায়।

এ থেকে আধুনিক সাহিত্য যে জীবনমুখী এবং সে জীবনে নগর ও গ্রামে বিস্তৃত সেই ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়। সে যুগের নগরমুখী বাঙ্গালীর চিত্তে পল্লীবাংলার স্থির চিত্র যে কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছে—তার নিদর্শন হিসেবে এই সব রচনা গ্রহণ করা যায়। গ্রামের প্রাচীনধর্মী সমাজ জীবনও নবসৃষ্ট নগর সভ্যতার উপকরণ ও আয়োজনের বিপরীতমুখী চিত্র এইসব রচনায় কখনও কখনও পাশাপাশি অঙ্কিত হয়েছে সর্বোপরি প্রাচীন বঙ্গপল্লীর অনড় অটল সামাজিক সংস্কার ও

২. The House of fiction 1957. James Henry. পৃ. ২৫।
৩ ঐ। পৃ ৪০।

শাসন কিভাবে দ্রবীভূত হচ্ছে, প্রাচীন সংস্কার, মূল্যবোধের পরিবর্তন কিভাবে গ্রাম বাংলায় ঘটছে, এবং নতুন মানসিকতার জন্ম নিচ্ছে—তার বিবরণ এইসব রচনা থেকেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

উনবিংশ শতকের বাংলা সাময়িকপত্রে চিত্রিত বাংলার পল্লীসমাজ (১৮৬৫ পর্যন্ত)

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর 'দিগদর্শন' থেকে বাংলা সংবাদপত্রের যাত্রারম্ভ। এই সময়েই প্রতিষ্ঠিত 'সমাচার দর্পণ', কিছু পরবর্তীকালের 'সমাচার চন্দ্রিকা', অতঃপর 'সংবাদ তিমির নাশক', 'বঙ্গদূত', 'সংবাদ প্রভাকর', 'জ্ঞানান্বেষণ', 'তত্ত্ববোধিনী', 'বিবিধার্থ সংগ্রহ', 'মাসিক পত্রিকা', ইত্যাদি পত্রপত্রিকার মধ্য দিয়ে বাঙালী তার আশা-আকাঙ্ক্ষার বিচিত্র রূপময় প্রকাশ দেখেছে, সমাজ সংস্কৃতির রূপ দর্শন করেছে। পরবর্তীকালে, 'সোমপ্রকাশ', 'অবোধবন্ধু'ও বাঙ্গালীর প্রাণের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেছে। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শন' বাংলাসাহিত্যে এক যুগান্তকারী ভূমিকা নিয়ে আবির্ভূত হ'ল—তখন বাংলা সাহিত্য পরিস্ফুট যৌবনে পদার্পণ করেছে।

এই বক্তব্য প্রকাশে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা সাময়িকপত্রে প্রকাশিত সংবাদগুলির সাহায্য গ্রহণ করা যায়। সাংবাদিকতার আধুনিক উন্নত প্রক্রিয়াগুলির সঙ্গে পরিচিত না হলেও এই পত্রপত্রিকাগুলি শুধুমাত্র নিরস সংবাদই পরিবেশন করেনি। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদি প্রকাশে কখন বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, কখন বা সমাজজীবনের কোন বিশেষ সংবাদ লেখক বা সম্পাদকের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীর আলোতে বিবৃত হয়েছে, যেখানে লেখকের নীতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী অথবা রঙ্গব্যঙ্গের প্রকাশ ঘটেছে। ফলে এসব সংবাদপাঠে পাঠকচিত্তে তৎকালীন সমাজ জীবনের স্পষ্ট চিত্র যেমন প্রতিফলিত হয় তেমন গল্পরসের আস্বাদও জন্মায়। উনবিংশ শতকের সংবাদপত্রগুলি কলকাতা নগর কেন্দ্রিক সমাজজীবন চিত্র প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সে যুগের গ্রাম বাংলার সমাজজীবনের মর্মস্থলেও পৌঁছতে পেরেছিল একথা যথার্থ।

উনবিংশ শতাব্দী বাংলার নবজাগরণের যুগ। সমাজ-ধর্ম, অর্থনীতি, রাজনীতি শিক্ষা-সাহিত্য সংস্কৃতি—জীবনের সর্বাধিক ব্যাপারে এ সময় একটা নব-মুক্ত-চেতনা বাঙ্গালীর প্রাণে সঞ্চারিত হয়েছিল। সতীদাহ প্রথা নিবারণ আইন প্রবর্তন, ব্রাহ্মধর্মের প্রকাশ ও তজ্জনিত উদার নৈতিক প্রগতিশীল চিন্তাধারা, ইংরেজী শিক্ষার সুফল অনুভবে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা, স্ত্রী শিক্ষা প্রবর্তন, বিধবা বিবাহ আইন ইত্যাদির পত্রপত্রিকার মাধ্যমে দেশের ও বিদেশের গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখযোগ্য

সংবাদ অবগত হওয়া, বিভিন্ন আশা-আকাঙ্ক্ষা, অভাব অভিযোগের ব্যাপার সাধারণ নরনারীর স্বতঃস্ফূর্তভাবে পত্রাকারে পরিস্ফুটন, সমাজে জ্ঞান-বিজ্ঞান সাহিত্য সংস্কৃতির উৎসুক ও সাগ্রহ অনুশীলনের বেগ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে বাঙ্গালী তার মধ্যযুগের অনূকার যবনিকা ছিন্ন করে আধুনিক যুগভূমিতে পদার্পণ করেছে।

নগর কলকাতাকে কেন্দ্র করেই বাঙ্গালীর এই বিপুল নব জাগরণ ঘটেছিল। কলকাতা কেন্দ্রিক বাঙ্গালী সমাজ আধুনিক নগর সভ্যতায় পৌঁছে গেল, কিন্তু বাংলার এই রেনেসাঁসের লগ্নে বাংলার গ্রামসমাজের পরিবর্তন ঘটেছে অতি ধীর লয়ে। সংবাদপত্রের বিচিত্র ধরনের সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে তৎকালীন গ্রাম বাংলার সেই আর্থ-সামাজিক রূপ ফুটে উঠেছে তাতে দেখা যায় বাংলার গ্রাম সমাজে সেই সময় সহ-মরণের মত বীভৎস প্রথা, দেবতার কাছে নরবলি দান প্রচলিত ছিল, কৌলীন্য প্রথার, পুরুষের বহুবিবাহ, কন্যাপন, বাল্যবিবাহ, অন্তর্জলী—পল্লীবাংলার সমাজে দৃঢ়ভাবেই প্রতিষ্ঠিত ছিল।

তৎকালীন সংবাদপত্রের দর্পণে আরও উদ্ভাসিত হয়েছে বাংলার গ্রাম সমাজের সম্মিলিত তীর্থযাত্রা বিচিত্র পূজা পার্বণ, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, যেমন চড়ক, গাজন, স্নানযাত্রা, দোলযাত্রা, বারুণী, নীলের পূজা, প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে উৎসবের মাতামাতি ও তাব নানা ফলাফলের চিত্র।

ইংরেজ রাজশক্তি প্রথম থেকেই এদেশের উচ্চবর্ণের সমাজে প্রচলিত সতীদাহের মত নিষ্ঠুর প্রথার বিরুদ্ধে ছিলেন, কিন্তু দেশীয় লোকের ধর্মাচরণে হস্তক্ষেপে পাছে জনরোষ ঘটে সেই ভয়ে এই বর্বরতা চোখে দেখেও নীরব থেকেছেন।[৪] ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে এ বিষয়ে প্রতিকারের ব্যাপারে শাসক পক্ষ থেকে চেষ্টা শুরু হয়। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতিপত্র সাপেক্ষে সহগমন বিধির আদেশ দেওয়া হল। এর ফলে গোঁড়া হিন্দুর সংস্কারে প্রবল টান পড়ল এবং সমাজে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হ'ল। রামমোহন রায় এই সময়ে পাদপ্রদীপের সামনে এলেন। তিনি বিদেশী শাসকের নীতিকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানালেন এবং সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণধার লেখনীতে যুক্তি তর্কের সাহায্যে দেশ জুড়ে প্রবল সামাজিক আন্দোলন শুরু করলেন। এই সুস্থ আধুনিক প্রগতিশীল চিন্তধারা সমাজের কিয়দংশকে স্পর্শ করেছিল। রামমোহনের আপ্রাণ চেষ্টায় লর্ড বেন্টিঙ্ক ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে সতীদাহ প্রথা আইনত দণ্ডনীয় ঘোষণা করেন। এই সময় সংস্কারাচ্ছন্ন প্রাচীন পন্থী হিন্দু সমাজের বিপুল বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েও রামমোহন তাঁর সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন নির্ভীকভাবে। অথচ ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে কলকাতার কাছেই একটি বিধবাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। তৎকালীন গভর্নর

৪. রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, শিবনাথ শাস্ত্রী, পৃ ৬৪ এবং বাংলাদেশের ইতিহাস (আধুনিক যুগ), ১৯৭১, রমেশচন্দ্র মজুমদার পৃ. ৩৩৯-৩৪০।

জেনারেল লর্ড আমহার্স্টের স্ত্রীর দিন পঞ্জিকা হ'তে পূর্ণ বিবরণ জানা যায়—[৫]

A young man having died of cholera his widows resolved to mount the funeral pile. The usual preparations were made and the licences procurea from the magestrate. The fire was lighted by the nearest relations; when the flame reached her, however, she losi courage and amid a volume of smoke and the deafening screams of mob, tomtoms, drums etc. She contriued to slip down unperceived, and gained a neighbouring jungle. At first she was not missed; but whom the smoke subsided, it was discovered she was not on the pile. The mob became furions and ran into the jungle to book for the unfortunate young creature, dragged her down to the river, [put her into dingy, and should off to the middle of the stream, when they forced her violently over board and she sank to rise no more !"

আধুনিক শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত নগর কলকাতার সমাজেও সতীদাহ প্রথার সপক্ষে প্রবল জনমত ছিল। রাজা রাধাকান্ত দেবের দলের প্রবল বিরোধিতা রামমোহনকে—সহ্য করতে হয়েছিল। সুতরাং গ্রাম সমাজে এ ব্যাপারে চরম রক্ষণশীল মানসিকতাই ছিল অনুমান করা যায়। সেই সামাজিক আন্দোলনের যুগে সংবাদপত্রে সতীদাহের একাধিক ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায়। ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে ৫ই মে তারিখে 'সমাচার দর্পণে' একজন প্রত্যক্ষদর্শী লিখেছেন—

"গরিফা গ্রামে ২২ শে বৈশাখে ২২ বৎসর বয়স্কা এক ব্রাহ্মণের কন্যা সতী হইয়াছে। সাক্ষাৎ যমদূতের ন্যায় হস্তধারণ পূর্বক ঘূর্ণপাকে সাতবার ঘুরাইয়া শীঘ্র চিতারোহণ করাইয়া শবের সহিত দৃঢ় বন্ধন পুরঃসরে জ্বলদগ্নিতে দগ্ধকরণ ও বংশদ্বয় দ্বারা শবের সহিত তাহার শরীর দাবিয়া রাখন ও তাহার কথা কেহ শুনিতে না পায় এ নিমিত্তে গোলমাল ধ্বনিকরণ অতি দুরাকার নির্দ্দায়িক মনুষ্যের কর্ম্ম।"[৬]

মধ্যযুগীয় ধর্মীয় গোঁড়ামির চূড়ান্ত নিষ্ঠুর রূপ সহগমন প্রথা যেমন ঊনবিংশ শতকের বাংলার গ্রাম-সমাজে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল, তেমনই কৌলীন্য প্রথা, পুরুষের বহুবিবাহ প্রথা, বাল্যবিবাহ প্রথা সমস্তই গ্রামীণ সমাজে অচ্ছেদ্য অমোঘ অনুশাসন হিসেবে যুক্ত ছিল। ঊনবিংশ শতকীয় নবজাগরণের ঢেউ নগর কলকাতাকে তুমুল আন্দোলিত করলেও প্রাচীন-পন্থার জগদ্দল পাথর গ্রাম বাংলার

৫. উদ্ধৃতি রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, ১৯৮৩, শিবনাথ শাস্ত্রী, পৃ. ৬৩।
৬. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—সংবাদপত্রে সে কালের কথা, ২।১৮৬ এবং রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, ৩য় খণ্ড, আধুনিক যুগ, ১৯৭১। পৃ.৩৪২

সমাজে চেপে ছিল। পুরানো ধ্যান ধারণার গড্ডালিকা প্রবাহেই গ্রামীণ সমাজ তখনও তার পদক্ষেপ মিশিয়ে চলেছে। তৎকালীন সংবাদপত্রগুলি এই সমাজ-ব্যবস্থার সত্য প্রতিফলক। কৌলীন্য প্রথা জনিত অসংখ্য বিবাহের হিসাব 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকা দিয়েছে।[৭]

....কুলীনদের বহুবিবাহ বিষয়ে অনেকবার সকলকে জ্ঞাপন করা গিয়াছে এবং ঐ কু-ব্যবহারেতে কি পর্যন্ত, দুঃখ জন্মে তাহাও বিলক্ষণরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এতদ্দেশীয় কোন২ সংবাদপত্র সম্পাদকেরা লিখিয়াছেন যে এতদ্রূপ বহুবিবাহ এইক্ষণে প্রায় নাই। আমরা পূর্বেই জ্ঞাতছিলাম যে এই কথা নিতান্ত অমূলক এবং এইক্ষণে জ্ঞানান্বেষণ হইতে নীচে লিখিতব্য বিবাহিত কুলীনদের নামের ফর্দ্দ ও তাঁহাদের বাসস্থানও কে কত বিবাহ করিয়াছেন তদ্বিবরণ অর্পণ করাতে পূর্বোক্ত অপহ্নবের কথা বিলক্ষণ প্রামাণিকই হইল।....."

ধাম	নাম	বিবাহ
ময়াপাড়া	রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৬২
জয়রামপুব	নিমাই মুখোপাধ্যায়	৬০
আড়ুয়া	রামকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়	৬০
মালগ্রাম	দিগম্বর চট্টোপাধ্যায়	৫৩
নগর	খুদিরাম মুখ	৫৪
বল্টুটী	দর্পনারায়ণ মুখ	৫২
বালী	রামজয় চট্টোপাধ্যায়	২২
পানিহাটী	রামধন মুখোপাধ্যায়	১৮

দেখা যাচ্ছে কলকাতা শহবের নিকটবর্তী বালিতেও বিবাহ সংখ্যা যথেষ্ট, সে ক্ষেত্রে গ্রামগুলিতে সংখ্যার বৃদ্ধি তো হবেই। অবশ্যই এই সংখ্যা তত্ত্বের হিসাব প্রকাশের পেছনে সম্পাদকেব আধুনিক প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গীই কাজ করেছে। তাঁরা এই প্রথার বর্বরতা জনসমক্ষে তুলে ধরার মানসেই এই বিবরণ দিয়েছেন।

কৌলীন্য প্রথার জন্য সমাজে অসম বয়স্ক নরনারীর বিবাহ প্রচলিত ছিল। বৃদ্ধ বর ও শিশু বা বালিকা কনে এমন ঘটনা অবাধেই ঘটত। কিন্তু এই সামাজিক রীতির বিরুদ্ধে কলকাতার শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হচ্ছিল যে সামাজিক আন্দোলন মাথাচাড়া দিচ্ছিল, কলকাতা থেকে প্রকাশিত এই সব সংবাদপত্রগুলিতে এ বিষয়ে বিভিন্ন মন্তব্য যুক্ত সংবাদ প্রকাশের মাধ্যমে তা জানা যায়। বাংলার গ্রাম সমাজে সে সামাজিক প্রতিক্রিয়া প্রত্যক্ষ ও প্রবল ছিল

৭. ঐ পৃষ্ঠা ২৫২-৫৩ / 'সমাচার দর্পণ' ২৩ এপ্রিল ১৮৩৬। ১২ বৈশাখ ১২৪৩।

না বটে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে আধুনিক চেতনা যে জাগ্রত হচ্ছিল, পুরানো সামাজিক রীতি, পদ্ধতির প্রতি গ্রাম সমাজেও যে বিরূপতা জন্মাচ্ছিল সংবাদপত্রে প্রকাশিত কিছু কৌতুককর ঘটনার মাধ্যমে বা কোন কোন পত্রের মাধ্যমে স্পষ্টই অনুভব করা যায়। 'সমাচাব দর্পণে' "বৃদ্ধেব বিবাহ" শিরোনামে প্রকাশিত ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের একটি কৌতুককর সংবাদ বিবরণ উদাহরণ হিসেবে উদ্ধৃত করা যায়—

বৃদ্ধের বিবাহ "দক্ষিণ দেশে ফয়তাবাজ নামে এক গ্রামের অবুঝচন্দ্র নামে এক ব্রাহ্মণে"র স্ত্রী বিয়োগের পর পুর্নবিবাহের ইচ্ছা হয়।....."ঘটকেরা তাঁহাকে আশ্বাসরূপ ঘোটকাবোহন করাইলেক ও কহিলেক যে এ কোন আশ্চর্য্য মহাশয়ের বয়ঃক্রম কত হইবেক। তিনি কহিলেন যে প্রায় সত্তরি বৎসর কোষ্ঠী রাখি না ঠিক বলিতে পারি না ছেহত্তরের মন্বন্তরের সময়ে আমার বয়স বৎসর পাঁচিশ ছাব্বিশ হইবেক আর এই যে দেখিতেছ দন্তগুলা পড়িয়াছে সে শুদ্ধ জল দোষের কারণ আর চেয়ে ধাতুপ্রযুক্ত চুলপাকিয়াছে কিন্তু শক্তি এমত অদ্যাপি ত্রিশ পাঁচিশ দণ্ড রোজ২ করি। পরে ঘটকেরা কন্যার অন্বেষণে দিকে২ গেল মোকাম বৈদ্যবাটীতে আটার উনিশ বৎসর বয়স্কা এক কন্যা স্থির করিয়া আসিয়া কহিল যে ওহে মজুমদার মহাশয় তোমার ভাগ্য ভাল পরম সুন্দরী উনিশ বৎসর বয়স্কা এক কন্যা স্থির করিয়াছি অবীয়া কুলীনের মেয়ে ৫০০টাকা পণ দিতে হইবেক আর সর্বাঙ্গে সোনার গহনা ইহা যদি পার তবে হইবেক আর, আমাদের ঘটকালি ১০০ টাকা চাহি। মজুমদার ঐ কথা শুনিয়া আহ্লাদে ডুবু২ হইয়া কহিলেন যে আজ্ঞা আমি ঐ সকলি দিব একথা প্রকাশ করিবেন না আপনারা শীঘ্র গিয়া লগ্নপত্র করিয়া আইসুন।...

বৈকালে সুশীলা কহিলেন বর কোথা....হাজার যদি শিশু কন্যা হয় তথাপি কালের মহাত্ম্য প্রযুক্ত কহিলেন যে আমি ও বুড়া বরকে বিবাহ করিব না.... এই সম্বাদ পাইয়া যত২ আদবুড়া ও পৌন বুড়া আইবুড়া ছিল তাহারা কেহ২ গোপ ছাটিয়া দাঁতে মিশি দিয়া কেহ২ মাথাময় বেড়ি রাখিয়া কালা পাড়ে ধুতি পরিয়া কে ঘড়ী একটা চাহিয়া টেঁকে দিয়া ও গোপে কলফ লাগাইয়া ঐ কন্যার সম্মুখে ঘুরিয়া২ বেড়াইতে লাগিল ইহা দেখিয়া মজুমদার কহিলেন যে আমার গলায় যিনি ছুবি দিবে তাহার বংশ থাকিবে না।[৮]

অনেক বুঝান-সুজানের পর কন্যা রাজী হইলেন ও কহিলেন যে তবে আমি বিবাহ করিব যদি গহনা ও টাকা আমার হাতে দেয়...." পণের টাকা ও সোনার

৮. "সমাচারদর্পণ" ৭ ডিসেম্বর ১৮৩৯।২৩ অগ্রহায়ণ ১২৪৬ সংবাদ থেকে জানা যায় বালি গ্রাম নিবাসী গোবিন্দচন্দ্র নামক কুলীন ব্রাহ্মণ একশ পত্নীকে, বিধবা করে লোকান্তরিত হয়। 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' ২য় খণ্ড, পৃ. ২৫৪।

গয়না হাতে পেয়ে, বিয়ের পনের দিন পর কুলীন কন্যা সুশীলা বৃদ্ধকে ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যায়।

বিবাহ বিষয়ে গ্রাম সমাজের বিচিত্র আলেখ্য রচনা করেছে সংবাদপত্রগুলি। গ্রামে কৌলীন্য প্রথার নিষ্ঠুরতা যেমন ছিল, তেমনি বিবাহ উপলক্ষে পাত্র বা পাত্রীপক্ষের শঠতা, প্রবঞ্চনাও কম ছিল না। বালককে কন্যা সাজিয়ে বিবহ দেওয়ার কৌতুককর ঘটনার বিবরণ দিয়েছে ২৪ আগষ্ট ১৮২২/৯ ভাদ্র ১২২৯ এর জেলা নদীয়ার মোতালক সাঁকোমথরপুর গ্রামে শ্রীরাম রাম চক্রবর্ত্তী নামে এক ব্রাহ্মণ থাকেন তাঁহারা দুই সহোদর...'' এদের বিবাহের কৌতুকর কাহিনী। পুরুষকে কন্যা সাজিয়ে বিবাহ।.....চক্রবর্ত্তীর বাটীতে তাহার এক ভাগিনেয়ক কল্পিত কন্যা বেশ করিয়া রাখিয়াছিল...বর ও কোনক্রমে ঐ কন্যা দর্শন করিয়া কত মনোরাজ্য ভোগ করিতে লাগিলেন কিন্তু সংপ্রদানের পরে বাসর ঘরে সহবাসে সে সকল বিপরীত হইল। আর কি করিবেক অতি প্রত্যুষে তাবৎ বরযাত্র শাসনগরে গিয়া ঐ চক্রবর্ত্তীকে নানা প্রকার প্রহার করিয়া কেবল প্রণাবশেষ করিল এবং যে কন্যা তাহাকে বিবাহ দিয়াছিল তাহাকে পাঠাইয়া দিল না।[১০]

আবার কোন এক... ''ধর্ম্ম জ্ঞান নাই কেবল টাকা লইতে তৎপর'' পিতার কন্যা কিভাবে স্বেচ্ছায় বিবাহ করে সে কালের গ্রাম-সমাজে আধুনিক স্বাধীন চেতনার পরিচয় দিয়েছে সে ঘটনাটিও পত্রিকাকার বিস্তারিত লিখেছেন। ঘটনাটি এরকম যে, বর্ধমানের কাছে এক গ্রামে এক ব্রাহ্মণের, তার ষোড়শবর্ষীয়া কন্যার জন্য বিপুল পণের দাবী ছিল, (সমাজে উচ্চবর্ণের মধ্যে কন্যা পণের প্রচল· ব্যাপারটি এ ঘটনায় জ্ঞাতব্য)। এক বিপত্নীক চাকুরীয়া ব্রাহ্মণ পাত্র হিসেবে এসে কন্যা পছন্দ করে। কন্যারও পাত্র পছন্দ হয়। কিন্তু পরে নাটকীয়ভাবে সেই কন্যাটি স্নানের ঘাটে ব্রাহ্মণকে ডেকে জানায় '' যেহেতুক আমার পিতার ধর্ম্মজ্ঞান নাই কেবল টাকা লইতে অতি তৎপর অতএব যদি তুমি পঁচিশ টাকা খরচ করিতে পার তবে গোপনে আমার মাসীর বাটীতে অদ্য রাত্রিতেই তোমার সহিত আমার বিবাহ হইতে পারে....বিবাহ গোপনে সংঘটিত হয় এবং পিতা জানতে পেরে ক্রুদ্ধ হয় ঠিকই, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ''....ব্রাহ্মণ আর২ স্থানে ও ভদ্রলোকের নিকট অনেক চেষ্টা করিল কিন্তু কেহই তাহার পক্ষ হইল না। তাহাতে ব্রাহ্মণ নিরুপায় দেখিয়া ভাবিল যদি জামাই না আসে তবে কিছুই পাই না। সুতরাং চৌদ্দ দিবসের প্রাতঃকালে জামাই আনিতে গেলেন। জামাই শ্বশুরকে দেখিয়া মহা সমাদর পূর্ব্বক একশত টাকা শুদ্ধা শ্বশুর বাটীতে গিয়া শ্বশুরকে ঐ টাকা দিয়া আপন স্ত্রীকে সঙ্গে

৯ ৩০ জুন ১৮২১। আষাঢ় ১২২৮, 'সমাচব দর্পণ' / সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২৯।

১০ 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ১ম খণ্ড, পৃ. ১২৯।

করিয়া বাটী আনিল।"[১১]

কৌতুকরস মণ্ডিত এ ঘটনা বিবরণে গ্রাম্য কন্যাটি যে নিজ অভিরুচি অনুযায়ী স্বামী পেয়েছে সেই ঘটনা কিন্তু তৎকালীন বাংলার গ্রাম সমাজের একটি/ আধটি বিরল ঘটনার অন্যতম মাত্র। ঊনবিংশ শতকের সমস্ত পরিধি জুড়েই প্রায় যে গ্রাম সমাজের চিত্র তৎকালীন সংবাদপত্রে দেখতে পাই, সেখানে হতভাগিনী নারীদের বেদনা জীবন কাহিনীই প্রধান স্থান নিয়েছে। কৌলীন্য, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি কু-প্রথার বলি গ্রামের অসংখ্য সরল ও নির্দোষ নারী সারাজীবন নিষ্ফলতায় কাটিয়েছে অথবা ঘটনাচক্রে বা ক্ষণিক পদ স্খলনের অপরাধে চিরজীবন সমাজ সংসার হারিয়ে পতিতার জীবন গ্রহণে বাধ্য হয়েছে। শান্তিপুর নিবাসী এক কুলীন কন্যা কিভাবে ভ্রষ্টা বার নারীতে পরিণত হয়েছিল 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রিকায়[১২] অশ্রুসিক্ত এক পত্রের মাধ্যমে তা ব্যক্ত হয়েছে।

"আমি শান্তিপুর নিবাসী এক কুলীন ব্রাহ্মণের কন্যা ছিলাম। ....একদিন আমি ...অবগত হইলাম যে তিন বৎসর অপেক্ষাও অল্প বয়ঃক্রম কালীন আমার বিবাহ হইয়াছে! এই বাক্য শ্রবণমাত্র আমি একেবারে স্তব্ধ রহিলাম। পরন্তু যখন ষোড়শবর্ষ বয়স তখন কোন দিবস অপরাহ্নে পঞ্চাশৎ বর্ষবয়স্ক একজন মনুষ্য আমার দিগের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন, এবং পরিচয় গ্রহণ দ্বারা জানা গেল মাত্র অন্তঃকরণ কম্পিত হইল।...তাঁহার কুৎসিত আকৃতি, পালিত অঙ্গ এবং পক্ক কেশাদি দর্শন করিয়া আমি হতবুদ্ধি হইয়াছিলাম! আমি জ্ঞানত তাহাকে বরণ করি নাই; কদাপি তাঁহার সহিত জ্ঞানাবস্থায় সাক্ষাৎ নাই, অথচ তিনি আমার প্রতি আমার সুখের মূলাধার কি আশ্চর্য্য, তাঁহার মূর্ত্তি যেমন কুৎসিত রজনীতে তাঁহার ব্যবহার ও তদ্রুপ প্রত্যক্ষ হইল। যাহা হউক পরদিন প্রাতঃকালে তিনি আমার পিতার নিকটে কিঞ্চিৎ ধন সংগ্রহপূর্বক যে প্রস্থান করিলেন, সেই পর্যন্ত আর দর্শন হয় নাই।...মা সাবধি দিবারাত্রি কেবল ক্রন্দন করিয়াছি। যদিও আমার নিতান্ত চেষ্টা ছিল, সৎ পথে রহিব, এবং কুলধর্ম রক্ষা করিব কিন্তু অবশেষ জ্বালাতন হইয়া ব্যভিচার পথকে অবলম্বন করিয়াছি এবং স্বাধীন মনে কলিকাতায় আগমন পূর্বক মছোবাজার বাসিনী হইয়াছি।" জনৈক 'পণ্ডিত মহাশয় দ্বারা লিপিবদ্ধ' এই করুণ কাহিনী একান্ত মর্মস্পর্শী।

মধ্যযুগীয় পল্লীকেন্দ্রিক বাংলাসমাজে হিন্দু নরনারীর জাত কর্ম থেকে প্রেতকর্ম পর্যন্ত সমস্তই ধর্মীয় বিধান বা সংস্কার অনুযায়ী ছিল। মৃত্যুকালীন অন্তর্জলী রীতিটিও হিন্দুর ধর্মীয় সংস্কারের অন্তর্ভুক্ত হয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। এই নিষ্ঠুর প্রথা সম্পর্কে ড. রমেশচন্দ্র মজুমদারের উক্তি ঃ

১১. 'সমাচার দর্পণ', ১০ নভেম্বর ১৮২১ / সংবাদপত্রে সেকালের কথা, পৃ. ২৭১।
১২. বিনয় ঘোষ / সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ৩য় খণ্ড / ৫৭১-৫৭২ পৃ.।

'হিন্দুদের মধ্যে আর দুটি নিষ্ঠুর প্রথা ছিল, গঙ্গাযাত্রা ও অন্তর্জলি। পীড়িত কোন ব্যক্তির মৃত্যু আসন্ন হইলে তাহাকে গঙ্গাতীরে নিয়া রাখা হইত। কোন কোন স্থলে মৃত প্রায় ব্যক্তির দেহের নিম্নভাগ গঙ্গার জলে ডুবাইয়া রাখা হইত। কারণ, হিন্দুদের বিশ্বাস ছিল যে, গঙ্গাতীরে মৃত্যু হইলে, বিশেষতঃ গঙ্গাজলের মধ্যে দেহত্যাগ করিলে, মৃতব্যক্তির পুণ্য ও আত্মার সদ্‌গতি হয়। কিন্তু অনেক স্থলেই যে ইহা আশু মৃত্যুর কারণ হইত তাহাতে সন্দেহ নাই। শিক্ষিত হিন্দুরা এই প্রথার তীব্র নিন্দা করিলে ও আইন বা সরকারী হুকুমে ইহা রহিত করিবার পক্ষপাতী ছিলেন না। গভর্ণমেন্ট তদনুযায়ী ইহা বন্ধ না করিয়া আদেশ দিলেন যে কোন মৃত্যুপথযাত্রীকে গঙ্গাতীরে নিবার পূর্বে পুলিশকে জানাইতে হইবে যে রোগীর বাঁচিবার আর কোন আশাই নাই। রোগীর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়েরা এই মর্মে পত্র দিবেন এবং সম্ভব হইলে এই মর্মে চিকিৎসকের সার্টিফিকেটও দাখিল করিবেন।''[১৩]

নাগরিক সমাজে এবিষয়ে সচেতনতা এলে অন্তর্জলির ঘটনা গ্রামীণ সমাজে বিরল ছিল না। সে কালের সংবাদপত্রে অন্তর্জলির সংবাদ দেওয়া হয়েছে। সংবাদপত্রের প্রতিবাদী চেতনায় অন্তর্জলির ভয়াবহতা একটি বিস্তৃত বিবরণে প্রকাশিত হয়েছে—

'......অর্ধশরীর জলমগ্ন করিয়া অর্দ্ধরৌদ্রের তাপে আর্দ্রভূমিতে রাখে অনন্তর দুই একজন আত্মীয় স্বজন তাহার পাদাঙ্গুষ্ঠ মৃত্তিকাতে ঠেসিয়া ধরে কোন ব্যক্তি তাহার বক্ষস্থলে মৃত্তিকা লেপন করিয়া হরিবোল[১] বলত কিঞ্চিৎ[১] গঙ্গাজল মুখে দেয় কিন্তু এমতও হইতে পারে যে মুর্খ চিকিৎসক রোগ ঠাওরাইতে না পারাতে অতিশীঘ্র তাহার মরণ সম্ভাবনা থাকে না এবং রোগিরো বোধ হয় যে, আমার শীঘ্র মৃত্যু হইবে না তাহাতে সে চেঁচাইয়া কহিতে থাকে যে আমি এইক্ষণে মরিব না আমাকে এখান হইতে উঠাইয়া লইয়া যাও....।......ঐ রোগির চিৎকারে কেহই মনোযোগ করে না এবং তাহার গলায় অনবরত জল ঢালিতে থাকে...এইরূপ নির্দয়তার ব্যাপার করিলেও স্বাভাবিক বলক্রমে তখন পর্যন্ত প্রাণ থাকে....কিন্তু অতি দুর্বল শরীরে ইত্যাদি যাতনা দেওয়াতে সুতরাং তাহার মৃত্যু অতি শীঘ্রই উপস্থিত হয় তখন পুনর্বার লইয়া গিয়া জলে ফেলে পরে পরিচালকেরা বিলম্ব সহিতে না পারিয়া তাহার অতিশীঘ্র মৃত্যুর চেষ্টা পায় অর্থাৎ অনবরত জল গিলিয়া দিতে থাকে পরিশেষে অধিক জল গিলিতে না পারাতেই মরিয়া যায়।[১৪]

১৩. বাংলাদেশের ইতিহাস, আধুনিক যুগ, ৩য় খণ্ড, ২য় সংস্করণ পৃ. ২৯৬ Bucklend, C.F., Bengal under the lientinant Governors Vol-1, পৃ. ৩২৩।

১৪. সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৩৫-৫৩৬।

উনবিংশ শতকে বাংলার গ্রাম-সমাজ চড়ক, গাজন, স্নানযাত্রা, দোলযাত্রা, রামবারুণী প্রভৃতি বিভিন্ন দীর্ঘকাল প্রচলিত ধর্মানুষ্ঠানের যাবতীয়, কুসংস্কার গতানুগতিক ভাবেই পালন করে চলেছিল। তৎকালীন গ্রামীণ সমাজে এগুলিই আপামর নরনারীর; আবাল বৃদ্ধ বণিতার আনন্দানুষ্ঠান ছিল। কিন্তু উনবিংশ শতকের কলকাতা কেন্দ্রিক নাগরিক সমাজের কিছু কদাচার গ্রাম সমাজেও প্রবেশ করতে শুরু করে। গ্রামের জমিদার বা বিত্তবান শ্রেণীর কিয়দংশ কলকাতায় গিয়ে তথাকথিত বাবুকালচারের মদ্যপান, রক্ষিতা রাখা ইত্যাদিতে যেমন রপ্ত হয়েছিল, তেমনি জুয়া খেলার মত অনিষ্টকারী আমোদ ও গ্রামে অনুপ্রবেশ করেছিল। এবং শহরে কিছু জুয়াড়ী উৎসবের সুযোগে গ্রামের সাধারণ মানুষকে জুয়ার আসরে টেনে এনেছে। এবং শঠতা দ্বারা তাদের সর্বস্বান্ত করে। উৎসব উপলক্ষে গ্রামের এইসব জুয়ার আসর বসাতে ফায়দা লুটতো পুলিশ এবং গ্রামের জমিদারও। এই সত্য সমাজ চিত্র সংবাদপত্রগুলিতে প্রচলিত হয়েছে এবং এইসব কুৎসিত ও সমাজচিত্র সংবাদপত্রগুলিতে প্রচলিত হয়েছে এবং এইসব কুৎসিত ও সমাজ-জীবনের অনিষ্টকারী আমোদ সম্পর্কে স্পষ্ট বিরূপতা ও তার প্রতিকারের দাবীও সংবাদপত্রে উচ্চারিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত পত্রটি উল্লেখযোগ্য—

"শ্রীযুক্ত জ্ঞানান্বেষণ সম্পাদক মহাশয়ের—চব্বিশ পরগণার ম্যাজিস্ট্রেটের সরহদ্দের মধ্যে খড়দহ গ্রামের, হিন্দুদিগের রাসযাত্রার সময়ে প্রতি বৎসর যে অন্যায় কর্ম সফল হয় তদ্বিষয়ক উল্লিখিত কত্রক পংক্তি আপনার পত্রে প্রকাশ করিলে বাধিত হইব।..

...পোলীশের আমলারা যাহারদিগের এই গ্রাম রক্ষা করণার্থ ভার আছে ও এই স্থানের জমিদার এবং এই বিগ্রহের সেবা করিয়া থাকেন যে সকল গোস্বামী ইঁহারা নকলে ফড় খেলায় অনেক টাকা পান তজ্জন্য প্রসিদ্ধ জুয়ারিদিগের খেলার নিমিত্ত এক স্থান স্থির করিয়া রাখিয়াছেন অতএব এই কুকর্মকারিরা মহোৎসবের কত্রক দিবস ক্রমাগত জুয়া খেলা করিয়া থাকেন ...পূর্বোক্ত স্থানের নিকট পানিহাটী নামক এক ক্ষুদ্র গ্রামে শ্রীযুক্ত বাবু প্রাণকৃষ্ণ রায় চৌধুরী রাসবাটীতে এতদ্রূপ তামসিক ক্রীড়ামহোৎসবের দিবসে হইয়া থাকে।"[১৫]

ধর্মের নামে চরম নিষ্ঠুরতা শুধু সতীদাহের মধ্যে বা চড়ক গাজনের শারীরিক যন্ত্রণাদায়ক আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ ঘটনাও ছিল না, নরবলির মত বীভৎস কলকাতার অনতিদূরবর্তী বর্ধমানের কাছে গোপনে ঘটেছিল ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে। নবযুগের প্রগতিশীলবোধে আলোকিত কলকাতায় বাংলা দেশ ও জাতির

১৫. জ্ঞানান্বেষণ. ১১ নভেম্বর ১৮৩৭ / ২৭ কার্ত্তিক ১২৪৪ / 'সংবাদপত্রে সকালের কথা', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ২৭৭।

আধুনিকীকরণ ঘটছিল, কিন্তু প্রদীপের তলায় অন্ধকারের মতই অমানবিক ও বর্বর এই প্রথাটি সামাজিক ইতিহাস রচয়িতাকে জানিয়ে দেয়; মধ্যযুগীয় কঠিন অন্ধকার বাংলা দেশ ও জাতির চেতনাকে উনবিংশ শতকের তৃতীয় দশকেও কি গভীরভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। এই সময়কার 'সংবাদ প্রভাকর', 'জ্ঞানান্বেষণ' প্রভৃতি সংবাদপত্রগুলিতে এই নরবলির বিস্তারিত বর্ণনা ও এই নৃশংস ঘটনার বিরুদ্ধে মত প্রকাশিত হয়—

"একদিবস দেবীর পূজক ব্রাহ্মণ যথা নিয়মে প্রাতঃস্নানাদি সমাধাপূর্বক মহামায়ার অর্চনার্থে মন্দিরের সন্নিকটে গমন করিয়া দেখিলেন যে খর্পরের স্থান রক্তে প্লাবিত চারি পার্শ্বে ধূপ ও ঘৃতের গন্ধে আমোদ করিয়াছে ইহাতে পুরোহিত অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া কুঠরীর মধ্যে প্রবেশ করত আরো বিস্ময়াপন্ন হইলেন যেহেতুক ঘরের চারিদিগে দেবীকে বেষ্টিত করিয়া রুধির জমাট হইয়াছে।...সম্মুখে এক প্রকাণ্ড চিনির নৈবেদ্য এবং তদুপযুক্ত আর' সামগ্রী....। দুই চারি দিবস পরে উক্ত নদ হইতে এক মুণ্ডহীন শব ভাসিয়া উঠিল ইহাতে সুতরাং তত্রস্থ বিচক্ষণগণেরা বিলক্ষণ রূপহে অনুমান করিলেন যে ঈশ্বরীর নিকটে ঐ শব বলি হইয়াছিল কিন্তু পূজার বাহুল্য দেখিয়া সকলে কহিলেন কোন রাজা আপনার সাধনার নির্ম্মিত্তই এ প্রকার ভয়ানক মহাকর্ম সমাধা করিয়াছেন।

এই বিষয় সর্বত্র রাষ্ট্র হইলে বর্ধমান জিলার অধীন চারি থানার দারোগা আসিয়া অনেক অনুসন্ধান করিয়া কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলেন না বরং নরবলির পক্ষেই বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইল কেননা সে স্থান সিদ্ধ এবং পূর্বে অনেকবার এরূপ ঘটিয়াছিল।"[১৬]

মুসলমান রাজশক্তির অবসানে বাংলাদেশে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্ব ও তৎপ্রবর্তিত অর্থনীতি এখনকার কৃষি ও পল্লী নির্ভর সমাজ কাঠামো ভেঙে চুরমার করে দিয়েছিল। বাঙালীর পুরানো জীবনচরণের ভিত্তি প্রকম্পিত হয়ে আমূল পরিবর্তিত হয়েছিল বাংলার কৃষি ও কুটীর শিল্প চরম বিপর্যস্ত হওয়ার ফলে কৃষি নির্ভর বাংলার গ্রাম সমাজ ক্রমশঃ রিক্ত নিঃস্ব ও জরাজীর্ণ হয়ে পড়ে। সরকার আইন পাশ করে প্রজাদের নিকট থেকে বলপূর্বক খাজনা আদায়ের অধিকার জমিদারদের দিলেন[১৭] সমসাময়িক পত্রপত্রিকায় প্রজাদের উপর জমিদারদের নৃশংস অত্যাচারের বিস্ময়কর চিত্র অঙ্কন করেছিল। বলপূর্বক খাজনা আদায়ের অধিকারের ফলে জমিদার "প্রজার বক্ষের উপর বাঁশ দিয়া টাকা সংগ্রহ

১৬. 'জ্ঞানান্বেষণ', ২১ জানুয়ারী ১৮৩৭। ৯ মাঘ ১২৪৩, / সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৩২।

১৭. ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশর ইতিহাস, ২য় সং, ৩য় খণ্ড, আধুনিক যুগ, পৃ. ৩৮১, Regulation VII of 1799. Regulation V of 1812.

করেন''[১৮]। জমিদাররা যে চাষীদের ক্রীতদাস তুল্য জ্ঞান করতেন তা শুধু রেভারেণ্ড আলেকজাণ্ডার ডাও এবং বিশ জন দরদী মিশনারীই তুলে ধরেননি[১৯], ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় পল্লীসমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষক সম্প্রদায়ের উপর জমিদারদের নৃশংস অত্যাচারের মর্মস্পর্শী করুণ বিবরণ পাওয়া যায়—

'....বাঙ্গালাদেশের ভূস্বামীরই এই প্রকার উপদ্রব, এবং অনেক প্রজারই এই প্রকার যাতনা। সম্প্রতি কৃষ্ণনগর জেলার কোন ভূস্বামী ও তাহাদের কর্ম চারিদিগের চরিত্র শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হওয়া গেল। তাঁহারা প্রজাদের স্থাবরাস্থাবর সম্পত্তি দূরে থাকুক, তাহারদিগের শরীর ও আপনার অধিকারভুক্ত জ্ঞান করেন, এবং তদনুসারে তাহারদিগের কায়িক পরিশ্রমও আপনার ক্রীতবস্তু বোধ করিয়া তাহার উপর দাওয়া করেন। তাঁহারদের এই প্রকার অখণ্ড অনুমতি আছে যে বিনা মূল্যে বিনা বেতনে তাঁহারদিগকে গোপেরা দুগ্ধ দান করিবেক, মৎস্যোপজীবিরা মৎস্য প্রদান করিবেক, নাপিতে ক্ষৌর করিবেক, যানবাহকে বহন করিবেক, চর্মকারে চর্মপাদুকা প্রদান করিবেক, ইত্যাদি সকলেই স্ব স্ব উপজীব্যোচিত অনুষ্ঠান দ্বারা তাঁহারদিগের সেবা করিবেক।''[২০]

কৃষকরা জমিদারদের চাহিদা পূরণ করতে না পারলে তাদের যে অমানবিক লাঞ্ছনা ও অত্যাচার ভোগ করতে হ'ত তার আঠার দফা তালিকা বিবৃত হয়েছে এই পত্রিকায়। সে গুলির মধ্যে আছে লাঠি ও বেত দিয়ে প্রহার, চর্মপাদুকা প্রহার, বাঁশ দিয়ে বুকডলা, নাক খত দেওয়ানো, পিছমোড়া করে বেঁধে সারা গায়ে বিছুটি দেওয়া, প্রচণ্ড গ্রীষ্মে প্রখর রৌদ্রে দাঁড় করিয়ে অত্যাচার করা, আবার তীব্র শীতে জলে চোবানো, বস্তায় পুরে জলে ডোবানো, চুনের ঘরে, ধানের গোলার মধ্যে আবদ্ধ করে রাখা, কয়েদ করে উপবাসী রাখা ইত্যাদি আরও বীভৎস অত্যাচার।[২১]

এখন থেকেই বঙ্গপল্লীর নিঃস্ব হতভাগ্য এই কৃষক সমাজকে শোষণ করা শুরু করেছে ''মহাজন'' শ্রেণী। নিরুপায় কৃষককুল জীবনধারণের (অন্য কোন পন্থা না থাকায়) অনন্যোপায় হয়ে অসময়ে মহাজনের কাছ থেকে খাদ্য শস্য দাদন নিত, আর পরিবর্তে নিজ পরিশ্রমে উৎপন্ন প্রায় সমস্ত ফসলই দিয়ে দিত মহাজনকে। শোধ দিতে না পারলে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ বেড়ে—কৃষককে চিরজীবনের মত ঋণের বোঝা বহন করতে হ'ত। বাংলা—পল্লীর কৃষকের এই করুণ অবস্থা

১৮. বিনয় ঘোষ—সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজ চিত্র, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৫।
১৯. ঐ। ৫ম খণ্ড পৃ. ২১।
২০. ঐ। ২য় খণ্ড পৃ. ১১৮-২৪।
২১. ঐ।

সমবেদনা ও সহানুভূতির সঙ্গে ব্যক্ত হয়েছে 'সংবাদ-প্রভাকর' পত্রিকার সম্পাদকীয়তে (১২৫৮ বঙ্গাব্দ)—মফঃসলে অর্থাৎ পল্লীগ্রাম মাত্রে কৃষক লোকেরা প্রায় সকলেই নির্ধন আচ্ছাদনের সামর্থ রহিত, সুতরাং তাহারদিগের আর অন্য উপায় কি আছে কাজেই ধান্যের বাড়ীদাতা মহাজনগণের নিকট যাইতে হয়। ...যাহারা একবার এই প্রকার ঋণগ্রস্ত হয়, তাহারদিগের মৃত্যু ব্যতীত ঐ ঋণ হইতে উদ্ধার হওনের অপর উপায় কিছুই দেখি না।'[২২]

উনবিংশ শতাব্দীতে কলকাতা নগরকে কেন্দ্র করে যেমন নাগরিক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল, তেমনি পল্লীগ্রামেও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদার ও কৃষকদের মধ্যে এক বিরাট মধ্য স্বত্ব শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। এ সম্বন্ধে পরবর্তীকালে বেঙ্গল ল্যাণ্ড রেভেনিউ কমিশনের রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে— 'The promise given by the East India Company never to alter the assessment [in Bengal] followed as it was by the gradual growth of the Zeminder's profits, encouraged sub-infendation and brought into existence a body of tenure holders vostly out numbering the original Zeminders." [২৩] গ্রামবাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণী বোঝাতে সমাজবিজ্ঞানী বিনয় ঘোষের নিম্নোক্ত মন্তব্যটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য ঃ "পত্তনিদার, দর পত্তনিদার, ছে-পত্তনিদার, ইজারাদার, গাঁতিদার, তালুকদার, জোতদার প্রভৃতি বিভিন্ন স্তরের মধ্যস্বত্বভোগী, নায়েব গোমস্তা, দেওয়ান, ম্যানেজার, তহশীলদার থেকে আরম্ভ করে, পাইক-বরকন্দাজ, এমন কি জমিদারের বাজার সরকার পর্যন্ত্য আমলাবর্গ, নতুন পুলিশের দারোগা কনেষ্টবল, মহাজন, এবং আইন আদালতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দালাল থেকে উকিল পর্যন্ত্য নানা রকমের লোক নিয়ে বাংলার গ্রাম সমাজে যে বিপুল-কলেবর এক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ হল, অর্থনীতি ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদনের (Production) সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক রইল না।"[২৪]

এই অনুৎপাদনশীল পরগাছা মধ্যবিত্ত শ্রেণী যে গ্রাম বাংলায় জাঁকিয়ে বসে সাধারণ কৃষকদের জীবন বিভীষিকাময় করে তুলেছিল, পল্লী সমাজের সেই রূপটি সংবাদপত্রগুলি প্রকাশ করতে দ্বিধা করেনি। ১২৬৪ বঙ্গাব্দে 'সংবাদ প্রভাকর'-এ প্রকাশিত হয়েছে--- 'পত্তনিয়াদার তালুকদার দরপত্তনিয়াদার ইত্যাদি ভূমির উৎপন্ন ভোগির সংখ্যা রাজ নিয়ম বলে যত বৃদ্ধি হইয়া আসিয়াছে ততই কৃষকের ক্লেশ বৃদ্ধি হইয়াছে, এতদ্ভিন্ন খোদকস্তা, পাইকস্তা, খোতদার, বীজধান দাতা ইত্যাদিও

২২. ঐ। ১ম খণ্ড পৃ. ৭৭।

২৩. Report of the Land Revenue Commission, Bengal, Vol I, Paras 72-93, 1938-40.

২৪. বিনয় ঘোষ— সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজ চিত্র, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩০।

ভূমির উৎপন্ন গ্রহণকারি বিস্তর আছে, তাহারা স্বহস্তে ক্ষেত্র কর্ষণ বীজবপণ ইত্যাদি ক্ষেত্রের কার্য্য কিছুই করে না, অথচ কৃষকের উপর কর্তৃত্ব করে''[২৫]

গোমস্তা, নায়েব, মহাজন ইত্যাদির সঙ্গে দারোগা পুলিশের অত্যাচারেও সেকালের পক্ষ পল্লীর কৃষক বা সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের বিবরণ লিখেছেন—'...প্রজাপীড়নের...এক অঙ্গের নাম ফৌজদারি উপদ্রব।—এ নাম শ্রবণমাত্র কোন ব্যাক্ত না কম্পিত কলেবর হয়? পঞ্চতম বর্ষীয় বালকও থানা দারোগার প্রসঙ্গ শুনিয়া সভয়ে মাতৃ-ক্রোড়ে গিয়া বিলীন হয়। তদবধি কেমন প্রগাঢ় সংস্কার জন্মিয়া যায়, যে চির জীবনই তাহারদিগের ভূত-প্রেত শ্মশানাদির ন্যায় ভয়ঙ্কর বোধ হয়। পথ মধ্যে কোন প্রচণ্ড মূর্ত্তি ফৌজদারি লোকের সহিত সহসা সাক্ষাৎ হওয়া কত-ভয়েরই বিষয়! ফলতঃ পল্লীগ্রামস্থ ইতর লোকদের পক্ষে এ সংস্কার অমূলক নহে, দারোগা ও তৎসংক্রান্ত কর্মচারিদের প্রসিদ্ধ দুর্ব্যবহার স্মরণ করিলে হৃদয়ের শোণিত শুষ্ক হইতে থাকে।''[২৬]

ঊনবিংশ শতকে বাংলার পল্লীগ্রামে সাধারণ কৃষিজীবি সমাজ যেমন বিপর্যস্ত হয়েছিল তেমনি সমস্ত কুটীর শিল্প করে যারা জীবিকা নির্বাহ করত তাদের অবস্থা ও শোচনীয় হয়ে পড়ে। বাংলার পল্লীগ্রামে ঘরে বসে চরকায় সূতো কেটে সেই সূতো তন্তুবায়কে যোগান দিয়ে অনেক দুঃখী অনাথা রমণী জীবিকা নির্বাহ করত। কিন্তু বিলাতী সূতাকল বা বিলাতী বস্ত্র শিল্প এদেশে তন্তুবায়দের যেমন সর্বনাশ ঘটিয়েছিল তেমনি ঐ সব সাধারণ চরকা কাটুনি গ্রাম্য অন্নাথা নারীদের জীবিকার্জনের পথও সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়েছিল। এই ঘটনা ঐতিহাসিক সত্য। গ্রামের সেই ধ্বংস প্রাপ্ত সূতাকাটনি রমণীদের সর্বনাশ ও তাদের বেদনার্তি সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় পত্রাকারে প্রতিফলিত হয়ে সেই যুগচিত্রকে স্পষ্ট করে তুলেছে— '...এখানে তিনবৎসরাধি দুই শাশুড়ী বধুর অন্নাভাব হইয়াছে সূতা কিনিতে তাঁতি বাটীতে আসা দূরে থাকুক হাটে পাঠাইলে পূর্বাপেক্ষা সিকিদরেও লয় না ইহার কারণ কি কিছুই বুঝিতে পারি না...অনেকে কহে যে বিলাতি সূতা বিস্তর আমদানি হইতেছে সেই সকল সূতা তাঁতিরা কিনিয়া কাপড় বুনে।...তাহার দর শুনিলাম ৩।৪ টাকা করিয়া সের আমি কপালে ঘা মারিয়া কহিলাম...এখানেও যদি উত্তম দরে বিক্রয় হইত তবে ক্ষতি ছিল না তাহা না হইয়া আমাদিগের সর্বনাশ হইয়াছে...''[২৭] এদেশে ইংরেজ আগমনের ফলে, তাদের শাসন ও শোষণে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে গ্রামবাংলা চূড়ান্ত ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল, গ্রামের সাধারণ

২৫. ঐ।

২৬. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—১৭৭২ শকাব্দ, বৈশাখ (১৮৫০ ইং) বিনয় ঘোষ— 'সংবাদপত্রে বাংলার সমাজ চিত্র', ১৯৬৩, ২য় খণ্ড।

২৭. সংবাদপত্রে সেকালের কথা, পৃ. ১৭৭ ১৭৮।

কৃষিজীবি, তন্তুবায়, হস্তশিল্পী কারিগর প্রভৃতি মানুষগুলির সর্বনাশ ঘটেছিল, পল্লীবাংলার এই করুণ ও মর্মন্তুদ সমাজচিত্র উনবিংশ শতকের সংবাদপত্রের দর্পণে যথাযথ প্রতিফলিত হয়েছে। সেই সঙ্গে ইংরেজ শাসন প্রবর্তনের ফলে কিছু ইতিবাচক ব্যাপারও বাংলার পল্লীসমাজে ঘটেছিল। ইংরেজী শিক্ষার জন্য নগর কলকাতায় তো বটেই সুদূর গ্রাম অঞ্চলে ব্যক্তিগত অথবা সামগ্রিক সামাজিক উদ্যোগে স্কুল প্রতিষ্ঠা কবার উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা গেল। ব্যক্তিগত উদ্যোগের একটি উদাহরণ— "কিয়ৎকাল হইল শ্রীযুক্ত বাবু তারকনাথ সুখচর গ্রামে এক পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন"[২৮] এই পত্রিকায় ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে ২৮ জুলাই 'আন্দুলগ্রামে নূতন বিদ্যালয় স্থাপনার্থে সভা' শীর্ষক সংবাদে দেখা যাচ্ছে যে বিদ্যালয় স্থাপনে বড় বড় জমিদার রাজা বা ধনাঢ্য ব্যক্তিদের অনুকূল্য যেমন প্রার্থিত ছিল তেমনি সমস্ত গ্রাম-সমাজের সাহায্য ও এখন থেকে চাওয়া হচ্ছিল।[২৯]

ইংরেজ রাজশক্তি তার শাসন ভিত্তিকে সুদৃঢ় করবার জন্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের সাহায্যে দেশের আইন শৃঙ্খলার যথপোযুক্ত ব্যবস্থা করে। পুলিশ কর্মচারীরা ভয়ঙ্কর চোর ডাকাত দমন করে গ্রামবাসীদের অশেষ কৃতজ্ঞতা পেয়েছে—এমন সংবাদ ও তৎকালীন পত্র পত্রিকার মাধ্যমে জানা যায়। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ১৪ নভেম্বর 'সমাচার দর্পণে' জনৈক শ্রী শিবচন্দ্র সিংহ পত্রে লিখেছেন— "শ্রীযুক্ত রবার্ট হালকেট সাহেব "নদীয়া" জেলায় "পক্ষপাতরহিত বিচারক্ষম" শাসন কর্তা নিযুক্ত হয়ে "দস্যু ভয় কি ক্ষুদ্র[১] চৌর্যভয় যাহা কোন প্রকারে কোন হাকিমের আমলে নিবারণ হয় নাই" সেটি তিনি দমন করেছেন ফলে সুশৃঙ্খলরূপে দস্যুভয় নিবারণ হইতেছে"[৩০]

১৮৩৪ খ্রীস্টাব্দের ১৩ সেপ্টেম্বরের সমাচার দর্পণে "রাধা বঙ্গ নামে একজন প্রধান ডাকাইত" যে থানা বেণীপুরের মোতালক একতালপুর মুসরীয় গ্রামে" বাস কবত, যে ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে বন্দী অবস্থা থেকে পলায়ন করেছিল তাকে এতদিন বাদে ধরার এক রোমহর্ষক বিবরণ দেওয়া হয়েছে এবং সে জন্য ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে যে "আশীর্বাদ করিয়া এইক্ষণে এ দেশস্থ তাবল্লোকে রাত্রিকালে কুতুহলে নির্ভয়ে সুখে নিদ্রা যাইতেছে।..."[৩১]

অবশ্য এই সঙ্গে গ্রামের দারোগাদের সম্বন্ধে বিরূপ মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে

২৮. সমাচার দর্পণ— ৭।১।৩৭, সংবাদ পত্রে সেকালের কথা ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৮ থেকে উদ্ধৃত।

২৯. দ্রষ্টব্য ঐ। পৃ. ২য় খণ্ড পৃ ৬৯-৭০।

৩০. সংবাদপত্রে সেকালের কথা ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৭৮।

৩১. ঐ। ২য় খণ্ড পৃ. ৩৭৬।

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে তারিখের 'সমাচার চন্দ্রিকা পত্রিকায়—"... কোন গ্রামে যদ্যপি ডাকাইতি কিম্বা চুরি অথবা খুনি বা দাঙ্গা হঙ্গামার সুরতহাল উপস্থিত হইল তবেই দারোগা বাহুস ফোট অর্থাৎ তালু ঠুকিয়া বা বগল বাজাইয়া তথায় উপস্থিত হয় প্রথমে সুরতহালে চাষার হাল গরু যায় ভদ্রলোক নাজেহাল হয় তাহারদিগের কি হাল করিবেক তাহা স্থির করিতে পারে না শেষ হাড়ির হাল করিয়া ছাড়ে অর্থাৎ সকল লোক ধরিয়া অগ্রে আপন লাভের নির্মিত্ত অমর্যদাপন্ন করে অর্থাৎ কয়েদ গালাগালি জামিন দাখিল ইত্যাদিতে তাহারা ভীত হইলে মাথট করিয়া অভিলাষ মত টাকা আনিয়া দিলে শেষ যে কারণে তথায় গিয়াছে তাহার বিষয় অবগত হইয়া রিপোর্ট লেখে যাহাতে তাহার উপর কোন দোষ না স্পর্শে গ্রামের লোক দ্বারা ইহাই সপ্রমাণ হইল ইত্যাদি লিখিয়া পাঠায় ইহা অনেক জজ তদারক করিয়া দারোগাকে সাজা দিয়া কর্ম হইতে দূর করিয়াছেন কিন্তু তথাচ নিবারণ হয় না এ বিষয়ের নিমিত্ত এক সুনিয়ম হইলে ভাল হয়।" —চন্দ্রিকা[৩২]

ইংরেজ শাসক এদেশে শাসন সুদৃঢ় করতে কিঞ্চিৎ উন্নতি সাধনও করেছিল। নতুন বণিক রাজশক্তি গ্রামাঞ্চলে নতুন নতুন রাস্তাঘাট নির্মাণের দ্বারা যাতায়াত ও ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধা করে দিয়েছিল। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ নভেম্বর এ প্রসঙ্গে 'সমাচার দর্পণে' সংশ্লিষ্ট ইংরেজ রাজ কর্মচারী প্রতি গ্রাম বাংলার মানুষ আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও আনন্দ প্রকাশ করেছে। "পরন্তু উক্ত বিচার কর্ত্তার কৃপায় ও উত্তম আয়োজনে উলা গোবর ডাঙ্গা প্রভৃতি গণ্ড ও ক্ষুদ্র গ্রাম সকলে এমত রাস্তা ও পন্থা ও মুল সকল বান্ধাইয়া দিতেছেন যে তদ্দ্বারা পরস্পর গ্রাম সকলে বাণিজ্য সম্বন্ধীয় লোকেরদিগের গমনাগমনের অত্যন্ত সুযোগ হইয়া দ্রব্যাদির দুর্মূল্যতার দিন' লাঘবতা ও হাট বাজার ও গোলাগঞ্জের উত্তরোত্তর উন্নতি হইতেছে"[৩৩]

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে ওয়াহাবী আন্দোলনের নেতা ছিলেন তিতুমীর। প্রথম দিকে তিতুমীরের অনুচরেরা বিশেষ বাধা পায়নি, কিন্তু ক্রমে তাদের কার্যকলাপ হিন্দু জনসাধারণের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার হয়। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ নভেম্বর ইংরেজ বাহিনীর কামানের গোলায় তিতুর "বাঁশের কেল্লা" বিধ্বস্ত হয় এবং তিতু নিহত হন। এই আন্দোলনকে আধুনিক কালে জমিদারের বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষের আন্দোলন বলা হয়েছে "আরব দেশে উদ্ভূত ওয়াহাবি ধর্মমত বেরিলির সৈয়দ আহমদ ও ২৪ পরগণা জেলার বাদুড়িয়া অঞ্চলের তিতুমীর মারফৎ ভারতবর্ষে

৩২. সংবাদপত্রে সেকালের কথা।
৩৩. সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৭৮।

পৌঁছে ব্রিটিশ শাসক ও জমিদার বিরোধী উনিশ শতকের এক প্রবল ও দীর্ঘকাল ব্যাপী আন্দোলনে পরিণত হয়, তার মধ্যে কিছুটা সাম্য-চিন্তাও পরিস্ফুট হয়।"[৩৪]

১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে বাংলাদেশে জমিদারদের বিরুদ্ধে ফরজী আন্দোলন শুরু হয়। শরিফৎ উল্লা ও তাঁর পরিবর্তীকালে পুত্র দুধুমিয়া এই আন্দোলনে উৎপীড়িত কৃষকদের হিন্দু-মুসলমান সংঘবদ্ধ করে জমিদার বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হন...."তাঁর ঐ ধরনের প্রচার তৎপরতার ফলে শুধু মুসলমান নয়, বেশ কিছু হিন্দু কৃষক, কারিগর ও নিম্নবর্গের মানুষও তাঁর দলে যোগ দেন।[৩৫] ইংরেজ সরকার কর্তৃক ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে দুধুমিয়া গ্রেপ্তার হন এবং তিন বৎসর বন্দী জীবনের পর তা মৃত্যু হয়। কিন্তু গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষ বিশেষতঃ হিন্দুদের মনে মুসুলমানদের এ দুটি বিপ্লব" বিশেষ ভীতিপ্রদ ও উদ্বেল সঞ্চার করিয়াছিল[৩৬]। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ২২ এপ্রিল তারিখের 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় প্রকাশিত "জিলা ঢাকা নিবাসি দুঃখি তাপিগণস্য" স্বাক্ষরিত পত্রে অনুরূপ মানসিকতা প্রতিফলিত হয়েছে।

পত্রটির প্রথম ভাগে আছে..."সম্প্রতি জিলা নদীয়ার অন্তঃপাতি নারিকেল বাড়িয়া গ্রামে তিতুমীর নামক এক জবন বাদশাহী লওনেচ্ছায় দলবদ্ধ হইয়া প্রথমত গোবর ডাঙ্গা নিবাসি বাবু কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের ধন প্রাণ আঘাতের বিষয় এর আর[২] হিন্দুদিগের জাতি প্রাণ ধ্বংস করণে প্রবর্ত্ত হইলে তথাকার ম্যাজিষ্ট্রের সাহেব এ বিষয় দাঙ্গা বোধ করিয়া ফৌজদারী নাজির মহম্মদ পুলিশকে কত্রক জন চাপড়াশ সমেত নারিকেল বাড়িয়া পাঠাইয়া ছিলেন। দুষ্ট জনেরা নির্দ্দয়তারূপে ঐ অভাগা পুলিশ নাজিরকে বধ করলি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের রিপোর্টমতে কলিকাতা হইতে অশ্বারূঢ় ও পদাতিক সৈন্য প্রেরিত হইয়া তিতুমীর জবন এককালীন নিপাত হইল।" পত্রের পরবর্তী ফরাজী আন্দোলন সম্পর্কে তৎকালীন গ্রাম বাংলার সাধারণ জনসমাজের অভিব্যক্তি ঃ "শরিতুল্লা নামক একজন জবন বাদশাহি লওনেচ্ছুক হইয়া....চতুর্দিগস্থ হিন্দুদিগের বাটী চড়াও হইয়া দেবদেবী পূজার প্রতি অশেষ প্রকার আঘাত জন্মাইতেছে এবং এই জিলা ঢাকার অন্তঃপতি মলকতগঞ্জ থানার সহশরন্দে রাজনগর নিবাসি দেওয়ান মৃত্যুঞ্জয় রায়ের স্থাপিত দ্বাদশ শিবলিঙ্গ ভাঙ্গিয়া নদীতে বিসর্জ্জন দিয়াছে" পরিশেষে পত্রটিতে মন্তব্য ও আবেদন আছে—"....আমি বোধ করিয়া শরিতুল্লা যবন যে

৩৪. মুক্তির সংগ্রামে ভারত / তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৮৬। পৃ. ২০।

৩৫. ঐ। পৃ. ২২

৩৬. রমেশচন্দ্র মজুমদাব বাংলাদেশের ইতিহাস, ৩য় খণ্ড, আধুনিক যুগ, ২য় সং, পৃ. ৫৬।

প্রকার দলবদ্ধ হইয়া উত্তর[১] প্রবল হইতেছে অল্প দিনের মধ্যে হিন্দুধর্ম লোপ হইয়া অকালে প্রলয় হইবেক। শরিতুল্লার জোরপাটের শত অংশের এক অংশ তিতুমীর করিয়া ছিল না। অতএব আমরা শ্রী ল শ্রী খুতের নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি তিনি হিন্দু ধর্ম ও দেশরক্ষার নিমিত্ত উক্তব্যক্তির দলভঙ্গের বিহিত আজ্ঞা করুন।"[৩৮]

ফুলমণি ও করুণার বিবরণে উনবিংশ শতকের পল্লীসমাজ

১৮৫২ খৃষ্টাব্দে রচিত 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' গ্রন্থটির ভূমিকা সম্বলিত নতুন সংস্করণ ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে চিত্তরঞ্জন বন্দোপাধ্যায় প্রকাশ করেন এবং "আলালের ঘরে দুলালের" পূর্ববর্তীকালের রচিত হওয়ার জন্য এটিকে প্রথম বাংলা উপন্যাসের নিদর্শন হিসেবে দাবী করেন।[৮] কিন্তু পরবর্তীকালে জানা যায় এ গ্রন্থ মৌলিক নয়, অনুবাদ মূলক রচনা[৩৯]

মৌলিক বাংলা উপন্যাসের প্রথম নিদর্শন হিসেবে এর দাবী সম্পূর্ণ নাকচ্ করেছেন ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।[৪] তাঁর মতে এটি 'দি উইক' নামে একটি ইংরেজী গল্প অবলম্বন করে রচিত। অনুবাদ মূলক কিংবা ইংরেজ পল্লীর অনুকরণে ফুলমণি ও করুণার বিবরণে'র পল্লীটি পরিকল্পিত হলেও এ আখ্যানে খ্রীষ্টান ধর্মান্তরিত বাঙালী অধুসিত উনবিংশ শতকের এক পল্লীর সমাজ জীবনের গতি প্রকৃতি চিত্রিত হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে তদানীন্তন বঙ্গপল্লীর সমাজ জীবনের পরিচিত গতি প্রকৃতি অনুভব করা যায়। সেই কারণে এ আখ্যানের পল্লীচিত্র বিশ্লেষণ যোগ্য।

"ফুলমণি ও করুণার বিবরণ" নিঃসন্দেহে খ্রীষ্টধর্মের নীতি আদর্শ প্রচারের বিশেষ উদ্দেশ্যেবহ রচনা। জন্মসূত্রে লেখিকা ছিলেন খ্রীষ্টান মিশনারী। পিতা রেভারেণ্ড ফ্রাসোঁয়া লাক্রোসা ধর্ম প্রচারক হিসেবে এদেশে আসেন। শ্রীমতি ম্যালেন্স এর জন্ম কলকাতায়, তাঁর স্বামী ছিলেন খ্রীষ্টান পাদরী, তিনি নিজেও হলেন ভক্তিপ্রাণা খ্রীষ্টান রমণী। মিশনারী সমাজ সেবিকা। এ দেশীয় খ্রীষ্টান মহিলাদের নীতি শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যেই তিনি গ্রন্থটি রচনা করেন। এ সম্বন্ধে এ সম্বন্ধে লেখিকার নিজের উক্তি উদ্ধৃত করা যায়—

It is a book specially intended for Native Christian women. I have endeavoured to show in it the practical influence of

৩৭. সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড, ৩৭৯।

৩৮. ঐ।

৩৯. ঐ।

christianity on the various details of domestic life..."[৪১]

খ্রীষ্টধর্মের যথার্থ অনুসরণে সংসার জীবন সুস্থ, সুন্দর ও মঙ্গলময় হয় এই বক্তব্যই আলোচ্য আখ্যানে সরাসরি লেখিকা প্রকাশ করেছেন নিম্নোক্ত কাহিনীর সাহায্যে— ফুলমণি নামের বাঙালী খ্রীষ্টান রমণীটির ধর্মের যথাযথ অনুশীলিত জীবনাচরণে তার ঘর-সংসার স্বামী সন্তানের সুন্দর পরিচ্ছন্ন ও সুখময় বিকাশ সম্ভব হয়েছে, কিন্তু পাশাপাশি করুণা নামের রমণীটি খ্রীষ্টান হওয়া সত্ত্বেও খ্রীষ্ট ধর্মশাস্ত্র অনুযায়ী জীবনযাপন করেনি, ফলে তার এবং তার স্বামী সন্তানের সুন্দর জীবন বিকাশ ঘটেনি। অবশেষে যথার্থ খ্রীষ্ট ধর্মানুযায়ী আচরণের ফলে করুণার জীবনেও সুস্থতা এসেছে।

এই নীতিবাদী আখ্যানের পটভূমি বাংলাদেশের যে খ্রীষ্টান গ্রাম বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকার অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সেই গ্রামটিকে পূর্বাপর ঐতিহ্যবাহী গ্রাম বাংলার অন্তর্ভুক্ত করতে অস্বীকার করেছেন। তাঁর মতে এই পল্লী খৃষ্টান মিশনারীগণ সৃষ্ট কৃত্রিম উপনিবেশ। এবং ইংরেজ পল্লীর অনুকরণে সৃষ্ট।[৪২]

কিন্তু বাংলাদেশের স্বতঃস্ফূর্ত চিরাচরিত পল্লী না হলেও শ্রীমতি ম্যালেন্স বর্ণিত এই খ্রীষ্টান পল্লীকে পুরোপুরি কৃত্রিম বলতে পারি না, সেহেতু এ আখ্যানে চিত্রিত নরনারী ও তাদের জীবন পরিবেশ ও মানসিকতায় বিগত শতাব্দীর গ্রাম বাংলার মানুষ ও জীবন পরিবেশের ছায়া পড়েছে।

বাংলার পল্লীসমাজ যে এ আখ্যানে ছায়া বিস্তার করেছে তার মূলে দু'টি কারণ দেখানো যায়— (১) শ্রীমতি ম্যালেন্স খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারিকা ছিলেন। তাঁব জন্ম কলকাতায়, গৃহে এদেশীয় ভৃত্যদের সাহচর্যে বাংলা ভাষা উত্তমরূপে শিখেছিলেন। তাদের কাছ থেকে গ্রাম্য বাঙালীর জীবনাচরণের কিছু সত্য বিবরণ জানার সম্ভাবনা ছিল। তা ছাড়া এ দেশীয় স্ত্রীলোকদের লেখাপড়া শেখানোর সূত্রে তিনি কোন কোন বাঙালী পরিবারের অন্তঃপুরে পৌঁছতে পেরেছিলেন। সেই সূত্রে বাঙালীর ঘরোয়া কিছু সংবাদ তাঁর পাওয়া একান্ত অসম্ভব ছিল না। তিনি নিজে প্রকাশকের কাছে লিখিত পত্রে এ বিষয়ে মন্তব্য করেছেন—

"The above subjects are worked into the little story, fictitious on the whole, but founded upon facts."[৪৩]

৪০. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়; প্যারীচাঁদ রচনাবলীর (ভূমিকা) কলকাতা ১৯৭১।

৪১. ফুলমণি ও করুণার বিবরণ, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, নূতন সং, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ।

৪২. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ রচনাবলী (ভূমিকা) কলিকাতা ১৯৭১।

৪৩. দ্রষ্টব্য PREFACE , ফুলমণি ও করুণার বিবরণ, ১৩৬৫।

(২) দ্বিতীয়ত ঃ শ্রীমতি ম্যলেন্স উচ্চবর্ণের ধর্মান্তরিত হিন্দু পরিবারের জীবনালেখ্য রচনা করেনি। এদেশে গ্রামাঞ্চলে খৃষ্টান মিশনারীরা ছলে বলে কৌশলে অন্ত্যজ দুঃখী বাঙালীদেরই ব্যাপকহারে ধর্মান্তরিত করেছিল। উচ্চ বর্ণের বাঙালী এত ব্যাপকভাবে ধর্মান্তরিত হয়নি, সেই ধর্মান্তরিত অন্ত্যজ দুঃখী হিন্দু বাঙালীরা (মুসলমান সম্প্রদায়ের কথা লেখিকা বলেননি) খ্রীষ্টান হয়েও তাদের পূর্বতন ধ্যান-ধারণা সংস্কার, নানাবিধ প্রথা ভুলতে পারেনি। এত দরিদ্র মানুষগুলির জীবনাচরণের ভঙ্গীও খৃষ্টধর্ম গ্রহণ মাত্রই পাল্টাতে পারে না।

ফলে, এই আখ্যানে কৃত্রিম উপনিবেশ জাতীয় খ্রীষ্টান গ্রামখানির, ধ্যান-ধারণা, জীবন আচরণে গ্রাম বাংলার দুঃখী ও সাধারণ মানুষের জীবন চেতনা বা মানসিকতা খুঁজে পাওয়া কষ্টকর নয়। বাংলার পল্লী সমাজের সাধারণ মানুষের জীবন যাত্রা, ঘর গৃহস্থালীর মলিন চিত্র, গ্রাম্য বাঙালীর বিচিত্র সংস্কার, কু-প্রথা, আচার রীতি এখানে প্রতিপালিত হয়েছে আবার তাদের মধ্যে ব্যতিক্রম মোটাভাত-কাপড় পাওয়া সুখী গ্রাম্য পরিবারের স্নিগ্ধ কুটির চিত্রও এখানে দেখা যাবে। "ম্যলেন্স ইংরেজী কাহিনীকে যতই মেনে চলুন তাকে বাঙালীর গল্প করে তুলতে সমর্থ হয়েছেন। ধার করা গল্প পাত্র-পাত্রীর বর্ণনা নিয়ে চললেও বাঙালী সমাজের বিশ্বাস করার মত ছবি মাঝে মাঝেই ধরা পড়েছে।"[৪৪]

ভদ্র ও ভদ্রেতর দু'টি পৃথক জীবন ধারা বাংলার গ্রামসমাজে চিরকাল রয়েছে। ভদ্রেতর সমাজের দারিদ্র্য সুপ্রাচীন। এ সমাজের প্রতি উচ্চবর্ণের অবজ্ঞা ও অবহেলাও চিরকালের। বাংলার ভাষায় লেখা প্রথম সাহিত্য-নিদর্শন চর্যাপদের—

'টালত মোর ঘর / নাহি পড়বেশি,
হাঁড়িত ভাত নাহি / নিতি আবেসি।'

ইত্যাদি পংক্তিতে পল্লীসমাজের অন্ত্যজ বাঙালীর দারিদ্র্য বেদনা স্পষ্ট উচ্চারিত। মধ্যযুগের বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলিতেও দারিদ্র্যক্লিষ্ট দুঃখী মানুষের ঘর গৃহস্থালীর চিত্র উঁকি দিয়েছে। এছাড়াও সামগ্রিক পল্লী সমাজের বিচিত্র বিশ্বাস, অশিক্ষা, কু-শিক্ষা সংস্কারাছন্নতা, বিশেষ ধ্যান-ধারণা বাঙালীর সাহিত্য চর্চায় স্থান করে নিয়েছে।

প্রাচীন গ্রাম বাংলায় দারিদ্র্য থাকলেও মোটামুটি মোটাভাত কাপড়ের একটা সংস্থান সাধারণ মানুষের ছিল; মরাই ভরা ধান, গোয়ালভরা গরু, পুকুর ভরা মাছের প্রবাদ কৃষিজীবী পল্লীবাঙালীর জীবনে অনেকাংশ সত্য ছিল।

কিন্তু ইংরেজের এদেশে শাসনের ফলে, বণিক সভ্যতার বিষস্পর্শে বাংলাদেশের পল্লীগ্রাম বিনষ্ট হয়েছে। বাংলা পল্লীর সাধারণ কৃষিজীবী, জেলে,

৪৪. ড. ক্ষেত্র গুপ্ত / বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস ১ম খণ্ড পৃ. ৮৭।

তাঁতি, কামার, কুমোরের সচ্ছলতার দিন ফুরিয়ে গেছে। একদিকে চরম দারিদ্র্য অন্যদিকে সামাজিক অবহেলায় জর্জরিত বাংলার নিম্ন শ্রেণীর গ্রামবাসীর একাংশ খ্রীষ্টান মিশনারীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ধর্মান্তরিত হয়েছে। কিন্তু তাদের চিরাচরিত আচার অনুষ্ঠান, রীতি-নীতি ধ্যান-ধারণা, সামাজিক বিশ্বাস—পুরোপুরি ত্যাগ করে উঠতে সকলে পারেনি।

লেখিকা যে খ্রীষ্টান পল্লীকে কাহিনীর পটভূমি করেছেন সেখানে চিত্রিত দারিদ্র্যপূর্ণ কুটীর, চরম অশিক্ষা, কুশিক্ষা সংস্কারাচ্ছন্নতা, শঠতা, পুরুষের লম্পটা, স্ত্রী নির্যাতন, গ্রাম্য স্ত্রীলোকের কলহ প্রবণতা, পরচর্চা, কিশোর বালকের মদ্যাসক্তি, জুয়াখেলা, আবার কোন কোন সুখী সচ্ছল গৃহকোণের স্নিগ্ধ ছবিতে—যেন ঊনবিংশ শতাব্দী সামগ্রিক গ্রাম বাংলার বিপর্যস্ত ও ভগ্নরূপ প্রতিফলিত হয়েছে।

'ফুলমণি ও করুণার বিবরণে'র শুরুতে লেখিকা কল্পিত প্রবেশ মুখের দৃশ্যটি অত্যন্ত বাস্তবানুগ....''গ্রামে প্রবেশ করিয়া প্রথমে চারি পাঁচখানা কুঁড়ে ঘর দেখিতে পাইলাম। তাহাদের উঠান অপরিষ্কার এবং তাহাদের সম্মুখে উলঙ্গ বালকেরা কাদা ধূলা দিয়া খেলা করত পুত্তলাদি গড়িতেছিল।''[৪৫]

ধর্মযাজিকা খ্রীষ্টান রমণী লেখিকার এই দৃশ্য মনঃপুত না হলেও--- এই চিত্র গ্রাম বাংলার অন্ত্যজ সমাজের ঘর-গৃহস্থালীর সত্য রূপ।

এই আখ্যানে যে খ্রীষ্টান রমণীর অখৃষ্টানসুলভ আচরণ লেখিকাকে দুঃখিত করেছে, সেই করুণার গৃহ কুটীরের বর্ণনাতে বা তার জীবনযাত্রার ভঙ্গীর মধ্যে বাংলা গ্রাম-সমাজের নীচের তলার দরিদ্র মানুষের বাসস্থানের কিম্বা জীবন ধারণের সত্যরূপই ধরা পড়েছে—

করুণার গৃহ বর্ণনা করুণার উঠানের মধ্যে একটি ছোট রান্নাঘর ছিল বটে, কিন্তু তাহার চাল সমস্ত ভাঙ্গিয়া পড়ানে উনুন ও রন্ধন করিবার দ্রব্য সকল বড় গৃহের দাবায় রাখিয়াছিল। আমার আগমনের পূর্বে করুণা অন্ন পাক করিতেছিল, তাহাতে ধুঁয়া প্রযুক্ত আমি গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারিয়া দেখিলাম সে গৃহও ভগ্ন প্রায় হইয়াছে। তাহার উঠানটি বড় অপরিস্কার ছিল, তথাপি আমাকে সেইখানে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইল। কেননা করুণা বলিল, মেম সাহেব, আমার যে মোড়াটি ছিল, তাহা আজি ছল্যেরা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে।

''যদ্যপি করুণা এমত দুঃখিতা ছিল, যে প্রায় আপনার পরিবারের আহারাদি যোগাইতে পারিত না, তথাপি তাহাদের ঘরে একটি নেড়ি কুকুর পোষা ছিল।''[৪৬]

এই করুণা খ্রীষ্টধর্মের অনুশাসন অনুযায়ী চলতো না, সে সভ্য ভদ্র রমণী

৪৫. ঐ।
৪৬. ফুলমণি ও করুণা

নয়। সে পুরোপুরি পল্লীগ্রামের বেশভূষা ও আচার আচরণে দুঃখী অন্ত্যজ সমাজের নারী-প্রতিনিধি। "তাহার কাপড় বড় ময়লা এবং চুল বাঁধা না থাকায় মস্তকের চতুর্দিকে পড়িয়াছিল।"[৪৭] সে অশিক্ষিতা পল্লী রমণীর মতই নবাগতা মেম সাহেবকে দেখে "ফুলমণির প্রতি ফিরিয়া ফুসফাস করিয়া জিজ্ঞাসা করিল উনি কে?[৪৮] করুণা পল্লীর নিম্ন শ্রেণীর রমণীদের স্বভাব অনুযায়ী ময়লা কাপড়ে থাকতে পারে, কিন্তু পান-তামাক ভিন্ন তার চলে না। তাই ছেলের অসুখের দোহাই দিয়ে মেম সাহেবের কাছ থেকে পাওয়া রুটি মিশ্রী দুই পয়সায় বিক্রি করে তা দিয়ে পান তামাক কিনে এনেছে।

করুণার সংসারের চিত্রটিও যথার্থই বাস্তবানুগামী। অবেলায় তার ছেলে কোথা হতে "কতকগুলি চনা মাছ"—নিয়ে এলে তা রান্না করার তেল সে প্রতিবেশীর কাছে চাইতে আসে। এই সব মানুষের সংসারে কোন পারিবারিক শৃঙ্খলাও নেই। তার স্বামী মদ্যপ, করুণাকে সংসার খরচ দেয় না, করুণাও গ্রাম্য নারীর মতই স্বামীর সঙ্গে কলহ করে, মাতাল স্বামীও তাকে প্রহার করে রক্তপাত ঘটায়। লেখিকা বর্ণনা দিয়েছেন— "করুণা আপন দ্বারের সিঁড়ির উপরে বসিয়া অতিশয় ক্রন্দন করিতেছিল, এবং তাহার মস্তকের একটা বড় ক্ষত হইতে দুই গাল বাহিয়া রক্ত পড়িতেছিল। সে আমাকে দেখিবামাত্র বলিতে লাগিল, আ! মেম সাহেব, আজি আপনি ভাল সময়ে আসিয়াছেন। আমার এই দুর্দশা আপনি স্বচক্ষে দেখিলেন। বিবেচনা করুন আমি অতি দুর্ভগা, আমি কোথা হইতে সুন্দর ঘর ও পরিষ্কার বস্ত্র পাইতে পারি? ও মেমসাহেব, যদি ঘরের মধ্যে মিষ্ট বাক্য বলে, তবে দুই দিন অনাহারে থাকিলেও থাকা যায়; কিন্তু এইরূপ নিত্য ঝগড়া মারামারি ইত্যাদি আমি আর সহ্য করিতে পারি না। হায়! আমার মৃত্যু হইলে ভাল হয়।

আমি উঠানের মধ্যে এক গামলা শীতল জল দেখিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাতে আপন রুমাল ডুবাইয়া করুণার মাথার ক্ষতস্থানে দিলাম, এবং পুনঃ২ এইরূপ করিলে ক্রমে২ রক্তস্রোত নিবারণ হইল। পরে আমি প্রেমভাবে তাহাকে জিজ্ঞাসিলাম, করুণা, তুমি কি প্রকারে এমত ক্ষতবিক্ষতা হইলা?

করুণা উত্তর করিল, মেম সাহেব বলি শুনুন। আজি আমি তাবৎ কিছু খাইতে না পাইয়া তিনটা বেলার সময়ে ফুলমণির নিকটে দুইটি পয়সা চাহিয়া আনিলাম; পত্রের দ্বারা কতকগুলি ছোট২ মাছ কিনিয়া রাত্রিতে ইহা রান্ধিব এমত মনে করিয়া সেই মাছ কুটিয়া ধুইয়া রাখিতেছি, এমত সময়ে আমার স্বামী আর দুইজন পুরুষকে লইয়া ঘরে আইল। তাহারা সকলে কিঞ্চিৎ মত্ত ছিল, তাহাতে

৪৭. ঐ।
৪৮. ঐ।

আমার স্বামী বড় রাগান্বিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগল, ওগো, ভাত তৈয়ারি আছে কিনা? আমি উত্তর দিলাম, চারিটার সময়ে কি ভাত হয়? মাতাল হইয়া কি বলিতেছ, তুমি তাহা জান না; আর তুমি কে, যে তুমি ভাত চাহিতে আসিয়াছ? খরচের নিমিত্তে তুমি কি পয়সা দিয়াছিলা? সে এই কথা শুনিয়া কোটা মাছের চুপড়িকে মাছ শুদ্ধ লাথি মারিয়া নর্দমাতে ফেলিয়া কহিল, তুই এমত কথা বলিস? আমি যদি পয়সা না দিই, তবে এই মাছ কি প্রকারে আপনার জন্য যোগাইয়া রাখিয়াছিলি? আমাকে এইরূপে ভর্ৎসনা করিয়া সে আপন মাতওয়ালা সঙ্গিদের প্রতি ফিরিয়া কহিল, চল ভাই, আজি আমাদের পয়সার অভাব নাই; অতএব এ বেটা যদ্যপি খাইতে না দিল, ভাবনা কি? অন্য স্ত্রীলোকদের সহিত আমাদের পরিচয় আছে কি না? এই কথা কহিয়া সে আমাকে অত্যন্ত মারিল, পরে তাহারা সকলে চলিয়া গেল।"[৪৯]

করুণার ছোট ছেলে নবীনের প্রথম উপস্থিতিতে, তার বর্ণনায় পল্লী বাংলার নিম্নশ্রেণীর শিশুর আকৃতি সাজ ও ব্যবহার প্রতিফলিত : "তাহার বর্ণ অতিশয় কাল, এবং ধূলা ও কাদাতে খেলা করিয়া আসিয়াছিল, এই জন্যে তাহাকে আরও মলিন বোধ হইল। সে প্রায় উলঙ্গ, কেবল তাহার কোমরে একখানি ছেঁড়া কানি বাঁধা ছিল।...আমি মেম সাহেবকে কেন সেলাম করিব? তুমি তো তাঁহার রুটী ও মিসরী আমাকে খাইতে দিলা না।

'.....নবীন তাড়াতাড়ি করিয়া কহিল, মেম সাহেব, আমার নিকটে, শুন, আমি তোমাকে বলি। বকুল নামে একজন স্ত্রী এই পাড়াতে থাকে, তাহার মেয়ার ব্যামোর হইয়াছে, এই জন্যে সে দুই পয়সা দিয়া মায়ের নিকটে ঐ রুটী কিনিয়া লইল, এবং মা সেই পয়সাতে তখনই তামাক কিনিয়া আনিল। ও মেম সাহেব, তুমি যদি তাহার তামাক খাওয়া দেখ, তবে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিবা। সমস্ত দিন তাহার আর কোন কষ্টই নাই এবং রাত্রির মধ্যে সে আমাকে একশত বার জাগাইয়া বলে, তামাক্ সাজ্', এই কারণে পিতার নিকটে কত বার মার খাইয়াছে, তবু তাহার জ্ঞান হয় না"[৫০]

অশিষ্ট গ্রাম্য পরিবারের নানা সত্যরূপ শ্রীমতি ম্যালেন্স এই আখ্যানে উদ্ঘাটিত করেছেন। বাইরের মেমসাহেব অতিথির সামনেই করুণা পুত্র নবীনকে প্রহার করে। তার জ্যেষ্ঠ পুত্র বংশী কিশোর বয়সেই জুয়া খেলা ও মদ্যপান শিখেছে। সেও মেম সাহেবের উপস্থিতিতেই চূড়ান্ত অভব্যতার সঙ্গে করুণাকে বলেছে : '..বুঝি তোমাকে দিবার, জন্যে আমি সনগরসব খেলা করিয়া দুই আনা লাভ

৪৯ ঐ।
৫০. ঐ।

করিলাম? আমি তো এখন মদ খাইব, পরে আমার ভাত না হইলে কিছু ক্ষতি নাই; তুমি আপনাব জন্য চেষ্টা কর।"[৫১]

উনবিংশ শতকের গ্রাম বাংলার একাধিক সংস্কারে বিশ্বাস ও প্রবণতা লক্ষ্য করেছেন। (সেগুলির কোন কোনটি এখনও বর্তমান) যেমন মধুর মৃত্যুকালে রোগ শয্যার পাশে গ্রামের পাড়া প্রতিবেশীর ভীড় করার দৃশ্য; নানাবিধ ওষুধ বা টোটকার পরামর্শদান। এ প্রসঙ্গে লেখিকা গ্রাম বাংলাব এই বিশেষ প্রবণতার সঙ্গে বিলাতী ভদ্রতাবোধের পার্থক্যটিও স্পষ্ট জানিয়েছেন— 'পরে আমি উক্ত গৃহের উঠানেব নিকটে দাঁড়াইয়া একজন স্ত্রীলোকের ক্রন্দন এবং কোন পীড়িত ব্যক্তির বড় কোঁকানি শব্দ শুনিতে পাইলাম। যদ্যপিও তাহাদেব সহিত আমার পূর্বে পরিচয় ছিল না, তথাপি আমি নিঃশব্দ বহির্দ্বার খুলিয়া ভিতরে গেলাম, কারণ আমি জানিতাম, যে বাঙ্গালা দেশস্থ লোকেদের পীড়া হইলে যদি বাহিরের কোন মানুষ আসিয়া তাহাদের নিকটে বৈসে, ও তাহাদের দুঃখে দুঃখিত হয়, তবে তাহারা বড় সন্তুষ্ট হয়। বিলাতে এমত নয় বটে, বরং সেখানে যদি কোন অপরিচিত ব্যক্তি হঠাৎ গিয়া রোগগ্রস্থ মানুষের নিকটে উপস্থিত হয়, তবে সেই পীড়িত ব্যক্তির বন্ধু বান্ধবে না তাহাকে অশিষ্ট জ্ঞান করে।

সে যাহা হউক আমি ভিতরে গিয়া দেখিলাম, উঠান ও দাবা লোকেতে প্রায় পরিপূর্ণ আছে।[৫২]

চতুর্থ অধ্যায়ে মধুর স্ত্রী রাণীর সন্তান প্রসবের বর্ণনাটি সেকালের পল্লীগ্রামের সাধারণ ঘরের প্রসবকালের সত্য বিবরণ। সেখানে সমাগত পল্লী রমণীদের পারস্পরিক বাক্যালাপে ও অভিমত প্রকাশের মধ্যে গ্রাম জীবনের সাধারণ সংস্কার বিশ্বাস ধ্যান ধারণা, নিখুঁতভাবে পরিস্ফুট হয়েছে।—

"রাণি দুই তিনমাস পূর্বে আপন শাশুড়ীর সাক্ষাতে এমত কথা বলিয়াছিল, যে গত রাত্রিতে একটা পেচা কিম্বা ভূতল পক্ষী ডাকিতে' আমার মাথার উপর দিয়া উড়িয়া গেল। এই কথা এখন তাহার শাশুড়ীর মনে পড়াতে সে বলিতে লাগিল, যদি এমত হয়, তবে সে পক্ষী ফিরিয়া না আইলে পোয়াতি প্রসব হইতে পারিবে না। এ কথাতে অন্য সকল স্ত্রীলোকেরা স্বীকার করিল, কেবল একজন বুড়ি ইহাতে সম্মতা না হইয়া বলিল, আমার বোধ হয় পেচাতে কোন ক্ষতি হয় না, ...ইহা শুনিয়া আর একজন স্ত্রীলোক বলিল ও কথা আমি কখন বিশ্বাস করিব না। সকল লোকেরা জানে যে ঐ পক্ষী ফিরিয়া না আইলে পোয়াতি প্রসব হয় না; হয়তো সে ফিরিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু তোমরা তাহাতে মনোযোগ করিলা

৫১. ঐ।
৫২. ফুলমণি ও করুণার বিবরণ, ঐ।

না।[৫৩]

এছাড়াও এখানে পল্লী রমণীদের মুখে গর্ভ নষ্টকারী দাইনীর অস্তিত্বে বিশ্বাসের কথা আছে, নির্বিঘ্নে প্রসবের জন্য গর্ভিণীকে তেল পড়া, জলপড়া, খাওয়ানোর কথা আছে। আবার লেখিকা অভিনিবেশ সহকারে অশরীরী প্রেতাত্মার ভয়ে প্রসব গৃহে লোহা, জুতা, ঝাটা ইত্যাদি টাঙানো ইত্যাদি গ্রাম্য আচারের কথাও উল্লেখ করেছেন।

উনিশ শতকে রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রমুখ মনীষীর প্রচেষ্টায় বাংলা দেশে স্ত্রী শিক্ষা প্রবর্তিত হলে সমাজের প্রাচীন পন্থীরা তুমুল বিরোধিতা সৃষ্টি করে। অন্তঃপুর ছেড়ে নারীরা বাইরের মুক্ত আলোয় বেরিয়ে আসা সে যুগের গতানুগতিক চিন্তায় সহজে গৃহীত হয়নি। খাস কলকাতাতেই প্রাচীন পন্থীরা সরব ছিলেন। সে ক্ষেত্রে গ্রাম বাংলার একান্ত অনগ্রসর সমাজে নব প্রবর্তিত নারী শিক্ষা বা মেয়েদের বিদ্যালয়ে খাওয়ার ব্যাপারে যে কতখানি বিরূপতা ছিল তার যথার্থ প্রতিফলন ঘটেছে ফুলমণির সঙ্গে করুণার কথপোকথনে।

''করুণা উত্তর করিল, তুমি তো রাণীর পক্ষে অবশ্য বলিবা, কারণ সে স্কুলের মেয়া ছিল, আর সে তোমার সুন্দবীর বন্ধু। কিন্তু ফুলমণি আমি তোমাকে যথার্থ বলি, লোকেরা আর স্কুলের মেয়েদের সহিত আপন পুত্রদিগকে বিবাহ দিবে না। স্কুলের মেয়েদের দ্বারা বার' এইরূপ গোলমাল উপস্থিত হইয়া থাকে।''[৫৪]

পল্লীবাংলার অন্ত্যজ জীবনের দুঃখ দারিদ্র্য, অশিক্ষা, সংস্কারাচ্ছন্নতা, হীনতার কিছু কিছু স্বাভাবিক সংবাদ শুধু নয়, সেই সঙ্গে লেখিকা তাঁর প্রিয় চরিত্র, আখ্যানের ধর্ম নিষ্ঠ খ্রীষ্টান রমণী ফুলমণির যে পরিচ্ছন্ন গৃহ-কুটীরটির চিত্র বর্ণনা করেছেন সেইটি সে যুগের গ্রাম বাংলায় সাধারণ মানুষের আকাঙ্ক্ষিত স্নিগ্ধ সুন্দর সচ্ছল গৃহ-কুটীরের চিত্র। অভিজ্ঞ সমালোচকের নিম্নলিখিত মন্তব্য উল্লেখ করে ''ফুলমণি ও করুণা'য় প্রতিফলিত গ্রাম বাংলার নিজস্ব স্বভাব সম্পর্কিত আমাদের বক্তব্য সমাপ্ত করা যায়— ''লেখিকা বাঙালীয়ানার যে ছাপটি এনেছেন তা অবশ্যই স্বাধীন চেষ্টার ফল এবং সে অংশ একান্ত বিফল নয়। কয়েকটি প্রসঙ্গের নিদর্শন দেওয়া যাক। মুমূর্ষু মধুর চারধারে পাড়ার মানুষের জটলা, চিকিৎসা ও চোটকার বিবিধ আয়োজন; রাণীর প্রসবকালে নারীদের নানা মত....করুণার বাড়ীঘরের অগোছালো রূপ, মাছ রান্নার জন্য তেল ধার চাওয়া, পাড়ায় মেম সাহেবকে ঘুরতে দেখে দল বেঁধে কুকুরের ডাকাডাকি, বংশীর মৃত্যুতে

৫৩ ঐ। পৃ. ৩৪।

৫৪. 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ'— ঐ পৃ. ৪৩।

লোকের ভীড়—... ছেলের শোকে মায়ের লুটিয়ে কান্নার সঙ্গে অনেক কথা সুর করে বলা, ফুলমণির ঘর, তার সজ্জা, উঠান, দাওয়া, গোয়াল প্রভৃতির বর্ণনা (যতই তাকে খ্রীষ্টানী আদর্শের নিদর্শন করে তোলার চেষ্টা হোক) বাঙালী পরিবারের ছবিই বটে''।[৫৫]

বাংলা সাহিত্যের নকশায় পল্লীসমাজ
নববাবু বিলাস (১৮২৩ খ্রী:) / একটি নগর জীবন আলেখ্য

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৭৮৭-১৮৪৮ খ্রী:)

বাংলা নক্‌শা রচনার প্রথম লেখক আখ্যা দেওয়া যায় ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে প্রকাশিত হওয়া বাংলা সংবাদপত্র গুলিতে বাংলাদেশের সমাজচিত্র বা সামাজিক গতি প্রকৃতি বিক্ষিপ্তভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল। সংবাদপত্র পরিচালকেরাই প্রথম বাংলা সমাজ জীবন চিত্র রঙ্গ ও ব্যঙ্গের দৃষ্টিতে পৃথক-গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। বিশেষত নাগরিক সমাজের (কলকাতা) স্খলন পতনকে নক্‌শাকারে প্রথম প্রকাশ করেছেন 'সমাচার চন্দ্রিকা'র সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় ১৮২১ খ্রী: থেকে ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত বাবুর উপাখ্যান, সৌখিন বাবু, বৃদ্ধের বিবাহ, বৈষ্ণব, শীর্ষক ব্যঙ্গ নক্‌শাগুলিকে বাংলা সাহিত্যের পণ্ডিত ও গবেষকবৃন্দ ভবানীচরণের রচনা হিসেবে অনুমান করেছেন[৫৬] ''ভবানীচরণ নিজেও এই ধরনের পুস্তিকা লিখিয়াছিলেন, সুতরাং সমাচার চন্দ্রিকায় প্রকাশিত রচনাগুলি ইঁহারই লেখনী নিঃসৃত মনে করা যাইতে পারে'' (ড. সুকুমার সেন)।

ভবানীচরণের 'কলিকাতা কমলালয়' (১২৩০ সাল) রচনাটি সম্পর্কে সমালোচকের সঠিক মন্তব্য এই যে এখানে ''মফঃস্বলবাসী ও কলিকাতাবাসীর প্রশ্ন-উত্তরের মধ্য দিয়া আজব শহর কলিকাতার কিছু বর্ণনা, বাঙালী ধনী ও মধ্যবিত্ত সমাজের ভালো মন্দ (বেশির ভাগ মন্দ) পরিচয় দেওয়া আছে।''[৫৭ক]

ব্যঙ্গধর্মী নকশাকার ভবানীচরণকে উপন্যাসের কিছু আস্বাদযুক্ত নববাবু বিলাস নামক নক্‌শাটির সৃষ্টিকর্তারূপে গাঢ় অভিমত পোষণ করেছেন গবেষক ও

৫৫. ঐ। পৃ. ৭।
৫৬. ড. ক্ষেত্র গুপ্ত / বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস / প্রথম খণ্ড পৃ. ৮৮-৮৯।
৫৭. ক) কলিকাতা কমলালয়— ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় লিখিত ভূমিকা ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ।

পণ্ডিতেরা^খ।

ইংরেজ বণিক সভ্যতার অভিঘাত সৃষ্ট কলকাতার নতুন 'বাবু কালচারের' স্বরূপটি ভালই ফুটেছে 'নববাবু বিলাসে'। এই বাবু সমাজের উৎপত্তি ও তাদের কার্যাবলীর বিশদ পরিচয় আছে এই নক্‌শায়। লেখক তাঁর বিদ্রুপ কটাক্ষে নব্য বাবু সম্প্রাদায়ের নৈতিক অধঃপতিত জীবনের সত্যনিষ্ঠ চিত্র ফোটাতে সম্পূর্ণই সার্থক হয়েছেন।

কলকাতার এই নতুন নগর সমাজ ও বাবুদের সম্বন্ধে শিবনাথ শাস্ত্রী মন্তব্য করেছেন ঃ "তখন মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, উৎকোচ, জাল, জুয়াচুরি প্রভৃতির দ্বারা অর্থ সঞ্চয় করিয়া ধনী হওয়া কিছুই লজ্জার বিষয় ছিল না। বরং কোনও সুহৃদ গোষ্ঠীতে পাঁচজন লোক একত্র বসিলে এরূপ ব্যক্তিদিগের কৌশল ও বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা হইত। ধনিগণ পিতামাতার শ্রাদ্ধে, পুত্র কন্যার বিবাহে পূজা পার্বণে প্রভূত ধন ব্যয় করিয়া পরস্পরের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেন। সিন্দুরীয়াপটীর প্রসিদ্ধ মল্লিকগণ পুত্রের বিবাহে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া নিঃস্ব হইয়া গিয়াছেন। যে ধনী পূজার সময় প্রতিমা সাজাইতে যত অধিক পরিমাণে ব্যয় করিতেন এবং যত অধিক পরিমাণে ইংরাজের খানা দিতে পারিতেন, সমাজ মধ্যে তাঁহার তত প্রশংসা হইত। ধনী গৃহস্থগণ প্রকাশ্যভাবে বারবিলাসিনীগণের সহিত আমোদ প্রমোদ করিতে লজ্জা বোধ করিতেন না। তখন উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও মধ্য ভারতবর্ষ হইতে একশ্রেণীব গায়িকা ও নর্তকী শহরে আসিত, তাহারা বাঈজী এই সম্ভ্রান্ত নামে উক্ত হইত। নিজ ভবনে বাঈজীদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া আনা ও তাহাদের নাচ দেওয়া ধনীদের একটা প্রধান গৌরবের বিষয় ছিল। কোন ধনী কোন প্রসিদ্ধ বাঈজীর জন্য কত সহস্র টাকা ব্যয় করিয়াছেন সেই সংবাদ শহরের ভদ্রলোকদিগের বৈঠকে ঘুরিত এবং তাহাতে তত দোষাবহ জ্ঞান করিত না। এমন কি বিদেশিনী ও যবনী কুলটাদিগের সহিত সংসৃষ্ট হওয়া দেশীয় সমাজে প্রাধান্য লাভের একটা প্রধান উপায় স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল।

এই সময় শহরের সম্পন্ন মধ্যবিত্ত ভদ্র গৃহস্থদিগের গৃহে 'বাবু' নামের এক শ্রেণীর মানুষ দেখা দিয়াছিল। তাহারা পারসী ও স্বল্প ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে প্রাচীন ধর্মে আস্থাবিহীন হইয়া ভোগ সুখেই দিন কাটাইত।...এই বাবুরা দিনে ঘুমাইয়া, ঘুড়ি উড়াইয়া, বুলবুলির লড়াই দেখিয়া, সেতার, এসরাজ বাজাইয়া, কবি, হাবা আকড়াই, পাঁচালি প্রভৃতি শুনিয়া, রাত্রে বারাঙ্গনাদিগের আলয়ে আলয়ে গীতবাদ্য ও আমোদ করিয়া কাল কাটাইত ঃ এবং খড়দহের মেলা ও মাহেশের স্নানযাত্রা প্রভৃতির সময়ে কলিকাতা হইতে বারাঙ্গনাদিগকে লইয়া দলে দলে

খ) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস—সুকুমার সেন, ২য় খণ্ড 'উনবিংশ শতাব্দ / পৃষ্ঠা—১৯৯।

নৌকাযোগে "আমোদ করিতে যাইত"।[৫৮]

রক্ষণশীল গোঁড়া হিন্দু সমাজের অন্যতম নেতা ভবানীচরণ কিছুটা সংস্কারপন্থী ও নীতিবাদী মন নিয়ে উক্ত সমাজকে এই নক্‌শায় ব্যঙ্গের কষাঘাত করেছেন— 'ইহাতে বাবু জীবনের উচ্ছৃঙ্খলতা ও অমিতাচার খেয়ালী অস্থিরমতিত্ব, সৌজন্য ও সুরুচির অভাব, বাল্যকালে হিতকর শাসন-সংযমের উল্লঙ্ঘন ও পরিণামে দুর্গতি সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু লেখকের প্রধান লক্ষ্য ব্যক্তি বিশেষের চরিত্রের স্ফুরণ নহে, সমস্ত সমাজ প্রতিবেশের চিত্রাঙ্কন। বাবু অপেক্ষা যে সমাজে বাবুর উদ্ভব তাহার প্রতিই তাহার মনোযোগ বেশি।'[৫৯ক]

কলকাতার এই বাবু সমাজের উৎপত্তি সম্বন্ধে "হুতোম প্যাঁচার নক্‌শায়" বঙ্কিম ব্যঙ্গে বলা হয়েছে— নবাবী আমল শীতকালে সূর্যের মত অস্ত গ্যালো। মেঘান্তের রৌদ্রের মত ইংরাজদের প্রতাপ বেড়ে উঠলো। বড় বড় বাঁশঝাড় সমূলে উচ্ছন্ন হলো। কঞ্চিতে বংশলোচন জন্মাতে লাগলো। নবো মুনিষি, ছিরে বেণে, ও পুঁটে তেলি রাজা হলো।...টাকা বংশগৌরব ছাপিয়ে উঠলেন। রামা মুরুফবাস কেষ্টা বাগদী, পেঁচোমল্লিখ ও ছুঁচো শীল কলকাতার কায়েত বামুনের মুরুব্বী ও শহরের প্রধান হয়ে উঠ্‌লো।'[৫৯খ]

'নববাবু বিলাসে' ভবানীচরণ ও বাবুদের উদ্ভব সম্বন্ধে ইতিহাস সম্মত সেই সত্যই উদ্‌ঘাটন করেছেন— এই কলিকাতা নামক মহানগর আধুনিক কাল্পনিক বাবুদিগের পিতা কিম্বা জ্যেষ্ঠভ্রাতা আসিয়া স্বর্ণকার বর্ণকার কর্মকার চর্মকার চটকার পটকার মঠকার বেতনোপভুক হইয়া কিম্বা রাজের সাজের কাঠের ঘাটের মঠের ইটের সরদারি চৌকিদারী জুয়াচুরি পোদ্দারী করিয়া অথবা দেখাতে মিথ্যাবচন পরকীয় রমণী সংঘটনকামী ভাড়ামি রাস্তাবন্ধ দাস্য দৌত্য গীত-বাদ্যতৎপর হইয়া কিম্বা পৌরোহিত্য ভিক্ষাপুত্র গুরুশিষ্যভাবে কিঞ্চিৎ অর্থসঙ্গতি করিয়া কোম্পানীর কাগজ কিম্বা জমিদারী ক্রয়াধীন বহুতর দিবসাবসানে অধিকতর ধন্যাঢ্য হইয়াছেন....[৬০]

এই নব্য ধনীদের এক মুর্খ উচ্ছৃঙ্খল পুত্র বা নব্যবাবুটি নিজ কুকর্মের ফল কিভাবে ভোগ করে 'নববাবু বিলাস' সেইটিকে উদাহরণ হিসেবে দেখিয়া ভবানীচরণ নীতিবাদ সমাজ মনস্কভাব স্বাক্ষর রেখেছেন। প্রাচীন বাংলা মঙ্গল

৫৮. ড. সুকুমার সেন ঐ।
৫৯. ক) ড. সুকুমার সেন। ঐ
খ) ড. ক্ষেত্র গুপ্ত—বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, গ্রন্থনিলয়, পৃ. ৭৫-৭৬।
৬০. শিবনাথ শাস্ত্রী—রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ চতুর্থ মুদ্রণ— ১৯৮৩ পৃ. ৫৫-৫৬, নিউ এজ পাবলিশার্স।

কাব্যের ধাঁচে এই গ্রন্থের শুরুতে গণপতি সরস্বতী বন্দনা, গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য বর্ণনা আছে। চারটি খণ্ডে বিভক্ত গ্রন্থের কাহিনীটি গদ্য ও পদ্যের মিশ্রণে রচিত। আকারে প্রাচীন গন্ধ থাকলেও প্রকৃতিতে এটি নগর কলকাতার সচল সমাজচিত্র।

কলকাতার উনবিংশ শতকে সেই হঠাৎ ধনী ব্যক্তিদের প্রতিনিধি স্থানীয় চরিত্রটিকে এখানে কর্তা বলা হয়েছে। তার নাম তোতারাম দত্ত কিংবা রামগঙ্গা নাগ যে কোনটি হতে পারে। এই কর্ত্তার পুত্রদের বিদ্যাশিক্ষায় ব্যঙ্গাত্মক বিবরণের মধ্যদিয়ে "তৎকালীন বাংলা ফারসী ও ইংরাজী শিক্ষার প্রণালী ও শিক্ষা ব্যবসায়ীদের"[৬১] চিত্র স্পষ্ট হয়েছে। নব্যবাবুদের পিছু পিছু ঘোড়া, খোয়ামুদে মোসাহেব, তাদের ইতর আমোদের সঙ্গী ইয়ার বন্ধু দলের চিত্র, পানভোজন বেশ্যা সঙ্গের জন্য মহাজনের কাছে বাবুদের বিপুল ঋণ করার ঘটনা, তাদের নির্বুদ্ধিতা অকর্মণ্যতা বড়লোকী চাল দেখাবার মানসিকতা ভবানীচরণ বাস্তব সম্মতভাবে দেখিয়েছেন।

নব্য বাবুদের বিলাসপঙ্কিল অতি লঘু বহির্জীবনের ঘটনাপ্রবাহই চিত্রাকারে নকশাকার প্রকাশ করেনি, অন্তঃপুরের জীবন সম্পর্কেও তিনি ইঙ্গিত করেছেন। এই বাবুদের যে নিজ ধর্ম পত্নীদের সঙ্গে কেমন পূণ্যগর্ভ সম্পর্ক ছিল সেটি যেন একটি ঘটনা বর্ণনার মাধ্যমে স্পষ্ট হয়েছে। বাবু অর্থের প্রয়োজনে ছলনা করে পত্নীর গহনার দিকে হাত বাড়ালে স্ত্রী বলেন—"আমি বুঝিয়াছি তোমার বড়ই টাকার দরকার হইয়াছে, কিন্তু সব দিতে পারি যদি তুমি সকলের সাক্ষাতে বল যে আমি অন্য দুই মাস অবধি প্রতিদিন বাটীর মধ্যেই শয়ন করিতেছি। বাবু কহিলেন তাহার আটক কি একথা আমি সর্বদাই সকলকে কহিব—তুমি টাকা দেও" বাবু গৃহিনীর চরিত্রের কলুষতা ও অর্থের দ্বারা দুই ভ্রষ্ট চরিত্র—স্বামী স্ত্রী আপোষ চিত্র এই সমাজের চরম অধঃপতনেরই ইঙ্গিত দিয়েছে। অন্তঃপুরের নীতি ভ্রষ্টতার চূড়ান্তরূপ ও বাবুসমাজের নির্মম ট্রাজেডি কাহিনীর শেষে লেখক বর্ণনা করতে দ্বিধা করেননি। আমোদ উচ্ছৃঙ্খলতায় সর্বশান্ত বাবু দেনার দায়ে জেলে গেছে জেল ফেরৎ প্রায় ফতুর বাবু বাড়ী ফিরে তার বিবাহযোগ্য পাঁচটি কন্যাকে বর্তমান দেখতে পয়েছেন। উনিশ শতকীয় কলকাতা নগরীর বাবুকালচারের করুণ পরিণতি বাবুর আর্ত সগতোক্তিতে প্রতিধ্বনিত হয়েছে।—"হা বিধাতা এক দিবস স্ত্রীর সহিত বাস করিলাম না তথাপি আমার হল যাতন, পরে করে গেল সুখ আমার ভাগ্যে ছিল দুখ সে যাহা হউক কিন্তু বিবাহ না দিলে জাতি রক্ষা হয় না" বাবু সমাজে সদর অন্দরের এই ভ্রষ্টাচার সমকালীন সংবাদ পত্রে প্রকাশিত তথ্যের মাধ্যমেও প্রমাণিত হয়। 'নববাবু বিলাস' রচনার বেশ কিছু পরবর্তী সময়ে

৬১. ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃ. ২২।

(১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ৫ নভেম্বরের) 'সংবাদ সুধাকরে' প্রকাশিত এক গ্রাম্য ব্রাহ্মণের কলকাতা দর্শনের অভিজ্ঞতায় নক্‌শা বর্ণিত কুল নারীর অবৈধ সংসর্গের সুস্পষ্ট সংবাদ আছে—.....যখন ঐ বিপ্রসন্তান সন্ধ্যা ফরিয়া বসিয়াছিলেন তখন প্রথমতঃ বাটীর বৃদ্ধকর্তা তৎপর তাঁহার জ্যেষ্ঠ ও মধ্যমপুত্র ও পরে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র ইহারা একে তাবতেই বাটী হইতে বহির্গমন করিলেন তৎপরে তদ্বাটীর দুইজন দৌবারিক ও অন্য কোন চাকর অন্দর মহলে প্রবেশ করিয়া নিশাবসান করিল যাবৎ কর্তা ও তাঁহার পুত্রেরা বাহিরে যামিনী যাপন করিয়া প্রাতঃকালে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এই স্থলে বিশেষ ব্যাখ্যার প্রয়োজনাভাব।"[৬২]

হুতোম প্যাঁচার নকশা (১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দ) [৬৩]

কালীপ্রসন্ন সিংহ

নগর কলকাতার ব্যঙ্গাত্মক চিত্রে বঙ্গপল্লীর অনুপ্রবেশ

বাংলা সাহিত্যে ব্যঙ্গ বিদ্রুপাত্মক সমাজ চিত্র রচনার যে ধারা ভবানীচরণের দ্বারা সৃষ্টি হয়েছিল, 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'—সেই ধারায় রচিত। ঊনবিংশ শতকে রচিত সামাজিক নকশাগুলির মধ্যে এটিই শ্রেষ্ঠ। "নক্‌শা ও ব্যঙ্গ কৌতুক রচনার মধ্যে "হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা (১৭৮৪ এবং ১৮৬৪ খৃঃ) সবচেয়ে মূল্যবান রচনা[৬৪] ঊনবিংশ শতকের এই প্রতিভাবান বাঙালী কালীপ্রসন্ন সিংহ—এই নক্‌শায় রচয়িতা (অবশ্য এ বিষয়েও মতভেদ আছে)। "কালীপ্রসন্ন সিংহ যে ইহা ছাপাইয়া প্রচার করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই কিন্তু তিনি যে বইটি লিখিয়াছিলেন তাহাতে বিলক্ষণ সংশয় আছে।"[৬৫] 'হুতোম প্যাঁচার নকশার প্রথম প্রকাশকাল ১৮৬২ খ্রী। "১৭৮৩ শকে (ইং ১৮৬২) হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা" প্রথমে খণ্ডশঃ প্রচারিত হয়।"[৬৬] প্রথম খণ্ডটির নাম ছিল 'চড়ক'।

এই নক্‌শায় লেখক মুখ্যত কলকাতা শহরের হঠাৎ গজানো নতুন ধনী শ্রেণীর বিলাস ব্যাভিচারে নীতিভ্রষ্টতাকে বিদ্রুপ ও ব্যঙ্গে বিদ্ধ করে তৎকালীন কলকাতার নগর সমাজের সত্যচিত্র পরিবেশন করেছেন।

৬২. হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা সমাজ কুচিত্র· পল্লীগ্রামস্থ বাবুদের দুর্গোৎসব বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ৪র্থ মুদ্রণ ঃ আশ্বিন ১৩৯১।

৬৩. ড. ক্ষেত্র গুপ্ত, বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড ঐ।

৬৪. ড. ক্ষেত্র গুপ্ত, ঐ। পৃ. ৮০।

৬৫ 'সংবাদ সুধাকর' (৫.১১.১৮৩১)— ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড / ১৩৫৬ বৎসর পৃ. ২৪৭। ৬৬ দু খণ্ডে প্রকাশিত

৬৬. ড. সুকুমার সেন / বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস / ২য় খণ্ড ঊনবিংশ শতাব্দ পৃ ২০০।

'......হুতোম সেকালের সমাজের নিখুঁত ছবি আঁকিয়া ছিলেন, তাঁহার রচনা ফটো গ্রাফধর্মী, গল্প তাঁহার নিকট গৌণ, তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল উনবিংশ শতাব্দীর কলিকাতার সামাজিক রূপবর্ণন। তাঁহার রচনা কৌশল এমনই অপূর্ব যে, পড়িতে পড়িতে সেই কলিকাতাকে আমরা যেন প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই।"[৬৭]

এ গ্রন্থের বক্তব্যের সত্যতা সম্বন্ধে গ্রন্থাকারও সম্যক অবগত ছিলেন, এখানে যে, "....শহরের কয়েকজন ধনী ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি ও পরিবারের জীবন ও আচরণের প্রতি বিরূপ কটাক্ষ আছে।"[৬৮] ফলে, তিনি যে তাদের আক্রোশের ও সমালোচনার হাত থেকে রক্ষা পাবেন না, সে বিষয়ে স্বয়ং "চড়ক" নামে প্রকাশিত এই নক্‌শার প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় ইঙ্গিত দিয়েছেন।— বিজ্ঞাপন।

হুতোম প্যাঁচা এখন মধ্যে এইরূপ নক্‌শা প্রস্তুত করবেন। এতে কি উপকার দর্শিবে, তা এখন আপনারা টের পাবেন না। কিন্তু কিছু দিন পরে বুঝতে পারবেন। হুতোমের কি অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু হয়ত সে সময় হতভাগ্য হুতোমকে দিনের ব্যালা দেখতে পেয়ে কাক ও ফরমাসে হারামজাদা ছেলেরা বৌঠা বা বাঁস দিয়ে, খোঁচা খুঁচি করে সেরে ফেলবে সুতরাং কি ধিক্কার কি ধন্যবাদ হুতোম কিছুই শুনতে পাবেন না।"[৬৯]

কলকাতার নবসৃষ্ট বাবুসমাজের উৎপত্তি সূত্র সম্বন্ধে 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শায় লেখক পরিহাস মিশ্রিত লঘুভাষায় সংক্ষেপে আলোকপাত করেছেন—

কোম্পানির বাংলা দখলের কিছু পরে, নন্দকুমারের ফাঁসি হবার কিছু পূর্বে আমাদের বাবুর প্রপিতামহই নিসকের দাওয়ান ছিলেন, সে কালে নিসকীর দাওয়ানীতে বিলক্ষণ দশ টাকা উপায় ছিল; সুতরাং বাবুর প্রপিতামহ পাঁচ বৎসর কর্ম্ম করে মৃত্যুকালে প্রায় বিশ লক্ষ টাকা রেখে যান— সেই অবধি বাবুরা বনেদী বড় মানুষ হয়ে পড়েন।"

"...ক্রমে ক্রমে, কৌশলে, বেণেতী বেসাতে, টাকা খাটিয়ে অতি অল্প দিন মধ্যে কলিকাতা শহরে কতকগুলি ছোটলোক বড় মানুষ হন। রামলীলা, স্নানযাত্রা, চড়ক, বলুন ওড়া, বাজি ও ঘোড়ার নাচ এঁরাই রেখেছেন।"[৭০]

এই বাবু সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্যই ছিল নৈতিক উচ্ছৃঙ্খলতা, মদ্যপান ও প্রবল বেশ্যাশক্তি। ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলিও এই শ্রেণীর মানুষগুলির কুৎসিত আমোদ প্রমোদের ভাল উপলক্ষ্য হয়ে উঠেছিল। এই সমাজের বেশ্যাসক্তি সম্পর্কে হুতোম

৬৭. ঐ।
৬৮. "হুতোম প্যাঁচার নকশা" বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সম্পাদিত নূতন সং ১৩৯১ বঃ ভূমিকা পৃ. ৯।
৬৯. ঐ। পৃ. ৯
৭০. ড. সুকুমার সেন ঐ। পৃ. ২০০।

লিখেছেন— "বেশ্যাবাজিটি আজকাল এ শহরে বাহাদুরির কাজ ও বড় মানুষের আলবাদ পোষাকের মধ্যেগণ্য,.....কলকেতার অনেক প্রকৃত হিন্দু দলপতি ও রাজা রাজারা রাত্তিরে নিজ বিবাহিত স্ত্রীর মুখ দ্যাখেন না,....কলকেতা শহর এই মহাপুরুষদের জন্য বেশ্যা শহর হয়ে পড়েচে, এমন পাড়া নাই যেখানে অন্তত দশঘর বেশ্যা নাই;"[৭১]

সমকালীন কলকাতার নাগরিক সমাজের সমস্ত অসঙ্গতির দিকই হুতোমের নক্‌শায় ধরা পড়েছে। হঠাৎ ধনী ভুঁই-ফোঁড়দের অপদার্থ উত্তর পুরুষদের উচ্ছৃঙ্খলতার যেমন প্রামাণ্য চিত্র তিনি ফুটিয়েছেন, তেমনি ইংরেজী শিক্ষিত সমকালীন বাঙালী সমাজের কিছু অংশের হাস্যকর বিলাতী অনুকরণ, বিশেত তাদের মদ্যপান ও মেরুদণ্ডহীন নিঃস্ক্রিয় জীবনাচরণের ব্যঙ্গাত্মক চিত্র এবং কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষের স্বরূপ ও উদঘাটন করেছেন—"আজকাল শহরের ইংরাজি কেতাব বাবুরা দুটি দল হয়েছেন, প্রথম দল 'উঁচুকেতা সাহেবেব গোবরের বষ্ট'। দ্বিতীয় 'ফিরিঙ্গীর জঘন্য প্রতিরূপ'। প্রথম দলের সকলি ইংরাজি কেতা, টেবিল চেয়ারের মজলিশ, পেয়ালা করা চা, চুরট, জগে করা জল, ডিকান্টরে ব্রাণ্ডী ও কাচের গ্লাসে সোলার ঢাকনি, সালু মোড়া,—হরকরা, ইংলিশম্যান ও ফিনিক্স সামনে থাকে, পোলিটিক্স ও বেষ্ট নিউস অব দি ডে নিয়েই সর্বদা আন্দোলন। ...এঁরা সহৃদয়তা, দয়া পরোপকার, নম্রতা প্রভৃতি বিবিধ সদগুণে ভূষিত, কেবল সর্বদাই রোগ, মদ খেয়ে খেয়ে জুজু, স্ত্রীর দাস,—উৎসাহ, একতা, উন্নতীচ্ছা একেবারে হৃদয় হতে নির্বাসিত হয়েছে; এরাই ওল্ড ক্লাস।

দ্বিতীয়ের মধ্যে—বালারম্বর মিত্র প্রভৃতি, সাপ হতেও ভয়ানক, বাঘের চেয়ে হিংস্র, বলতে গেলে এঁরা এক রকম ভয়ানক জানোয়ার।.... ক্যামন করে আপনি বড় লোক হব, 'ক্যামন করে সকলে পায়ের নীচে থাকবে' এই এঁদের নিয়ত চেষ্টা—'পরের মাথায় কাঁটাল ভেঙ্গে আপনার গোঁপে তেল দেওয়াই এঁদের পলিসী, এঁদের কাছে দাতব্য দূরপরিহার—চার আনার বেশী দান নাই!'"[৭২]

বাবুসমাজের ব্যঙ্গাত্মক চিত্রাঙ্কনের এই নকশায় টিকিধারী ভণ্ড ব্রাহ্মণ পুরোহিত, বেশ্যাপাড়ার বেলফুল মালা বরফ বিক্রয়কারী বড়লোকের মোসাহেব, গঙ্গা স্নানে আগত পরচর্চাকারী বৌ-ঝির দল, মুখরা মেছুনী, সৌখীন গাড়োয়ান, বই হাতে স্কুলের ছেলেরা মৌতাতী বুড়োরা, মদ্যাসক্ত ব্রাহ্ম বাবু, ঠক টিকিট ক্লার্ক ইত্যাদি কলকাতার নগর সমাজের প্রায় সর্বাংশের প্রতিনিধিরাই ব্যঙ্গ ও পরিহাসের রঙে রঞ্জিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে।

৭১. হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা— ঐ। ভূমিকা।
৭২ ঐ। কলিকাতার চড়ক পার্বণ।

মুখ্যত উনবিংশ শতকের নগর কলকাতারই এটি সমাজ দর্পণ— হলেও এ রচনার বিশেষত্ব এই যে সমকালীন বাংলাদেশের গ্রাম সমাজের রূপ প্রকৃতির কিয়দংশ এখানে বিশ্লেষিত হয়েছে এবং সে বিশ্লেষণ সত্যমূলক।

ইংরেজের বণিক রাজত্ব কলকাতা নগর কেন্দ্রিক নতুন সভ্যতা সৃষ্টি করায় পল্লী বাংলায় ক্রমশ শহরের মানসিকতা বা প্রভাব পৌঁছতে লাগল কিন্তু খোদ কলকাতা ও গ্রাম বাংলার মধ্যে পার্থক্য বহুদূর ছিল। শহর যত দ্রুত পরিবর্তিত হয়েছে গ্রামের পরিবর্তন গতিবেগ পায়নি। সমাজ জীবনের সর্বস্তরেই গ্রাম ও শহরের সেই পার্থক্যবোধ এই নক্‌শায় দেওয়া কোন কোন চিত্র বা বিবরণে অনুভব করা গেল।

গভীর পল্লী অনুভাবনা হয়ত হুতোমের ছিল না কিন্তু নগর কলকাতার সমাজ জীবন আলেখ্যে চকিতে কখন কখন কোন কোন ক্ষেত্রে পল্লীগ্রামের প্রসঙ্গ তিনি এনেছেন; সেখানে শহর ও গ্রামের তুলনামূলক বিচার দৃষ্টিটি দেখা গেছে। সেইরকমই একটি প্রসঙ্গ গ্রাম্য জমিদার বিষয়ক।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বাংলাদেশের গ্রামে ক্ষুদ্র বৃহৎ জমিদার সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। নব-সৃষ্ট বণিক রাজশক্তির বাণিজ্য কেন্দ্র কলকাতায় যে হঠাৎ ধনী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয় তাদের একাংশের উচ্ছৃঙ্খল বাবুকালচারের সঙ্গে সেই সব গ্রাম্য জমিদারেরাও কেউ কেউ যুক্ত হয়েছিল। এই জমিদারেরা কলকাতায় এসে রক্ষিতা সঙ্গ, বাইজীনাচ দেওয়া, মদ্যপান ইয়ার মোসাহেব পরিবৃত হয়ে ভ্রমর বাবুকালচারের সেই সব আচরণ ভালোভাবেই আয়ত্ত করে ছিলেন। গ্রামের জমিদারীটিকে তারা প্রজা শোষণের দ্বারা অর্থ উপার্জনের মূল উৎস রেখেছিলেন। সেই পয়সা ওড়াতেন নগর কলকাতার রঙিন নেশায়। কিন্তু কলকাতার বাবুদের সঙ্গে তাঁদের সাজ পোষাকে আচার আচরণে কিছু পার্থক্য হুতোম যথেষ্ট অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করেছেন। তাদের চেহারা সাজ ও আচার আচরণের হাস্যকর দিকগুলি হুতোম প্যাঁচার ব্যঙ্গাত্মক লেখনীতে বর্ণিত হয়েছে—

অনেক পাড়াগেঁয়ে জমিদার ও রাজারা মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় পদার্পণ করে থাকেন। নেজামত আদালতে নম্বরওয়ারী ও মোৎফরেক্কার তদ্বির কত্তে হলে ভবানীপুরেই বাসার ঠিকানা হয়। কলিকাতার হাওয়া পাড়াগেঁয়ের পক্ষে বড় গরম। পূর্বে পাড়াগেঁয়ে কলিকাতায় এলে নোনা লাগত, এখন নোনা লাগার বদলে আর একটি বড় জিনিষ লেগে থাকে— অনেকে তার দরুণ একেবারে ওঁাকে পড়েন—খাগিগোচর পাল্লায় পড়ে শেষে সর্বশান্ত হয়ে বাড়ি যেতে হয়। পাড়াগেঁয়ে দুই এক জন জমিদার প্রায় বারোমাস এখানেই কাটান। দুকুরব্যালা ফেটিং গাড়ী চড়া, পাঁচালি বা চণ্ডীগানের পেলেদের মতন চেহারা, মাথায় ক্রেপের চাদর জড়ানো, জন দশ বারো মোসাহেব সঙ্গে বাইজানের ভেড়ুয়ার মত পোষাক,

গলায় মুক্তোর মালা—দেখলেই চেনা যায় যে, ইনি একজন বনগাঁর শিয়াল রাজা, বুদ্ধিতে কাশ্মীরি গাধার বেহদ্দ—বিদ্যার মূর্তিমান মা। বিসর্জন, বারোইয়ারী, খ্যামটা নাচ আর ঝুমুরের প্রধান ভক্ত—মধ্যে মধ্যে খুনী মামলার গ্রেপ্তারী ও মহাজনের ডিক্রীর দরুন গা ঢাকা দেন। রবিবার, পাল পার্বণ বিসর্জন আর স্নানযাত্রায় সেজে গুজে গাড়ি চড়ে বেরোন![৭৩]

শিক্ষিত নাগরিক চেতনা বশতই লেখক পাড়াগাঁর জমিদারদের বাবুকালচারের এই জব্বরজন অনুস্মৃতিতে বিরূপতা পোষণ করেছেন। তাঁর বিরূপতা তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গাকারে এই মানুষগুলির স্বরূপ চিত্রিত করেছে।—'.....দুই এক জন জমিদার মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় এসে বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠা ও প্রশংসা নিয়ে যান। তাঁরা সোনাগাছিতে বাসা করেও সে রঙ্গে বিব্রত হন না; বরং তাদের চালচুল দেখে অনেক শহুরে তাক হয়ে থাকেন। আবার কেউ কাশীপুর, বোড়স্যা, ভবানীপুর, ও কালীঘাটে বাসা করে, চব্বিশ ঘন্টা সোনাগাছিতেই কাটান, লোকের বাড়ি চড়োয়া হয়ে দাঙ্গা করেন; তারপর দিন প্রিয়তমার হাতধরে যুগলাবেশে জ্যাঠা খুড়া বাবার সঙ্গে পুলিশে হাজির হন, ধারে হাতী কেনেন। পেমেন্টের সময় ঠ্যাঙ্গাঠেঙ্গি উপস্থিত হয়— পেড়াপেড়ি হলে দেশে সরে পড়েন, সেথায় রামরাজ্য![৭৪]

গ্রামের জমিদারীতে এইসব জমিদাররা যে দোর্দণ্ড প্রতাপশীলী ছিলেন সে কথা হুতোম 'সেথায় রাম রাজ্য'— সামান্য বাক্যাংশই স্পষ্ট করতে পেরেছেন। এই সব জমিদারদের এক পা ছিল গ্রামে অর্থশোষণের জন্য, আর অন্য পা ছিল শহরে—বিলাস ও আমোদ-প্রমোদের জন্য। জমিদারদের এই চরিত্র হুতোম স্বল্প অবকাশে বোঝাতে পেরেছেন।

কলকাতার নাগরিক সমাজের নানা গ্লানির চিত্র যেমন এই নকশায় উদ্ঘাটিত হয়েছে। গ্রাম বাংলার তৎকালীন সামাজিক নানা কদাচারের ইঙ্গিত করতেও হুতোম ছাড়েননি। গ্রামের কুৎসিত ধর্মীয় প্রথা, ভণ্ড গুরুদের কদাচার ও শাস্তির এক কৌতুককর বর্ণনা এই নক্শায় পাওয়া যায় । স্বামী সহবাসের পূর্বে স্ত্রীকে ধর্মীয় গুরুর সঙ্গে সহবাস করিয়ে শুদ্ধ করে নেওয়ার নামই ছিল 'গুরুপ্রসাদী' হওয়া। হুতোম বর্ণনা করেছেন—

"পূর্বে মেদিনীপুর অঞ্চলে বৈষ্ণবতন্ত্রেব গরুপ্রসাদী প্রথা প্রচলিত ছিল— নতুন বিবাহ হলে গুরুসেবা না করে স্বামী সহবাস করবার অনুমতি ছিল না। বেতালপুরের রামেশ্বর চক্রবর্তী পোড়াগাঁ অঞ্চলে একজন বিশিষ্ট লোক।" এই ব্যক্তির একমাত্র কন্যার গুরুপ্রসাদী হওয়ার ও গণ্ডর উচিত শাস্তি জামাতা কর্তৃক

৭৩. ঐ। হঠাৎ অবতার পৃ. ৮৯।
৭৪. ঐ / কলিকাতার চড়কপার্বণ।

প্রাপ্ত হওয়ার বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

"...হরহরি বাবু গুরুপ্রসাদীর কিছুমাত্র জানতেন না, গোঁসাই দলবল নিয়ে উপস্থিত,..... ছোকরা বল্লে, "জামাইবাবু তা জানে না আজ আমাদের গুরু প্রসাদী হবে।"...

হরহরি বাবু ছোঁড়ার কাছে শুনে একগাছি রুল নিয়ে গোস্বামীর ঘরে শোবার পূর্বেই খাটের নীচে লুকিয়ে ছিলেন এক্ষণে দেখলেন যে, স্ত্রী ঘরে ঢুকে গোস্বামীকে একটি প্রণাম করে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগলে।.... প্রভু কন্যার গায়ে হাত দিয়ে বল্লেন, "বল, আমি রাধা তুমি শ্যাম", কন্যাটিও অনুমতি মত "আমি রাধা তুমি শ্যাম" তিন বার বলেচে, এমন সময় হরহরিবাবু আর থাকতে পাল্লেন না, খাটের নীচে থেকে বেরিয়ে এসে এই "কাঁদে বাড়ি চলরাম" বলে গোস্বামীকে রুলসই কত্তে লাগলেন,...হরহরি বাবু হঠাৎ দরজা খুলে ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়ে, একেবারে থানার দারোগার কাছে গিয়ে সমস্ত কথা ভেঙ্গে বল্লেন। ... শেষে সকলে ঘরে গিয়ে দ্যাখে যে, গোস্বামীর দাঁতে কপাটি লেগে গ্যাচে, অজ্ঞান অচৈতন্য হয়ে পড়ে আচেন, বিছানায় রক্তের নদী বচ্চে! সেই অবধি গুরু প্রসদী উঠে গ্যালো, লোকেরও চৈতন্য হলো; প্রভুরাও ভয় পেলেন। বর্তমানে যে, গ্রামে গরুপ্রসাদী চলিত আছে, প্রভুরা আর স্বয়ং যান না, অনুমতিতেই কাজ নির্বাহ হয়"[৭৫]

দুর্গাপূজা বাঙালীর সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব। ষোড়শ শতক থেকেই শারদোৎসব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, অষ্টাদশ শতক থেকে দুর্গাপূজায় জাঁকজমকের ঘটা বেড়ে ওঠে। ঐতিহাসিক ড. রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে— 'ইহা খুব প্রাচীন না হইলেও ষোড়শ শতকে ইহা যে একটি প্রধান ও লোকপ্রিয় ধর্মানুষ্ঠানে পরিণত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। আঠারো শতকেই ইহা যে খুব আমোদ-প্রমোদের সহিত সম্পন্ন হইত সে বিসয়ে নিঃসন্দেহে বলা যায়।"[৭৬]

দুর্গাপূজা প্রথম দিকে বড় বড় রাজা, জমিদার ও ধনী ব্যক্তিদের একক প্রচেষ্টাতেই সম্পন্ন হত। কিন্তু চাঁদা তুলে বারোয়ারী পূজা উনিশ শতকের প্রাক্কাল থেকে শুরু হয়। এই বারোয়ারী পূজা নগর কলকাতা থেকে বাংলার গ্রামাঞ্চলেও প্রচলিত হয়। দুর্গাপূজাকে উপলক্ষ করে নগরে যে আমোদ-প্রমোদ, উৎসবের বর্নাঢ্য আয়োজন, মাতামাতি ও প্রতিযোগিতা ছিল, গ্রামের পূজা উৎসবেও যে সেগুলি প্রবেশ করেছিল তার বিবরণ হুতোম এখানে দিয়েছেন— "গুপ্তিপাড়া, কাঁচরাপাড়া, শান্তিপুর, উলো প্রভৃতি কলকেতার নিকটবর্তী পল্লীগ্রামে

৭৫. হুতোম প্যাঁচার নক্শা— ঐ। কলিকাতার চড়ক পার্বণ

করার ধুম করে বারোইয়ারি পূজা হয়েছিল। এতে টক্করি ও বিলক্ষণ চলেছিলো! একবার শান্তিপুরওয়ালারা পাঁচ লক্ষ টাকা খরচ করে এক বারোইয়ারি পূজো করেন; সাত বৎসর ধরে তার উজ্জুগ হয়; প্রতিমেখানি ষাটহাত উঁচু হয়েছিল, শেষে বিসর্জনের দিনে প্রত্যেক পুতুল কেটে কেটে বিসর্জন কত্তে হয়। তাতেই গুপ্তিপাড়াওয়ালারা "মার" অপঘাত মৃত্যুর উপলক্ষে গণেশের গলায় কাচা বেঁধে এক বারোইয়ারি পূজো করেন, তাতেও বিস্তর টাকা ব্যয় হয়"[৭৭]

পল্লী বাংলার সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে যে হুতোম মোটামুটি অবগত ছিলেন তার পরিচয় এই নকশায় আরও কিছু রয়েছে। পল্লীগ্রামের জমিদারদের সম্পর্কিত কটাক্ষ, একাধিক উক্তি, মন্তব্য ও বিবরণ বা তৎকালে পল্লীবাংলার কোন কোন অঞ্চলে প্রচলিত "গুরুপ্রসাদী"র মত কুরুচিকর প্রথা সম্বন্ধে হুতোম এখানে বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন। আবার লঘুচালে বাংলার পল্লীগ্রামের মেয়েদের নববিবাহিত জামাতাকে দেখতে ছুটে আসা, শ্বশুরালয়ে জামাতাকে নিয়ে শালি শালাজদের নানা ঠাট্টা রসিকতার নিতান্ত বাস্তব চিত্রও নকশাকার এঁকেছেন—"জামাইবাবু তিন চার দিনে বেতলিপুর পৌঁছিলেন। গাঁয়ে সোর পড়ে গ্যালো চক্রবর্তীর শহুরে জামাই এসেছে, গাঁয়ের মেয়েরা কাজকর্ম ফেলে ছুটোছুটি জামাই দেখতে এলো। ছোঁড়ারা শহুরে লোক প্রায় দ্যাখেনি, সুতরাং পালে পালে এসে হরহরিবাবুরে ঘিরে বসলো— চক্রবর্তীর চণ্ডীমণ্ডপ লোকে রৈ রৈ কত্তে লাগলো; এক দিকে আশ-পাশ থেকে কতকগুলো মেয়ে উঁকি মাচ্চে; এক পাশে কতকগুলো গোড়িমওয়ালা ছেলে ন্যাংটা দাঁড়িয়ে রয়েচে; উঠোনে বাজে লোক ধরে না। শেষে জামাইবাবুকে জলযোগ করবার জন্য বাড়ির ভিতর নিয়ে যাওয়া হলো। পূর্বে জলযোগের যোগাড় করা হয়েছে— পিঁড়ের নীচের চারদিকে চারটি সুপুরি দেওয়া হয়েছিল; জামাইবাবু যেমন পিঁড়েয় পা দিয়ে বস্তে যাবেন অমনি পিঁড়ে গড়িয়ে গ্যালো; জামাইবাবু ধুপ করে পড়ে গেলেন। শালী শেলোজ মহলে হাসির গরবা পড়লো! (জলযোগের সকল জিনিষগুলিই ঠাট্টা পোয়া) মাটির কালো জাম, ময়দা ও চালের গুঁড়ির সন্দেশ, কাঠের আক ও বিচালির জলের চিনির পানা, জলের গেলাসে ঢাকুনি দেওয়া আরসুলো মাকোর্সা, পানের বাটায় ছুঁচো ও ইঁদুর পোরা। জামাইবাবু অতিকষ্টে ঠাট্টার যন্ত্রণা সহ্য করে বাইরে এলেন। সমবয়সী দু'চার শালা সম্পর্কের জুটে গ্যালো; শহুরের গল্প, পাড়াগাঁর তামাশা ও ব্যঙ্গই দিনটি কেটে গ্যালো।"[৭৮]

এই বর্ণনায় বাংলার পুরানোকালের পল্লীগ্রামের অতি পরিচিত দৃশ্য। ঠিক একই রকম ছবি পাওয়া যায় রেভারেণ্ড লালবিহারী দে রচিত "চন্দ্রমুখীর

৭৭. হুতোম প্যাঁচার নকশা— ঐ কলিকাতার বারোইয়ারি পূজা।

৭৮. ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার বাংলা দেশের ইতিহাস / আধুনিক যুগ / ২য় সং, পৃ. ২৭৮

উপাখ্যানে।" জামাই এলে গাঁয়ের বৌ-ঝিদের মধ্যে যে সেকালে সাড়া পড়ে যেত, ঠাট্টা রসিকতার কেন্দ্রবিন্দু হতেন জামাতা এ বর্ণনা বঙ্কিমচন্দ্রও দিয়েছেন তাঁর একাধিক উপন্যাসে।

চন্দ্রমুখীর উপাখ্যানে (১৮৫৯ খ্রী:)
পল্লীসমাজ
রচয়িতা ঃ লালবিহারী দে

"চন্দ্রমুখীর উপ্যাখ্যানে"র (১৮৫৯ খ্রী:) রচয়িতা হিসেবে রেভারেণ্ড লাল বিহারী দে-কে স্বীকার করে নিয়েছেন বাংলা সাহিত্যের পণ্ডিত ও আলোচকেরা। "লেখক সম্ভবত পাদরি লালবিহারী দের (১৮২৪-৯৪)। তাঁহার সম্পাদিত 'অরুনোদয়' পত্রিকায় রচনাটি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল (১৮৫৭-৫৯) এবং পরে সংশোধন সংযোজন সহ ১৮৫৯ (১২৬৬) সালে গ্রন্থাকারে—বাঙ্গালা নাম "চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান" ইংরেজী নাম চন্দ্রমুখী (Chandra muikhee : A Tale of bengali Life)-শ্রীরামপুরে মুদ্রিত হয়"[৭৯]

ড. দেবীপদ ভট্টাচার্য জনচক্ষুর আড়ালে পড়ে থাকা এই গ্রন্থটিকে প্রায় উদ্ধার করে এনে প্রমাণ করেছেন যে এটির লেখক লাল বিহারী দে।—"এই তুলনামূলক প্রমাণ সাদৃশ্য থেকে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করা যায় যে "চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান" বইটি Gobinda Somanta গ্রন্থরচয়িতা রেভারেণ্ড লাল বিহারী দের রচিত মৌলিক বাংলা উপন্যাস।"[৮০]

লালবিহারী দে-এর বাংলাদেশের বর্ধমান জেলায় এক দরিদ্র সুবর্ণ বণিক পরিবারে জন্ম হয়। দরিদ্র লালবিহারী বহু কষ্টে পাদরি ডাফের স্কুলে বিদ্যা শিক্ষা করেন ও পিতৃহীন অবস্থায় বালক বয়সেই খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেন। "লাল বিহারী দে কোনোদিনই ভুলতে পারেননি যে তিনি ধর্মে ও বর্ণগত মর্যাদায় হিন্দুসমাজের চোখে অবহেলিত। তার থেকে উদ্ধার পাবার জন্যই তিনি হয়তো-বা খ্রীষ্টধর্ম বরণ করেন"[৮১]

স্বধর্ম পরিত্যাগ করলেও বাংলাদেশ ও বাংলাভাষার প্রতি তাঁর এক গভীর ও আন্তরিক টান ছিল। বিশেষত বাংলাদেশের পল্লী, পল্লীর নরনারী ও জীবনাচরণ, তাদের বিচিত্র সংস্কার, ধ্যানধারণা অথবা পল্লীবাংলার প্রাকৃতিক রূপচিত্র

বাংলার দেশের ইতিহাস ২য় খণ্ড (মধ্যযুগ) দ্রষ্টব্য

৭৯. হুতোম প্যাঁচার নকশা। ঐ। কলিকাতার বারোইয়ারি পূজা।

৮০. হুতোম প্যাঁচার নক্শা। ঐ। কলিকাতার বারোয়ারি পূজা পৃ. ৪৩।

৮১. ড. সুকুমার সেন / বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস / ২য় খণ্ড / উনবিংশ শতাব্দ পৃ. ১৯১।

লালবিহারীর ভাবলোকে একটি নিবিড় শ্রদ্ধা ও ভালবাসার আসন লাভ করেছিল। "......দেশের সাধারণ মানুষের প্রতি গভীর সহানুভূতি, তাদের অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন করে তুলবার প্রবল আগ্রহ, তাদের জীবনরূপকে সাহিত্যে প্রতিফলনের জন্য গ্রন্থ রচনা, তাদের মুখে মুখে বেঁচে থাকা উপকথাকে সংরক্ষণ প্রচেষ্টা—সবই লাল বিহারীর দেশ প্রীতির সাক্ষ্যবহ। বাংলার মাটি ও মানুষের প্রতি এই প্রাণের টান লালবিহারী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।"[৮২]

এই কারণেই খ্রীষ্টধর্মের একনিষ্ঠ প্রচারক হ'য়েও গ্রামবাংলার প্রাণ কোষে কোষে ছড়ানো রূপকথা; উপকথার মালা সংগ্রহ করে "Folk tales of Bengal" নামে সংকলন প্রকাশ করেছেন, গ্রামবাংলার শোষিত কৃষক সমাজের সত্য জীবনচিত্র এঁকেছেন— 'Bengal Peasant life" বা Govinda Samanta নামক রচনায়। প্রখ্যাত সমালোচক লিখেছেন "লালবিহারী দে (১৮২৪-৯৪) নিষ্ঠাবান খ্রীষ্টান এবং খাঁটি বাঙালী ছিলেন । বাংলার পল্লীজীবন তার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং শোষিত কৃষকদের সম্পর্কে তাঁর আন্তরিক আগ্রহ ছিল।.....খ্রীষ্টধর্মের প্রচারক হ'য়ে গ্রামীণ লোককথা (Folk Tales of Bengal) সঙ্কলনে পথিকৃৎ হতে পেরেছিলেন এই কারণেই; আর লিখতে পেরেছিলেন বাংলার কৃষকের কথা (Bengal Peasant Life) বা Govinda Samanta—যদিও নিজে ছিলেন ইংরেজী শিক্ষিত মানুষ"।[৮৩]

বাংলাদেশ ও জাতির প্রতি টানে, বঙ্গপল্লীর নিজস্ব সংস্কৃতির প্রতি গভীর অনুরাগে কৃষকদের প্রতি অকৃত্রিম সহানুভূতির তাগিদে তিনি ইতিপূর্বে Calcutta Review পত্রিকাতেও কিছু কিছু প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। সেখানে "কৃষক সমাজের ক্রীড়াকৌতুকের জমিদারের অত্যাচার শোষণের কথা না বলে পারেননি।"[৮৪] Bengal Festivals and Holidays, Calcutta Review July, 1852-এ লেখক বাঙালীর সারা বৎসরের অজস্র পূজা-পার্বণ ও উৎসবগুলির তথ্যময় বর্ণনা দিয়েছেন। যেমন দুর্গা, মনসা, লক্ষ্মী, কালী, জগদ্ধাত্রী, সরস্বতী ইত্যাদি পূজা, ধর্ম ঠাকুরের পূজা, শীতলা পূজা, গঙ্গাপূজা ও রথ, ঝুলন, রাস, দোল ইত্যাদি।

গ্রামবাংলার মাটি জল বায়ু ও তার মানুষগুলিকে ভালবেসে লালবিহারী দে বঙ্গপল্লীর সাধারণ মানুষের বিশ্বস্ত কথাচিত্র রচনা করেছেন ইংরেজী ভাষায় লিখিত "গোবিন্দ সামন্তে"। এ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে আছে গ্রামের পাঠশালা,

৮২. ড. দেবীপদ ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত ঃ রেভারেণ্ড লাল বিহারী দে ও চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান। ২য় সং, ১৯৮৭, পৃ. ৭৫।

৮৩. ড. দেবীপদ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৪।

৮৪. ড. দেবীপদ ভট্টাচার্য। ঐ। পৃ. ২৯-৩০।

গণৎকার, বিবাহ ব্যাপারের খুঁটিনাটি, ভূত নামানোর বিবরণ, গ্রামের হিন্দু বিধবাদের জীবন কথার রূপচিত্র---, দ্বিতীয় খণ্ডে বর্ণিত হয়েছে "....সাধারণ দরিদ্র প্রজার উপর একদিকে গ্রাম্য জমিদার, তার নায়েব, গোমস্তা লাঠিয়ালদের নিষ্ঠুর অত্যাচার অপরদিকে নির্মম সুদখোর মহাজনের নিষ্ঠুর অপকৌশল..."[৮৫] গ্রামের ঘুষখোর দারোগা, সরকারী কর্মচারীদের সঠিক পরিচয় যেমন দিয়েছেন তেমনি সমকালীন গ্রাম বাংলায় অত্যাচারী নীলকর সাহেব কর্তৃক জোর করে চাষীদের জমিতে নীল বোনা, দাদন চাপিয়ে দেওয়া, তাদের প্রতি অমানুষিক ব্যবহার করার সত্য চিত্র এঁকেছেন। সেই সঙ্গে পুলিশ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে নীলকর সাহেবদের সহযোগিতা পাওয়ার সত্যটিও লেখক এখানে উল্লেখ করেছেন। ফলে উনবিংশ শতকের পল্লীবাংলা যেন যথার্থই আপন স্বরূপে ইংরেজী ভাষায় লেখা এ গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে।

লালবিহারী দে রচিত বাংলা আখ্যান গ্রন্থ "চন্দ্রমুখীর উপাখ্যানে" (১৮৫৯) সমকালীন বাংলার গ্রাম সমাজ কতখানি প্রতিফলিত হয়েছে, সেই আলোচনায় প্রবেশের মুখে লেখকের গ্রামবাংলার প্রতি গভীর আন্তরিকতা বা পল্লী সচেতনতা সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার জন্য এই আলোচনাটিকে পূর্ব ভূমিকা হিসেবে স্থাপন করা হল।

খৃষ্টধর্মের মাহাত্ম্য প্রচারমূলক গ্রন্থ 'চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান'ই প্রথম বাংলা মৌলিক আখ্যান গ্রন্থ সেটি মুখ্যত বঙ্গপল্লীর সমাজ জীবন ও নরনারীকে কেন্দ্রকরে রচিত। নগর জীবনের ভাবসংস্কৃতির ঢেউ যে উনবিংশ শতকের পল্লীবাংলায় পৌঁছেছিল তার ইঙ্গিত পাওয়া গেছে এ আখ্যানে। ইংরেজ প্রবর্তিত নতুন যন্ত্রসভ্যতার স্পর্শে আলোড়িত যুগসন্ধিক্ষণের পল্লীবাংলার চিত্র লেখক সততার সঙ্গেই অঙ্কিত করেছেন তার রচনায়।

ড. সুকুমার সেন "চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান'কে একস্থানে বিশেষিত করেছেন "পল্লীজীবনের চালচিত্র"[৮৬] হিসেবে। অন্যত্র বলেছেন ঃ "চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান"কে "টেকচাঁদদের ব্যঙ্গ দৃষ্টি চন্দ্রমুখীর লেখকের ছিল না। তবে তাঁর ছিল কৌতুক উজ্জ্বল পর্যবেক্ষকের সরস চোখ। তার পরিচয় রয়েছে পল্লীচিত্রের টুকরোগুলিতে, মানবচরিত্রের খণ্ডগুলিতে। চন্দ্রমুখী উপন্যাস নয়, বড় গল্পও নয়। চন্দ্রমুখী বিগত শতাব্দীর বাংলাদেশের এক অঞ্চলের ক্ষণদীপ্ত চিত্রমালিকা। তার গাঁথনিতে মুনশিয়ানা নেই কিন্তু সে চিত্রগুলির অকৃত্রিমতা সংশয়াতীত।"[৮৭]

৮৫. ড. ক্ষেত্রগুপ্ত / বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস, ১ম খণ্ড।
৮৬. ড. দেবীপদ ভট্টাচার্য। ঐ। পৃ. ২২। ড. দেবীপদ ভট্টাচার্য পৃ. ২৩ পাদটীকা।
৮৭ ড. দেবীপদ ভট্টাচার্য পৃ. ৩০।

লালবিহারী দে উনবিংশ শতকের ইংরেজী শিক্ষিত নবীনপন্থী বাঙালীর অন্যতম ছিলেন। উপরন্তু তিনি ধর্মান্তরিত হয়ে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারক হয়েছিলেন। কাজেই তাঁর একটি প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী মাহাত্ম্য প্রচারের আন্তরিক প্রবণতাও।

"চন্দ্রমুখীর উপাখ্যানে" পল্লী প্রাথমিক ভাবে দুটি পর্যায়ে উপস্থিত—

১. গ্রাম বাংলার নিসর্গরূপ।

২. উনবিংশ শতকের গ্রাম বাংলার সমাজচিত্র।

চন্দ্রমুখীর উপাখ্যানে পল্লীবাংলার নিসর্গরূপ (প্রাকৃতি চিত্র)

গ্রামবাংলার নিজস্ব প্রকৃতি পরিচয় আছে "চন্দ্রমুখীর উপাখ্যানে"। বিশেষত বর্ধমানের গ্রামাঞ্চলের নদনদী ও স্থান নাম এখানে রয়েছে। "বাঙ্গালা দেশের যে অংশে লালবিহারীর জন্ম ও কর্ম, যে অঞ্চলের নিখুঁত ছবি তাঁহার ইংরাজী উপন্যাস Gobinda Samanta-এ (১৮৭৪) প্রতিবিম্বিত সেই অঞ্চলের জীবনের কিঞ্চিৎ অংশ চন্দ্রমুখীতে পূর্বাভাসিত হইয়াছে।"[৮৮] ড. দেবীপদ ভট্টাচার্যের এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট অভিমত এই যে ঃ 'এ উপন্যাস থেকে জানা যায়, এখানে বর্ধমান জেলার কথা বলা হয়েছে। এখানে কয়েকটি গ্রামের ও নদীর নাম আছে যেগুলির অধিকাংশ বর্ধমান জেলার।'[৮৯] আমরা বলতে পারি, বাংলাদেশের বিশেষত গ্রাম অঞ্চলের রূপচ্ছবির মধ্য দিয়ে পল্লীবাংলার সামগ্রিক দৃশ্যরূপই আখ্যানে প্রতিবিম্বিত হয়েছে।

চন্দ্রমুখীর উপাখ্যানে পল্লীবাংলার নিসর্গ প্রকৃতি একটি বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়ে অবস্থিত হয়নি, গ্রামকেন্দ্রিক এই আখ্যানে গ্রামের অনিবার্য পটভূমি রূপেই প্রকৃতি এখানে চিত্রিত, কিন্তু গ্রামের জনজীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়েই নিসর্গ প্রকৃতি এখানে উপস্থিত। পল্লীর সাধারণ নরনারীর সুখ দুঃখ তরঙ্গিত জীবনাবেগের পাশে পল্লীপ্রকৃতি তার নিজস্ব রূপ নিয় ঋতুচক্রের পর্বে পর্বে আপন মনে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। এই প্রকৃতি রূপের গুরুত্ব কিছু কম নয়।

নদী বিশেষত কান্না নদী তীর প্রাকৃতিক রূপচিত্র নিয়ে একাধিকবার এ আখ্যানে চিত্রবদ্ধ হয়েছে। কান্না নদী ও তার তীরবর্তী চন্দ্রপুর গ্রামের প্রকৃতি দৃশ্য বর্ণনার মাধ্যমে গ্রন্থটির সূত্রপাত— "কান্না নদীতীরে চন্দ্রপুর নামে এক গ্রাম আছে। ....উক্ত নদী অতি ক্ষুদ্র, গ্রীষ্মকালে উহা প্রায় শুষ্ক হইয়া যায়, কিন্তু দামোদরের সহিত সংযোগ থাকাতে বর্ষাকালে এমত পূর্ণা হয় যে, তাহার উপর দিয়া ডোঙ্গা, ক্ষুদ্র নৌকাদি অনায়াসে গমনাগমন করিতে পারে। ....ঐ ঘাটদ্বয়

৮৮. ড. সুকুমার সেন / বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস / ২য় খণ্ড / উনবিংশ শতাব্দ পৃ. ১৯১

৮৯. অধিবাচন / সুকুমার সেন, দেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত।

ইষ্টক নির্মিত নয়, কিন্তু প্রচুর পরিষ্কার, বালুকাময় প্রযুক্ত উহাতে কর্দম হইতে পারে না। আর ঐ ঘাটদ্বয়ের মধ্যে এক ঝাড় বাঁশ থাকাতে নর ও নারীগণ অদৃশ্য হইয়া অবগাহনাদি করিতে পারেন।...কান্না নদীর উভয় পার্শ্বে অনেক শিমূল বৃক্ষ আছে, ঐ বিটপী সকল ফাল্গুন মাসে রক্তবর্ণ পুষ্পেতে বিভূষিত হইলে অতি সুদৃশ্য হয়।"[৯০]

কান্না নদীর ঋতুপর্যায়ের বিভিন্নরূপ লেখক উল্লেখ করেছেন ও বর্ণনা দিয়েছেন, গ্রীষ্মের ও বর্ষার নদীর রূপভেদ, নদীর সঙ্গে গ্রামবাসীর সম্পর্ক কোনোটিই তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি— "কান্না নদী গ্রীষ্মকালে প্রায় শুষ্ক হয়, কিন্তু যে বৃষ্টির কথা পূর্বে কহিয়াছি তদ্দ্বারা উহাতে কিঞ্চিৎ জল প্রবেশ করিয়াছিল। তরুণ ঐ নদীতটের এক বংশবৃক্ষের শুষ্ক মূলে বসিয়া স্রোতের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন বক ও বকী ও কাদা-খোঁচা পক্ষিগণ নদীর কিনারায় ক্রীড়া করিতেছিল, এবং রাজহংস ও রাজহংসীগণ পরমানন্দে সন্তরণ ও অবগাহন করিতেছিল।"[৯১]

কান্না নদী ছাড়াও আরও দুটি নদীর প্রসঙ্গ এ আখ্যানে উল্লেখিত হয়েছে। একটি গঙ্গা বা ভাগীরথী অপরটি দামোদর। তার মধ্যে ভাগীরথী বা গঙ্গার উল্লেখ গ্রামের নিসর্গ চিত্রের বর্ণনা প্রসঙ্গে আসেনি। আখ্যানের নায়ক হেমচন্দ্রের পিতামহীর "অন্তর্জলি" প্রসঙ্গে গঙ্গার উল্লেখ করা হয়েছে। পল্লী নদী হিসেবে গঙ্গা এখানে উপস্থিত হয়নি। কাজেই পল্লী প্রকৃতির আলোচনার অঙ্গ হিসেবে ভাগীরথী বা গঙ্গার প্রসঙ্গ ধরা যাবে না। দামোদর বৃহৎ নদ হ'লেও পল্লী জীবনের সুখ দুঃখের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। ৮ অধ্যায়ে হেমচন্দ্রের সঙ্গে চন্দ্রপুর গ্রামের এক কৃষকের কথপোথনের সময় কৃষকটি কান্না নদীকে দামোদরের "সো রাণী" বলে উল্লেখ করেছে। ১৭ অধ্যায়ে চন্দ্রমুখী গ্রামের সখীদের সঙ্গে দামোদর নদীতে জল নিতে যাওয়ার প্রসঙ্গে লেখক নদী দৃশ্য এভাবে বর্ণনা করেছেন—"ফাল্গুন মাসের একদিন সন্ধ্যাকালে যখন ভানু বেহারনাথ পর্বতের পশ্চাভোগে অদৃশ্য হইতেছিলেন ও পূর্ণশশধরের শীতল রশ্মি শালবনের মধ্য দিয়া দৃশ্য হইতেছিল এবং দামোদরের স্থির নীরকে মন্দ[২] সমীরণ চুম্বন করিতেছিল, ও বকাবকী এবং রাজহংস রাজহংসী জলক্রীড়া করিতেছিল, আরবাই হংসগণ শন[২] শব্দ করত আকাশে উড্ডীয়মান হইতেছিল, এমন সময়ে চন্দ্রমুখী এক সুলোচনা ললনা সমভিব্যাহারে পিতল কলসী কক্ষে লইয়া নদতটে উপস্থিত হইলেন।"[৯২]

৯০ ড সুকুমার সেন। ঐ।

৯১ ড. দেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত রে লাল বিহারী দে ও চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান. ২য় সং, ১৯৮৭ পৃ. ৬৮।

৯২. ঐ। ১ অধ্যায় পৃ. ৭৭-৭৮।

নদীব্যতীত পল্লীবাংলার একান্ত নিজস্ব নিসর্গ সংস্থান আরো আছে। সেই সব খাল-ঝিল-পুষ্করিণী পরিবৃত নিভৃত নির্জন গ্রাম বাংলার ছবি এ আখ্যানে লেখক উপস্থিত করেছেন। পল্লীগ্রামের জনজীবনের সঙ্গে গভীর-সংযুক্ত পুষ্করিণী ও ঝিলের বর্ণনা এখানে একাধিকবার এসেছে। আখ্যানের শুরুতে আছে চন্দ্রপুর গ্রামের জলাশয়ের দীর্ঘ বিস্তৃত বর্ণনা ঃ 'উক্ত পল্লীতে কয়েকটি বৃহৎ সুদৃশ্য পুষ্করিণীও আছে যাহাতে বড় মৎস্য জন্মে, ... কোন জলাশয়ের পাড় মল্লিকা. করবী, যুঁই, গোলাপ, সেঁউতী, ও শেফালিকা পুষ্পের বৃক্ষ, এবং স্থানে অপরাজিতা ও তরুলতার নিকুঞ্জও আছে। ঐ সকল সরোবর বসন্তকালে অতি মনোনীত ও হর্ষোৎপাদক স্থান হয়। চৈত্র এবং বৈশাখ মাসে যখন উক্ত তরুগণ সুগন্ধি পুষ্পে সুশোভিত হয় কদম্ব এবং বকুল বৃক্ষের শাখাতে কোকিলগণ কুঞ্জ ধ্বনি করে এবং মন্দ সমীরণ বহে তখন ঐ পুষ্করিণী সকলের ঘাটেতে গ্রামস্থ তরুণেরা সায়ংকালে বসিয়া আমোদ-প্রমোদ করেন। সেই সময়ে তরুণীগণও কলশী কক্ষে করিয়া অন্য সময়াপেক্ষা অধিকক্ষণ দণ্ডায়মানা হইয়া পরস্পর গৃহকথা কহেন।"[৯৩]

গ্রাম জীবনের সঙ্গে অঙ্গীভূত এই রকমই একটি পুষ্করিণী চিত্র দেখি অষ্টম অধ্যায়ে হেমচন্দ্রের শ্বশুরালয় যাওয়ার পথে "গোপাল নগর নামক এক ক্ষুদ্র গ্রামে"; লেখক পুষ্করিণী দৃশ্য তার খুঁটিনাটি বিবরণসহ লিপিবদ্ধ করেছেন— "ঐ সরোবর অতি দীর্ঘ ও প্রশস্ত, উহার তটে বালি আছে, ও উহার চতুষ্পার্শ্ব তাল ও খর্জ্জুর বৃক্ষে বেষ্টিত। ঐ বালুকার চরের উপর দণ্ডায়মান হইলে তাল ও খর্জ্জুর বৃক্ষসমূহের মধ্য দিয়া দূরস্থ শস্যক্ষেত্র সকল দৃষ্ট হয়। ঐ সরোবরের সামিল এমন পরিষ্কার যে উহার মধ্যে দণ্ডায়মান হইলে পদের নখ দৃষ্ট হয়, ও স্বর্ণ কি রৌপ্য উহার মধ্যে পড়িলে অনায়াসে পাওয়া যায়। ঐ সুশীতল সলিলে স্নান করল ও মন্দ সমীরণ সেবন হেতু ঐ তরুণ স্নিগ্ধ ও প্রফুল্ল চিত্ত হইলেন।"[৯৪]

এই জলাশয়েই তাঁর শ্বশুরালয় সম্পর্কীয় এক রমণীর সঙ্গে সাক্ষাত হয়। তবে এ সাক্ষাৎকারে কাহিনীর গতি প্রকৃতি কিছু পরিবর্তিত হয়নি। দ্বাদশ অধ্যায়ে কাহিনীর মধ্যে আর একটি গ্রাম্য জলাশয়ের বর্ণনা লেখক করেছেন। লেখকের তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণী দৃষ্টির পরিচয় এই বিলটির রূপাঙ্কনেও মেলে। 'উক্ত ক্ষেত্রে প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে এক বৃহৎ ঝিল আছে যাহা দীর্ঘ ও প্রস্থে বিংশতি বিঘা হইবে, উহার জল অতি পরিস্কার ও সুদৃশ্য ও উপকারক। ঝিলের প্রায় সকল

৯৩. ঐ। ৯ অধ্যায় পৃ. ১১০।
৯৪. ঐ। অধ্যায় পৃ. ১৪৫।

জলই পদ্ম ও হেলা পুষ্পের পত্র এবং লতাতে আচ্ছাদিত। আর ঐ সুদীর্ঘ ও প্রশস্ত জলাশয়ের চতুষ্পার্শ্বে বৃহৎ' তাল ও খর্জ্জুর বৃক্ষ আছে সে সকল ঐ সময়ে ফলবতী হইয়া অতি রমণীয়া হইয়াছিল। উক্ত ঝিলের দক্ষিণ ও পূর্বদিকে ধীবরগণ বংশ ও তালপত্র নির্মিত ক্ষুদ্র' কুটীরে বাস করে। আর উহার উত্তর-পূর্ব অর্থা' ঈশান কোণে এক ইষ্টক নির্মিতা দেবী বহুকালবধি স্থাপিতা হইয়াছেন।"[৯৫]

মানবজীবন সভ্যতা জলপ্রবাহেব ধারেই গড়ে উঠেছে। বহতা নদী মানব সভ্যতার মূল আশ্রয়। কিন্তু এই অপ্রবাহিনী জলাশয়গুলিকেও যে পল্লীজীবনের উষ্ণ স্পর্শ বেষ্টন করে থাকতো সে কথাও ঠিক।

এই গ্রন্থে চন্দ্রমুখীর জীবন আখ্যানের সঙ্গে চন্দ্রপুর গ্রাম ছাড়াও আরও কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বঙ্গপল্লীযুক্ত হয়ে আছে। সেই সব গ্রামের বর্ণনা প্রসঙ্গে ও লেখক বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত ও প্রান্তর, আমকাঁঠালের বাগান, বাঁশের ঝাড় গ্রামের রাস্তাঘাট পুষ্করিণী শোভিত গামবাংলার পরিচিতি দৃশ্যেই এঁকেছেন। যেমন মুলুকচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুরোহিতের বাসস্থান বেলপুকরি গ্রামের বর্ণনা— "সে গ্রাম অতিক্ষুদ্র বটে কিন্তু অতি মনোরম। ঐ গ্রামে তাল ও খর্জ্জুর বৃক্ষেতে বেষ্টিত আর উহাতে প্রবেশ করিবামাত্র পথেব দুই পার্শ্বে কতকগুলি বকুল বৃক্ষ দৃষ্ট হয় যাহাদ্বারা ঐ বর্ণ সুদৃশ্য ও সুশীতল হইয়াছে। ঐ পল্লীতে চারিঘাট বিশিষ্ট এক পুষ্করিণী আছে যাহার চতুপার্শ্ব কদম্ব ও কলিকা ও গোলঞ্চ পুষ্পের তরুতে সুশোভান্বিত।"

কখনো পল্লীবাংলার সূর্যাস্ত সূর্যোদয়ের বর্ণনা কখনো কোনো শস্যক্ষেত্রের মধ্যবর্তী "বৃহৎ বটবৃক্ষের" পরিচিতি বর্ণনা লেখক এখানে দিয়েছেন—"....যাহার সুশীতল ছায়াতে পথিকগণ স্বল্পকাল বিশ্রাম করে ও রাখালেরা গ্রাম্যপশুদিগকে চরানি দিয়া পরস্পর আমোদ-প্রমোদ করে, আর এই সুদৃশ্য পাদপের বিপুল শাখাতে নানা প্রকার পক্ষিগণ বাস করে।"[৯৬]

দেখা যাচ্ছে গ্রামের কোনো নিসর্গ সংস্থানই পল্লীর নরনারীর জীবনপ্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। এমনকি ঝড়, বৃষ্টি-বজ্রপাতের দৃশ্যও এ আখ্যানে পল্লবাসী মানুষের জীবনের সঙ্গে সংপৃক্ত। ১১ অধ্যায়ে ব্রাহ্মণে নিধিরাম সপ্তগ্রামে যাওয়ার পথে যে প্রবল ঝড় ও তুমুল বৃষ্টিপাতের সম্মুখীন হয়েছিল সে বর্ণনা লেখক যথেষ্ট আকর্ষণীয় ও বিশ্বাসযোগ্য রূপে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছেন— "নিধিরাম মনে করিয়াছিলেন যে ঐ ক্ষেত্রপার হইয়া নিকটস্থ পল্লীতে রাত্রিযাপন করিবেন। কিন্তু মাঠে প্রবেশ করিবামাত্র চারিদিকে অবলোকন করিয়া দেখিলেন,

৯৫. ঐ। ১ অধ্যায় পৃষ্ঠা ৭৭।
৯৬. ঐ। ৮ অধ্যায় পৃষ্ঠা ১০৬।

আকাশ মণ্ডল মেঘেতে আচ্ছাদিত হইয়াছে ও অতি প্রচণ্ড বায়ু সাতিশয় বেগে বহিতেছে এবং চঞ্চলা সৌদামিনী জলধর মধ্যে ক্রীড়া করিতেছে এবং স্থানে[১] বজ্রপাত ও হইতেছে। অতএব ঐ বক্ষন্দন উর্দ্ধশ্বাসে ক্ষেত্রমধ্যদিয়া দৌড়িতে লাগিলেন।"[৯৭] ইতিমধ্যে সেখানে বৃষ্টি ভেজা রাখালেরাও সমাগত হয়েছে। তাদের সঙ্গে নিধিরাম দীর্ঘ সময় কাটায় নানা গল্পে। এই বৃষ্টিপাতের চিত্র যেমন সুঅঙ্কিত তেমনি "....বৃষ্টি নিবৃত্তি হইলে, অস্তগতোদ্যত রবির কিরণদ্বারা শস্য ক্ষেত্র হাস্য করিতে লাগল। দূরস্থ বৃক্ষগণের উচ্চতম পল্লবাদি স্বর্ণপ্রায় সুদৃশ্য হইল। আর পক্ষী ও পক্ষীগণ স্বীয়[১] শারকদিগকে সঙ্গে লইয়া উপস্থিত প্রায় যামিনী যাপন নিমিত্ত ঐ বট বিটপীর চারিদিকে কোলাহল করিতেছিল,"[৯৮] নিসর্গ চিত্র ও সৌন্দর্য-মাধুর্যের স্পর্শযুক্ত হয়েছে।

চন্দ্রমুখীর উপাখ্যানে প্রতিফলিত তৎকালীন বাংলার পল্লীসমাজের বিশ্লেষাত্মক আলোচনাটি কয়েকটি বিষয় অবলম্বনে পৃথক পৃথকভাবে করা যায়। যেমন—
প্রথমত ঃ বঙ্গপল্লীর নিজস্ব সাধারণ দৃশ্যরূপ,

দ্বিতীয়ত ঃ পল্লীবাংলার সমাজ জীবনের বিবরণ, বঙ্গপল্লীর নানা সংস্কার রীতি নীতি প্রথাব বিবরণ। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত পল্লী নরনারীর সামাজিক শাসনের চিত্র।

তৃতীয়ত ঃ পল্লীবাংলার নরনারীর পরিচয়.

চতুর্থত ঃ উনবিংশ শতকের পল্লীবাংলায় কলকাতা কেন্দ্রিক আধুনিক চেতনা বিকাশের ও ইংরেজ প্রবর্তিত যন্ত্রসভ্যতা প্রবেশের কিছু প্রভাব।

অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধ থেকে বাংলা দেশে কৃষিভিত্তিক বাংলাদেশ ক্রমশ তাদের নবসৃষ্ট নগর সংস্কৃতি অভিমুখী হতে শুরু করে। বাঙালীর নব সংস্কৃতির পীঠস্থান হয় ইংরেজের নতুন বাণিজ্য নগরী কলকাতা। বাঙালীর জীবনাচরণেও বিপুল পরিবর্তনের ঢেউ! প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ধ্যানধারণা, সমাজ বিন্যাস, সামাজিক রীতিনীতি, সংস্কারগুলি ইংরেজী-শিক্ষিত নগর কেন্দ্রিক বাঙালী জীবনে প্রবল প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে দূরে সরে যেতে থাকে। নবীন ও প্রাচীন ধ্যান-ধারণার দ্বন্দ্ব বিক্ষোভ, সামাজিক আলোড়ন থেকে সৃষ্টি হয় নতুন বাঙালী সমাজের। উনবিংশ শতকের নগর কলকাতার এই বিপুল পরিবর্তন বা নব রূপান্তর সমগ্র বাংলাদেশে একই সঙ্গে ঘটেনি। বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলে নব চেতনা ঢেউ আছড়ে পড়তে বিলম্ব হয়েছে। ঢেউ পৌঁছলেও গ্রামজীবনে দ্রুত পরিবর্তন সম্ভবপর হয়নি। কলকাতা কেন্দ্রিক নতুন কালের দৃষ্টিভঙ্গি, নাগরিক চাকচিক্য, অভিনবতম, পল্লী বাংলার আদি অকৃত্রিম শান্তরূপকে বিশেষ টলাতে

৯৭. ঐ। ১২ অধ্যায় পৃ. ১২৩।
৯৮. ঐ। ৩ অধ্যায়, পৃ. ৮২।

পারেনি। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সমাজ বিন্যাস, ধ্যান-ধারণা, সংস্কার ও রীতিনীতির অনড় কাঠামো গ্রাম বাংলায় ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধেও বজায় ছিল।

আর এই সব পুরোনো ও গতানুগতিক ভাবধারায় বিশ্বাসী বিপুল সংখ্যক নরনারীর জীবনধারা শহর থেকে অনেক দূরে বাংলাদেশের নিভৃত গভীরের পল্লীগুলিতে প্রবাহিত হয়ে যেত নিজস্ব বিশ্বাসে।

পল্লীবাংলার সেই চিরায়ত শান্তস্নিগ্ধ বর্হিদৃশ্য, গতানুগতিক সমাজভাবনা ও পুরোনো পন্থী মানুষজনের যথা সম্ভব প্রামাণ্য চিত্র লালবিহারী দে এঁকেছেন তাঁর এই গ্রন্থে।

নাগরিক কোলাহল থেকে দূরে কান্না নদীতীরবর্তী চন্দ্রপুর নামে এক গ্রামের বিশদ বর্ণনা দিয়ে "চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান" শুরু হয়েছে। আখ্যানের নায়িকা চন্দ্রমুখীর পিত্রালয় এই চন্দ্রপুর গ্রাম। "চন্দ্রপুরে"র নদী পুষ্করিণী, শস্য ক্ষেত, বাগান ইত্যাদির বর্ণনার সঙ্গে লেখক যুক্ত করেছেন গ্রাম বাংলার অন্যতম বৈশিষ্ট্য তার ধর্মস্থানের বিবরণ। "গ্রামে কতকগুলি ইষ্টক নির্মিত মন্দির আছে যাহাতে শিব, কালী, বিশালাক্ষ্মী প্রভৃতি দেব-দেবীর প্রতিমা বহুকালবধি স্থাপিত আছে"[৯৯] এছাড়া রাঢ় বাংলার প্রচলিত লৌকিক দেবতা ধর্মঠাকুরের উল্লেখও আছে।

গ্রামের সচ্ছল গৃহস্থ, দরিদ্র ব্রাহ্মণ পুরোহিত কিংবা জেলে ও কৃষকের আর্থিক অবস্থার পার্থক্য তাদের গৃহ চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। চন্দ্রমুখীর পিতা মুলুকচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৃহ-দৃশ্য বর্ণনায় বিগত শতকের পল্লীবাংলার সচ্ছল ভদ্র পরিবারের গৃহ কুটীরের চিত্র উদ্ভাসিত হয়েছে।[১০০] মুলুকচাঁদের পুরোহিত ব্রাহ্মণের মৃত্তিকা নির্মিত বেড়ায় অপরাজিতা লতা দেওয়া গৃহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ও গ্রামবাংলার সনাতন দৃশ্যচিত্র।

পল্লীসমাজ তার খুঁটিনাটি বিবরণ নিয়ে এ আখ্যানে উপস্থিত হয়েছে। ঊনবিংশ শতকের বঙ্গপল্লী বর্ণ বা শ্রেণী অনুযায়ী বিন্যস্ত ছিল। গ্রাম সমাজে ব্রাহ্মণের স্থান ছিল সর্বোচ্চ। কায়স্থ, বৈদ্য, নবশাখ সম্প্রাদয়, চাষী জেলে কামার কুমোর অধ্যুষিত গ্রাম যেমন ছিল. তেমনি শুধু ব্রাহ্মণ অধ্যুসিত বর্ণহিন্দুর গ্রাম বা নিম্নবর্গের মালা, তেওরদের নিয়েও গ্রাম গঠিত হ'ত। এসব তথ্যে এ আখ্যান গ্রন্থ পূর্ণ।

চন্দ্রমুখীর উপাখ্যানে চন্দ্রপুর গ্রাম সম্বন্ধে বলা হয়েছে— "ঐ পল্লীতে অনেক ভদ্র কায়স্থ ও বৈদ্য এবং নবশাক বাস করেন।"[১০১] আবার মুলুকচাঁদের ব্রাহ্মণ পুরোহিতের বেলপুকরি গ্রামের "অধিকাংশ লোক ব্রাহ্মণ, ইহাকে গুরু পুরোহিতের

৯৯. ঐ। ১১ অধ্যায়, পৃ. ১২০।
১০০. ঐ। ১১ অধ্যায় পৃ. ১২০।
১০১. ঐ। ১২ অধ্যায়, পৃ. ১২৩।

গ্রাম বলিলেই হয়,"[১০২] লেখক এ আখ্যানের অন্যতম চরিত্র রাধুনী ব্রাহ্মণ নিধিরামের সঙ্গে জনৈক জেলের কথপোকথনে নিম্নবর্ণ অধ্যুসিত পল্লীর উল্লেখ করেছেন—"কী। এখানে তো কেবল জেলে, মালা আর তোমার গে তেওরের বসতি, এর সাজে বামুন কায়েত কই।....এই আম বাগানটা দেখিতে পাচ্ছেন, ওর ওপাশে বামুন পাড়া।"[১০৩]

প্রখ্যাত সমালোচক মন্তব্য করেছেন "চন্দ্রমুখীর উপাখ্যানে"র ".....প্রধান অংশ পল্লীজীবনের বিচিত্র আচার আচরণের বিবরণ"[১০৪]। তিনি আরও বলেছেন—"কিন্তু জাতকর্ম থেকে প্রেতকর্ম অন্নপ্রাশন বাল্য শিক্ষা বিবাহ দ্বিরাগমন অন্তর্জলি যাত্রা পর্যন্ত সবটাই প্রায় ধরা পড়েছে সরল নক্শা ধর্মী বিবরণে।"[১০৫]

পল্লীবাংলার এক "সুকুলীন" মুলকচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একমাত্র কন্যা চন্দ্রমুখীর জন্ম থেকে বিবাহ পর্যন্ত বিস্তৃত বর্ণনা ও পরবর্তীতে অসুখী দাম্পত্যজীবনের পরিণামও উল্লেখ করা হয়েছে এই আখ্যানগ্রন্থে। এই উপলক্ষে বর্ণিত হয়েছে গ্রামজীবনের পালনীয় বিচিত্র আচার সংস্কার রীতিনীতি ইত্যাদি ব্যাপাবগুলি।

"চন্দ্রমুখী" জন্মালে তার পিতা ঘটা করে ছয়দিনের সূতিকা পূজা, আটদিনে 'আটকৌড়িয়া', তেরদিনে ষষ্ঠীপূজা. ছয়মাসে অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠান করেছেন। সেকালের এসব অবশ্য পালনীয় অনুষ্ঠানগুলির দেশজ খুঁটিনাটির আনুপূর্বিক বর্ণনা এ গ্রন্থে আছে। যেমন "আটকৌড়িয়ার বর্ণনা ঃ "অষ্টম অতি প্রত্যুষে প্রাচীন শীঘ্র শয্যা ত্যাগ করত পুত্রের শয়নাগারের দ্বারে আঘাত করিয়া বলিলেন, মুলুকচাঁদ ও বাবা এখনও উঠ নাই, শীঘ্র উঠ, আজি মেয়ের আটকৌড়িয়া হইবে,......এত খৈ ভাজিতে হইবে, তাকে বাচতে হবে, এত কাহন কড়ী চাই আর তার মধ্যে যদি কানা কড়ী থাকে তবে সে সব বেচে ফেলিতে হইবে।....একশত তঙ্কার সামগ্রী অর্থাৎ আটভাজা, কড়ী ও মিষ্টান্ন ইত্যাদি প্রস্তুত হইল। সূর্য্যাস্তের অনেক পূর্বে আমন্ত্রিত জন সকল কোলাহল করত একত্র হইতে লাগিল"।[১০৬]

চন্দ্রমুখীর "অন্নপ্রাশনে"র বিবরণে[১০৭] জানা যায় গ্রামের সকল ব্রাহ্মণে, শূদ্র ও নবশাখকে নিমন্ত্রণ "করার জন্য" প্রায় ছয় মোন চাউল সিদ্ধ হইল ও তদনুযায়িক ব্যঞ্জন, দধি, পায়স এবং মিষ্টান্ন প্রস্তুত করা হয়। "আনন্দবৃদ্ধি হেতু"

১০২. ঐ। ১ অধ্যায়, পৃ. ৭৮।
১০৩. ঐ।
১০৪. ঐ।
১০৫. ঐ। পৃ. ৮২
১০৬. ঐ। ১২ অধ্যায় পৃ. ১২৪।
১০৭. ড. ক্ষেত্র গুপ্ত, বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৪৭।

বাজনার আয়োজন হয়। সে সময়ের গৃহের উৎসবে পল্লীগ্রামের মানুষ মুলুকচাঁদ "দ্বাদশ ঢোল, ছয়টা ঘোড়খাই, চারিখানা কাঁসি, চারি সম্প্রদায় জগঝম্প, ও দুই জোড়া সানাই" এর ব্যবস্থা করেছিলেন। এই অন্নপ্রাশন উপলক্ষে গৃহের রীতি অনুযায়ী গ্রামের ধর্মঠাকুর "দক্ষিণ রায়ের" পূজা দেওয়ার ও সেই পূজায় নৈবেদ্য ধূপ ধুনা বাদ্য ইত্যাদির সঙ্গে বলিদানের ছাগের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। অন্নপ্রাশনের ধর্মীয় অনুষ্ঠান ছাড়াও নিমন্ত্রিত গ্রামবাসীর ভোজনের বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। দেশাচার অনুযায়ী প্রথমে ব্রাহ্মণভোজন, পরে, ঐ "উচ্ছিষ্ট" পত্রে "শূদ্রদের ভোজনের উল্লেখ লেখক করেছেন। সবশেষে গ্রামবাসী নারীদের আগমন ও অন্তঃপুরে তাদের ভোজন।

চন্দ্রমুখীর বিবাহ সম্পর্কিত বর্ণনায় পাওয়া যায় তৎকালীন বিবাহ সম্বন্ধকারী বৃদ্ধ ঘটকের কার্যকারিতার বিবরণ ঘটক মারফৎ পাত্রপাত্রী পক্ষের পারস্পরিক কথার্বাতা ও মিষ্টান্ন প্রদানের চিত্র। বিবাহের বাগদান, গুরুমহাশয়কে দিয়ে "দূরস্থ কুটুম্ব"দের কাছে পত্র লেখানো, নানা রকম বাজনা, রায়ের পোষাক পরিচ্ছদ, "মুকুট পদ্দুকা-আর রৌপ্যমণ্ডিত কাষ্ঠ নির্মিত এক চতুদ্দোলা প্রস্তুত" হওয়ার ও বরের বিবাহযাত্রার পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষ বিবরণে লেখক সেই যুগটিকে জীবন্ত করে তুলেছেন।[১০৮]

সপ্তগ্রাম থেকে চন্দ্রপুর পদব্রজে ছিল তিন দিনের পথ। সেই দূরত্ব অতিক্রমের জন্য বিবাহের চারদিন আগেই যাত্রা করেছিল বরপক্ষ। বরের সঙ্গে বরযাত্রীদের সঙ্গে গুরু, পুরোহিত ভৃত্য ও নাপিত ছিল। বরের "চর্তুদ্দোলায়" যাত্রার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। চন্দ্রমুখীর কনে সজ্জার বিবরণটিও লেখক বিস্তারিত দিয়েছেন ঃ..."পরে বিবাহের শুভদিন উপস্থিত হইলে চন্দ্রমুখীর সমবয়স্কা বালিকাগণ আসিয়া তাহার বেশভূষা করিয়া দিতে নিযুক্তা হইল। হরিদ্রাতে দধি মিশ্রিত করত তাহার গাত্র মার্জ্জন করিয়া দিলেন ও কেশ বিনাইয়া এক অপূর্ব খোঁপা বান্ধিলেন। নাপিত পত্নী তাহার পদদ্বয়ে অলক্ত, অর্থাৎ আলতা লেপন করিলেন; এবং তিনি উত্তম রক্তবর্ণ পটাম্বর পরিধান করত ও স্বর্ণ রৌপ্য আভরণে বিভূষিতা হত শশধর সৃদশ সুদৃশ্য হইলেন।"[১০৯]

বিবাহের পর বাসর ঘরের বিবরণে তৎকালীন পল্লীবাসিনী বালিকা নারীদের প্রগল্ভ রূপ, রঙ্গের চিত্রটি এখানে যথাযথ চিত্রিত হয়েছে। বাসরে নারীদের রাত্রিজাগরণ, নব জামাতাকে নিয়ে পল্লীর রমনীদের রস-রসিকতা, বাসরে গান গাওয়ার বিবরণের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের "ইন্দিরা" কাহিনীর ইন্দিরার পিতৃগৃহে

১০৮. ঐ। পৃ. ১৪৮।
১০৯. ড. দেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত "চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান"—ঐ ২ অধ্যায়ে পৃ. ৮০।

প্রত্যাবর্তন ও স্বামীর সঙ্গে পুর্ণমিলনের পর ইন্দিরার স্বামীকে ঘিরে গ্রামেব রসিকা নারীদের আমোদ উৎসবের দৃশ্যের বহুলাংশে মিল আছে।[১১০]

উনবিংশ শতকের পল্লীবাসী বাঙালী জন্ম থেকে বিবাহ ব্যাপারে যেমন সামাজিক প্রথাগুলিকে ধর্মীয় সংস্কারে পরিণত করেছিল, মৃত্যুপথে যাত্রাকালে ও সমাজধর্মের সেই গতিই তারা অনুসরণ করেছে। অন্তর্জলি ছিল তৎকালীন বর্ণহিন্দু সমাজের অবশ্য পালীনয ধর্মীয় প্রথা। এই অন্তর্জলির একাধিক বর্ণনা সমাকালীন সংবাদ পত্রে বিবৃত আছে, যা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। লেখক লালবিহারী দে "চন্দ্রমুখীর উপাখ্যানে" হেমচন্দ্রের পিতামহীর অন্তর্জলির বিবরণ মারফৎ সে যুগের পল্লীসমাজে প্রচলিত এই ধর্মীয় সংস্কারকে বিশদভাবে উপস্থিত করেছেন—

"....স্থবিরা প্রায় একমাস নদীতীরে বাস করিলেন,....এক ঘোরান্ধকার রজনীতে অতিশয় ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হইল ও বিদ্যুৎপাত হইতে লাগিল, এমন সময় কবিরাজ কহিল বোধ হয় সূর্যোদয়ের পূর্বেই এর গঙ্গা লাভ হইবে। অবিলম্বেই বৃদ্ধার অন্তর্জলির বিধান স্থির হইল। নিধিরাম ও আর এক জন ব্রাহ্মণ "গঙ্গানারায়ণ ব্রহ্ম" বলিতে ঐ বৃদ্ধার খট্টা গঙ্গাব গর্ভে লইয়া যাওয়াতে ভাবত তাঁহাকে ক্রোড়ে করিযা বসিলেন, তাহাতে তাঁহার বক্ষস্থল অবধি মস্তক পর্যন্ত মুখোপাধ্যায়েব ক্রোড়ে থাকিল নিম্নভাগ জলে নিমগ্ন রহিল। রাধা সলিল মধ্যে বসিয়া মাতার পদদ্বয়ের বৃদ্ধাঙ্গলীদ্বয় টিপিয়া থাকিলেন ও ভারত তাঁহার কর্ণকুহরে বাবম্বার "গঙ্গানারাযণ ব্রহ্ম" বলিতে লাগিলেন।[১১১]

মৃত্যুর পর মৃতেব পারলৌকিক ক্রিয়াদিতেও পল্লী বাংলার সাধারণ মানুষ সমাজের কাছে দায়বদ্ধ ছিল। সে সময়ে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে যথাসাধ্য দীন-দুঃখী ও ব্রাহ্মণে ভোজন করানো এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদেব সম্মান বা পারিতৌষিক প্রদান ও সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থের অবশ্য পালনীয় সমাজ ধর্ম বিবেচিত হ'ত। এই সামাজিক চেতনার পরিচয় আছে হেমচন্দ্রের পিতামহীর শ্রাদ্ধানুষ্ঠানেব বিবরণে।[১১২]

উনবিংশ শতকে বাংলাদেশে কলকাতাকে কেন্দ্র করে ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন হয়েছে। আধুনিক ধরনের শিক্ষাপদ্ধতির সূত্রপাত ঘটেছে। নগর কলকাতা ও তার নিকটবর্তী মফঃস্বলে ও উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। কিন্তু সুদূর গ্রামাঞ্চলে তখনও পুরানো শিক্ষা পদ্ধতিই প্রচলিত ছিল। "চন্দ্রমুখীব উপাখ্যানে"র ৫ অধ্যায়ে পল্লী বাংলার সেই সাবেকী শিক্ষা ব্যবস্থা একজন গুরুমশায় নির্ভর পাঠশালাব আনুপূর্বিক বিবরণ রয়েছে। চন্দ্রমুখীর পিতা

১১০. ঐ; ৪ অধ্যায়ে পৃ. ৮৫-৮৯।
১১১. ঐ। ৭ অধ্যায়
১১২. ঐ। ৭ অধ্যায়।

মুলুকচাঁদ নিজের চণ্ডীমণ্ডপে একটি "বাঙ্গালা পাঠশালা" বসিয়ে ছিলেন। গুরুমশায়ের জ্ঞান-বিদ্যা অনুযায়ী সেখানে কিছু অঙ্ক, বাংলা ও কিঞ্চিৎ ব্যাকরণের পাঠ মাত্র দেওয়া হত। এই সব গ্রাম্য বিদ্যালয়ের পাঠচর্চার আবশ্যকীয় অঙ্গ ছিল ছাত্রদের ওপর বিচিত্র ধরনের শাস্তি। ছাত্রেরা গুরুমশায়ের প্রহারের ভয়ে সর্বদা তটস্থ থাকতো, প্রহারে থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য ছাত্ররা যে "স্বীয়" গৃহ হইতে তাম্রকুট, গুবাক ও পয়সা ইত্যাদি" গুরুকে এনে দিত; সে বিষয়ে ঈষৎ কটাক্ষ করতে লেখক ছাড়েননি। সেই সময়ের শাস্তি হিসেবে প্রবল বেত্রাঘাত ছাড়াও, ছিল "...নাড়ু গোপাল, একপদে দাঁড় করান, অন্তর্টিপুনী, চপেটাঘাত এবং তর্জ্জন গর্জ্জন" তিরস্কার ছাড়াও ছিল কখনো কখনো ফলের মধ্যে পিঁপড়ে বা বিছুটি ভরে তার মধ্যে পড়ুয়াকে ঢুকিয়ে রাখবার মত অমানবিক শাস্তি সমূহ। এছাড়া লাল বিহারী "হাতছড়ি" নামের একটি অভিনব শাস্তির উল্লেখও করেছেন। এই অধ্যায়ে সে কালের পল্লীসমাজের এই চিত্রের সঙ্গে সাধারণ পল্লীসমাজের শিক্ষা-বিষয়ক ধারণাটি ব্যক্ত করেছেন লেখক। পল্লীর শিক্ষা ব্যবস্থা মুখ্যতঃ বালকদের জন্যই ছিল, স্ত্রী শিক্ষার চেতনা সমাজে তখনও প্রশংসিত ছিল না। চন্দ্রমুখীকে লেখাপড়া শেখাবার কথায় মুলুকচাঁদের স্ত্রী ও মাতার বক্তব্য থেকে সে সত্য ধরা পড়ে। নিতাই দাস অর্থাৎ গুরুমশায় ও চন্দ্রমুখীর পিতার ".......কথোপকথন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভার্য্যা শ্রবণ করত আপন স্বশ্রূকে বলিলেন—ঠাক্রুণ গো, তোমার বেটা আমার মেয়েটিকে অল্প বয়সে বিধবা করিবার চেষ্টায় আছে, ঐ দেখ সরকারকে কি বলছে! শুনতে পাওনা, চন্দ্রমুখীকে লেখাপড়া শিখাইবার পরামর্শ হইতেছে। ঐ দেখ নিতাই দাস সরকার বসিয়া রহিয়াছে।"

তাহাতে স্থবিরা আপন পুত্রকে কহিলেন—ভাল মুলুক একে তোর একটি মেয়ে, তাকে তুই রাঁড় করিতে চাস, লেখাপড়া শিখে কোন মেয়ে ভাগ্যবতী হয়েছে? না, এমন কর্ম করো না। তোমার বৌদিগকে ভাল শিখাও। চন্দ্রকাল অবধি আর পাঠশালে যাসনে।"[১১৩]

"চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান" গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার সরল গতানুগতিক কাহিনী অবলম্বনে লেখা। অতএব পল্লীবাংলার সাধারণ নরনারীর উপস্থিতি এ আখ্যানে আশা করা যায়। স্বাভাবিক রূপ নিয়েই পল্লীবাসী নরনারী এ গ্রন্থে উপস্থিত হয়েছে। এ আখ্যানের নরনারীগুলিকে প্রাথমিকভাবে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—

ক) পল্লীবাসী উচ্চবর্ণের মানুষ

খ) নিম্নবর্ণের সাধারণ পল্লীবাসী

১১৩. বঙ্কিম রচনাবলী / ১ম খণ্ড / সমগ্র উপন্যাস, সাহিত্য সংসদ ইন্দিরা / এক বিংশতি তম পরিচ্ছেদ / 'সেকালে যেমন ছিল' অংশে দ্রষ্টব্য।

তবে এই শ্রেণীবিভাগ ও খুব সূক্ষ্ম নয়। কেননা উচ্চ বা নিম্ন দুই বর্ণের পল্লীবাসী নরনারীর কারো কারো চরিত্রে উনবিংশ শতকের নব প্রগতিবাদী চেতনা ও খ্রীষ্টধর্মচেতনার প্রভাব কিছু পড়েছে। সে প্রসঙ্গের আলোচনা পরবর্তী পর্যায়ে করা হবে।

পল্লীবাসী উচ্চ বর্ণের মানুষ

এই তালিকায় আছে মুলুকচাঁদ মুখোপাধ্যায়, তার মাতা, স্ত্রী-কন্যা ও পুত্রেরা, তার গুরুপুরোহিত, পাঠশালার "গুরুমশাই", বৃদ্ধ ঘটক ব্রাহ্মণ, জামাতা হেমচন্দ্র, হেমচন্দ্রের পিতা ভারতচন্দ্র, ভাতরচন্দ্রের বৃদ্ধা মাতা, ভগ্নী, স্ত্রী, এছাড়া হেমচন্দ্রের সঙ্গী ব্রাহ্মণ পাচক নিধিবাম, হেমচন্দ্রের বিবাহযাত্রী আত্মীয় স্বজন, গুরুপুবোহিত, মুমূর্ষু মায়ের অন্তর্জলির সঙ্গীগণ। এছাড়াও আছে আটকৌড়ে, অন্নপ্রাশন, বিবাহ ইত্যাদি ক্রিয়া কর্মে উপস্থিত ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য ভদ্রজন, বালকের দল, বিবাহবাসরের রসিকা নারীরা। নিধিরামের রাত্রাপথে দেখা হওয়া এক সন্ন্যাসীর প্রসঙ্গও এখানে উল্লেখ করা যায়।

মুলুকচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়

চন্দ্রমুখীর পিতা মুলুকচাঁদ উনিশ শতকের পল্লীবাংলার সামন্ততান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ ব্যবস্থার প্রতিনিধি। তিনি কুলীন ব্রাহ্মণ, সুখী ও স্বচ্ছল গৃহস্থ। মধ্যযুগীয় বাংলার সমাজধর্ম অনুযায়ী চালিত। ইংরেজ আগমনে এদেশে একশ্রেণীর নতুন চাকুরীজীবী বাঙালীর উদ্ভব হয়েছিল, মুলুকচাঁদ তাদের অন্তর্ভুক্ত নন। তিনি নিজ "ভূস্যাদির দ্বারাই প্রতিপালিত।"[১১৬] পুরোন পল্লীসমাজের সাধারণ গৃহস্থের মত তাঁর গৃহজীবন স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, বৃদ্ধা মাতা ও জ্ঞাতি কুটুম্বযুক্ত। সাবেকী সমাজ ধর্মের অনুসরণেই নবজাত কন্যার আটকৌড়ে, ষষ্ঠীপূজা, অন্নপ্রাশন ও পরে বিবাহ ইত্যাদি সম্পাদন করেছেন। বৃদ্ধামাতার আজ্ঞানুবর্তী, ব্রাহ্মণ গুরুপুরোহিতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এই প্রায় মধ্যযুগীয় বাঙালী ব্যক্তিটির স্বভাবে লেখক কিছু আধুনিক চেতনা সঞ্চারিত করেছেন— প্রথমত ঃ কন্যা সন্তানের প্রতি অপত্যস্নেহ। কুলীন কন্যাকে প্রাত্রস্থ করার চরম দুর্ভোগ সেযুগে পিতাকে বহন করতে হত। তাই কন্যা সন্তানের প্রতি কুলীন সমাজের মানুষ হয়েও মুলুকচাঁদের অপত্য স্নেহের আন্তরিক প্রকাশ লক্ষণীয়। দ্বিতীয়ত ঃ স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে পুরনো সংস্কারাচ্ছন্ন মানসিকতার পরিবর্তে মুলুকচাঁদ আধুনিক মতের সমর্থক। তিনি কন্যা চন্দ্রমুখীকে স্ত্রী ও মায়ের প্রতিকুলতা সত্ত্বেও পাঠশালায় যেতে সাগ্রহে অনুমতি দিয়েছেন।।

১১৬. ঐ। ৫ অধ্যায় পৃ. ৯১

মুলুকচাঁদের কুলপুরোহিত কীর্তিবাস ভট্টাচার্য্য

মধ্যযুগীয় বাংলার গ্রাম সমাজের ব্রাহ্মণ অধ্যাপকের ক্ষীয়মান ধারার প্রতিনিধি। তিনি স্বগৃহে ছাত্র প্রতিপালন করে তাদের বিদ্যাদান করেন এবং যজন যাজনে জীবিকা নির্বাহ করেন। এই ব্যক্তির যজমানের গৃহে পূজা পার্বণের খবরে খুশী হওয়া কিংবা যজমানের গৃহে আহারের আয়োজন সম্পর্কে নিশ্চিন্ততা— সে কালের পল্লীবাংলার গ্রাম্য পুরোহিতের স্বভাব চরিত্রকে স্পষ্ট প্রকাশ করেছে।

এ আখ্যানের ঘটক ব্রাহ্মণ ও তৎকালীন গ্রামবাংলার পরিচিত ও গতানুগতিক চরিত্র। পুত্র ও কন্যার বিবাহে উভয় কর্তৃপক্ষই সেকালে এই ধরনের ঘটকের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতেন। তালপাতার ছাতা মাথায় ঘটক ব্রাহ্মণের চিত্রটি গত শতকের পল্লীজীবনের আস্বাদ এনে দেয়।

মুলুকচাঁদের বৈবাহিক ভারতচন্দ্র পুরোনোকালের বাঙালী। ধরাবাঁধা সমাজ কাঠামোর অনুবর্তনে মুমূর্ষু মায়ের গঙ্গাতীরে অন্তর্জলির ব্যবস্থা করেছেন। পুত্রের খ্রীষ্টান-ধর্মাবলম্বী হওয়ার সংবাদ সহ্য করতে না পেরে মুর্চ্ছিত হয়ে পড়েন।

নিধিরাম ভট্টাচার্য্য

ঊনবিংশ শতাব্দীর পল্লী বাংলায় নিধিরাম ভট্টাচার্য্যের মত দরিদ্র ব্রাহ্মণ সহজেই চোখে পড়ত। সে হেমচন্দ্রের পিতার কমলচারী। কিন্তু তাকে হেমচন্দ্র খুড়া সম্বোধন করে। প্রয়োজনে প্রভু পুত্রের পথযাত্রার সঙ্গী এবং পাচক। দরিদ্র হলেও ব্রাহ্মণত্বের মর্যাদাবোধ এইসব মানুষের ছিল। পথে ধীবরের সঙ্গে কথোপকথনে সে বর্ণ হিন্দুর গৃহ অনুসন্ধান করেছে রাত্রিবাসের জন্য।

এ আখ্যানের ভদ্রস্তরের পল্লী রমণীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মুলুকচাঁদের স্ত্রী ও মা। এই দুই নারী সম্পূর্ণভাবেই গত শতকের গ্রাম বাংলার আচার আচরণ ও জীবন সংস্কার সংযুক্ত। ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলার পল্লীসমাজে নরনারীর জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় চেতনার প্রাধান্য ছিল। বিশেষত নারী সমাজই এই সংস্কারাচ্ছন্নতা ও পুরোনো ধ্যান ধারণার প্রধানত গতানুগতিক কাঠামোকে আঁকড়ে ধরেছিল। মুলুকচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মা সুতিকা পূজা আটকৌড়ে ইত্যাদি সামাজিক ক্রিয়াকর্মের আনুপূর্বিক বর্ণনা দিয়েছেন।[১১৫] পুত্রের শুভকাজে যাত্রাকালে টিকটিকি ডেকে উঠলে যাত্রা স্থগিত রাখতে আদেশ দিয়েছেন—'মাতা কহিলেন, না বাবা, আমার মাথা খাও এবেলা সেখানে যেও না কি জানি, যদি কোন অমঙ্গল ঘটে, একটা কথা আছে, "হাঁচি টিকটিকী বাধা, যে

১১৪. ড. দেবীপ্রসাদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান' ১৪ অধ্যায়, পৃ. ১৩৭-১৩৮।

১১৫. ঐ। ১৫ অধ্যায় পৃ. ১৩৯-১৪০।

না মানে সে ধেড় গাধা।"[১১৬] মুলুকচাঁদের স্ত্রী ও মার কথোপকথনে স্ত্রীশিক্ষার প্রতি উনিশ শতকের সাধারণ গ্রাম্য নারীসমাজের একান্ত বিরূপ মানসিকতাটি সুস্পষ্ট।[১১৭]

চন্দ্রমুখী এ আখ্যানের মুখ্য চরিত্র। সে ঊনবিংশ শতকের পল্লীবাংলার উচ্চবর্ণের হিন্দু পরিবারের কন্যা ও বধূ। কিঞ্চিৎ বিদ্যা শিক্ষা করলেও গত শতকের সাধারণ পল্লীকন্যার গতানুগতিক জীবনধারারই অনুসারী। সামাজিক রীতি অনুযায়ী জন্মানোর পর থেকেই সূতিকা পূজা, আটকৌড়ে অন্নপ্রাশন ইত্যাদি অনুষ্ঠান তাকে ঘিরে হয়েছে। দেশাচার অনুযায়ী মাত্র দশ বৎসর বয়সেই ঘটকের মাধ্যমে হেমচন্দ্রের সঙ্গে তার বিবাহ। সে যুগের আর পাঁচটি পল্লীকন্যার মত পল্লীর সমাজনিয়মের দ্বারাই তার জীবন চালিত। বাংলার গ্রামে সদ্য প্রবেশ করা রেলগাড়ির শব্দ, গতি ও দৃশ্য দেখে চন্দ্রমুখীর বিস্ময় ও চমক সে যুগের পল্লী বালিকার যথার্থ অভিব্যক্তি। এই চন্দ্রমুখী উনিশ শতকের পল্লীবাংলার সাধারণ নারীদের প্রতিচ্ছবি।

স্বামীর অবহেলা ও অবজ্ঞা সত্ত্বেও সে যুগের পতিব্রতা নারীদের মতই চন্দ্রমুখী সহ্যশীলা, তার হয়ত কিছু বিদ্যালাভের ফলে সে স্বামীকে সৎবুদ্ধি দিতে চেষ্টা করেছিল। সে যুগের অজস্র কুলীন কন্যাদের মত চন্দ্রমুখীকেও স্বামীর অধঃপতনের জন্য শেষ পর্যন্ত পিত্রালয়েই ফিরে যেতে হয়েছে। যদিও কৌলীন্য প্রথার অভিশাপ নয়, তৎকালীন কলকাতার বাবুকালচারের উচ্ছৃঙ্খলতায় যুক্ত হয়ে হেমচন্দ্রের চারিত্রিক অধঃপতনের ফলেই চন্দ্রমুখী জীবন বিপর্যস্ত হয়েছে।

ঊনবিংশ শতকের বাংলাদেশের পল্লীসমাজের অন্তর্ভুক্ত নিম্নবিত্ত অন্ত্যজ শ্রেণীর অজস্র নরনারীর সাক্ষাৎ এ আখ্যানে পাওয়া গেছে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—মুলুকচাঁদের গৃহের ভৃত্যে, দাসী, ভৃত্যকন্যা, কুল পুরোহিতের ভৃত্য, ঘটক ব্রাহ্মণকে পথনির্দেশক কৃষক ও তার পুত্র, হেমচন্দ্রের পাল্কী বাহকের দল, গ্রামের রাখালের দল, ধীবর হেমচন্দ্রের সঙ্গে আলাপচারী এক কৃষক ও তার স্ত্রীপুত্র ইত্যাদি।

তৃতীয় অধ্যায়ের কুলপুরোহিতের অমার্জিত কথা ও আচরণযুক্ত অভাব গ্রাম্যভৃত্য যেমন আছে, তেমনি মুলুকচাঁদের দাস নফরের গ্রাম্য সবলতা ও প্রকাশিত তার কথায়। সাধারণ কৃষকের দূরত্ব জ্ঞানের অভাব, কৃষক পুত্রের দুষ্টামী লেখক ইঙ্গিত করেছেন, ৭ অধ্যায়ের মদ্যাসক্ত শিবিকা বাহকেরা একান্ত সত্য চরিত্র।

১১৬. ঐ। ৫ অধ্যায় পৃ. ৯১
১১৭. ঐ। ৩ অধ্যায়

সে যুগের পল্লীবাংলার গৃহস্থ সংসারে ভৃত্যও দাসীদের আত্মবৎ দেখা হত। কেউ খুড়ী, কেউ দিদি, কেউ দাদা নামে সম্বোধিত হ'ত। সেই রকমই, মুলুকচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক ভৃত্য কন্যার উপস্থিতি আছে ৮ অধ্যায়ে। পল্লীসমাজের সেই মানসিকতা হেমচন্দ্রের প্রতি ভৃত্য কন্যাটির উক্তিতে প্রতিফলিতঃ "ওমা, সে কি রে আমি যে তোমার শালী হই, চন্দ্রপুরে আমার বাপের বাড়ী, আমাব বাপ তোমার শ্বশুড় বাড়িতে কর্ম্ম করে।"[১১৮]

বিগত শতকের বাংলাদেশের সুদূব পল্লীগ্রামের সাধারণ চাষী, জেলে রাখাল ইত্যাদি সাধারণ মানুষগুলির সাধারণ প্রকৃতি ও পরিচয় প্রকাশিত হয়েছে এ আখ্যানে। ১১ অধ্যায়ে একদল বৃষ্টিভেজা শীতার্ত রাখালের উপস্থিতি আছে: এই দীন গ্রামবাসী মানুষগুলি গ্রামেব বিভিন্ন ব্যক্তির গরু চরায়, তাদের মজুরী কিন্তু যৎসামান্য। তাদের নিজেদের কথায়—"কেউ দুই আনা, কেউ চার আনা গরুটো পিচু দেয়, মাসে দু'টাকা ন সিকে হয়। কোন পরব্ সরব হলে ধুতিখানা গামচাখানা পাওয়া যায়।"[১১৯]

এক গ্রাম্য জেলের উপস্থিতি আছে ১২ অধ্যায়ে। এই চরিত্রটির ওপর লেখকের খ্রীষ্টধর্মের আদর্শবাদ কিছু প্রতিফলিত হলেও তাব আকৃতি ও পরিচ্ছদ সম্পূর্ণই সেযুগের পল্লীবাংলার ধীবর শ্রেণী সুলভ। "তাহার মস্তকে কেশের লেশ মাত্র ছিল না ও তাহার গলদেশে কণ্ঠমালা ও দক্ষিণবাহুতে এক রৌপ্য তাগা ছিল, এবং তিনি দিগম্বর প্রায়, কেবল কটি দেশে এমন এক ক্ষুদ্র বস্ত্র ছিল যে তাহা উরুদেশ পর্যন্তও নামে নাই। ঐ ব্যক্তি জালখানি সঙ্গে লইয়া ও মৎস্যের চুপড়ীটি দক্ষিণহস্তে ঝুলাইযা এবং বামহস্তে হুকাটি ধরিয়া তাম্রকুট সেবন করিতে করিতে আপন গৃহে প্রত্যাগমণ করিতে ছিলেন।"[১২০]

নিম্নবর্ণের এই পল্লী মানুষগুলি ব্রাহ্মণকে দেখে প্রাতঃ প্রাণাম জানাতে ভুলতো না, বাহ্মণ অতিথি সেবা করে তারা কৃতার্থ হ'ত। এই ধীবরের উক্তি "আমি ছোট জাত বটি, আপনার সেবা করিবার যোগ্য নহি, কৃপা করে এ অধীনের কুঁড়েতে এই যামিনী যাপন করেন, তবে চরিতার্থ হই"[১২১] ব্রাহ্মণের পদসেবাও তারা স্বীয় কর্তব্যের মধ্যেই ধরত। "রামেন্দ্র সুন্দর আহারান্তে ব্রাহ্মণের পদসেবা করিতে কিঞ্চিৎ তৈল লইয়া নিধিরামের শয্যার নিকটে উপস্থিত হইবাতে তিনি পদদ্বয় বিস্তার করিলেন।"[১২২]

১১৮. ঐ। ৩ অধ্যায়, পৃ. ৮৩।
১১৯. ঐ। ৫ অধ্যায় পৃ. ৯১।
১২০. ঐ। ৮ অধ্যায়, পৃ ১০৬।
১২১. ঐ। ১১ অধ্যায়, পৃ. ১২১।
১২২. ঐ। ১২ অধ্যায়, পৃ. ১২৩।

৯ অধ্যায়ে হেমচন্দ্রের সঙ্গে আলাপরত কৃষকটি যেন সে যুগের দরিদ্র সরল ও সংস্কারাচ্ছন্ন কৃষকজীবীদের প্রতিমূর্তি। মণিবের জামাতাকে দেখে নদী পেরিয়ে এসে সে প্রণাম জানায়। স্বাভাবিক সংস্কারে সে কান্না নদীকে দামোদর নদের সুয়োরাণী মনে করে। সে নির্বিবাদেই নিজ গ্রাম্যতা ও অজ্ঞতাকে মেনে নেয়— "........আমি একে চাষা তায় পাড়াগেঁয়ে! প্রণাম. এখন যাই—আপন দুঃখ করিগে—"[১২৩]। এই 'দুঃখ' করা যে কৃষক জীবনের অঙ্গ, লেখক হয়ত সেটি ইঙ্গিত দিতে চেয়েছেন। লালাবিহারী অপ্রাসঙ্গিক ভাবে এই কৃষকের পত্নীর সর্প দংশনের ঘটনাটি বিবৃত করলেও সেখানে পল্লী বাংলার সাধারণ কৃষিজীবীর বাস্তু সাপকে দেবতা জ্ঞান করা, মনসা দেবীকে সন্তুষ্ট করতে স্তব করা বা ওঝার সাহায্যে বিষ নামানোর লৌকিক বিশ্বাসগুলি প্রতিফলিত হয়েছে।

ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতার সংস্পর্শে ঊনবিংশ শতকের বাংলাদেশে যে অভূতপূর্ব জাগরণ ঘটেছিল, তাতে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে মধ্যযুগীয় ধারণার পরিবর্তন ঘটিয়ে বাঙালী দ্রুত আধুনিক যুগ চেতনায় প্রবেশ করেছিল। শিক্ষা-সাহিত্য-সমাজ-ধর্ম-সর্বব্যাপী এক বিপুল পরিবর্তন ঘটেছিল সুখাত নবগঠিত কলকাতা নগরীকে আশ্রয় করে। নগর-জীবন-সৃষ্ট আধুনিক ভাব বিপ্লবের সেই ঢেউগুলি হ'ল আধুনিক ইংরেজী শিক্ষা, স্ত্রীশিক্ষা, সতীদাহ প্রথা নিবারণ আইন পাশ, ব্রাহ্মধর্মের উন্নত ও প্রগতিশীল চিন্তাধারা, হিন্দুসমাজের মধ্যযুগীয় সংস্কারের বিরুদ্ধচারী হয়ে অভিজাত কিংবা শিক্ষিত বাঙালী নব্য যুবকদের খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ, বিধবাবিবাহ আইন প্রবর্তন—বাল্যবিবাহ, কৌলীন্য প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, সংবাদপত্রগুলির মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন সমস্যার ব্যাপারে প্রবল জনমত গড়ে তোলার ঘটনা ইত্যাদি। ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে নব-জীবন চেতনা দৃঢ়মূল হয়ে বাংলার নগরজীবনে বিদ্ধ হলেও নব ভাব-আন্দোলনের তরঙ্গ-বিক্ষোভ জনিত দ্বন্দ্ব তখনও প্রবল ছিল। এই তরঙ্গ বিক্ষোভ বাংলার পল্লীজীবনকে সহজে প্রভাবিত করতে পারেনি, পল্লী বাঙালীর সাবেকী ছাঁচে ঢালা মন নগরের মত দ্রুত বিগলিত হয়নি। পল্লীজীবনে পরিবর্তন এসেছে ধীর লয়ে। শান্ত পল্লীর চিরাচরিত ধ্যান-ধারণায় শহরের শিক্ষিত মানুষ নতুন কথা বলতে চেয়েছে, নতুন ধারণা প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে, অথবা, ইংরেজ-সৃষ্ট নগরসভ্যতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য যন্ত্রশাসন পল্লী বাংলাতেও প্রবেশ করেছে এবং পল্লীচেতনায় বিপুল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে।

"চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান" খাঁটি উপন্যাস নয়, কিন্তু গত শতকের পল্লীবাংলার জীবনচ্ছবি, পল্লীর নরনারীর সত্য আলেখ্য এখানে আছে। এই আখ্যানে

১২৩. ঐ। ১২ অধ্যায়, পৃ. ১২৫।

পল্লীজীবনের সত্য চিত্র এঁকে রাখলেও কলকাতা নগরবাসী আধুনিক ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত ও খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত লেখক এখানে নাগরিক জীবন-প্রসূত ঊনবিংশ শতকের ভাব আন্দোলনের কয়েকটি রেখা এই গ্রামজীবনাশ্রয়ী সরল কাহিনীতে যুক্ত করেছেন। এ আখ্যানের কেন্দ্র বিন্দুতে আছে স্নিগ্ধ পল্লীবাংলা, কিন্তু তাকে ঘিরে রেখেছে ঊনিশ শতকীয় নাগরিক জীবন চেতনার ও আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার এক অদৃশ্য বলয়। ঊনবিংশ শতকের প্রাচীন ও নবীন যুগচেতনার সন্ধিস্থলে ছড়ানো পল্লীজীবনের সত্য সংবাদ আছে চন্দ্রমুখীর উপাখ্যানে।

রেভারেণ্ড লালবিহারী দে ঊনবিংশ শতকের প্রগতিশীল চেতনা সম্পন্ন ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালী ও ধর্মান্তরিত খ্রীষ্টান প্রচারক হওয়ায় এ আখ্যানে বাংলা পল্লীর খাঁটি চলচ্চিত্র এঁকে তুললেও তাঁর গোঁড়ামী মুক্ত নাগরিক চেতনা ও খ্রীষ্টধর্মের মাহাত্ম্য প্রচারের প্রবণতা কখনও নিজের বক্তব্য বিবৃতির মধ্য দিয়ে, কখনও বা চিত্রিত নরনারীর উক্তি ও মানসিকতার মাধ্যমে অভিব্যক্ত হয়েছে।

ফলে (ক) এ আখ্যান গ্রামজীবন কেন্দ্রিক হলেও কোন কোন স্থানে ঊনিশ শতকীয় বাংলার নগর জীবনের প্রগতিশীল চেতনার প্রকাশ হয়ে উঠেছে। (খ) এদেশে ইংরেজ প্রবর্তিত যন্ত্রসভ্যতা সৃষ্ট ঊনিশ শতকের পল্লীবাংলার যথার্থ রূপটি উপস্থিত হয়েছে।

চন্দ্রমুখীর উপাখ্যানে ঊনিশ শতকীয় বাংলাদেশের নগর জীবনের প্রগতিশীল চেতনা

মধ্যযুগীয় কৌলীন্য প্রথাটি ঊনবিংশ শতকের বাংলা দেশে হিন্দু সমাজে সুদৃঢ় ভাবেই প্রচলিত ছিল। পল্লী অঞ্চলে এই সব প্রাচীন প্রথাগুলি একেবারেই অনুসৃত হত। কৌলীন্য প্রথার বিরুদ্ধে শিক্ষিত বাঙালী এই শতকেই নিন্দামুখর ও প্রগতিবাদী হয়েছিল। প্রগতিশীল ইংরেজী শিক্ষিত নব্য বাঙালী লালবিহারীও এই প্রথা সম্বন্ধে তাঁর বিরূপতা স্পষ্টই ব্যক্ত করেছেন ২ অধ্যায়ে। লেখক অকপট সহানুভূতি ও আক্ষেপের সঙ্গে কুলীন সমাজের নারীদের দুর্ভাগ্য ও অপমানের কথা উল্লেখ করেছেন— কুলীনেরা স্বীয় দুহিতাদের প্রতি বড় প্রসন্ন নহেন। তাহার প্রধান কারণ কি এই, যে ঐ অভাগিনীদের বিবাহেতে অধিক ব্যয় হয় এবং তাহাদিগকে ও তাহাদের সন্তান সন্ততিকে আজন্মকাল প্রতিপালন করিতে হয়। কেননা তাঁহাদের জামাতাগণ স্বীয়২ পরিবার প্রতিপালন না করিয়া বরং শ্বশুরালয়ে কালযাপন করিতেই পরমাহ্লাদিত হয়েন।

স্ত্রীপালিত মান্য বরগণ কোন কার্য করেন না যেহেতুক তাহাদের কুলের হানি হইবে। সুতরাং অলস মধুমক্ষিকার ন্যায় তাঁহারা সপরিজনে পরোপার্জ্জিত অর্থদ্বারা প্রতিপালিত হয়েন! এইরূপ ভারগ্রস্ত হইবার আশঙ্কাতে সুকুলীন মহাশয়েরা কন্যা

জন্মিলে সাতিশয় উদ্বিগ্নচিত্ত হন। কিন্তু বন্দ্যোপাধ্যায় সাধারণ কুলীনদিগের ন্যায় নহেন।"[১২৪]

কলকাতা নগরীতে উনবিংশ শতকের প্রথমপর্ব থেকেই স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে উদার ও চিন্তাশীল বাঙালী মনীষীরা আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন ঐ শতাব্দীর মধ্যভাগে শহরাঞ্চলে ঘটে গেছে। কিন্তু পল্লী বাংলার ব্যাপক অঞ্চলে স্ত্রীশিক্ষা তখনও চরম নিন্দনীয়ই ছিল। পল্লীবাংলার মধ্যযুগীয় চিন্তাধারায় সমাজ পটে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে চন্দ্রমুখীর পিতা মুলুকচাঁদের বক্তব্য একান্ত আধুনিক। চন্দ্রমুখীকে তিনি স্ত্রী ও মায়ের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ছেলেদের সঙ্গে বিদ্যাচর্চার সুযোগ দিয়েছেন। মুলুকচাঁদের ও তাঁর গৃহ পুরোহিতের সংলাপে উনিশ শতকের কলকাতা ও পাশাপাশি অঞ্চলে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের আন্দোলনের উল্লেখও এই গ্রাম কাহিনীতে নগর চেতনার স্পর্শ এনে দিয়েছে।

"নিতাই। কিন্তু কলিকাতা ও সন্নিকটস্থ নারীগণ এমন বিদ্যা শিক্ষা করিতেছে. আর ঐ মহানগরীতে বালিকাদের জন্যে একটি পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছে, শ্রুত আছি যে ভদ্রলোকের কন্যাগণও এক বিদ্যালয়ে গমন করেন।

নন্দ। হাঁ আমার ভাগিনাও ঐ কথা বলিতেছিল, বাস্তবিক স্ত্রীশিক্ষা অশাস্ত্রময়, দ্রৌপদী, শকুন্তলা বিদা ইহারা অতি নিপুণা, সুরসিকা এবং সুপণ্ডিতা ছিলেন। বোধ হয় স্ত্রীশিক্ষা শীঘ্রই প্রচলিত হইবে।"[১২৫]

৪ অধ্যায়ে ঘটক খুড়োর সঙ্গে ছকুভট্টের আলাপে ইংরেজ বা সাহেবদের অনুসরণে লেখক স্ত্রী পুরুষের একত্র ভোজন রীতির পক্ষেই সায় দিয়েছেন।

৭ অধ্যায়ে চন্দ্রমুখীর বিবাহ আসরে দুই নিমন্ত্রিত ব্যক্তির পারস্পরিক সংলাপে দেশীয় বিবাহ রীতির পরিপ্রেক্ষিতে ইংরেজদের বিবাহরীতির আলোচনা স্থান পেয়েছে।

চরিত্রগুলির মধ্যে হেমচন্দ্র উনবিংশ শতকের আলোক প্রাপ্ত আধুনিক যুবক। সে ইংরেজী পাঠ শিক্ষা করে। তার আধুনিক চেতনার প্রকাশ ঘটেছে— (ক) বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হলে স্বচক্ষে পাত্রী দেখে আসতে যাওয়ার মধ্যে, (খ) দ্বিরাগমনে শ্বশুরালয়ে যেতে তার পাঠ-নষ্টের জন্য বিচলিত হওয়ার মধ্যে।

তাছাড়া প্রত্যক্ষভাবে সে পুরোনো জীবনধারায় আধুনিকতা আনবার মতামত প্রকাশ করেছে একাধিক স্থানে। যেমন শ্বশুরালয়ে পল্লীরমণীদের সঙ্গে কথাবার্তার সময় ইংরেজদের ধরনের স্ত্রী-পুরুষের একত্রে আহারের ব্যবস্থার প্রতি সায়

১২৪. ঐ।
১২৫. ঐ। ৯ অধ্যায় পৃ. ১১২।

দিয়েছে।

সভ্য হওয়ার জন্য ইংরেজী জ্ঞানকে অতি আবশ্যকীয় বলে ঘোষণা করেছে (১০ অধ্যায়ে)—ইরেজী না জানলে সভ্য হওয়া যায় না"—এটির মধ্যে তখনকার দিনের ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালীর একটি বিশিষ্ট ধারণাই প্রতিফলিত।

১০ অধ্যায়ে হেমচন্দ্র ইংরেজ নারীসমাজের বিবাহ পূর্ব বিদ্যাচর্চা বা শিল্প কর্ম শিক্ষা, বাল্য বিবাহের পরিবর্তে পরিণত বয়সে ও স্বীয় অভিরুচি মত বিবাহ করার প্রথাকে প্রশংসা সহকারে উল্লেখ করে তৎকালীন নগরজীবন কেন্দ্রিক আধুনিক চেতনার বর্হিপ্রকাশ ঘটিয়েছে।

১৩ অধ্যায়ে হেমচন্দ্র সমাকালীন নগর কলকাতার বিধবা বিবাহ সম্পর্কিত প্রবল সামাজিক আন্দোলন সম্পর্কে আলোকপাত করেছে তার বিস্তৃত আলোচনার মাধ্যমে। বিধবা বিবাহের সপক্ষে হেমচন্দ্রেব স্বাভাবিক পক্ষপাতি সে সময়ে প্রগতিশীল চিন্তাধারায় প্রতিফলক। হেমচন্দ্রের উক্তি— "কিন্তু বিধবাদের বিবাহ প্রচলিত হইলে অনেক অত্যাচার লুপ্ত ও প্রচুর মঙ্গল হইবে। আর এ বিষয়ে অনেক সুপণ্ডিত ও বিজ্ঞব্যক্তিগণ মনোযোগী হইতেছেন। অল্প দিন গত হইল এক ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশ হইযাছিল যাহাতে বিধবাদের বিবাহ যে শাস্ত্র সম্মত ইহা অতি প্রসিদ্ধ রূপ সপ্রমাণ করা হইয়াছে। দুঃখের বিষয়ে এই যে, লেখক মহাশয় ও তাঁহার মতাবলম্বীগণ অদ্যাবধি কেবল দুই একটি বিধবার বিবাহ দিয়াছেন। দেখ, কত২ ভদ্র কন্যারা অল্প বয়সে স্বামী হীনা হইয়া দুষ্কর্ম্মান্বিতা হইয়াছে। অধিকন্তু কোন২ যুবতী ভণ্ড ব্যভিচার ও ভ্রূণ হত্যা করেন।"[১২৬] এই উক্তির উদ্দীষ্ট পণ্ডিত অবশ্যই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়।

এই প্রসঙ্গে হেমচন্দ্র অল্পবয়সী বিধবা নারী যে কুপথগামী হতে পারে তার উল্লেখ করে, "মল্লিকা" নামের এক সুন্দরী বিধবার পতনের কাহিনী বর্ণনা করেছেন।

সমকালীন কলকাতা নগর কেন্দ্রিক আধুনিক প্রগতিশীল মনোভাব লেখক এভাবেই পল্লী কাহিনীতে এনেছেন এবং সেই সঙ্গে এদেশে আধুনিক যন্ত্রযুগের প্রবেশ ও পল্লীসমাজে তার প্রতিক্রিয়াটিও স্বল্প অবসরে দেখিয়েছেন।

১৭ অধ্যায়ে দেখা যাচ্ছে চন্দ্রমুখী দামোদর নদীতে আরও গ্রাম্য সঙ্গীদের সঙ্গে জল নিতে এসে বাষ্পীয় রেল ইঞ্জিন বা রেলগাড়ী দেখতে পেয়েছে। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম এদেশে রেল চলাচলের সূত্রপাত হয়। যন্ত্রসভ্যতা ভারত তথা বাংলাদেশেব মাটিতে প্রবেশ করল। পল্লীগ্রামের সরল মধ্যযুগীয় জীবনাচরণে সেই

---

১২৬. ঐ। ৫ অধ্যায় পৃ. ৯১।

যুগ মুহূর্তের অসামান্য প্রতিক্রিয়া ধরা পড়েছে চন্দ্রমুখী ও সঙ্গীনীদেব উক্তিতে, রাখাল বালকের উক্তিতে, কিংবা তাদের রেলগাড়ী দেখার দৃশ্য বর্ণনায়—

"নবীনারা সলিলের অনতিদূরে ঘড়াগুলি রাখিয়া জলক্রীড়া করিতে২ একটা উৎকট শব্দ শ্রবণ করিয়া সাতিশয় উদ্বিগ্না হইতে লাগিলেন, এবং মনে২ করিলেন অবিলম্বেই ঝড় ও বৃষ্টি হইবে, অতএব তাঁহারা সত্তা হইয়া স্ব২ গৃহে গমন করিতে লাগিলেন।....তাঁহার সমভিব্যাহারিনীরা বলিল, তাইতো ভাই আমরাও কখনো এমন ভয়ানক শব্দ শুনি নাই, এ কিন্তু ভাই ঝড় নয়, গঙ্গাসাগরে যেমন ঢেউব শব্দ শুনিয়াছিলাম এ তেমনি বোধ হয়।"[১২৭]

রাখালের কাছে "কলের গাড়ী" আসবাব কথা শুনে "বমণীরা আস্তে আস্তে ঘটগুলি চরে রাখিয়া উচ্চ ভূমিতে উঠিলেন, এবং দেখিলেন একটা বৃহৎ চোঙ্গা হইতে বাশি২ ধূম নির্গত হইতেছে, ও এক সারি কাষ্ঠ নির্ম্মিত ঘব অতি বেগে দৌড়িতেছে। ঐ ব্যাপাব অবলোকন করত তাহারা অতি চমৎকৃতা হইলেন, ও পরস্পব ইংরাজদের প্রশংসা করিতে লাগিলেন, আর তাহাবা অতি মৃদুস্বরে এই গীত গান করিতে২ পাহাড় হইতে নামিলেন যথা—

কি কল বানাইয়েছে ইংবাজ কোম্পানি,
কলে গাড়ি চলে আপনি সজনি •
আর ইচ্ছে করে কলসী রেখে,
দেখে আসি কলখানি।[১২৮]

এই নতুন বাষ্পীয় রেলগাড়ি বাংলার জনজীবনে যে বিস্ময়ের আলোড়ন এনেছিল, পল্লীকবি তা গানের মধ্যে প্রকাশ কবেছেন, পল্লীবাসী নরনারীর মুখে মুখে ফিরতো যে গান, চন্দ্রমুখীও তার সঙ্গীনীরা সেই গানই গেয়েছেন। পল্লীগ্রামের রাখালের মুখে ও শোনা গেছে সেই গান একটু পৃথকাকারে।

এ ভাবেই নতন যুগ নুতন সমাজ-চেতনা ঊনবিংশ শতকের পল্লী বাংলার অনাধুনিক জীবন কাহিনীকে চার পাশ দিয়ে বেষ্টন করে চলেছে।

রেভারেণ্ড লালবিহারী তাঁর খ্রীষ্টানধর্ম প্রচারের মানসিকতা থেকে ১২ অধ্যায়ে নিধিরাম ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে একটি ধীবরের কথোপকথনে, খ্রীষ্টধর্মের মাহাত্ম্যসূচক বক্তব্য রেখেছেন ও উচ্চবর্ণের বাঙালীরাও যে খ্রীষ্টধর্মের মাহাত্ম্যহেতু ধর্মান্তরিত হ'চ্ছে সে ইঙ্গিত করেছেন।[১২৯]

১২৭. ঐ ১৩ অধ্যায় পৃ. ১২৮।
১২৮. ঐ ১৭ অধ্যায় পৃ. ১৪৫।
১২৯. ঐ। ১৭ অধ্যায় পৃ. ১৪৫-১৪৬।

খ্রীষ্টধর্মের জয়গানের উদ্দেশ্যেই লেখক ১৫ অধ্যায়ে হেমচন্দ্রের ভাই নবকুমারের খ্রীষ্টধর্ম অবলম্বনের কথা ও তার অতি সৎ স্বভাবের এবং শুভ পরিণত জীবনের পাশাপাশি শেষ অধ্যায়ে হেমচন্দ্রের চরিত্রের অধঃপতন ও পরিশেষে চরম দুর্দশার কথা আকস্মিকভাবেই বর্ণনা করে কাহিনী সমাপ্ত করেছেন।

উনবিংশ শতকে হিন্দু-সমাজের সংস্কার ও অনুদারতার বিরোধিতা করে 'ইয়ং বেঙ্গল' সমাজের অনেক যুবক খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। মধুসূদন, কৃষ্ণমোহনের মত লালবিহারীও ধর্মান্তরিত খ্রীষ্টান। নবকুমারের দীক্ষাগ্রহণের মধ্যে সেই যুগধর্ম প্রতিফলিত হয়েছে, কিন্তু আখ্যান কাহিনীতে এটি অপ্রয়োজনীয় অংশ। লেখকের ধর্ম প্রচারের চেতনা দ্বারাই এই নগর সংবাদ গ্রাম কাহিনীতে যুক্ত হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে পল্লীচেতনা

বঙ্কিমচন্দ্রের মানস ভূমির বিশ্লেষণ দেশ ও কালের পরিপ্রেক্ষিতে

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশে, সদ্যসৃষ্ট নগর পরিমণ্ডলে, নববজীবন চেতনায় ঋষি বঙ্কিমের মানসমূল কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। আধুনিক ভারতীয় জীবনচেতনার যেটি মূল বৈশিষ্ট্য সেই ইংরাজী শিক্ষাকে বঙ্কিমচন্দ্র সাগ্রহে গ্রহণ করেছিলেন। এক কথায় বলা যায়, বাঙ্গালীর নবজাগরনের মূল সূত্রগুলি আত্মসাৎ করেই বঙ্কিমচন্দ্রের মানস পরিমণ্ডল গড়ে ওঠে। বাংলাদেশ ও বাঙ্গালীকে তিনি সেই নব যুগচেতনার আত্মগত ফলটি উপহার দিয়েছেন— সাহিত্য সাধনার মাধ্যমে। তাঁর উপন্যাস ওই নবজীবন চেতনারই অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। প্রাচীন ও গ্রাম্য স্থূল রসরুচি, জীবনবোধ ও মানসিকতার পরিবর্তে আধুনিক রুচি ও মানসিকতার মুক্তপ্রবাহ বঙ্কিমচন্দ্রই সর্বপ্রথম বাংলা কথাসাহিত্যে সঞ্চারিত করেছিলেন। তথাপি নিঃসন্দেহে একথাও যথার্থ; বঙ্কিমচন্দ্রের মানসিকতা থেকে গ্রামবাংলার প্রভাব অবসিত হয়নি, তাঁর উপন্যাসে যুগপৎ সংযুক্তি ঘটেছে নাগরিক বিদগ্ধ রস, রুচি ও চেতনার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামকেন্দ্রিক চেতনার। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবচৈতন্যে বঙ্গপল্লী নিশ্চিতভাবে এক অসাধারণ প্রসারণ বা বিস্তার ঘটিয়েছে। এই বৈশিষ্ট্যের মূলে আছে তৎকালীন বাংলাদেশের নগর প্রকৃতি এবং বঙ্কিমচন্দ্রের নিজ গৃহ পরিবেশের আংশিক দায়িত্ব।

ভারতবর্ষ, তথা বাংলাদেশ চিরকালীন কৃষি-ভিত্তিক এবং পল্লী নির্ভর দেশ। পল্লীর প্রতি আকর্ষণ বাঙ্গালীর চিরন্তন প্রবণতা। ইংরেজ শাসনাধীনে আসবার পর থেকে এই ভূ-খণ্ড ক্রমশ আধুনিক জীবনচেতনায় অভ্যস্ত হতে শুরু করে। সেই জীবনচেতনা প্রকৃতপক্ষে আধুনিক নগরকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত হয়। বিদেশী শাসক বাণিজ্যের সুবিধার্থে বন্দর কলকাতাকে রাজধানী বানিয়ে বাংলাদেশের আধুনিক নগর সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করে দিয়েছিল।

ইয়োরোপের শিল্পবিপ্লব ও শিল্পায়নের ফলে গড়ে ওঠা নগর সৃষ্টির ইতিহাস এদেশে অনুপস্থিত। ভারতবর্ষের আধুনিক নগর সৃষ্টির ইতিহাসে রেলপথের

প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণের এক বিরাট ভূমিকা রয়েছে। গ্রামীণ ভারতবর্ষের সুবিস্তৃত কৃষিক্ষেত্র থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ করাই ছিল বৃটিশ স্টীম ইঞ্জিনের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই রেলপথ ধরেই আবির্ভাব ঘটেছে "বাণিজ্যিক ডিপো বা বন্টন কেন্দ্র" রূপ শহরগুলির। কলকাতা বন্দর ছিল পাট, চামড়া, চা, কফি বন্টনের প্রধান ১ কেন্দ্র। অধ্যাপক গ্যাডগিলের ভাষায় ঃ ".......... In India the growth of industries has been taking place very slowly, Whatever little growth in towns there has been is due much more the growth of commerce than of industry."[১] —এই বন্দর নগর গুলিতে প্রথমে বিত্তশালী জমিদারেরা এবং ধীরে ধীরে দুর্ভিক্ষতাড়িত কৃষকদের একাংশ স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকে। কিন্তু এই জমিদার ও বিত্তশালীদের আমোদ-প্রমোদ, ব্যবসা-বাণিজ্য মহাজনী কারবার— সমস্ত কিছুরই মূল উৎস ছিল সামন্ত শোষণ। ইংরাজী শিক্ষার স্পর্শ পেলেও গ্রাম নির্ভর শহুরেরা পল্লী মানসিকতার ও চেতনার উর্দ্ধে ছিল না।

এই কলকাতাকে আশ্রয় করে বাংলার নতুন নাগরিক সমাজ গড়ে উঠে। উনবিংশ শতকের এই নাগরিক সভ্যতায় প্রাচীন সংস্কার, বর্ণ ভেদাভেদের ক্রমার্ধলোপ ঘটতে শুরু করে। অন্যদিকে নতুন নতুন সামাজিক স্তর সৃষ্টি হয়। অভিজাত জমিদার শ্রেণী বা লক্ষপতি বণিক গোষ্ঠির কথা বাদ দিলেও 'ইংরাজী শিক্ষা ও তাহার ফলে যে একদল বড় বড় সরকারী চাকুরী পাইয়াছেন বা অন্য কোন নূতনভাবে জীবিকা অর্জনের পথ প্রশস্ত করিয়াছেন, শিল্প বাণিজ্যের দ্বারা লক্ষপতি না হইলেও মোটামুটিভাবে যাহারা স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রার ব্যবস্থা করিয়াছেন—এই সম্প্রদায় মিলিয়া এক মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছে।"[২] তাছাড়া, 'ইংরেজী শাসন প্রণালীর পরিবর্ত্তনে এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবদানে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, সদরওআলা, উকিল, ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার প্রভৃতির সৃষ্টি হওয়ায় মধ্যবিত্ত ও উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সম্প্রসারণ হইল।"[৩]

আমোদ-প্রমোদ, বাণিজ্য স্বার্থ সব কিছু অতিক্রম করে নাগরিক সমাজে এমন কতকগুলি সংস্কার, সনাতনী প্রথার প্রতি আকর্ষণ আরোপিত রীতিনীতির আধিপত্য দেখা যায় যা বহুযুগ যাবৎ গ্রামীণ সমাজেরই প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। মুখ্যত সামন্ততন্ত্র-ভিত্তিক নগর কলকাতার ওপর নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রত্যক্ষ

১. Gadgil. D.R The Industrial Evolution of India in Recent times. Reprinted 4th Edition. 1948.
২. রমেশচন্দ্র মজুমদার। বাংলাদেশের ইতিহাস, আধুনিক যুগ। পৃঃ ২৫৮
৩. রমেশচন্দ্র মজুমদার। বাংলা দেশের ইতিহাস, আধুনিক যুগ—পৃঃ ২৫৮

ও পরোক্ষ প্রভাব পড়েছিল—

ক) দুর্গাপূজা, শ্যামাপূজা, রাসমেলা ইত্যাদি পূজা-পার্বণ ও অনুষ্ঠানাদির প্রতি আকর্ষণ। উৎসবাদি উপলক্ষ্যে কত কথা, পাঁচালী, কবিওয়ালার গান, যাত্রা, চড়কপূজা ইত্যাদির প্রতি আগ্রহ।

খ) অসংখ্য ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার, কুসংস্কার ও প্রথা কলকাতায় অত্যন্ত স্বভাবিক ব্যাপার রূপে প্রচলিত ছিল। যেমন ঃ গঙ্গাযাত্রা, অন্তর্জালি, সমুদ্র-যাত্রার বিরোধিতা, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, কৌলিন্যপ্রথা, শয্যাগ্রহণী, চিরবৈধব্য, অবরোধ প্রথা, একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথা ইত্যাদি।

গ) ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর সতীদাহ প্রথা দণ্ডনীয়— এই আইন প্রণীত হয়। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে বিধবা-বিবাহহ আইন পাশ হয়। এই আইনের বিরুদ্ধে কিন্তু প্রথম আন্দোলন করেছিলেন শহর কলকাতার বিত্তশালী ও অভিজাত শ্রেণীর অধিবাসীরা। তাঁদের অন্যতম হলেন, রাজা রাধাকান্ত দেব, মহারাজা কালীকৃষ্ণ ঠাকুর বাহাদুর, গোপীমোহন দেব প্রভৃতি। 'উনিশ শতকের শেষভাগে (১৮৯১ খৃঃ) বিশেষভাবে বেহহারাম মালাবারির চেষ্টায় স্ত্রীর বয়স ১২ বৎসরের কম হইলে স্বামী তাহার সহিত সহবাস করিতে পারিবে না— এই মর্মে যখন সহবাস সম্মতি (Age of consent) আইন বিধিবদ্ধ হয় তখন লোকমান্য তিলক ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। পুরুষের বহুবিবাহ নিবারণের জন্য আইন করার স্বপক্ষে ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ বাংলার বহু গণ্যমান্য লোক ইহার বিরুদ্ধবাদী ছিলেন।[৪]

বঙ্কিমচন্দ্রের পরিবার ছিল তৎযুগীয় এই উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্যতম। বঙ্কিমচন্দ্রের মানসিকতায় নগর ও পল্লীবাংলার উভয়বিধ মিশ্রণের মূলে তৎকালীন নগর প্রকৃতির দ্বিমুখীতা যেমন, তেমনই তাঁর গৃহ পরিবেশেরও আংশিক ভূমিকা অনস্বীকার্য। বাল্যকালেই পল্লী ও নগর উভয়ের ভাবানুসঙ্গ বঙ্কিমচন্দ্রের মানসমণ্ডলে বিধৃত হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা যাদবচন্দ্র ছিলেন একাধারে ইংরাজী শিক্ষিত সবকাসী চাকুরিয়া এবং সেই সঙ্গে মনেপ্রাণে গোঁড়া হিন্দু। এই পরিবারে পল্লীপ্রাণ সাবেক বাঙ্গালীর ভাবচিন্তার বিশেষ প্রধান্য ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতুস্পুত্র শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উক্তি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় ঃ "গৃহে দেবাপম পিতা, দেবীপ্রতিমা মাতা; জাগ্রত দেবতা রাধাবল্লভ। ভট্টপল্লীর প্রসিদ্ধ অধ্যাপকেরা আসিয়া শাস্ত্র আলোচনা করিতেন। প্রসিদ্ধ কথকেরা মধ্যে মধ্যে ভাগবত পাঠ করিতেন। পূজার দালানে হোম চণ্ডীপাঠ, শান্ত স্বস্ত্যান; ওঠানে গোবিন্দ অধিকারীর কৃষ্ণযাত্রা; দুর্গোৎসব, রথ, রাস প্রভৃতি বারোমাসে তের পার্বন; ক্ষুদ্র পল্লীর, গৃহে

৪. রমেশচন্দ্র মজুমদার বাংলাদেশের ইতিহাস, আধুনিক যুগ—পৃঃ ৩১০

গৃহে শঙ্খধ্বনি, মন্দিরে মন্দিরে স্তোত্র পাঠ।"[৫] "বাল্যজীবনের এই পরিবেশ তাঁর মানসজীবনের মূল ভিত্তিরূপে অসামান্য ভূমিকায় অবস্থিত। মধ্য জীবনে জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চার কালে তিনি ঘোরতর সংশয়বাদী হইয়া উঠিলেও এই ঐতিহ্যের আকর্ষণ তিনি পরিপূর্ণ কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই।"[৬]

গোঁড়া হিন্দু হওয়া সত্ত্বেও যাদবচন্দ্র তৎকালীন ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন এবং ইংরেজ অধীনে সরকারী কর্মে নিযুক্ত ছিলেন। কিছু কিছু নাগরিক জীবন বৈশিষ্ট্য তাঁর জীবনেও অনুপ্রবিষ্ট হয়। কর্মসূত্রে তাঁকে বদলি হয়ে স্থানান্তরে যেতে হয়েছে। ভিন্ন স্থানে দুই একটি ইংরেজ পরিবারের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ ঘটে। এর প্রভাব পড়ে বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনেও। মেদিনীপুরে স্থানীয় হেডমাস্টার টিড জন সাহেবের অনুরোধে বঙ্কিমচন্দ্রকে ইংরাজী বিদ্যালয়ে ভর্তি করানো হয়। এতদ্ব্যতীত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মলেট সাহেবের গৃহেও বালক বঙ্কিমচন্দ্রের যাতায়াত ছিল। এঁদের সুপারিশে বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যে ইংরাজী শিক্ষার সূত্রপাত।

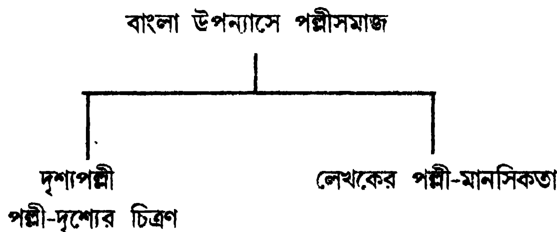
একদিকে ইংরেজী শিক্ষা ও আধুনিক নাগরিকতার স্পর্শ এবং অন্যদিকে বাঙ্গালীর পল্লী সংস্কৃতির মূল উভয়ই বালক বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয়ে নিহিত হয়ে গিয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিতে বঙ্গপল্লী যে বহু বিচিত্র ধারায় ও রূপে অসংখ্য বার উপস্থিত হয়েছে; তার প্রকৃত কারণ সম্ভবত এইগুলিই।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে পল্লীচেতনার স্তর বিভাগ

বাংলা উপন্যাসে পল্লীচেতনার দুটি পর্যায় লক্ষ্য করা যায়। (ছক নং ১)

ক) দৃশ্যমান পল্লীচিত্র বর্ণনা ও

খ) লেখকের পল্লী মানসিকতার প্রকাশ।



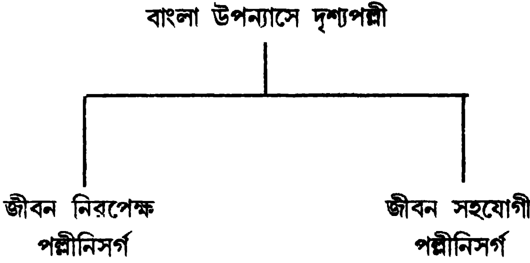
৫. শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—

৬. বঙ্কিম-মানস— অরবিন্দ পোদ্দার, পৃঃ ১৩৯

দৃশ্যমান পল্লীচিত্র অর্থাৎ পল্লীর দৃশ্যচিত্র। এই পর্যায়ে প্রধানত পড়ে পল্লী নিসর্গ। পল্লীর নির্সগ বর্ণনাকেও প্রকৃতি অনুযায়ী দুটি স্তরে বিন্যস্ত করা যায়। (ছক নং২)

ক) জীবন নিরপেক্ষ পল্লী নিসর্গ।

খ) জীবন সহযোগী পল্লী নিসর্গ।



পল্লী নিসর্গ যখন শুধুমাত্র আনুসঙ্গিক বর্ণনা বা ঘটনার মধ্যে সীমাবদ্ধ, তার কোনো বৃহৎ ব্যঞ্জনা বা তাৎপর্য মানবজীবনকে স্পর্শ করে না, সেই নিসর্গ বর্ণনাকে আখ্যা দেওয়া যায় "জীবন নিরপেক্ষ পল্লী নিসর্গ।" কিন্তু যখন পল্লী নিসর্গ জড়, মূক প্রকৃতি-চিত্র মাত্র না থেকে ঔপন্যাসের কাহিনী ও চরিত্রের ওপর স্বল্প গভীর প্রভাব বিস্তার করে, ঘটনা নিয়ন্ত্রক শক্তি হয়ে ওঠে, তাকে বলা যায় জীবন সহযোগী পল্লী নিসর্গ ।

লেখকের পল্লী মানসিকতা ঃ

এই কথাটি ব্যাখ্যা করা যায় উপন্যাসে প্রাপ্ত লেখকের কয়েকটি দৃষ্টিকোণ অবলম্বন করে। গ্রাম জীবনের প্রধান লক্ষণগুলি উপন্যাসে দৃষ্টিগোচর হলে, উপন্যাস কাহিনী গঠনে, চরিত্র রূপায়নে সহায়ক হলে লেখকের পল্লী মানসিকতা বা পল্লী-প্রবণ মন নিম্নলিখিত সূত্রগুলি থেকে অনুসন্ধান করা যায়—

ক) উপন্যাসে পল্লীসমাজের ভূমিকা।

খ) পল্লীবাসীদের ভূমিকা।

গ) মূল চরিত্রগুলির মানসিক ভূগোলের চতুঃসীমা।

ঘ) পল্লী প্রসঙ্গে নগর মানসিকতার প্রভার তার ফলাফল।

ঙ) উপন্যাসেব গঠনে পল্লী-প্রভাব।

চ) উপন্যাসে পল্লীরস।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিতে পল্লীচেতনার প্রকাশ প্রসঙ্গে পূর্বোক্ত আলোচনা ও সূত্রগুলি গ্রহণ করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের আলোচ্য উপন্যাসগুলির নাম ঃ দেবী চৌধুরাণী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে পল্লী চেতনার প্রাথমিক বিভাগ ঃ

ক) বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে দৃশ্যপল্লীর বর্ণনা বা চিত্রণ।

খ) পল্লীর মানসিকতা।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে দৃশ্যপল্লীর চিত্রণের স্বরূপ বিশ্লেষণ করে স্পষ্টতই দুটি স্তর পাওয়া যায়।

১) জীবন নিরপেক্ষ পল্লী-নিসর্গ।

২) জীবন সহযোগী পল্লী নিসর্গ।

বঙ্কিমচন্দ্রের একাধিক উপন্যাস বঙ্গপল্লীর নিসর্গ সংস্থান মূল্যবান ভূমিকায় অবস্থিত। পল্লীনিসর্গ কখনো নিছক দৃশ্য চিত্ররূপে জীবন নিরপেক্ষ. কখনো উপন্যাসের কাহিনী ও চরিত্রের মর্মকথা স্ফুরণের সহায়ক হয়ে. কাহিনী ও ঘটনার ক্রমবিকাশের অন্যতম মাধ্যম রূপে জীবন সহযোগী হয়ে উঠেছে।

আপাতদৃষ্টিতে বঙ্কিম বর্ণিত পল্লী জীবন নিরপেক্ষ পল্লী নিসর্গ। একান্তই বঙ্গপল্লীর নিসর্গ রূপাঙ্কন মাত্র। দিগন্ত বিস্তৃত শস্যক্ষেত্র, প্রবাহিতা নদী, নদী সন্নিকটে গ্রাম দৃশ্য, নদীচর, নদীর ঘাট, গ্রাম সন্নিকট বনাঞ্চল, গ্রামের পুষ্করিণী, খাল-বিল— এসমস্তই বঙ্গপল্লীর অতি পরিচিত নিসর্গ সংস্থান। এছাড়াও গ্রামের বর্ষা, শরৎ, শীত ইত্যাদি ষড় ঋতুর এক একটি বিশিষ্ট রূপ আছে। গ্রামের রাত্রি, প্রদোষ দিবাভাগ—সবই নিসর্গ চিত্রের অন্তর্ভুক্ত।

পল্লীগ্রামের নিসর্গ যেখানে শুধুমাত্র আনুষঙ্গিক বর্ণনার প্রয়োজনে চিত্রিত, উপন্যাসের মূল চরিত্রাবলীর গূঢ় জীবন রহস্য বা তাৎপর্য বিশ্লেষক রূপে অঙ্কিত হয়নি, সেই রকম নিসর্গ বর্ণনা দিয়ে সূত্রপাত ঘটেছে "বিষবৃক্ষ" উপন্যাসের। নায়ক নগেন্দ্রনাথ দত্তের জলপথে নৌকা যাত্রার বর্ণনাটি। নদী, পল্লী বাংলার একটি বিশিষ্ট দৃশ্যচিত্র। পল্লীবাংলার বক্ষবিদীর্ণকারী নদীর দুই তীরেন গ্রামগুলি চিত্র বৎ বোধ হয়। তাই নদীর দৃশ্য পরিকল্পনায় বা বর্ণনায় নদীতীরস্থ গ্রামচিত্রও সংযোজিত হয়। বঙ্গপল্লীর পার্শ্ববর্তী এইরকম এক প্রবাহিত নদী চিত্র দিয়েই "বিষবৃক্ষ" উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদের আরম্ভ। জমিদার নগেন্দ্রনাথের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকেরও নদীর উভয় পার্শ্বস্থ পল্লীগ্রামের পরিচিত দৃশ্যাদি দৃষ্টিগোচর হয়। — "নগেন্দ্র দেখিতে দেখিতে গেলেন, নদীর জল চল চল চলিতেছে—ছুটিতেছে বাতাসে নাচিতেছে— রৌদ্রে হাসিতেছে,— আবর্ত্তে ডাকিতেছে। জল অশান্ত অনন্ত ক্রীড়াময়। জলের ধারে তীরে তীরে মাঠে মাঠে রাখালেরা গরু চরাইতেছে, কেহ বা বৃক্ষের তলায় বসিয়া গান করিতেছে, কেহ বা তামাক খাইতেছে, কেহ

বা মারামারি করিতেছে, কেহ ভূজা খাইতেছে। কৃষকেরা লাঙ্গল চষিতেছে, গোরু ঠেঙ্গাইতেছে, গোরুকে মানুষের অধিক করিয়া গালি দিতেছে, কৃষাণকেও কিছু কিছু ভাগ দিতেছে। ঘাটে ঘাটে কৃষকের মহিষীরাও কলসী, ছেঁড়া কাঁথা, পচা মাদুর, রূপার তাবিজ, নাকচাবি, পিতলের পৈঁচে, দুই মাসের ময়লা পরিধেয় বস্ত্র, মসীনিন্দিত গায়ের বর্ণ, রুক্ষ কেশ লইয়া বিরাজ করিতেছেন। তাহার মধ্যে কোন সুন্দরী মাথায় কাদা মাখিয়া মাথা ঘষিতেছেন, কেহ ছেলে ঠেঙ্গাইতেছেন, কেহ কোন অনুদ্দিষ্টা অব্যক্ত নাম্নী প্রতিবেশিনীর উদ্দেশ্যে কোন্দল করিতেছেন, কেহ কাষ্ঠে কাপড় আছড়াইতেছেন। কোন কোন ভদ্র গ্রামের ঘাটে কুলকামিনীরা ঘাট আলো করিতেছেন। প্রাচীনরা বক্তৃতা করিতেছেন— মধ্যবয়স্করা শিবপূজা করিতেছেন—যুবতীরা ঘোমটা দিয়া ডুব দিতেছেন—আর বালক-বালিকারা চেঁচাইতেছে, কাদা মাখিতেছে, পূজার ফুল কুড়াইতেছে, সাঁতার দিতেছে, সকলের গায়ে জল দিতেছে, কখন কখন ধ্যানে মগ্না মুদ্রিত নয়না কোন গৃহিনীর সম্মুখস্থ কাদার শিব লইয়া পলাইতেছে। ব্রাহ্মণ ঠাকুরেরা নিরীহ ভাল মানুষের মত আপন মনে গঙ্গা স্তব পড়িতেছেন, পূজা করিতেছেন, এক একবার আকণ্ঠ নিমজ্জিতা কোন যুবতীর প্রতি অলক্ষ্যে চাহিয়া লইতেছেন। আকাশে সাদা মেঘ রৌদ্রতপ্ত হইয়া ছুটিতেছে, তাহার নীচে কৃষ্ণবিন্দুবৎ পাখী উড়িতেছে, নারিকেল গাছে চিল বসিয়া, রাজমন্ত্রীর মত চারি দিক দেখিতেছে, কাহার কিসে ছোঁ মারিবে। বক ছোট লোক, কাদা ঘাঁটিয়া বেড়াইতেছে, ডাহুক রসিক লোক, ডুব মারিতেছে। আর আর পাখী হাল্কা লোক, কেবল উড়িয়া বেড়াইতেছে, হাটুরিয়া নৌকা হটর হটর করিয়া যাইতেছে— আপনার প্রয়োজনে। খেয়া নৌকা গজেন্দ্র গমনে যাইতেছে,—পরের প্রয়োজনে। বোঝাই নৌকা যাইতেছে না— তাহাদের প্রভুর প্রয়োজন মাত্র।

নগেন্দ্র প্রথম দুই একদিন দেখিতে দেখিতে গেলেন। পরে একদিন আকাশে মেঘ উঠিল, মেঘ আকাশ ঢাকিল, নদীর জল কালো হইল, গাছের মাথা কালো হইল, মেঘের কোলে বক উড়িল, নদী নিস্পন্দ হইল।"

এই বর্ণনা কেবল একটা নিঃসক্ত দৃশ্যসুখ জাগায়নি এ যেন পল্লীবাঙলার নিত্য দিন যাত্রার বৃত্তান্ত মোটা তুলির দু-একটা টানে ছবিতে ফোটানো। অসামান্য পর্যবেক্ষণ শক্তির দক্ষতায় ঔপন্যাসিকের চোখে পল্লীবাংলার 'কৃষক মহিষী"দের বৈশিষ্ট্য যেমন ধরা পড়েছে, পল্লীর বিভিন্ন বয়সী নারীদের কর্মধারা যেমন তাঁর সর্তক দৃষ্টি এড়ায়নি, তেমনই "ব্রাহ্মণ ঠাকুরদে"র কাপট্য ও ভণ্ডামী ও তিনি তীক্ষ্ণ চোখে দেখেছেন। আর সেই সঙ্গে শিল্পী বঙ্কিম ঝড়ে থমকানো, চঞ্চল নদীর স্থির আয়নাবৎ রূপও সামান্য আঁচড়ে ফুটিয়েছেন।

এই পরিচ্ছেদেরই শেষ ভাগে পল্লীবাংলার একটি বর্ষারাত্রির রূপবস্তু বিশ্বাসযোগ্য আলেখ্য ঔপন্যাসিক সৃষ্টি করেছেন ঃ "আকাশে মেঘাড়ম্বর কারণ রাত্রি প্রদোষকালেই ঘনান্ধ তামসময়ী হইল। গ্রাম, গৃহ, প্রান্তর, পথ, নদী, কিছুই লক্ষ্য হয় না। কেবল বনবিটপী সকল; সহস্র সহস্র খদ্যোতমালা পরিমণ্ডিত হইয়া হীরক খচিত কৃত্রিম বৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। কেবলমাত্র গর্জ্জন বিরত শ্বেত কৃষ্ণাভ মেঘমালার মধ্যে হ্রস্বদীপ্তি সৌদামিনী মধ্যে মধ্যে চমকিতেছিল— ....। কেবলমাত্র নববারি সমাগম প্রফুল্ল ভেকেরা উৎসব করিতেছিল। ঝিল্লীরব মনোযোগ পূর্ব্বক লক্ষ্য করিলে শুনা যায়, ... শব্দের মধ্যে বৃক্ষাগ্র হইতে বৃক্ষপত্রের বর্ষাবিশিষ্ট বারিবিন্দুর পতন শব্দ, বৃক্ষতলস্থ বর্ষাজলে পত্রচ্যুত জলবিন্দু পতন শব্দ, পথিস্থ অনিঃসৃত জলে শৃগালের পদসঞ্চারণ শব্দ, কদাচিৎ বৃক্ষারূঢ় পক্ষীর আর্দ্রপক্ষের জল মোচনার্থ পক্ষ বিধূনন শব্দ। মধ্যে মধ্যে শমিতপ্রায় বায়ুর ক্ষণিক সর্গন, তৎসঙ্গে পত্রচ্যুত বারিবিন্দু সকলের এককালীন পতন শব্দ।" — পল্লীগ্রামের এই মেঘাবৃত বর্ষারজনীর দৃশ্যচিত্র উপন্যাসের চরিত্রাবলীর ভাববিকাশের সঙ্গে বিশেষ সংপৃক্ত নয়। তবে কাহিনীর ঘটনাস্রোত বিস্তারের সুখে কিঞ্চিৎ তাৎপর্যপূর্ণ কেননা, এই রাত্রিতেই উপন্যাসের মূল পুরুষ চরিত্র "নগেন্দ্রনাথ; উপন্যাসের সমস্যা সৃষ্টিকারিণী নারী চরিত্র "কুন্দনন্দিনীর জীবন প্রবাহের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন।

"কুন্দনন্দিনী"র দুর্যোগময় জীবনের প্রতিফলক রূপে হয়তো বঙ্কিমচন্দ্র এই দুর্যোগপূর্ণ রজনীটির চিত্র অঙ্কন করেছিলেন। তিনি এই পটভূমিতেই কুন্দনন্দিনীকে প্রথম উপন্যাসে উপস্থিতও করেছেন। কিন্তু এই বর্ষার ঘোর রজনী কুন্দনন্দিনীর ভাব বিশ্লেষক রূপে ব্যবহার না করে পট-দৃশ্য হিসেবেই প্রকাশ করেছেন। ফলে এই প্রকৃতি চিত্র জীবন নিরপেক্ষ পল্লীনিসর্গ রূপেই পাঠকের চিত্তে প্রতিভাত হয়।

'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে বর্ষা রজনীর চিত্র পুনরায় পাওয়া যায়। চৌত্রিশ পরিচ্ছেদে ঃ "বর্ষাকাল, বড় দুর্দিন। সমস্ত দিন বৃষ্টি হইয়াছে। একবারও সূর্যোদয় হয় নাই। আকাশ মেঘে ঢাকা।............রাত্রি অনেক হইল। ধরনী মসীময়ী— আকাশের মুখে কৃষ্ণার গুণ্ঠন। বৃক্ষগণের শিরোমালা কেবল গাঢ়তর অন্ধকারের স্তুপস্বরূপ মক্ষিত হইতেছে............ বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি পড়িতেছে। এক একবার বিদ্যুৎ হইতেছে— সে আলোর অপেক্ষা আঁধার ভাল"।— এই প্রকৃতি চিত্রটি কিন্তু নিছক জীবন নিরপেক্ষ নিসর্গ দৃশ্য হয়ে থাকেনি। উপন্যাস কাহিনীর বিশেষ প্রয়োজনে এই দৃশ্যটি সংযোজিত। এই দৃশ্যে দেখা যায় এক "ব্রহ্মচারী ভিজিতে ভিজিতে 'চলিতেছেন।" এই ব্রহ্মচারী বর্ষণমুখর রাত্রিতে এক রমণীকে মৃতপ্রায় অবস্থায় পথমধ্যে উদ্ধার করেছেন। সেই রমণী উপন্যাসের প্রধান নারী চরিত্র সূর্য্যমুখী। সূর্য্যমুখীর বর্ত্তমান দুঃখময় স্বামীপ্রেমহীন অন্ধকার ক্লিষ্ট জীবনানুভূতির সঙ্গে ঔপন্যাসিক বেশ সঙ্গতিপূর্ণ ভাবেই ঐ বর্ষা রাত্রির চিত্র পরিকল্পনা করেছেন।

বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন পল্লী প্রকৃতিচিত্র বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের একাধিক স্থানে দৃষ্টিগোচর হয়। দেখা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র বিশেষ বিশেষ প্রকৃতি দৃশ্যের পটভূমিকায় উপন্যাসের চরিত্র স্থাপিত করেছেন। ফলে উপন্যাসের সময় কালের ক্রমাগ্রসরতা পরিলক্ষিত হয়। ফলে উপন্যাসে গতি সঞ্চার হয়। যেমন, বিষবৃক্ষ উপন্যাসে সূর্য্যমুখীর গৃহত্যাগের পর সময় যে ক্রমশঃ এগিয়ে যাচ্ছে এবং তার ফলে প্রকৃতিচিত্রও পরিবর্তিত হচ্ছে সেটি স্পষ্টই ঔপন্যাসিকের বর্ণনায় প্রতীয়মান হয়। সূর্য্যমুখীর গৃহত্যাগের সময়কাল সম্ভবতঃ বর্ষার পূর্বে।

একটি বর্ষার রাত্রে উপন্যাসে সূর্য্যমুখীকে পুনরায় দেখা গেল। ব্রহ্মচারী সূর্য্যমুখীকে উদ্ধার করে নগেন্দ্রনাথকে সে সংবাদ জ্ঞাপন করেন। নগেন্দ্রনাথের নিকট সংবাদ পৌঁছতে বর্ষা অতিক্রান্ত হয়ে শরৎকাল হয়ে যায়। নগেন্দ্রনাথ যখন সূর্য্যমুখীর খোঁজে মধুপুরে এসে উপস্থিত হন, সেই সময়ের (শবৎকালের) বাংলাদেশের পল্লীগ্রামের একটি সংক্ষিপ্ত অথচ আকর্ষক চিত্র দিয়ে সাঁইত্রিশ সংখ্যক পরিচ্ছেদের সূচনা হয়েছে। ঋতুচক্রের বৈচিত্র্য পল্লীগ্রামের পটও এখন পরিবর্ত্তিত। "বর্ষা গেল। শরৎকাল আসিল। শরৎকালও যায়। মাঠের জল শুকাইল। ধান সকল ফুলিয়া উঠিতেছে। পুষ্করিনীর পদ্ম ফুরাইয়া আসিল। প্রাতঃকালে বৃক্ষপল্লব হইতে শিশির ঝরিতে থাকে। সন্ধ্যাকালে মাঠে মাঠে ধূমাকার হয়। এমতকালে কার্ত্তিক মাসের একদিন প্রাতঃকালে মধুপুরের রাস্তার উপরে একখানি পাল্কী আসিল। পল্লীগ্রামের পাল্কী দেখিয়া দেশের ছেলে খেলা ফেলে পাল্কীর ধারে কাতার দিয়া দাঁড়াইল।" — শরৎ-শেষের এই পল্লীবাংলার পটভূমিতে শূন্য হৃদয় নগেন্দ্রনাথেব চিত্রটি বড় করুণ হয়ে পাঠকের চিত্তে ধরা পড়ে। "সন্ধ্যাকালে যখন নগেন্দ্র দত্ত মধুপুর হইতে পাল্কীতে উঠিলেন তখন এই কথা মনে মনে বলিলেন, আমার এত দিনে সব ফুরাইল।" পল্লী প্রকৃতি এখানে প্রত্যক্ষভাবে ঘটনা ধারায় প্রভাব বিস্তার না করলেও ঔপন্যাসিকের আন্তরিক দৃষ্টিপাতে পল্লী নিসর্গ উপন্যাসে নিজস্ব একটি বৈশিষ্ট্য লাভ করতে সক্ষম হয়েছে।

বাংলা পল্লীর সাধারণ দৃশ্য চিত্র বর্ণিত হয়েছে 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে। এখানে বঙ্গপল্লীর দুটি বিপরীত চিত্র বিশ্বাসযোগ্য ভাবে উপস্থিত। বঙ্গাব্দ ১১৭৬ এ বাংলা দেশে যে নিদারুণ মন্বন্তর ঘটেছিল তার ফলে পল্লীগ্রাম গুলি হয়েছিল সম্পূর্ণভাবে শ্রীভ্রষ্ট। সেই শ্রীহীন, নিরন্ন, দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট বঙ্গপল্লীর বিশ্বস্ত, সত্য চিত্র বঙ্কিমচন্দ্র এঁকেছেন এই উপন্যাসের প্রথম খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদ জুড়ে। "১১৭৬ সালে গ্রীষ্মকালে একদিন পদচিহ্ন গ্রামে রৌদ্রের উত্তাপ বড় প্রবল। গ্রামখানি গৃহময় কিন্তু লোক দেখি না।...........রাজপথে লোক দেখি না, সরোবরে স্নাতক দেখিনা, গৃহদ্বারে মনুষ্য দেখি না, বৃক্ষে পক্ষী দেখি না, গোচরণে গোরু দেখি না, কেবল শ্মশানে শৃগাল কুক্কুর। এক বৃহৎ অট্টালিকা...........তাহার অভ্যন্তরে ঘরের

ভিতর মধ্যাহ্নে অন্ধকার, অন্ধকারে নিশীথ ফুল্লকুসুম যুগলবৎ এক দম্পত্তি বসিয়া ভাবিতেছে। তাহাদের সম্মুখে মন্বন্তর।" 'পদচিহ্ন' গ্রামের নামটি কাল্পনিক হলেও বঙ্গাব্দ ১১৭৬ এ বাংলা দেশের অধিক সংখ্যক পল্লী গ্রামের এইটিই দৃশ্যমান চিত্র হয়ে উঠেছিল।

বিপরীতভাবে, দুর্ভিক্ষ ক্লিষ্ট বঙ্গপল্লীর এই দৃশ্য রচনার সঙ্গে সঙ্গে এই উপন্যাসেই অন্যত্র একটি স্থানে তিনি বঙ্গপল্লী এবং পল্লী কুটিরের এক রসাস্পদ স্নিগ্ধ চিত্র পাঠকদের উপহার দিয়েছেন ঃ "জঙ্গলের মধ্যে একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম, কিন্তু গ্রামখানি বড় সুন্দর। কোমল তৃণাবৃত গোচরণভূমি; কোমল শ্যামল পল্লবযুক্ত আম, কাঁঠাল, জাম, তালের বাগান, মাঝে নীলজল পরিপূর্ণ স্বচ্ছ দীর্ঘিকা।" সমৃদ্ধ পল্লী কুটিরের চিত্র ঃ "একটি বৃহৎ আম্রকানন মধ্যে একটি ছোট বাড়ী। চারি দিকে মাটির প্রাচীর, চারিদিকে চারিখানি ঘর। গৃহস্থের গরু আছে, ছাগল আছে, একটা ময়ূর আছে, একটা ময়না আছে, একটা টিয়া আছে, একটা বাঁদর ছিল কিন্তু সেটাকে আর খাইতে দিতে পারে না বলিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। একটা ঢেঁকি আছে, বাহিরে খানার আছে, উঠানে লেবু গাছ আছে, গোটাকতক মল্লিকা যুঁই এর গাছ আছে।"— এই রকম স্নিগ্ধ রসাস্পদ গ্রাম (১ম খণ্ড, ১৫শ পরিচ্ছেদ) কিম্বা গ্রাম্য কুটির সেযুগে সত্যিই দুর্লভ ছিল না। মন্বন্তর যেমন অষ্টাদশ শতকের গ্রাম বাংলায় অভিশাপ এনেছিল, তাকে শ্রীভ্রষ্ট করেছিল, সেরকমই স্বচ্ছল, শ্রীযুক্ত পল্লী ও বাংলাদেশের একটি সত্যচিত্রই ছিল।

প্রকৃতপক্ষে, বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীতে জড় নিসর্গ প্রায় সবসময়েই অল্পবিস্তর প্রাণবান শক্তিতে পরিণত হয়েছে। নদী, উদ্যান, দীঘি, পুষ্করিনী, ফলফুলের গাছ, পশুপাখী (ময়ূর ব্যতীত) এসবই বঙ্গপল্লীর নিজস্ব নিসর্গপট। এবং এই নিসর্গ বা নিসর্গপ্রকৃতির অংশ প্রায়ই উপন্যাসের চরিত্র পকাশক বা ঘটনা সম্ভাবক হয়ে উঠেছে। তাই উপন্যাসের ঘটনা বা চরিত্রাবলী থেকে পল্লী নিসর্গকে সব সময় বিচ্ছিন্ন করে দেখানো যায় না। বিষবৃক্ষ উপন্যাসে যেমন দেখেছি বিশেষ নিসর্গ সংস্থানের পটভূমিতে উপন্যাসের নায়ক বা নায়িকাকে স্থাপন করা কিম্বা বিশেষ পল্লী নিসর্গের বর্ণনা দ্বারা উপন্যাসের ঘটনাধারার নতুন কোনো আলোকসন্ধানের উপস্থাপনা। সেই রকম ঠিক না হলেও একথা বলা যায়, আনন্দমঠ উপন্যাসের বিপ্লবাত্মক চেতনার জন্ম ত্বরাণিত করেছে কিম্বা ইন্ধন সৃষ্টি করার মূলে রয়েছে দুর্ভিক্ষ, পীড়িত, ক্লিষ্ট বঙ্গপল্লী। সেক্ষেত্রে, উপন্যাসের মূল বক্তব্য অত্যাচারী রাজশক্তির বিরুদ্ধে অত্যাচারিত সাধারণ মানুষের বিদ্রোহের যথার্থ পটভূমি হয়েছে প্রথম খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদের ঐ নিরন্ন গ্রাম বাংলার মর্মান্তিক দৃশ্যপট, — একথা তো অনায়াসে বলা যায়। আবার, প্রথম খণ্ডের পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ এ স্নিগ্ধ গ্রাম্য কুটিরের দৃশ্যে পাঠক নিমাইমনির অতৃপ্ত অপত্য স্নেহ "সুকুমারীর" প্রতি

লক্ষ্য করে নিশ্চয়ই স্নিগ্ধ হৃদয় হবেন। বাঙ্গালী রমণীয় চিরন্তন বাৎসল্য রস প্রকাশের যোগ্য পটভূমি হয়েছে শান্ত স্নিগ্ধ গ্রাম্য কুটিরের অঙ্গনটি। এই পল্লীদৃশ্যেই উপন্যাসের প্রধানা নারী শান্তিকে উপস্থিত হতে দেখি। যার উপস্থিতি উপন্যাসে নতুন গতি সঞ্চার করেছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ঔপন্যাসিক সচেতনভাবে কিম্বা অসচেতনভাবে বার বার নীরব পল্লী নিসর্গকে উপন্যাসের প্রধান চরিত্রাবলী উপস্থাপনের কিম্বা নতুন ঘটনা ধারা সংযোজনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন।

'ইন্দিরা' কাহিনীর কেন্দ্রবিন্দুতে আছে একটি দিঘী। এই 'কালাদিঘী' নামব জলাশয়টির এই কাহিনীর মূল চরিত্র ইন্দিরার জীবনের পট পরিবর্তনের সাক্ষী হিসাবে বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। কেননা, এই দিঘীর তটেই ডাকাতদল কর্ত্তৃক ইন্দিরা লুন্ঠিত হয়. তার ফলেই তার জীবনের এক আশ্চর্য্য ইতিহাস সৃষ্টির সূত্রপাত ঘটল, বঙ্কিমচন্দ্র নায়িকার জীবন কাহিনীর সঙ্গে সংপৃক্ত এই পল্লী জলাশয়টির একটি রেখাচিত্র না এঁকে পারেননি। নায়িকা ইন্দিরার ভাষায় এই বর্ণনা ঃ "দেখিলাম যে, সম্মুখে অতি নিবিড় মেঘের ন্যায় বিশাল দির্ঘিকা বিস্তৃত রহিয়াছে, চারিপার্শ্বে পর্ব্বতশ্রেণীবৎ উচ্চ অথচ সুকোমল শ্যামল তৃণাবরণ শোভিত পাহাড়, পাহাড় এবং জলের মধ্যে বিস্তৃত ভূমিতে দীর্ঘ বটবৃক্ষ শ্রেণী, পাহাড়ে অনেক গোবৎস চরিতেছে— জলের উপর জলচর পক্ষীগণ ক্রীড়া করিতেছে— মৃদু পবনের মৃদু মৃদু তরঙ্গ হিল্লোলে স্ফাটিক ভঙ্গ হইতেছে—ক্ষুদ্রোর্ম্মি প্রতিঘাতে কদাচিৎ জলজ পুষ্পপত্র এবং শৈবালে দুলিতেছে। দেখিতে পাইলাম যে, আমার দ্বারবানেরা জলে নামিয়া স্নান করিতেছে— তাহাদের অঙ্গচালনে তাড়িত হইয়া শ্যামসলিলে মুক্তাহার বিক্ষিপ্ত হইতেছে।" স্বামী সন্দর্শনে গমনকারিনী নব যুবতী ইন্দিরার মানসিক প্রফুল্লতা ও স্বপ্নময়তার মতই এই পল্লী জলাশয়টির সৌন্দর্য্য ঔপন্যাসিক বিচক্ষণতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করেছেন।

দ্বিতীয় স্তর ঃ জীবন সহযোগী পল্লীনিসর্গ

উপন্যাস-কাহিনী বা চরিত্রকে প্রভাবিত করেনি, মানব জীবনের সঙ্গে গভীরভাবে অন্বিত হয়নি কিম্বা উপন্যাসে গূঢ় কোনো তাৎপর্য সঞ্চারিত করেনি,— এরকম পল্লী নিসর্গ চিত্র বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে খুব অল্পই রয়েছে। নিসর্গ দৃশ্যকে ঔপন্যাসিক অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কাহিনী ও চরিত্রের ভাব বিশ্লেষক মাধ্যম হিসেবেই ব্যবহার করেছেন। গভীর চিন্তাশীল এবং মননধর্মী ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র জগৎ ও জীবনকে শুধুমাত্র ওপরের স্তর থেকেই দেখেন নি। গভীর অনুধ্যানের দ্বারা তিনি জীবনের মর্ম মূলের সন্ধানও পেয়েছেন। সেই জন্য প্রকৃতিও তাঁর কাছে প্রাণবান ও গতিময়। তিনি বারংবার তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলির পাশাপাশি নিসর্গ প্রকৃতির

অবস্থান ঘটিয়েছেন, পল্লীনিসর্গ ও মানবজীবনের গূঢ় গভীর রহস্য তার লেখনীতে বারংবার অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশ্রিত হয়ে গেছে।

নদী, উদ্যান, পুষ্করিনী, দিঘী— গ্রাম্য প্রকৃতির এই বিশেষ সংস্থানগুলিকেই বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসের নরনারীর সঙ্গে একাত্ম করে তাদের প্রাণবান চরিত্রে পরিণত করেছেন একাধিক উপন্যাসে।

নদী ঃ পল্লী নিসর্গের একটি বড় অংশ নদী। বঙ্কিমচন্দ্রের একাধিক উপন্যাসের সূত্রপাতে বা মধ্যে একটি না একটি নদী অবস্থান করলেও 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের নদীই একান্তভাবে পল্লীবাংলার নদীধারার সম্পূর্ণ বৈশিষ্ট্যযুক্ত। উপন্যাসের নায়ক নায়িকার জীবন বিকাশে অংশগ্রহণ করলেও 'কপালকুণ্ডলা'র গঙ্গাসাগরের নদী, 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের ভাগীরথী নদী, 'দেবী চৌধুরাণীর' ত্রিস্রোতা নদী, কিম্বা 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের চিত্রা নদী— কোনোটিকেই বঙ্গপল্লী প্রকৃতির ঠিক খাঁটি নিদর্শন বা একাত্মীভূত অঙ্গ হিসেবে ধরা যায় না। তবে 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে চিত্রিত ভাগিরথী নদী বা কপালকুণ্ডলা কাহিনীর রসুলপুরের নদী। কিঞ্চিৎ গ্রাম্য নদীর স্বভাবযুক্ত। কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে ঐ নদীবক্ষে পল্লীবাসী বাঙ্গালী চরিত্রের একাধিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হওয়ায় নদীটি যেন বঙ্গপল্লীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে। যুক্তি স্বরূপ বলা যায়, নবকুমার ও প্রাচীন যাত্রীর এই নদীবক্ষে যে কথোপকথন হয় তার দ্বারা পাঠক প্রাচীন যাত্রীর মধ্যে পল্লীবাংলার ঘোর সাংসারিক এক গৃহস্থ অথচ ধর্মরক্ষার উদ্দেশ্যে (প্রথারক্ষার্থে) তীর্থযাত্রা করে সেই পরিচিত চরিত্রের খোঁজ পান। কিম্বা এই নদীতীরেই নবকুমার তার স্বার্থপর পল্লীবাসীর কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হন। পল্লীবাসী বাঙ্গালী চবিত্রের ক্ষুদ্রতা এই নদীবক্ষে প্রতিফলিত হওয়ায় 'কপালকুণ্ডলার' নদী বঙ্গপল্লীর নদীধারার সঙ্গে সামান্য সাদৃশ্য অর্জন করেছে। 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের এই নদীই কাহিনী বা ঘটনার মূল প্রেক্ষাপট। এই নদীতীরে সঙ্গীগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হওয়ার ফলস্বরূপ নবকুমারের জীবনের পরবর্ত্তী ঘাত প্রতিঘাত। কাপালিকের সঙ্গে সাক্ষাত, 'কপালকুণ্ডলার' সঙ্গে সাক্ষাত। সুতরাং 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের কাহিনী বিবর্ত্তনে, চরিত্র বিকাশে যে নদীর গোপন ভূমিকা আছে সে নদী কিছুটা বঙ্গপল্লীর নদীস্বভাব যুক্ত— একথা হয়তো বলা যায়।

চন্দ্রশেখর উপন্যাসের সূত্রপাতে এক নদী। ভাগীরথী তীরে, আম্রকাননে বসিয়া একটি বালক ভাগীরথীর সান্ধ্য জলকল্লোল শ্রবণ করিতেছিল। তাহার পদতলে, নবদুর্ব্বাশয্যায় শয়ন করিয়া একটি ক্ষুদ্র বালিকা নীরবে তাহার মুখপানে চাহিয়াছিল— "। (প্রথম পরিচ্ছেদ) এই বালক প্রতাপ, বালিকা শৈবালিনী। উভয়ের প্রাণয়োদগাম এই ভাগীরথী তীরে। এই ভাগীরথী উভয়ের গ্রাম পাশ্ববর্ত্তী নদী। সুতরাং গ্রামের নদী। কিন্তু গ্রাম্য নদীতটের সচরাচর যে পরিচিত দৃশ্য দেখা

যায়, বঙ্কিমচন্দ্রের সেই দৃশ্য রচনা করবার প্রবণতা এই উপন্যাসের নদীতটকে ঘিরে পরিলক্ষিত হয়নি, ভাগীরথী নদী এখানে শুধুমাত্র গ্রামের পরিচিত প্রবাহিনী রূপে না থেকে প্রতাপ ও শৈবলিনীর জীবন ধারায় মিশে গেছে। অপরিণত কৈশোরে এই নদীবক্ষে উভয়ে প্রাণ বিসর্জনের প্রতিজ্ঞা নিয়েছিল। প্রাণত্যাগ করা তাদের সম্ভবপর হয়নি বটে, তবে তাদের জীবননাট্যের প্রথম অঙ্কের এইখানেই ইতি হয়। কেননা, এরপর দুটি জীবনের ধারা দুটি ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়ে গেছে। শৈবালিনীর বিবাহ হয়েছে চন্দ্রশেখরের সঙ্গে, প্রতাপ তার জীবন থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। কিন্তু এই নদী পুনরায় তাদের জীবনের সংকট মুহূর্তে এসেছে। বরং বলা ভাল, প্রতাপ, শৈবালিনীর জীবনের আর একটি সংকট মুহূর্তে নদী হয়েছে, পটভূমি "শৈবালিনী রুদ্ধ নিঃশ্বাসে বলিল, 'কি শপথ প্রতাপ?" উভয়ে পাশাপাশি কাষ্ঠ ছাড়িয়া সাঁতার দিতেছিল। গঙ্গার কলকল চলচল জলভঙ্গরব মধ্যে এই ভয়ঙ্কর কথা হইতেছিল। চারিপাশে প্রক্ষিপ্ত বারিকণা মধ্যে চন্দ্র হাসিতেছিল। জড় প্রকৃতির দৌরাত্ম!" নদীবক্ষের এই শপথ শৈবালিনী ও প্রতাপের জীবননাট্যকে আর এক নব বিবর্তনের দিকে চালিত করেছে। কিন্তু এই গঙ্গা বা ভাগীরথী পল্লীবাংলার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যযুক্ত নদী নয়। উৎসমূল থেকে ভারতের উত্তরখণ্ডকে বিভিন্ন বাঁকে সমৃদ্ধ করে গঙ্গা বাংলাদেশের দক্ষিণভাগে সমুদ্রে লীন হয়েছে। এই মহান নদী, মানব জীবনের গভীর রহস্য ও পরিবর্তনের সঙ্গেই তুলনীয়। ক্ষুদ্র বঙ্গপল্লীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য যুক্ত না করে ঔপন্যাসিক ভাগীরথী বা গঙ্গার আরও বৃহত্তর তাৎপর্য অনুসন্ধান করেছেন প্রতাপ ও শৈবালিনীর আশ্চার্য জীবননাট্যের সঙ্গে যুক্ত করে।

দীঘি ও পুষ্করিনী ঃ

বঙ্গপল্লীর এই দুটি অতি পরিচিত নিসর্গসংস্থান বঙ্কিমচন্দ্রের একাধিক উপন্যাসে প্রাণবান চরিত্রে পরিণত হয়েছে। জড় প্রকৃতি কাহিনী বিন্যাস ও চরিত্র বিকাশের দায়িত্ব কখনো কখনো গ্রহণ করেছে। 'বিষবৃক্ষ', 'চন্দ্রশেখর', 'কৃষ্ণকান্তের উইল' প্রমুখ উপন্যাসে গ্রাম্য জলাশয়গুলির মুখ্যতঃ এই ভূমিকা।

বিষবৃক্ষ উপন্যাসের পুষ্করিনীটির চরিত্র অপর দুটি উপন্যাসের জলাশয়ের থেকে সামান্য পৃথক এই কাহিনীর মধ্যভাগে স্থিত পুষ্করিনীটির সর্ব সাধারণের ব্যবহার্য্য জলাশয় নয়। জমিদার নগেন্দ্রনাথের উদ্যান সংলগ্ন সৌখিন জলাশয়। বঙ্কিমচন্দ্র এই পুষ্করিনীর পটভূমিতেই উপন্যাসের নায়ক নগেন্দ্রনাথ ও অন্যতম নায়িকা কুন্দনন্দিনীকে স্থাপন করেছেন। এই দুই চরিত্রের পারস্পরিক অনুরাগ, অন্তর্দ্বন্দ্ব, কষ্টবোধ সমস্তই 'উদ্যান মধ্যস্থ বাপী তটে প্রথম উন্মুক্ত হয়েছে, কুন্দ,

এই উপন্যাসে খুব অল্প সময়েই সাবক হয়েছে। তার মানসলোক উন্মোচিত করবার জন্যই যেন বঙ্কিমচন্দ্র ষোড়শ পরিচ্ছেদটি সৃষ্টি করেছেন। এখানে কুন্দের আত্মপ্রকাশ, এই জলাশয়ের বর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা ব্যবহারের চূড়ান্ত শিল্পকুশলতা প্রকাশিত। এই দীর্ঘিকা অতি সুবিস্তৃত; তাহার জল অতি পরিষ্কার এবং সর্বদা নীলপ্রভ.........পুষ্পোদ্যানমধ্যে এক শ্বেত প্রস্তর রচিত লতামণ্ডপ ছিল। সেই লতামণ্ডপের সম্মুখেই পুষ্করিনীতে অবতরণ করিবার সোপান। সোপান প্রস্তরবৎ ইষ্টকে নির্মিত, অতি প্রশস্ত এবং পরিষ্কার।"

মানব হৃদয়ের সঙ্গে জলের এক সূক্ষ্ম ও গভীর সম্পর্ক যে বর্ত্তমান, সেটি বঙ্কিম যেন আন্তরিকভাবে অনুভব করেছিলেন, তাঁর একাধিক উপন্যাসে দেখা যায় নায়ক নায়িকার সুখ দুঃখাদির অনুভব প্রেম প্রণয়ের অনুভবটি প্রকাশ পেয়েছে জলের পাশে। 'বিষবৃক্ষ' পুষ্করিনীটির শৈল্পিক বর্ণনার পর বঙ্কিমচন্দ্র লিখছেন ঃ "সোপানের উপরে কুন্দনন্দিনী অন্ধকার প্রদোষে একাকিনী বসিয়া স্বচ্ছ সরোবরহৃদয়ে প্রতিফলিত নক্ষত্রাদির সহিত আকাশ প্রতিবিম্ব নিরীক্ষণ করিতেছিলেন।" এবং সেই সঙ্গে "......কুন্দনন্দিনী মনের দুঃখে ভাবিতেছেন।" কুন্দের ভাবনা ঐ পুষ্করিণীর জলে নক্ষত্র প্রতিফলনের মতই আশ্চর্য্য ভাবে সংপৃক্ত। যে মুহূর্ত্তে কুন্দ ঐ জলে প্রাণ বিসর্জন দিতে ইচ্ছুক হয় সেই মুহূর্ত্তে নগেন্দ্রনাথের স্পর্শ পাওয়া মাত্র তার আর জীবন বিসর্জনের স্পৃহা থাকে না। নিসর্গ প্রকৃতিও মুহূর্তে তার ভাব পরিবর্তন করেছে। কুন্দ সেই মুহূর্ত্তে পুষ্করিনীর জলে মৃত্যুর ভয়ংকর আকর্ষণের পরিবর্ত্তে জীবনের আকাঙ্খা প্রতিফলিত হতে দেখেছে। কুন্দনন্দিনী। দেখ পুষ্করিণীর জল পরিস্কার সুশীতল, সুবাসিত বায়ুব হিল্লোলে তাহার নীচে তারা কাঁপিতেছে। ডুবিবে? ডুবিয়া মর না? কুন্দনন্দিনী মরিতে চাহে না।"

কুন্দনন্দিনীর হৃদয়ের প্রতিফলন ঘটালেও এই পুষ্করিণী সম্পূর্ণরূপে গ্রাম্য জলাশয় নয়। গ্রাম্য জলাশয়ের সামাজিক সত্তা বিষবৃক্ষের উদ্যান মধ্যস্থ পুষ্করিণীতে পাওয়া যায় না এই পুষ্করিনী জমিদার নগেন্দ্রনাথের বিরাম উদ্যান বাটিকার সযত্ন নির্মিত নিজস্ব জলাশয় এখানে সাধারণ মানুষের স্পর্শ নেই তথা সাধারণ জীব তার স্পর্শ রহিত। গ্রাম্য পুষ্করিণীর বিশ্বসযোগ্য লক্ষণ নিয়ে 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে উপস্থিত হয়েছে 'ভীমা' পুষ্করিণী। "ভীমা নামে বৃহৎ পুষ্করিণীর চারিধারে ঘন তালগাছের সারি। অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের হেমাভ রৌদ্র পুষ্করিণীর কালো জলে পড়িয়াছে; কাল জলে রৌদ্রের সঙ্গে তালগাছের কাল ছায়া সকল অঙ্কিত হইয়াছে। একটি ঘাটের পাশে কয়েকটি লতামণ্ডিত ক্ষুদ্র বৃক্ষ, লতায় লতায় একত্র গ্রথিত হইয়া, জল পর্যন্ত শাখা লম্বিত করিয়া দিয়া, জল বিহারিণী কুলকামিনীগণকে আবৃত করিয়া রাখিত। সেই আবৃত অন্ধকার মধ্যে শৈবলিনী এবং সুন্দরী

ধাতুকলসী হস্তে জলের সঙ্গে ক্রীড়া করিতেছিল।"

এই জলাশয়টি উপন্যাসে শুধুমাত্র নির্জীব বর্ণনায় বিধয় হয়ে থাকেনি। বরং দেখা যায়, শৈবলিনীর জীবন ঘটনার স্রোতে এই ভীমা পুষ্করিণীটি বিশেষ তাৎপর্য নিয়ে অবস্থিত। এই জলাশয়ের তীরেই শৈবলিনীর সঙ্গে লরেন্স ফষ্টরের সাক্ষাৎকার দৃশ্য রচিত হয়েছে। এই লরেন্স ফষ্টরই 'ভীমার' তীরে শৈবলিনীকে দেখে রূপমুগ্ধ হয় এবং পরিশেষে গৃহ থেকে লুণ্ঠন করে। ফলে উপন্যাসের কাহিনী নিয়ন্ত্রণে ভীমা পুষ্করিণীর দায়িত্ব অবশ্যই কিছুটা থেকে যায়। শৈবালিনীর সঙ্গে এই জলাশয়ের যেন কিছু মানসিক যোগাযোগ ছিল। সেই যোগাযোগ ঔপন্যাসিক বিবৃত করেন এইভাবে — "সেই আবৃত্ত অল্পান্ধকার মধ্যে শৈবালিনী এবং সুন্দরী ধাতু কলসীসহ জলের সঙ্গে ক্রীড়া করিতেছিল। এবং অতঃপর শৈবালিনীর মনের চাঞ্চল্যের সঙ্গে পুষ্করিণীর ঈষৎ বায়ু হিল্লোলিত জলতরঙ্গের গভীর সাদৃশ্য ইঙ্গিত করে পাঠককে নারী চরিত্রের গূঢ় রহস্যময়তায় পৌঁছে দিয়েছেন। "জল চঞ্চল; এই ভুবন চাঞ্চল্য বিধায়িনীদিগের হৃদয়ও চঞ্চল, জলে দাগ বসে না, যুবতীর হৃদয়ে বসে কি?" 'ভীমা' চন্দ্রশেখর উপন্যাসে একটি সাধারণ গ্রাম্য জলাশয় যেখানে অপরাপর গ্রাম্য-রমণীদের সঙ্গে শৈবালিনীও জল ভরতে, স্নান করতে যায়. অথচ, এই সাধারণ পল্লী নিসর্গ সংস্থানটি একদিকে উপন্যাসের ঘটনা বিবর্তনে সহায়তা করেছে, অপরদিকে শৈবালিনীর মানস ক্রিয়া কিছুটা প্রতিফলিত করেছে।

'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দুতে আছে 'বারুনী' নামক একটি পুষ্করিণী। 'বিষবৃক্ষ', 'চন্দ্রশেখর', 'ইন্দিরা' ইত্যাদি গ্রন্থে অবস্থিত পল্লী জলাশয়গুলির তুলনায় 'বারুনীর' তাৎপর্য অনেক বেশি। বিশ্লেষকদের মতে বারুনী পুষ্করিণীর রোহিনী ও গোবিন্দলালের গভীর গোপন অন্তঃস্থলের একটি মুখর দর্পণ। শুধু এটিই নয়, বারুনী পুষ্করিণীর অপর বৈশিষ্ট্য বাংলা দেশের পল্লীগ্রামের সমাজচিত্র ফুটিয়ে তোলা। সুতরাং 'বারুনী' পুষ্করিণীর ভূমিকা এই উপন্যাসে দুটি দিক থেকেই ক্রিয়াশীল। প্রথমত কাহিনী বা ঘটনার ওপর প্রভাব সৃষ্টি, চরিত্রগুলির ওপর প্রভাব বিস্তার এককথায় কাহিনী বা ঘটনা সম্ভাবক ও চরিত্র নিয়ামক, দ্বিতীয়ত গ্রামের সমাজচৈতন্যের প্রতিফলক।

হরিদ্রাপুর গ্রামের জমিদার গৃহের উদ্যানবাটিকার শ্রীবর্দ্ধক জলাশয় 'বারুনী'। প্রথম খণ্ডের সপ্তম পরিচ্ছেদে ঔপন্যাসিক এই জলাশয়েরর সৌন্দর্য্যের একটি তদগত বর্ণনা দিয়েছেন। "পুষ্করিণীটি অতিবৃহৎ-নীলকাচের আয়নার মত ঘাসের ফ্রেমে আঁটা পড়িয়া আছে। সেই ঘাসের ফ্রেমের পরে আর একখানা ফ্রেম— বাগানের কেস-পুষ্করিণীর চারিধারে বাবুদের বাগান ....আর মাথায় ওপর আকাশ— সেও সেই বাগান ফ্রেমে আঁটা, সেও একখানা নীল আয়না।" 'বারুনী'

বিষবৃক্ষের জমিদার গৃহের দীর্ঘিকার মত সংরক্ষিত জলাশয় না। গ্রামের সর্বসাধারণের ব্যবহার্য্য পুষ্করিণী। প্রথম খণ্ডের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে 'বারুণী'র এই বৈশিষ্ট্যের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্র ইঙ্গিত করেছেন ঃ 'বাবুদের একটা বড় পুকুর আছে— নাম বারুণী, জল তার বড় মিঠা— রোহিণী সেইখানে জল আনিতে যাইত।'— সুতরাং উদ্যানদীর্ঘিকা হলেও 'বারুণী' পুষ্করিণীর একটি সামাজিক সত্তা আছে এর তীরে বিভিন্ন বয়স ও মানসিকতার গ্রাম্য নারী সমবেত হয়। গোবিন্দ লাল ও রোহিনীর অবৈধ সম্পর্কের নানা কল্পিত কাহিনী ঝি-চাকরাণীরা গ্রাম্য রমণীরা এই জলাশয়ের ঘাটেই সৃষ্টি ও পল্লবায়িত করে। "এইরূপে ক্ষীরোদা, পথে রামের মা, শ্যামের মা, হীরা, তারী, পারী যাহার দেখা পাইল তাহারই কাছে আপন মর্ম পীড়ার পরিচয় দিয়া পরিশেষে সুস্থ শরীরে প্রফুল্ল হৃদয়ে বারুণীর স্ফটিক বারিরাশি মধ্যে অবগাহন করিল।"[৭] ক্রমশঃ এই মিথ্যা রটনা ভ্রমরের কানে পৌছলে সে গোবিন্দলালের প্রতি সন্দিহান হয়, কিন্তু রোহিনীর কানে একথা পৌঁছলে ফল হয় মারাত্মক। সে ভ্রমরকেই তার কলঙ্কের মূল উৎস মনে করে ক্রুদ্ধ হয়ে প্রতিশোধ নিলে, ভ্রমর গোবিন্দলালের অপরাধ সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হয়ে তাকে মর্মান্তিক পত্র লেখে। যার প্রতিক্রিয়া কৃষ্ণকান্তের উইল উপন্যাসের কাহিনী দুর্ভেদ্য ও জটিল হয়ে ওঠে।— এই ভাবে 'বারুণী' উপন্যাসের ঘটনা কাহিনী নিয়ন্ত্রণে পরোক্ষ অংশ গ্রহণ করেছে।

প্রত্যক্ষ ভাবেও বারুণী পুষ্করিণী এই উপন্যাসের প্রধান ঘটনা সম্ভাবক হয়ে উঠেছে। গোবিন্দলালের প্রতি রোহিণীর প্রথম আকর্ষণ সৃষ্টি হয়েছে 'বারুণীর' পটভূমিতে। রোহিণীকে জলাশয়েব ঘাটে ক্রন্দনশীলা অবস্থায় দেখে, স্বাভাবিক দয়ার্দ্র চিত্তেই গোবিন্দলাল বাক্যালাপ করে, কিন্তু এর ফলেই গোবিন্দলালের প্রতি রোহিণীর প্রথম অনুরাগ সূচিত হয়। রোহিণীর সঙ্গে এই জলাশয়ের যে নিবিড় সম্পর্ক ছিল উপন্যাসের প্রথম খণ্ডের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদেই জানা গেছে। 'বৈকালে অন্যান্য কাজ শেষ হইলে, রোহিণী জল আনিতে যাইত। ..... রোহিণী একা জল আনিতে যায়।" উপন্যাসের প্রথম খণ্ডের পঞ্চম পরিচ্ছেদে হরলালের বিশ্বাসঘাতকায় রোহিনীর চোখে জল এসেছিল। এই নবীনবয়সী রূপসী বিধবা রমণী তার মনোদুঃখ একাকীই বারুণী পুষ্করিণীর জলে, পার্শ্ববর্তী নিসর্গ প্রকৃতির মধ্যে সঞ্চারিত করেছে ঃ "আবার কুহু ঃ কুহু ঃ কুহু ঃ। রোহিণী চাহিয়া দেখিল— সুনীল নির্মল, অনন্ত গগণ— নিঃশব্দ, অথচ সেই কুহুরবের সঙ্গে সুর বাঁধা। ...... দেখিল সরোবরতীরে গোবিন্দলালের পুষ্পদ্যান, তাহাতে ফুল ফুটিয়াছে....... সেই কুহু রবের সঙ্গে সুর বাঁধা। .... কোকিল আবার এক অশোকের উপর হইতে

৭. কৃষ্ণকান্তের উইল প্রথম খণ্ড একবিংশত পরি ঃ

ডাকিল "কুউ"। তখন রোহিণী .... কলসী জলে ভাসাইয়া কাঁদিতে লাগিল। কেন কাঁদিতে বসিল তাহা আমি জানি না। ..... তবে আমার বড়ই সন্দেহ হয়, ঐ দুষ্ট কোকিল রোহিণীকে কাঁদাইয়াছে।" এইবাবে বোহিণীব জীবন ঘটনার সঙ্গে বারুণী পুষ্করিণী ও পারিপার্শ্বিক নিসর্গ আশার্ঘ্যভাবে যুক্ত হয়ে যাচ্ছে। রোহিণীর অবচেতন মনে, সংক্ষিপ্ত জীবন বাসনার অগ্নিতে এই রারুণী পুষ্করিণীর পার্শ্বস্থ বৃক্ষের কোকিল যে সর্বনাশের ইন্ধন কিছুটা সঞ্চার করেছে — সেকথা অস্বীকার করা যায় না।

রোহিনীকে ভ্রমর বারুণী পুষ্করিণীতে ডুবে প্রাণত্যাগ করতে বলেছিল। ডুবন্ত রোহিণীকে পুষ্করিণী থেকে গোবিন্দলালই উদ্ধার করে, এবং সেই ঘটনা দ্বারাই উভয়ের মানসিক অবস্থার উন্মোচন হয়। পরস্পরের প্রতি গাঢ় বাসনাবদ্ধ হয় এবং ঐ জলাশয়ের পাশেই হয়েছিল। প্রথম খণ্ডের পঁচিশ সংখ্যাক পরিচ্ছেদে গোবিন্দলালও রোহিণীর বারুণীর তীরে সাক্ষাত হয়। গোবিন্দলালের হৃদয় এখান থেকেই ভ্রমরকে পরিত্যাগ করে রোহিণীর প্রতি ধাবিত হতে শুরু করেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র অতি সংক্ষেপে বিশদ ব্যাখ্যা দিয়েছেন ঃ কেবল এইমাত্র বলিব যে সে রাত্রে রোহিণী গৃহে যাইবার পূর্বে বুঝিয়া গেলেন যে, গোবিন্দলাল রোহিনীর রূপে মুগ্ধ।"

এইভাবে বারুণী পুষ্করিণী রোহিণী ও গোবিন্দলালের অবৈধ প্রণয়ের উৎস ও বিকাশ স্থল হয়ে উঠে উপন্যাস কাহিনীর ঘটনা বিবর্তনে এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছে।

নিছক ঘটনা স্বাভাবিক নয়, বারুণী এই উপন্যাসে চরিত্র প্রতিফলকও বটে। ঔপন্যাসিক স্বয়ং এই জলাশয়টিকে উপরস্থ আকাশের প্রতিফলক দর্পণ আখ্যা দিলেও পাঠক একে শুধুমাত্র বৃক্ষ ও আকাশের প্রতিফলক মনে করেন না। বারুণী প্রকৃতপক্ষে রোহিণী ও গোবিন্দলালের মানস ক্রিয়া প্রতিফলনের উপযুক্ত মাধ্যম, রূপে, স্বচ্ছ দর্পণ রূপে উপন্যাসের কেন্দ্র বিন্দুতে অবস্থান করে আছে।

প্রথম খণ্ডের সপ্তম পরিচ্ছেদে, সর্বপ্রথম রোহিনীর মানসতট বারুণীর স্বচ্ছ জলে ভেঙ্গে পড়েছে ঃ "রোহিণী কি ভাবিতেছিল বলিতে পারি না। কিন্তু বোধহয় ভাবিতেছিল যে কি অপরাধে এ বাল বৈধব্য আমার অদৃষ্টে ঘটিল? আমি অন্যের অপেক্ষা এমন কি গুরুতর অপরাধ করিয়াছি যে, আমি এ পৃথিবীর কোন সুখ ভোগ করিতে পাইলাম না। .... ঐ গোবিন্দলালবাবুর স্ত্রী আমার অপেক্ষা কোন গুণে গুণবতী কোন পুণ্যফলে তাহাদের কপালে এ সুখ আমার কপালে শূন্য? .... কিন্তু আমার সকল পথ বন্ধ কেন? আমার এ অসুখের জীবন রাখিয়া কি করি?" আবার, উইল চুরির জন্য রোহিণীর পাপবোধ বারুণীর ঘাটেই জন্মেছিল "…. রোহিণী ঘাটে উঠিয়া .... ধীরে ধীরে ঘরে যাইতে লাগিল। তখন ছলৎ ছলৎ

ঠনাক্। ঝিনিক্ বিনিকি ঠিন্! বলিয়া কলসীতে আর কলসীর জলেতে আর রোহিণীর বালাতে কথোপকথন হইতে লাগিল। আর রোহিণীর মনও সেই কথোপকথনে আসিয়া যোগ দিল— রোহিনীর মন বলিল— উইল চুরি করা কাজটা। জল বলিল ছলাৎ! রোহিণীর মন- কাজটা ভাল হয় নাই বালা বলিল— খিন্ খিনা—না! তা ত না— রোহিণীর মন— এখন উপায়? কলসী— ঠনক্ ঢনক্ ঢন্ — উপায় আমি, দড়ি সহযোগে।" কলসী— ঠন্ক ঢনক্ ঢন্— উপায় আমি, দড়ি সহযোগে।"[৮]

গোবিন্দলালের হৃদয় তল ও বারুণী তটে বারংবার উদ্ঘাটিত হয়েছে। রোহিনীর অসামান্য রূপ প্রভা বারুণীর জল তলকে যে আলো করে রেখেছে সেই কথা গোবিন্দলাল অনুভব করলেন—"দেখিলেন স্বচ্ছ স্ফটিক মণ্ডিত হৈম প্রতিমার ন্যায় রোহিণী জলতলে শুইয়া আছে। অন্ধকার জলতল আলো করিয়াছে"[৯] এই নিমজ্জিতা নারীকে উদ্ধার করে তার অপরূপ রূপ-লাবণ্য ও তার ব্যর্থতায় গোবিন্দলালের দুঃখ প্রকাশ এইভাবে বঙ্কিম লিখেছেন ঃ "গোবিন্দলালের চক্ষে জল পড়িল। বলিলেন, "মরিমরি! কেন তোমায় বিধাতা এত রূপ দিয়া পাঠাইয়াছিলেন, দিয়াছিলেন ত সুখী করিলেন না কেন? এমন করিয়া তুমি চলিলে কেন?" এই সুন্দরীর আত্মঘাতের তিনি নিজেই যে মূল— একথা মনে করিয়া তাঁহার বুক ফাটিতে লাগিল।"[১০]

ঘটনাচক্রে পরবর্তী সময়ে রোহিনী ও গোবিন্দলালের নামে অপবাদ রটনা ভ্রমরের কানে যাওয়ায়, সে গোবিন্দলালকে কঠিন পত্র লিখে পিতৃগৃহে চলে যায়। গোবিন্দ লাল সেই সময়ে ভ্রমরকে ভুলবার জন্য রোহিনীকে চিন্তা করতে শুরু করে, এবং সেই চিন্তা স্থল হয় সেই বারুণী পুষ্করিণী। "রোহিণীর কথা প্রথমে স্মৃতিমাত্র ছিল, পরে দুঃখে পরিণত হইল। দুঃখ হইতে বাসনায় পরিণত হইল। গোবিন্দলাল বারুণী তটে, পুষ্পবৃক্ষ পরিবেষ্টিত মণ্ডপ মধ্যে উপবেশন করিয়া সেই বাসনার জন্য অনুতাপ করিতেছিলেন।"[১১]

—এই ঘাটের পিচ্ছিল পথেই উভয়ের মোহমুগ্ধ অবৈধ জীবনের ইঙ্গিত বঙ্কিমচন্দ্র দিয়ে রেখেছেন।

উপন্যাসের শেষ পর্যায়ে ভ্রমরের মৃত্যুর পর (২য় খণ্ড, ১৫শ পরিচ্ছেদ) বারুণী পুষ্করিণী; গোবিন্দলালের অনুতাপ ও অনুশোচনা কাতর চিত্তের আশ্চর্য

৮. কৃষ্ণকান্তের উইল / ১ম খণ্ড / ৭ম পরি
৯. ঐ। পঞ্চদশ পরিঃ
১০. ঐ। ১ম খণ্ড/ ১৬ পরিচ্ছেদ
১১. ঐ। ১ম খণ্ড/ ২৫শ পরিচ্ছেদ

সফল এক প্রতিফলক হয়ে উঠে একটি জীবন্ত চরিত্রে পরিণত হয়েছে। জগৎ সংসারের ধারা যেমন অপরিবর্তিত, ব্যক্তি মানুষের সুখ-দুঃখের সংকীর্ণ হিসাব বিপুল পৃথিবী রাখে না, বারুণী পুষ্করিণীও তাই পূর্বের মতই প্রবাহিত। "বারুণীর গভীর কৃষ্ণোজ্জ্বল বারি রাশি জ্বলিতে ছিল"[১২] কিন্তু,— গোবিন্দলালের সাজানো সংসার যেমন তছনছ হয়ে গেছে, তেমনি বারুণী তীরস্থ উদ্যানও বিনষ্ট হয়ে গেছে। বারুণী এই পর্বে যেন গোবিন্দলালের বিবেক। তার শোক, দুঃখ, সুঃসহ অর্ন্তজ্বালা ও মনোবিকারের চিত্র বারুণীর পটভূমিতে আশ্চর্য্য সঙ্গতি লাভ করেছে। এই বারুণীর তীরে রোহিণীর সঙ্গে গোবিন্দলালের প্রথম সম্পর্ক। সেই রোহিণীকে স্বহস্তে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার পর এই জলাশয়ের তটেই রোহিণীর ছায়া শরীর, তার মৃত্যু সংকেত কিম্বা পত্নী ভ্রমরের জ্যোর্তিময়ী মূর্ত্তি উদয় যথার্থ মনোবিশ্লেষণের প্রকাশ এবং সংকেত বহ।

সুসজ্জিতা এবং সজ্জাহীনা বারুণী পুষ্করিণীর দ্বিবিধ রূপের আলেখ্য চিত্রণে লেখকের অনায়াস দক্ষতার পরিচয় মিলেছে, এইভাবে জড় পল্লী নিসর্গ মহৎ লেখকের লেখনীতে প্রাণবন্ত ও সক্রিয় শক্তিতে রূপান্তরিত।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে পল্লীসমাজ ও তার ভূমিকা

আধুনিক জীবনচেতনা সমৃদ্ধ, নাগরিক শিক্ষা ও রুচি সমৃদ্ধ বঙ্কিমচন্দ্রের মানস পরিমণ্ডলে বঙ্গপল্লীর প্রভাব যে ক্ষীয়মান হয়নি, সেকথা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। পল্লী ও নগর উভয়বিধ মানসিকতা আত্মীভূত করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। ফলে তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসে পল্লীবাসী বাঙ্গালীর মানসিকতা, জীবনাচরণের খুঁটিনাটি, এক কথায় গোটা পল্লীসমাজের চিত্র প্রায়ই অনিবার্যভাবে উপস্থিত হয়েছে।

কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়ের পটভূমিতে বঙ্কিমচন্দ্রের সমস্ত উপন্যাসগুলির ঘটনাকাল স্থাপিত নয়। বাংলাদেশে ইংরেজ শাসনের বহু পূর্বকাল থেকে আরম্ভ করে উনবিংশ শতাব্দীর যুগপট পর্যন্ত অবলম্বন করে তাঁর বিভিন্ন উপন্যাস রচিত। 'কপালকুণ্ডলা' মোগল আমলের বাংলাদেশ নির্ভর উপন্যাস। 'চন্দ্রশেখরে'র মত ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস রচিত হয়েছে অষ্টাদশ শতাব্দীর গ্রামবাংলার পটভূমিতে। এই পটভূমিতেই সৃষ্টি হয়েছে ইতিহাসাশ্রিত আদর্শমূলক উপন্যাস আনন্দমঠের কাহিনী। দেবীচৌধুরাণীর মত গার্হস্থ্য সমাজজীবন ভিত্তিক আদর্শ মূলক উপন্যাস উনবিংশ শতকের পটভূমিতে ও গ্রাম বাংলার মূল আশ্রয়ে বঙ্কিমচন্দ্র রচনা করেছেন 'বিষবৃক্ষ' কৃষ্ণকান্তের উইল— এই দুটি পূর্ণাঙ্গ

১২. ঐ। ২য় খণ্ড/ ১৫শ পরিচ্ছেদ

উপন্যাস। 'ইন্দিরা' কাহিনীর পটভূমিও উনবিংশ শতকের গ্রামবাংলার পটাশ্রিত, কিন্তু এর অধিকাংশ ঘটনাস্থল শহর কলকতা। 'রজনী' উনবিংশ শতাব্দীর নগর কলকতা-আশ্রিত মনঃস্তত্ত্ব মূলক উপন্যাস, কিন্তু এই নগর জীবনাশ্রয়ী উপন্যাসে ও পল্লীবাংলার কিছু নিজস্ব চিন্তাধারার প্রতিফলন ঘটেছে।

এখন বিচার্য্য বিষয় এই যে, যে যুগ পটভূমিকায় উপন্যাসগুলি স্থাপিত, সেই যুগের পল্লী সমাজ ঠিক কতখানি এগুলিতে প্রকাশিত বা তার দ্বারা উপন্যাসের মূল ভাববস্তু বা চরিত্রাবলী কতখানি নিয়ন্ত্রিত এককথায় পল্লীসমাজ বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে কোথাও কেন্দ্রীয় শক্তি হয়ে উঠতে পেরেছে— সেইটিই এ প্রসঙ্গে বিচার্য।

কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের পটভূমি কিঞ্চিতাধিক আড়াইশ বৎসর পূর্বের বাংলাদেশ, মোগল সম্রাট আকবর শাহের রাজত্বের শেষলগ্নের ঘটনা কালে কপাল কুণ্ডলার কাহিনী পরিবেশিত। সেই যুগের বাংলাদেশ ছিল সম্পূর্ণই গ্রাম ভিত্তিক। সুতরাং সেই সময় পটের পল্লীবাংলার সমাজ এই উপন্যাসে অল্পবিস্তর ছায়া বিস্তার করবে, এইটিই প্রার্থিত। উপন্যাস কাহিনীর পরিচালক শক্তি রূপে পল্লীসমাজ এ উপন্যাসে প্রমাণিত না হলেও লেখকের পল্লী-চেতনায় কিছু গৌণ উপাদান এখানে আছে এবং তার প্রকাশ ঘটেছে উপন্যাসে পল্লী সমাজের কিছু কিছু আচার আচরণ, রীতিনীতি, সংস্কার মানসিকতা ইত্যাদির মধ্যে।

উপন্যাসের সূত্রপাতে মধ্যযুগীয় পল্লীবাংলার একটি বিশেষ সামাজিক প্রবণতা লক্ষ্য করা গেল। গ্রামবাসীরা সম্মিলিতভাবে তীর্থযাত্রায় গিয়েছিল, তারপর প্রত্যাগমন করছে একত্রে। এই সম্মিলিত তীর্থযাত্রা বহু কালাবধি বাংলা পল্লীসমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অলিখিত প্রথা ছিল। উপন্যাসিক এ প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ "পর্তুগীজ ও অন্যান্য নাবিক দস্যুদিগের ভয়ে যাত্রীর নৌকা দলবদ্ধ হইয়া যাতায়াত করাই তৎকালের প্রথাছিল।"[১] গঙ্গাসাগরে সন্তান বির্সজন দান— এই গ্রাম্য সামাজিক কুপ্রথাটিও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে উপন্যাসের সূত্রপাত বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়েছেন— "একটি স্ত্রীলোক গঙ্গাসাগরে সন্তানবির্সজন করিয়া আসিয়াছিল, ছেলে জলে দিয়া আর তুলিতে পারে নাই,—সেই কেবল কাঁদিল না।"[২]

'কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের কাহিনীতে প্রাচীন বাংলা পল্লীসমাজের রীতিনীতির মধ্যে বেশ কয়েকটি বিশেষ প্রভাব সঞ্চার করেছে। কপালকুণ্ডলার ননদিনী শ্যামাসুন্দরীর বহু পত্নীক কুলীন স্বামীর উল্লেখ যেমন এখানে আছে, তেমনই সেই

১. কপালকুণ্ডলা প্রথম খণ্ড প্রথম পরিচ্ছেদ।
২. ঐ।

স্বামীকে বশ করবার জন্য সেই যুগীয় তুকতাকের পল্লী ধারণাটিও উল্লিখিত আছে। এবং এই 'ঔষধ' করবার জন্য বৃক্ষলতা খুঁজতে গিয়েই কপালকুণ্ডলা নবকুমারের মনে সূক্ষ্ম অভিমানের জন্ম দিয়েছে। এবং এই সূক্ষ্ম অভিমান বা ভুল বোঝাই নবকুমারের চিত্তে কপালকুণ্ডলার প্রতি ক্রমশঃ অবিশ্বাসের বীজ রোপণ করেছে।[৩] অবশ্য কাপালিক, পদ্মাবতী এই দুটি চরিত্র এই পরিস্থিতিতে উপযুক্ত ইন্ধন জুগিয়েছে।

তৎকালীন পল্লী-বাংলার সমাজ অনুশাসন অনুযায়ী নবকুমার প্রথমা স্ত্রী পদ্মাবতীকে পরিত্যাগ করেছিলেন; কেননা পদ্মাবতীর পিতা সপরিবারে মুসলমান সেনা কর্তৃক ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। ধর্ম সম্পর্কীয় এই স্পর্শ কাতরতা পল্লী বাংলার একটি বৃহৎ সামাজিক লক্ষণ। পর্তুগীজ জলদস্যু কর্তৃক বঙ্গপল্লীতে সুযোগ মত অবাধ লুণ্ঠন, এই সামাজিক চিত্র 'কপালকুণ্ডলা' চরিত্রের জীবন পরিচয়ের মধ্যে ফুটে উঠেছে। কপালকুণ্ডলা বাল্যকালে পর্তুগীজ জলদস্যুদের দ্বারা লুণ্ঠিত হয়েছিল। কপালকুণ্ডলার পরিচয় প্রদান কালে অধিকারী নবকুমারকে জানিয়েছেন ঃ "ইনি বাল্যকালে দুরন্ত খ্রীষ্টিয়ান তস্কর কর্তৃক অপহৃত হইয়া যান ভগ্ন প্রযুক্ত তাহাদিগের দ্বারা কালে এ সমুদ্রতীরে ত্যক্ত হয়েন।"[৪]

সপ্তদশ শতকের মধ্যযুগীয় পল্লীবাংলায় মন্ত্রতন্ত্র ইত্যাদি বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে দৈবশক্তির ওপর অসামান্য বিশ্বাস সর্বত্র বিস্তারিত ছিল। সর্বব্যাপী এই দৈববিশ্বাসের পল্লী-সংস্কার কপালকুণ্ডলা চরিত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। যাত্রাকালে গমনাগমন শুভ কিনা নির্ণয়ের জন্য দেবতার আশীর্বাদ কামনা করা এই রকম এই পল্লী-সংস্কার। কপালকুণ্ডলা ও নবকুমারের সঙ্গে বিদেশ যাত্রাকালে শুভাশুভ নির্ণয়ের জন্য দেবীর চরণে পুষ্প অর্পন করেছে এবং পুষ্পটি পদচ্যুত হওয়ায় আগামী জীবনের অমঙ্গল সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হয়েছে। এই বিশ্বাস মূলতঃ বঙ্গপল্লীর সামাজিক সংস্কার। 'অধিকারীর'র মত প্রায় সামাজিক ব্যক্তির সঙ্গে মিশবার ফলেই হয়তো কপালকুণ্ডলা এই সংস্কার জেনেছিল। এই সামাজিক পল্লী সংস্কার কপালকুণ্ডলার হৃদয়ে ক্রয়াশীল এক ব্যাপক বিস্তারী; গভীর ও দৃঢ়মূল মহাশক্তির প্রতি বিশ্বাসের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে হয়তো এক স্বতন্ত্র মহিমা লাভ করেছে, কিন্তু শ্যামাসুন্দরী যে দেবীর চরণ থেকে বিল্বপত্র ভ্রষ্ট হওয়ার সেই কাহিনী শুনে শিহরিত হয়। সেই শিহরণ পল্লীবাংলার সাধারণ নর-নারীর মর্মমূলে স্থিত সাধারণ ও ব্যাপক অন্ধ সংস্কার। ভারতবর্ষের জনজীবনের গভীরতায় যে দৈব বিশ্বাস আজও ক্রিয়াশীল, 'কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের সময়কালে সেই বিশ্বাস আরও গভীর ভাবেই বহমান ছিল।

৩. দ্রষ্টব্য— কপালকুণ্ডলা ও নবকুমারের কথোপকথন/ ৪র্থ খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ।
৪. কপালকুণ্ডলা/ ১ম খণ্ড / অষ্টম পরিচ্ছেদ।

অথচ একথাও ঠিক, তৎকালীন পল্লীসমাজ 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের কাহিনী ও চরিত্র বিকাশে মূল গুরুত্বপূর্ণ অংশ নেয়নি। তিনশ বৎসর পূর্বে মুসলমান শাসনাধীন গ্রাম বাংলায় হিন্দু সামাজিক প্রথায় নারী প্রায় অসূর্য্যাম্পর্শা ছিল। স্ত্রী স্বাধীনতার চেতনা বাষ্পাকারেও প্রকাশ পায়নি। জাতিরক্ষার বাড়াবাড়ি ছিল। সে যুগের পটভূমিতে তাই, 'কপালকুণ্ডলা'র মতো অরণ্য-দুহিতার পক্ষে সমাজে, সংসারে বিনা আলোড়নে স্থান পাওয়ার ঘটনাটি খুবই বিস্ময়কর। শ্বাশুড়ী ননদের সেই প্রাচীন পল্লী সামাজিক কাঠামোতে, কুলীন ব্রাহ্মণ পরিবারে বধূরূপে কপালকুণ্ডলার প্রতিষ্ঠা হয়েছে অথচ এবিষয়ে তৎকালীন পাড়াপ্রতিবেশী যা সমাজের কোনো সমালোচনা নেই বা ভ্রূক্ষেপ নেই— এ চিত্র সেই যুগপটে অসম্ভব বোধহয়।

পল্লীসমাজের ভূমিকা কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে তেমন সঞ্চারিত হতে পারিনি। সপ্তদশ শতকের বাংলা পল্লীসমাজে উপন্যাসের পটভূমি গড়ে ওঠায়, সেই সূত্রে বিক্ষিপ্তভাবে কোথাও কোথাও পল্লীসমাজের চিত্র দেখা যায়, সর্বত্র নয়। কিন্তু কপালকুণ্ডলার, আকাশপথে ভৈরবী দর্শনের ব্যাপারটির আলোচনা এ প্রসঙ্গে এসে যাচ্ছে। কেননা, অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃত কিছু দর্শন নাগরিক, যুক্তিবাদী মনের পরিচায়ক নয় বরং বিপরীতভাবে এই ধরনের চিন্তা গ্রাম-সমাজেই সুলভ। সপ্তদশ শতকের গ্রামবাংলার পটভূমিতে কপালকুণ্ডলা নামক তৎকালীন এক রমণীর পক্ষে আকাশপটে ভৈরবী দর্শন, অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। বিশেষত কপালকুণ্ডলার মানস মূলে গভীরভাবে দৈবী বিশ্বাস ছিল। এই ভৈরবী দর্শন কপালকুণ্ডলার পরবর্তী জীবনে বিরাট তাৎপর্য্যপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। বলা যায় পরবর্তী জীবন নিয়ন্ত্রণ করেছে। অবশ্য, একথা ঠিক কপালকুণ্ডলার দৈবী বিশ্বাস সংকীর্ণ পল্লী-আশ্রিত সাধারণ সামাজিক সংস্কার মাত্র নয়। মানবজীবনের জগত প্রবাহের অন্তরালে অবস্থিত অনিবার্য বিশ্বশক্তি চেতনাই এই বিশ্বাসের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশ্রিত। তথাপি, কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে তৎকালীন পল্লীসমাজের ভূমিকা বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে এই বিষয়টি আলোচনা যোগ্য।

চন্দ্রশেখর ঃ

কিঞ্চিৎ ইতিহাসাশ্রিত, রোমান্সধর্মী উপন্যাস চন্দ্রশেখরে অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা পল্লী সমাজ কিছুটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে।

উপন্যাসের সূত্রপাতে বঙ্কিমচন্দ্র প্রধান দুটি চরিত্র প্রতাপ ও শৈবলিনীর বাল্য প্রণয়চিত্র অঙ্কন করেছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে জানিয়ে দিয়েছেন তারা সম্পর্কে জ্ঞাতি বা নিকট বন্ধনযুক্ত। সুতরাং বিবাহে বাধা আছে। সামাজিক কারণে তৎকালীন পল্লীবাংলায় এই দুইজনের বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়ায় উভয়ের মিলনের আশা থাকেনি। এই ইঙ্গিতের দ্বারা ঔপন্যাসিক চন্দ্রশেখর উপন্যাসে প্রথম গ্রন্থিপাতের

মূলে তৎকালীন পল্লীবাংলার সামাজিক রীতিনীতির ওপর অংশত দায়িত্ব তুলে দিয়েছেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর বঙ্গপল্লীর সমাজচিত্র চন্দ্রশেখর উপন্যাসে বারংবার পাওয়া যাবে, এবং তা শুধুমাত্র চিত্রবৎ থাকবে না, কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঘটনা ও চরিত্র নিয়ামকের ভূমিকা লাভ করবে। যেমন, 'কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে পর্তুগীজ দস্যু কর্তৃক পল্লীবাংলার নর-নারী লুণ্ঠনের ঘটনার মত, অষ্টাদশ শতকে ইংরেজগণ কর্তৃক বঙ্গপল্লী- নারী হরণের ঘটনা 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। এখানে লরেন্স ফস্টার নামক এক ইংরেজ সেনা রূপমুগ্ধ হয়ে গভীর রাত্রিতে শৈবলিনীকে গৃহ থেকে লুণ্ঠন করে। আর, এ ধরনের ব্যাপারে পল্লীসমাজ নীরব দর্শক হয়েই থাকতো; তাই চন্দ্রশেখরের বাড়িতে ডাকাতি হওয়ার ঘটনা জেনেও গ্রামবাসীরা কেউ উদ্ধার কার্যে যায়নি। অথচ, এই রকম লুণ্ঠিতা হতভাগিনী নারীদের পুর্নগ্রহণের ব্যাপারে তৎকালীন পল্লীসমাজ কিন্তু কোনো রকম সহানুভূতি বা বিবেচনার পরিচয় মাত্র দিত না। এই করুণ নিষ্ঠুর পল্লীসমাজের বিধান বা রীতির দিকটি শৈবলিনী সুন্দরীর কাছে ব্যক্ত করেছে।[৫] লরেন্স ফস্টার কর্তৃক অপহৃত হয়ে শৈবলিনীর জীবন স্রোত এক সম্পূর্ণ নূতন ধারায় প্রবাহিত হল, কাহিনীতে জটিলতাও এসেছে, একথা ঠিক কিন্তু এই জটিলতা সৃষ্টিতে শৈবলিনীর মনোগত পরিকল্পনাই বেশি ক্রিয়াশীল। পল্লীসমাজের ভূমিকা নামমাত্র। বলা যায়, পল্লী সমাজের কঠিন রীতির দোহাই দিয়ে শৈবলিনী নিজ অভিপ্রায় (প্রতাপের সঙ্গে মিলনের চেষ্টা) সিদ্ধ করার কৌশলটি নিয়েছে।

এই উপন্যাসে তৎকালীন বঙ্গ-পল্লীসমাজ কয়েকটি ক্ষেত্রে ঘটনা কাহিনীর বাঁক পরিবর্তনে অথবা চরিত্র বিকাশে প্রভাব বিস্তার করতে পারতো, কেননা, গৃহ পরিত্যাগিনী, দস্যুলুণ্ঠিতা পত্নী শৈবলিনীকে, গোঁড়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিত চন্দ্রশেখর পুর্নগ্রহণ করতে চেয়েছে। কিন্তু দেখা গেল শৈবলিনীর গৃহত্যাগ বা তার উদ্ধার, প্রায়শ্চিত্ত এর কোনোটির মধ্যেই তৎকালীন বঙ্গ পল্লীসমাজ হস্তক্ষেপ করেনি। পল্লীসমাজ ধর্মভ্রষ্টা গৃহ-রমণীকে এত সহজে কিভাবে গ্রহণ করবে, বিশেষতঃ তৎকালীন সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে, চন্দ্রশেখরের উদার ও অগ্রসর মনের পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হতে হয়।

এই প্রসঙ্গে বলা যায় শৈবলিনীর স্বপ্নদর্শন ও মানসিক বিকারের (চতুর্থ খণ্ড, তৃতীয়, চতুর্থ পরিচ্ছেদ) মূলে মধ্যযুগীয় পল্লীবাংলার সামাজিক সংস্কার গভীরভাবে বিদ্যমান আছে, এবং সেই দিক থেকে বিচার করলে শৈবলিনীর হৃদয়ে স্বামীর

৫. শৈবালিনী.....চক্ষের জল মুছিয়া বলিল, 'আমি যাইব, —আমার স্বামী আমায় গ্রহণ করিবেন, কিন্তু আমার কলঙ্ক কি তখন ঘুচিবে'—চন্দ্রশেখর /১ম খণ্ড চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

প্রতি বিশ্বাসঘাতিনী হওয়ার জন্য অনুপাত, অনুশোচনা বা আত্মগ্লানি সৃষ্টি করেছে আবহমান কাল আগত বঙ্গীয় পল্লী সমাজের নারীর সতীত্বের, মূল্য বোধটি। কিন্তু পল্লীসমাজ এই ইতিহাসশ্রয়ী উপন্যাসের, মানবমনের বিচিত্র বর্ণচ্ছটার প্রান্তে প্রগাঢ় বর্তে নিজেকে প্রকাশিত করতে পারেনি। অষ্টাদশ শতকের বঙ্গ পল্লীসমাজ বিক্ষিপ্তভাবে উপন্যাসের ঘটনা কাহিনী ও চরিত্রাবলীকে প্রভাবিত করেছে, উপন্যাসের কেন্দ্রিয় শক্তি হয়নি।

বিষবৃক্ষ :

পল্লী বাংলার সমাজ চিত্র কতকাংশে প্রকাশিত হলেও 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসেও তাকে কেন্দ্রীয় ভূমিকায় অবস্থান করতে দেখি না। অথচ বাংলাদেশের পল্লীগ্রামের প্রেক্ষাপটে ঊনবিংশ শতকের ঘটনা কালে বিষবৃক্ষ উপন্যাস গড়ে উঠেছে। তৎকালীন সামাজিক সমস্যা এখানে আছে, সুতরাং, এই সূত্রে বঙ্গ-পল্লীসমাজ উপন্যাসের ঘটনা কাহিনী বিকাশে কিম্বা চরিত্র নিয়ন্ত্রণে অংশত দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারতো। কিন্তু তা হয়নি।

বিষবৃক্ষের কাহিনীর কেন্দ্রীয় সমস্যা বিধবা কুন্দনন্দিনীর প্রতি জমিদার নগেন্দ্রনাথের প্রণয় আকর্ষণ ও বিবাহকে অবলম্বন করে সৃষ্টি। 'বিষবৃক্ষ' বর্ণিত কাহিনীর ঘটনাকাল এদেশে বিধবা বিবাহ আইন প্রচলন হবার পর (১২৮০ বঙ্গাব্দে)।

কিন্তু আইন প্রণয়ন হলেও এই আইন হিন্দু সমাজে তৎক্ষণাৎ গৃহীত হয়নি। বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তরসূরী লেখক শরৎচন্দ্রের কালেও 'বিধবা বিবাহ' বাঙ্গালীর জীবনে একটি বড় আলোচ্য বিষয় ছিল। অথচ 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে জমিদার নগেন্দ্রনাথ কর্তৃক বিধবা কুন্দনন্দিনীকে বিবাহ করার ঘটনাটিতে বঙ্কিমচন্দ্র কোনোরূপ সামাজিক বাকবিতণ্ডার চিত্র মাত্র অঙ্কন করেননি। এই বিবাহ ব্যাপারে তৎকালীন পল্লীসমাজের প্রকৃতিকে তিনি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছেন। শুধুমাত্র বিভিন্ন চরিত্রের মানস আন্দোলনের চিত্রই এই ব্যাপারে বঙ্কিমচন্দ্র উপস্থিত করেছেন। পল্লীসমাজ, জমিদার নগেন্দ্রনাথের প্রাসাদ ফটকের অভ্যন্তরে দৃষ্টি নিপেক্ষ করেনি। সেই কারণে, বিধবা তরুণী কুন্দনন্দিনী, সূর্য্যমুখীর তিরস্কারে গৃহ ত্যাগ করে হীরার আশ্রয়ে একাধিক দিন অতিবাহিত করার পর প্রত্যাগমন করলেও তৎকালীন পল্লীসমাজ এই নিয়ে আলোড়ন হয় না। কুন্দের জন্য দেবেন্দ্রর স্ত্রীরূপ ধারণ, দারোয়ানদের কাছে ধরা পড়ার ঘটনা নিয়েও গোবিন্দপুর গ্রামের সমাজ মুখর হয় না। অথচ, সেইটিই ছিল স্বাভাবিক।

পল্লী সামাজিক প্রবণতা বা প্রতিবেশকে বঙ্কিমচন্দ্র বিষবৃক্ষ, কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের কাহিনীর চৌহদ্দিতে প্রাধান্য দেননি। একথা ঠিক, সামান্য চিত্র রূপে এগুলি নগেন্দ্রনাথের অন্তঃপুরের রন্ধনশালায় বা মেঘে মজলিসে গ্রাম্য রমণীদের

পরচর্চা, পরনিন্দা কিম্বা কলহপ্রিয়তা বর্ণনার মধ্য দিয়ে স্থান করে নিয়েছে মাত্র। তৎকালীন বঙ্গপল্লীর সমাজে জমিদারের অপ্রতিহত লাম্পট্য দেবেন্দ্র চরিত্রের কার্যাবলীর মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। উপন্যাসের মধ্যে পল্লীসমাজ খুব গভীর প্রভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়নি, এটি অনায়স লক্ষ্য। তবে কুন্দ চরিত্রের ওপর বঙ্গপল্লীর সামাজিক সংস্কার হয়তো কিঞ্চিৎ আধিপত্য বিস্তার করেছিল। এবং কিয়ৎ পরিমাণে কুন্দর জীবন-ধারা নিয়ন্ত্রিত করেছে। উপন্যাসের প্রথমে যখন প্রথম কুন্দকে দেখা যায়, তখন তার একটি স্বপ্ন দর্শনের বর্ণনা উপন্যাসিক বিশদভাবে লিখেছেন। এই স্বপ্নে কুন্দনন্দিনীর মাতৃ-আবির্ভাব এক তাঁর নির্দেশাবলী কুন্দের জীবনে সম্পূর্ণ মিলে গিয়েছে। কুন্দের জবীনের শেষ ভাবে পুনরায় এই স্বপ্নে মাতৃদর্শন ও মাতৃনির্দেশ মিলেছে। কুন্দ এইবার তার মাতৃনির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে। কাহিনী সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলেও এই অতিপ্রাকৃত সামাজিক পল্লীজনোচিত সংস্কার কুন্দের হৃদয়ের গভীরে বিদ্ধ হয়েছিল। তার মানসিক দুর্বলতার সুযোগে, পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে শেষ মুহূর্তে এই স্বপ্নদৃশ্য পুনরাবৃত্ত হয়েছিল— কুন্দের মৃত্যুকামনাকে জাগ্রত করেছিল।

এইভাবে কোনো কোনো চরিত্রের গূঢ় সংস্কারের মধ্য দিয়ে পল্লীমানসিকতাকে বেগে অথচ সীমিত পরিসরে উৎসারিত করে দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র সেই সেই চরিত্রের অভ্যন্তর গঠন চিনিয়ে দিয়েছেন।

ইন্দিরা ঃ

কাহিনী পটভূমিরূপে বাংলাদেশের পল্লীগ্রাম এ-কাহিণীতে বিশিষ্ট স্থান নিয়েছে। বঙ্গীয় পল্লীসমাজের নানান রীতিনীতি, আচার ব্যবহার, সংস্কার এখানে প্রতিফলিত হয়েছে, গ্রামীণ রসরুচিরও সাক্ষাত এই কাহিনীতে পাওয়া যায়; তবুও পল্লীসমাজ উপন্যাসের কাহিনী নিয়ন্ত্রণে বা চরিত্র বিকাশে প্রধান ভূমিকায় অবস্থিত নেই।

এ কাহিনীর নায়িকা ইন্দিরার মুখ থেকেই জানা যাচ্ছে এই কাহিনীর সূত্রপাত পল্লীবাংলায়।— "আমার শ্বশুর বাড়ি মনোহরপুর। আমার পিত্রালয় মহেশপুর। উভয় গ্রামের মধ্যে দশ ক্রোশ পথ।" গ্রামের দীঘি থেকেই কাহিনীর জটিলতা শুরু। "পথে কালাদিঘী নামে বৃহৎ দীর্ঘিকা আছে........ মাঠের উপরে একখানি দোকান আছে মাত্র, নিকটে যে গ্রাম আছে তাহারও নাম কালাদীঘি,"[৬]

নায়িকা ইন্দিরা স্বামীগৃহে গমনকালে এই দীঘির পাড়ে ডাকাতদল কর্তৃক আক্রান্ত ও লুণ্ঠিত হয়। উনবিংশ শতকের বঙ্গপল্লীতে একটি পরিচিত সামাজিক দুর্ঘটনার চিত্র এই ডাকাতি। পল্লীগ্রামের এই বিশ্বাস্য সামাজিক দুর্ঘটনার দ্বারাই

৬. ইন্দিরা / দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অতঃপর নায়িকার জীবন কাহিনী নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। সুতরাং এই ডাকাতির প্রভাব কাহিনীর প্রারম্ভেই পাঠক অনুভব করবেন।

একথা ঠিক, 'ইন্দিরা' কাহিনীতে পল্লীসমাজ অতঃপর আর কোনো ভাবে কেন্দ্রীয় ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত হয়নি, বরং বলা যায় নগরজীবন কেন্দ্রীক ভাব ভাবনা দ্বারাই কাহিনী পরিচালিত হয়েছে, তথাপি এই গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্র তৎকালীন বঙ্গ পল্লীর এমন কিছু অকৃত্রিম রস-রুচি ও প্রবণতার সরস চিত্র অঙ্কন করেছেন, যা পাঠকের মনকে আকর্ষণ করবে।

'ইন্দিরা' যে যুগের কাহিনী, সেই যুগে পল্লীবাংলায় একটি সামাজিক একাত্মতা বোধ গ্রামীণ গৃহস্থদের মধ্যে বর্তমান ছিল। তাই কোনো সংসারের জামাতার সঙ্গে সেই গ্রামের সমস্ত রমণীকূলের এক অলিখিত গূঢ় সম্পর্ক থাকতো। সেই সম্পর্ক রঙ্গ-রসিকতার অম্লমধুর সম্পর্ক। কোনো গৃহে জামাতার আগমণ ঘটলে তাকে ঘিরে পল্লীর বিভিন্ন বয়সের রমণীরা রঙ্গরসিকতার আয়োজন করতেন। আদর, যত্ন, খাওয়াদাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জামাতা ঠকানোর বিপুল আয়োজন তৎকালীন বাংলা পল্লীসমাজে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। 'ইন্দরা কাহিনীতে সাবেক বাংলাদেশের পল্লী রমণীদের এই সামাজিক প্রথা বঙ্কিমচন্দ্র যেন ঈষৎ মনোযোগ সহকারে নিঁখুত ভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ "....দলে দলে পাড়ার মেয়েরা আসিয়া সন্ধ্যার পর আমার স্বামীকে ঘেরিয়া লইয়া মজলিস করিয়া বসিল।...........পাড়ার যমুনা ঠাকুরাণী সভাপত্নী হইয়া জমকাইয়া বসিয়া আছেন।.... শরীরের ব্যাস ও পরিধি অসাধারণ দেখিয়া আমার স্বামী তাঁহাকে 'নদীরূপা' মহিষী বলিয়া ব্যঙ্গ করিতেছেন। .... প্রতিশোধার্থ তিনি আমার স্বামীর সম্মুখে আমাকে প্রকারান্তরে 'গাই' বলিলেন,"[৭] কিম্বা আর একটি উদাহরণ ঃ 'পাড়ার পিয়ারী ঠান দিদি, জাতিতে বৈদ্য–– বয়স পঞ্চাশ-ষাট বৎসর, ...তিনি সর্বাঙ্গে অলঙ্কার পরিয়া ঘাঘরা পরিয়া রাধিকা সাজিয়া আসিয়াছেন। আমার স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া কৃষ্ণ কৈ? কৃষ্ণ কৈ? বলিয়া সেই কামিনী কুঞ্জ বন পরিভ্রমণ করিতেছেন। ....কামিনী বলিল, 'ঠানদিদি সকল জাতেই জাত দিয়াছ নাকি?'[৮] সমবেত নারী সমাজের বাক্যে রস-রসিকতায়, ভাষায়, একশ বৎসর পূর্বের বঙ্গপল্লীর এই সামাজিক বৈশিষ্ট্যটি পরিস্কারভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এই রকম রস-রসিকতা, বিবাহ বা অন্যান্য উৎসবাদি উপলক্ষ্যেও সেযুগের পল্লীসমাজের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হিসেবে রক্ষিত হত। মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যগুলিতে এই চিহ্ন পাওয়া যায়। কালিদাসের রঘুবংশেও সদৃশ সামাজিক প্রথা পাওয়া যায়। ——

৭. ইন্দিরা / একবিংতিতম পরিচ্ছেদ।
৮. একবিংশতিতম পরিচ্ছেদ, ইন্দিরা

কৃষ্ণকান্তের উইল ঃ

উপন্যাস কাহিনীতে জটিল আবর্ত সৃষ্টি করতে বা চরিত্রগুলির ভাবমণ্ডলে প্রভাব মুদ্রিত করতে বঙ্গ-পল্লীসমাজের একটি স্পষ্ট ভূমিকা অনুভব করা যায় 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসে। '.....কৃষ্ণকান্তের উইল এর অপর লক্ষণীয় বিষয় বাংলাদেশের পল্লীগ্রামের মধ্যবিত্ত সমাজের জীবন ধারার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়। এই পরিচয় পুস্তকের প্রত্যেক পরিচ্ছেদে ছড়াইয়া আছে। শুধু জমিদারের কাছারিবাড়ি নয়, গ্রামের পোষ্ট অফিস, মেয়েমজলিস, এমনকি চাষী ও ভৃত্যদের পরস্পর কথোপকথনের এমন নিখুঁত ছবি তিনি আঁকিয়াছেন যে, মনে হয়, তিনি আজীবন এই গুলোর মধ্যেই বাস করিয়াছেন।'[৯]

কিন্তু নিছক চিত্র নয়, পল্লীবাংলার সমাজ স্বয়ং সক্রিয়ভাবে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের ঘটনা কাহিনী বিবর্তনে কিম্বা চরিত্রাদির ওপরে কতখানি প্রধান্য বিস্তার করেছে, সে তথ্য উপন্যাস বিশ্লেষণেই উদঘাটিত হবে।

উপন্যাস কাহিনীতে, নায়ক গোবিন্দলাল ও তার স্ত্রী ভ্রমরের শান্তময় জীবনের বিধবা নারী রোহিণীর আগমণেই জটিলতার জন্ম। এই জটিলতার মূলে পল্লীসমাজ কার্যত কিন্তু ভূমিকা নিয়েছে। প্রথমত জমিদার কৃষ্ণকান্ত যে উইলখানি প্রথমে লেখেন, সেখানে তাঁর উচ্ছৃঙ্খল পুত্র হরলালকে সামান্য সম্পত্তির অংশ দেওয়া হয়। সেই উইল চুরি এবং জাল উইল স্থাপিত করবার জন্যই রোহিণীকে হরলাল নিয়োগ করে। সম্পত্তির অংশ পুত্র-পৌত্রাদিকে দানপত্র করে দেওয়ার পল্লীর একটি বিশিষ্ট সামাজিক প্রথা। শুধু পল্লীর নয়, সমস্ত সম্পত্তিবান ব্যক্তিরাই এই প্রচলিত সামাজিক প্রথা অল্পবিস্তর পালন করে গ্রাম-কেন্দ্রিক সাবেক বাংলাদেশের গ্রাম্য জমিদারদের উইল করা বা উইল নিয়ে অংশীদারদের মধ্যে জাল-জুয়াচুরী, মামলা মকদ্দমার চিত্র যথেষ্টই জানা আছে। এখনও এরকম ঘটনা দুর্লভ নয়। তবে উইল জাল, উইল চুরি, কারচুপি—এসব ঘটনা শুধুমাত্র গ্রামের নিজস্ব ঘটনা নয়, অর্থ বা সম্পত্তির জন্য এই নীচতা সবখানেই দেখা যায়। যাইহোক, পল্লীগ্রামের এক দোর্দন্ড প্রতাপ জমিদার কৃষ্ণকান্ত রায় সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গকে সাক্ষী রেখে তাঁর সম্পত্তি বিলি ব্যবস্থায় যে সামাজিক দলিল রচনা করেন, সেই উইলটিই এই উপন্যাসের কাহিনীতে প্রথম অশান্তির সৃষ্টি করেছে। এই চুরি উপলক্ষ্যে রোহিণী ধরা পড়েছে এবং গোবিন্দলালের সঙ্গে সাক্ষাতকারের সময় সে অকপটে গোবিন্দলালের প্রতি তার আকর্ষণের কথা ব্যক্ত করেছে। এই

৯. বঙ্কিমচন্দ্রে কৃষ্ণকান্তের উইলের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সংস্করণের ভূমিকা থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে / প্রাপ্তিস্থান নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি কর্তৃক স্বক্ষরতা প্রকাশন থেকে প্রকাশিত বঙ্কিম রচনা সংগ্রহের ভূমিকা পৃ:-২৩।

ঘটনা গোবিন্দলালের হৃদয়ের কিছু প্রভাব সঞ্চার করেছে।

দ্বিতীয়তঃ গোবিন্দলাল, ভ্রমরের জীবনে জটিলতা সৃষ্টির জন্য গ্রাম্য সমাজ প্রত্যক্ষ ভূমিকা নিয়েছে। পরচর্চা, পরনিন্দা, অথবা কলঙ্ক রটনা ইত্যাদি পল্লীবাংলার সামাজিক প্রবণতা। গোবিন্দলাল প্রথমাবধিই স্ত্রী ভ্রমরকে ত্যাগ করে রোহিণীতে আসক্ত হননি। ঘটনাচক্রে বারুণী পুষ্করিণীতে নিমজ্জিতা রোহিণীকে তিনি উদ্ধার করেন। (এই পুষ্করিণীতে নিমজ্জনের ব্যাপারটিও গ্রাম্য সামাজিক প্রথা। কলঙ্ক হলে পল্লীবাংলার সমাজে নারীদের 'দড়ি কলসী' অর্থাৎ জলে প্রান বিসর্জনই প্রধান পরিত্রাণের মাধ্যম। রোহিনী গোবিন্দলালেব প্রতি আসক্ত জেনে ক্রুদ্ধ ভ্রমর দাসীকে দিয়ে তাকে ঐভাবে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে কলঙ্ক মোচন করতে বলে পাঠায়, তার ফলে ঘটনার বিবর্তন)। রোহিনীকে গোবিন্দলাল উদ্ধার করায় সেই ঘটনাটি বিকৃত হয়ে নানা ভাবে পল্লবিত হয়ে রোহিণী ও গোবিন্দলালের কলঙ্ককথা হয়ে দাঁড়ায়। "যে সূর্য্যের নবীন কিরণ তেজস্বী না হইতেই ক্ষীরি প্রথম ভ্রমরের সাক্ষাতে রোহিনীর কথা পড়িয়াছিল, তাঁহার অস্তগমনেব পূর্বেই গৃহে গৃহে ঘোষিত হইল যে রোহিনী গোবিন্দলালের অনুগৃহীত।"[১০] ক্ষুদ্র পল্লীসমাজের এই আলোচনা শ্রীঘ্রই রোহিণীর কানে পৌঁছিয়েছে। রোহিণীর মনে হয়েছে তার কলঙ্ক রটনাকারিণী ভ্রমরই। তাই রোহিনী ভ্রমরকে মানসিক শাস্তি দেওয়ার জন্য গোবিন্দলালের সঙ্গে নিজের অবৈধ সম্পর্কের মিথ্যা কল্পিত কাহিনী ভ্রমরকে জানিয়ে আসে। এর ফল হয় সাংঘাতিক। যা ভ্রমর এবং গোবিন্দলালের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাওয়ার প্রথম পদক্ষেপ স্বরূপ। কেননা, রোহিণীর ঐ হীন নির্লজ্জতায় ভ্রমর অভিমানে অন্ধ হয়ে স্বামীর বিশ্বস্ততায় সন্দিহান হয়ে পত্র লেখে এবং পিত্রালয়ে চলে যায়। গোবিন্দলাল পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলী কিছুই না জেনে, ভ্রমরের এই কার্যে তার প্রতি বিরূপ হয়ে ওঠে। ক্রমশ উপন্যাসের ঘটনা কাহিনী অনিবার্যভাবে ঐ পথেই প্রভাহিত হত।

'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের ঘটনাও চরিত্রাবলীকে যে বাহ্যশক্তিগুলি নিয়ন্ত্রিত করেছে পল্লী-নারীসমাজের এই পরচর্চা বা মিথ্যা রটনা প্রবণতা তার মধ্যে অন্যতম প্রধান। এছাড়া তৎকালীন বঙ্গপল্লীর অন্যতম সামাজিক শক্তি জমিদারের প্রতাপ এই উপন্যাসের শেষাংশ বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছে। ভ্রমরের পিতা মাধবানাথের কথা ও কার্য্যাবলী এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। সে কন্যা ভ্রমরের দুর্গতি দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে রোহিনীর সর্বনাশ সাধনে প্রবৃত্ত হয়েছে। উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ডেব দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ থেকে একেবারে ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত ঘটনা কাহিনীর বিচিত্র বাঁক পরিবর্তনে জমিদার মাধবানাথ তার সামাজিক শক্তিকে প্রয়োগ

১০. কৃষ্ণকান্তের উইল / প্রথম খণ্ড / একবিংশতিতম পরিচ্ছেদ।

করেছেন। রোহিনীকে বিপথগামী করবার জন্য নিশানাথকে প্রাসাদপুরে পাঠিয়েছেন এবং তার কার্যকারিতায় গোবিন্দলাল শেষ পর্যন্ত রোহিণীকে হত্যা করেছে।

আনন্দমঠ ও দেবী চৌধুরাণী ঃ

অষ্টাদশ শতাব্দীর পল্লীবাংলার প্রেক্ষাপটে এই উপন্যাস দুটি রচিত। এই দুটি উপন্যাসে ঔপন্যাসিক তৎকালীন বাংলাদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক চিত্র অঙ্কন করেছেন। তার ফলে তৎকালীন পল্লীবাংলার বাহির ও অভ্যন্তর দ্বিবিধ পরিচয় এ দুটি উপন্যাস মোটামুটি পাওয়া যায়। শুধু পরিচয় নয়, তৎকালীন পল্লীবাংলার অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ এই দুটি উপন্যাসের মূল কাহিনী ও চরিত্রের মূল উৎস।

১১৭৬ বঙ্গাব্দে হেষ্টিংস এর সময়ে বাংলা দেশে প্রবল মন্বন্তরের ফলে গ্রামীণ অর্থনৈতিক কাঠামোতে ভাঙ্গন দেখা দেয়। বাংলাদেশের তখন মূলতঃ কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি। ঐ মন্বন্তরে কৃষির বিনষ্টির ফলে সমগ্র গ্রামবাংলা শ্মশানে পরিণত হয়। সেই দুর্ভিক্ষ ক্লিষ্ট বাংলাদেশের গ্রাম জীবনের এক সত্যচিত্র বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠ উপন্যাসে উপস্থিত করেছেন। "..... লোকে প্রথমে ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল, তারপরে কে ভিক্ষা দেয়। উপবাস করিতে আরম্ভ করিল, তারপেব রোগাক্রান্ত হইতে লাগিল। গরু বেচিল, লাঙ্গল জোয়াল বেচিল, বীজধান খাইয়া ফেলিল। ......তারপর মেয়ে বেচিতে আরম্ভ করিল।......." ইত্যাদি। এই দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র মজুমদার, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন জেমস মিলের দ্বারা স্বীকৃত।[১১] বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের বর্ণনার সঙ্গে বিখ্যাত ঐতিহাসিক হান্টারের উক্তি সম্পূর্ণ মিলে যায়।[১২] আচার্য্য যদুনাথ সরকারের উদ্ধৃতি ও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।[১৩]

১১. 'এই দুর্ভিক্ষের ফলে দেশের একতৃতীয়াংশ অর্থাৎ এককোটি লোকের মৃত্যু হয়।' রমেশচন্দ্র মজুমদার বাংলা দেশের ইতিহাস। জেমস মিলের ভাষায়— More than a third of the inhabitant of Bengsl were computed to have been destroyed."

১২. All thought the stifliing Summer of 1770 people went on dying. The husband men sold their cattle; they sold their sons and daughters till at length no buyer of children could be found, they ate the backs of trees and the grass of the field; and june 19770 the Resi dent of the durbar affirmed. that the living were feeding on the dead.......": (w.w. hunter Annals of Rural bengal. Vol 1 page 26-27)

১৩. এই গ্রন্থে সেই যুগের রাজনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থা ঠিক প্রতিফলিত হইয়াছে এবং ইহার প্রধান ঘটনাটি নিছক সত্য, ইতিহাস হইতে আগাগোড়া ধার করা।"

এই দুর্ভিক্ষপীড়িত পল্লীবাংলাকে তৎকালীন শাসনকর্তারা কিন্তু রেহাই দেয়নি। মহম্মদ রেজা খাঁ 'একেবারে শতকরা দশটাকা রাজস্ব বাড়াইয়া দিল।' বঙ্কিমচন্দ্র মর্মস্পর্শী ভাষায় লিখেছেন ঃ "বাংলায় বড় কান্নার কোলাহল পড়িয়া গেল।" এ সম্পর্কে Oxford History গ্রন্থে ভিনসেন্ট স্মিথের বক্তব্য স্মরণীয়[১৪] আনন্দমঠের সন্ন্যাসী বিদ্রোহকে তৎকালীন পল্লীবাংলার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের অগ্নিগর্ভ বিদ্রোহ রূপেই বঙ্কিমচন্দ্র প্রতিফলিত করেছেন।

মন্বন্তর ক্লিষ্ট পল্লীবাংলার ক্ষুধার্ত মানুষ দলে দলে ডাকাতির জীবিকা নিয়েছিল মরিয়া হয়ে। এইরকম একদল ক্ষুধার্ত ডাকাতের হাতে কল্যাণী ধৃত হয়। এই ঘটনাতেই উপন্যাস কাহিনীতে প্রথম জটিলতার সৃষ্টি হয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসে। আনন্দমঠ উপন্যাসে পল্লী সমাজ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে অবস্থিত হয়েছে বলা যায়। ছোট ছোট কয়েকটি মুহূর্তে সামাজিক রীতি-নীতি ও ভাব-ভাবনার প্রতিফলন আকস্মিকভাবে ঘটেছে তাও দেখা যায়। প্রথম খণ্ডের পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে জীবানন্দের ভগিনী নিমাইমনি জীবানন্দকে তার স্ত্রী শান্তির সঙ্গে সাক্ষাত করানোর জন্য যেভাবে অনুনয় করে, সেখানে পল্লীসমাজেব নর-নারীর পারিবারিক জীবনের বন্ধন সম্পর্কের প্রতি গভীর মমতা পূর্ণ দৃষ্টিপাতের চিহ্ন অনায়াসে ফুটে ওঠে। ......"নিমাই গিয়া দ্বারে দাঁড়াইল, দ্বারের কবাট রুদ্ধ করিয়া, দ্বারে পিঠ দিয়া বলিল, আগে আমায় মেরে ফেল, তবে তুমি যাও। বউ-এর সঙ্গে দেখা না করে তুমি যেতে পারবে না।"[১৫] জীবানন্দ, অতঃপর শান্তির সঙ্গে সাক্ষাত করে এবং ফল স্বরূপ আনন্দমঠ উপন্যাসের কাহিনীতে আবার নতুন গতি সঞ্চার হয়।

এই পরিচ্ছেদেই অতঃপর ভ্রাতৃবধূ শান্তিকে স্বামীসন্দর্শনে পাঠাতে গিয়ে নিমাইমণির যে আচরণ প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে দীর্ঘদিন পরে পতি-পত্নীর মিলনের জন্য বঙ্গ পল্লী-রমণীর সামাজিক রীতি-আচরণ পরিলক্ষিত হয়। সে তার ভ্রাতৃবধূ শান্তির রুক্ষ্ম চুল তৈলসিক্ত করে খোঁপা বেঁধে দেয়, ঢাকাই শাড়ি পরাবার জন্য জেদ করে নিমাই ভাণ্ড হইতে তাড়াতাড়ি অঞ্জলি অঞ্জলি তৈল লইয়া সেই স্ত্রীলোকের মাথায় মাখাইয়া দিল। তাড়াতাড়ি একটা চলনসই খোঁপা বাঁধিয়া দিল। তারপর তাহাকে এক কিল মারিয়া বলিল, "তোর সেই ঢাকাই কোথা আছে

১৪. ভিনসেন্ট স্মিথের Oxford dictionary তে আছে, রেজা খাঁ — "did not worry about ther suffering of the people. He Collected the revenue almost in full and added 10 percent for 1771".

১৫. আনন্দমঠ/ প্রথম খণ্ড/ পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

বল।" ....তখন নিমাই ....বলিল, "দাদা এসেছে, তোকে যেতে বলেছে,"[১৬] এই দৃশ্যটির মধ্যে পল্লী বাংলার সমাজ জীবনের ননদ ও ভ্রাতৃবধূর সুন্দর, প্রেমপূর্ণ সম্পর্কের ইঙ্গিত যেমন পাওয়া যায়, তেমনি পাওয়া যায়, বিরহিনী ভ্রাতৃবধূকে দীর্ঘদিন পর স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার উপযুক্ত বেশ বিন্যাসের সামাজিক রীতি-আগ্রহটির চিত্র।

এছাড়াও তৎকালীন সমাজে যে স্ত্রী স্বামীচেতা রীতিমত অসম্ভব বা নিন্দনীয় ব্যাপার ছিল সেকথাও বঙ্কিমচন্দ্র জানিয়েছেন শান্তির জীবনের পূর্বকথা শোনাতে গিয়ে। শান্তির গৃহবধূসুলভ আচরণ প্রথম জীবনে না থাকাতে শশুরবাড়ীর শাসন সহ্য করতে হয়েছে। এবং সেই শাসন অসহ্য হওয়ায় শান্তি গৃহত্যাগ করে। পুনর্বার গৃহে গ্রহণ করতে রাজী হয়নি, জাত রক্ষার ভয়ে, ".......কিন্তু শাশুড়ী তাহাকে গৃহে স্থান দিলেন না,— জাতি যাইবে।"[১৭] এর ফলে জীবানন্দ স্ত্রীসহ অন্যত্র বসবাস করতে থাকে। এই রকম ভাবে আদর্শ গভীর আনন্দমঠ উপন্যাসে পল্লীসমাজ খণ্ড চিত্র হ'য়ে কখনো, কখনো গভীর ব্যাপক প্রভাব সঞ্চারী রূপে স্থান করে নিয়েছে।

গভীর দার্শনিক বক্তব্যের ফাঁকে ফাঁকে দেবী 'চৌধুরাণী' উপন্যাসে অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলাদেশের পল্লীর সমাজচিত্র দৃষ্ট হয়। কেননা, এই উপন্যাসের চরিত্রগুলির জীবনের প্রকাশ ও বিকাশ ঘটেছে পল্লী বাংলায়। পল্লীবাংলার সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক চিত্র, গ্রাম্যচরিত্র ও মানসিকতা অনিবার্য্য ভাবে এখানে উপস্থিত হয়েছে এবং কাহিনী ও চরিত্রে প্রভাব বিস্তার করেছে। হেস্টিংস এর আমলে বাংলাদেশে ইজারাদার দেবীসিংহের ও কোনো কোনো ভূম্যধিকারীর অত্যাচারে পল্লীবাসী বাঙ্গালীর জীবন কিরূপ দুর্বিসহ হ'য়ে উঠেছিল তার সত্য বিবরণ দেবীচৌধুরাণী উপন্যাসে ভবানী পাঠকের মুখ থেকে পাওয়া যাচ্ছে ঃ [১৮] "কাছারির কর্মচারীরা বাকিদারের ঘরবাড়ী লুঠ করে, লুকানো ধনের তল্লাসে ঘর ভাঙ্গিয়া, মেঝ্যা খুঁড়িয়া দেখে, পাইলে এক গুণের জায়গায় সহস্রগুণ লইয়া যায়, না পাইলে মারে, বাঁধে, কয়েদ করে, পোড়ায়, কুড়ুল মারে, ঘর জ্বালাইয়া দেয়, প্রাণবধ করে। সিংহাসন হইতে শালগ্রাম ফেলিয়া দেয়, শিশুর পা ধরিয়া আছাড় মারে, যুবকের বুকে বাঁশ দিয়া ডলে, বৃদ্ধের চোখের ভিতর পিঁপড়ে, নাভিতে পতঙ্গ পুরিয়া বাঁধিয়া রাখে। যুবতীকে কাছারিতে লইয়া গিয়া সর্বসমক্ষে উলঙ্গ করে, মারে, স্তন কাটিয়া ফেলে, স্ত্রীজাতির যে শেষ অপমান, চরম বিপদ সর্ব্বসমক্ষে তাহা প্রাপ্ত করায়।"

১৬. আনন্দমঠ / প্রথম খণ্ড / পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।
১৭. আনন্দমঠ / দ্বিতীয় খণ্ড / ১ম পরিচ্ছেদ।
১৮. দেবী চৌধুরাণী / প্রথমখণ্ড / ১৬শ পরিচ্ছেদ।

এই দুঃশাসনের যুগে গ্রাম বাংলায় চুরি, ডাকাতি, এক স্বাভাবিক সমাজচিত্র ছিল। সেই দিক থেকে দেবী চৌধুরাণীর ডাকাতির ভয়ের ঘটনা সত্যমূলক। সমকালে ডাকাতি যে কোন স্তরে পৌঁছিয়েছিল তার বিবরণ পাওয়া যায় হান্টারের লেখায়।[১৯]

সামাজিক এই অনাচারেই ভবানীপাঠক দস্যুতে পরিণত হয়েছে। এই ভবানী পাঠকের সংস্পর্শে এসেই প্রফুল্ল দেবীচৌধুরাণীতে পরিণত হয়। ভবানী পাঠকই প্রফুল্লকে দেশের সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে বিশেষভাবে জ্ঞাত করায়, ফলে শেষ পর্যন্ত যে দেবীচৌধুরাণীরূপ নিতে স্বীকৃত হয়। সুতরাং সমাজ পরিস্থিতির এই দিকটি প্রফুল্ল চরিত্রের দেবী চৌধুরানীতে রূপান্তরিত হওয়ার প্রধান কারণ। আরও যে কারণ আছে, সেগুলিও তৎকালীন বঙ্গ পল্লীর সামাজিক রীতি নীতি বা প্রণতা ভিত্তিক। এক কথায় প্রফুল্লর দেবীচৌধুরাণীতে রূপান্তরণ এবং উপন্যাস কাহিনীর ঘটনা বিন্যাসের মূলে আছে অষ্টাদশ শতকের গ্রাম বাংলার সমাজ। বাংলাদেশের পল্লী সমাজে পারস্পরিক কোন্দল, একে অপরের নামে মিথ্যা কলঙ্ক আরোপ করে তার জাতিনাশ, বৈবাহিক ব্যাপারে ক্ষতি করা এ সমস্তই অতি প্রবলভাবে বর্ত্তমান ছিল। পল্লী সমাজের এই হীন চিত্তবৃত্তির ফলেই প্রফুল্ল তার স্বামীগৃহে মিথ্যা কলঙ্কে অভিযুক্ত হয়ে স্থান পায়নি। স্বামীগৃহ থেকে শ্বশুড় হরবল্লভ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হাওয়ার পর, প্রফুল্ল মায়ের মৃত্যুর পর সে যখন একাকী হয়ে যায়, তখন স্থানীয় জমিদারের লম্পট গোমস্তা দুর্লভ চক্রবর্ত্তীর নজরে পড়ে, এবং লুণ্ঠিত হয়। এই রকম লাম্পট্য এবং নারীর নিরাপত্তাহীনতা ছিল তৎকালীন পল্লী বাংলার সচরাচর দৃষ্ট সামাজিক ব্যাধি। ঘটনাচক্রে সেই সময়েই প্রফুল্ল মুক্তি পেয়ে ভবানী পাঠকের সংস্পর্শে এসেছে। সুতরাং প্রফুল্লর জীবন বিকাশে তৎকালীন পল্লী সমাজ যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে অংশ গ্রহণ করেছে, সে কথা অনস্বীকার্য।

পল্লী বাংলার অষ্টাদশ শতকের সমাজ ভাবনার অজস্র দিক, নানান রীতি নীতি এই উপন্যাসে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। ব্রজেশ্বরের 'তিন সংসার' করা বা বহুবিবাহ তৎকালীন বাংলা দেশের সামাজিক প্রথা ছিল। কৌলিন্য প্রথারও বিশেষ চলন ছিল। ব্রজেশ্বরের পিতার সম্পর্কিত পিসী বহ্মঠাকুরাণী ব্রজেশ্বরকে বলেছে ঃ "তোর ঠাকুরদাদার তেষট্টিটা বিয়ে ছিল— বঙ্গীয় পল্লীর নারী সমাজের সঙ্গে সে যুগে গ্রামের জামাতাদের একটি বিশেষ রঙ্গ রসিকতার সম্পর্ক ছিল, তার বিশদ চিত্র 'ইন্দিরা' কাহিনীতে পাওয়া যায়। জামাতার শ্বশুর বাড়ী আসবার সংবাদে সে যুগে পল্লীগ্রামে যে কিরকম সাড়া পড়ে যেত, তার সরস চিত্র পাওয়া যায় দেবী চৌধুরানী উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে। এ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং

---

১৯. হান্টার, ঐ।

লিখেছেন— "তখনকার দিনে একটা জামাই আসা বড় সহজ ব্যাপার ছিল না।"— ব্রজেশ্বরের তার শ্বশুরবাড়ী সাগরের পিতৃগৃহে আগমনের প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র প্রদত্ত জামাই এর জন্য আদর যত্নের আয়োজনের বিবরণের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের রমণীদের সাজসজ্জার আয়োজনের ব্যস্ততা তৎকালীন সামাজিক রীতি নীতিরই পরিচায়ক ঃ "জেলের দৌরাত্মে প্রাণ রক্ষা হয় না।........দই, দুধ, ননী, ছানা, সর মাখনের ফরমাইসের জ্বালায় গোয়ালার মাথা বেঠিক হইয়া উঠিল;...........কাপড়ের ব্যাপারীর কাপড়ের মোট লইয়া যাতায়াত করিতে করিতে পায় ব্যথা হইয়া গেল; কাহারও পছন্দ হয় না, কোন ধুতি চাদর কে জামাইকে দিবে। পাড়ার মেয়ে মহলে বড় হাঙ্গামা পড়িল। যাহার যাহার গহনা আছে, তাহারা সে সকল সারাইতে, মাজিতে, ঘষিতে, নূতন করিয়া গাঁথাইতে লাগিল। যাহাদের গহনা নাই, তাহারা চুড়ি কিনিয়া, শাঁখা কিনিয়া, সোনা-রূপা চাহিয়া চিন্তিয়া এক রকম বেশভূষার যোগাড় করিয়া রাখিল— নহিলে জামাই দেখিতে যাওয়া হয় না। যাঁহাদের রসিকতার জন্য পশার আছে— তাঁহারা দুই চারিটা প্রাচীন তামাশা মনে মনে ঝালাইয়া রাখিলেন.....কথার তামাশা পরে হবে— খাবার তামাশা আগে। তাহার জন্য ঘরে ঘরে কমিটি বসিয়া গেল।"[২০]

এ ছাড়াও সে যুগের নারীদের শ্বশুরালয়ে দিনমানে স্বামীর সাক্ষাৎ না পাওয়ার সামাজিক রীতি, আবার পিত্রালয়ে নারীদের এ ব্যাপারে কিছু শিথিলতা পাওয়া, প্রতিবেশির মৃত্যুকালে তার সঙ্গে শত্রুতা না রাখা, পল্লীবাঙ্গালীর এইসব সামাজিক চেতনা উপন্যাস মধ্যে স্থান পেয়েছে। সেই সঙ্গে নতুন বৌ গ্রামে পৌঁছলে তাকে দেখবার জন্য পল্লীবাসীদের ঔৎসুক্য, বধূবরণের সামান্য স্ত্রী আচারের চিত্রও বঙ্কিমচন্দ্র ইষৎ কৌতুকের সঙ্গে বর্ণনা করেছেন।

দেবী চৌধুরাণী মূলত তত্ত্বমূলক উপন্যাস, কিন্তু এই তত্ত্বমূলক উপন্যাসের পটভূমি বাংলাদেশের অষ্টাদশ শতকীয় পল্লী পরিবেশে। চরিত্রাবলীও গ্রাম জীবন সম্ভূত। বিশেষত এই উপন্যাসে অনুশীলন তত্ত্বের প্রচার করেও কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র শেষ পর্যন্ত নায়িকা দেবীচৌধুরাণীকে পল্লীবাংলার গৃহবধূ ও নতুন বৌ চরিত্রে পরিণত করে, তাকে দিয়ে পুকুরঘাটে বাসন মাজিয়েছেন।[২১]

গীতোক্ত নিষ্কাম ধর্মের প্রতীকরূপে দেবী চৌধুরাণী মূর্ত্তি সৃষ্টি করা হলেও অষ্টাদশ শতাব্দীর পল্লী বাংলার সমাজজীবন সম্ভব কর্ত্তব্যপরায়ণা, নিঃস্বার্থ কর্মপরায়ণা গৃহস্থ বধূরূপেই এই উপন্যাসের মূল চরিত্রকে ঔপন্যাসিক মহত্ত্ব দিয়েছেন। সুতরাং এই দেবীচৌধুরাণী উপন্যাসটিতে তৎযুগীয় পল্লীবাঙ্গালার ব্যাপক সমাজচিত্র বা সমাজচেতনা প্রতিফলিত হবে, এ পাঠকের কাছে প্রার্থিতই থাকে।

২০. দেবীচৌধুরাণী— দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

২১. "প্রফুল্ল, পিছন ফিরিয়া বাসন মাজিতেছিল।"— দেবীচৌধুরাণী / তৃতীয় খণ্ড / ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯)

বঙ্কিম সমসাময়িক বাংলা ঔপন্যাসিকদের মধ্যে নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী রমেশচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্র কর্ত্তৃক প্রেরণা প্রাপ্ত হয়ে তিনি উপন্যাস রচনায় প্রবৃত্ত হন এবং ঐতিহাসিক উপন্যাসের ধারাতেই তাঁর প্রতিভা মুখ্যত নিয়োজিত করেন। বঙ্গ বিজেতা (১৮৭৪), মাধবীকঙ্কন (১৮৭৭), মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত (১৮৭৮) ও রাজপুত জীবনসন্ধ্যা (১৮৭৯)— এই কটি উপন্যাস ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি নির্দিষ্ট সময়ধারা অবলম্বনে রচিত হওয়ায় একত্রে শতবর্ষ আখ্যা পেয়েছে। ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলিতেই তাঁর প্রতিভা মূলত স্ফুরিত হলেও, শেষ জীবনে সমকালীন বাংলার পল্লীগ্রামের জীবন অবলম্বনে 'সংসার' ও 'সমাজ' নামে তিনি দুটি উপন্যাস রচনা করেন। বাস্তব তথ্য পরিবেশনের নৈপুণ্যে এই দুটি উপন্যাস তৎকালীন পল্লী বাঙালীর জীবন দলিল হয়ে উঠেছে।

রমেশচন্দ্রের প্রথম সামাজিক উপন্যাস 'সংসার' প্রকাশিত হয় ১৮৮৬ সালের মাঝামাঝি। ধারাবাহিকভাবে বঙ্কিমচন্দ্র পরিচালিত প্রচারে (১২৯২ বঙ্গাব্দ) প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। উপন্যাসটি পরিবর্দ্ধন ও পরিবর্তন করে যান। তাঁর মৃত্যুর পর এটি 'সংসার কথা' নামে প্রকাশিত হয়।

দ্বিতীয় সামাজিক উপন্যাস 'সমাজ' প্রকাশিত হয় ১৮৯৪ সালে। ইতিপূর্বে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত 'সাহিত্য' পত্রিকায় কিছু অংশ (১৩০০-০১ বঙ্গাব্দ) ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। এ দুটি উপন্যাসের বক্তব্যে প্রমাণিত হয়, রমেশচন্দ্র সমাজ সংস্কারের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। 'বিদ্যাসাগর প্রবর্ত্তিত বিধবা বিবাহ এবং ব্রাহ্ম সমাজ কর্ত্তৃক পরিচালিত অসবর্ণ বিবাহ প্রচেষ্টার সারবত্তা তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করিয়াছিলেন। একারণ তিনি 'সংসার' উপন্যাসে বিধবা বিবাহ এবং 'সমাজ' উপন্যাসে অসবর্ণ বিবাহের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদনে সবিশেষ প্রয়াসী হন।' (ভূমিকা, যোগেশচন্দ্র বাগল কর্ত্তৃক সম্পাদিত রমেশ রচনাবলী, সমগ্র উপন্যাস, সাহিত্য সংসদ, ফেব্রুয়ারী ১৯৮২ সং, পৃ- পঁয়ত্রিশ) সমাজ-সংস্কার বিষয়ে 'সংসার' এবং 'সমাজে' তাঁর নিজের দৃষ্টিভঙ্গী কতখানি ক্রিয়াশীল সে সম্পর্কে স্বয়ং রমেশচন্দ্র একটি চিঠিতে লিখেছেন ঃ ".......On principle inter-cast marriage is a duty with us, because, it unites the divided and enfebled nation, and we should establish this principle (as well as widow marriage, etc.) safely, and securely in our little society, so that the greater Hindu society, of which we

are only a portion and the advanced guard, may take heart and follow. I cannot tell you how deeply. I have felt this for years past; of my last two novels 'Sansar' goes in for widow marriage, and, 'Samaj',.......goes in for inter-cast marriage." (সূত্র, ঐ, পৃষ্ঠা ঐ) আধুনিক একাধিক সমালোচকও 'সংসার' ও 'সমাজ' গ্রন্থ দুটিকে রমেশচন্দ্রের আদর্শচেতনা প্রকাশমূলক রচনা বলেছেন। 'বিধবা বিবাহ ও অসবর্ণ বিবাহের গুরুত্ব প্রচারের জন্যই রমেশচন্দ্র 'সংসার' ও 'সমাজ' রচনা করেন।" (বাংলা উপন্যাসের উৎস সন্ধানে, অশোককুমার দে, জুলাই ১৯৭৪ সং, পৃঃ ১৭৬) কিন্তু উপন্যাস দুটির রসপরিণতি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতামত থাকলেও 'সংসার' ও 'সমাজ' যে উনবিংশ শতকের শেষার্ধের পল্লীবাংলার খাঁটি সমাজচিত্র হয়ে উঠেছে, এ বিষয়ে সকলেই একমত।

প্রখ্যাত সাহিত্য আলোচক ও ইতিহাসকারের অভিমত ঃ "অতঃপর রমেশচন্দ্র মধ্যবিত্ত গৃহস্থের জীবন লইয়া দুইখানি উপন্যাস লিখিয়াছিলেন, 'সংসার' (১২৯৩) ও 'সমাজ' (১৮৯৪)। সংসারে পশ্চিমবঙ্গের পাড়াগাঁয়ের দরিদ্র ভদ্র সংসারের চিত্র আছে।......লালবিহারীর Bengal Peasant Life বা Govinda Samanta বইটিতে (১৮৭৪) বর্ধমান জেলার চাষী ঘরের নিখুঁত চিত্র পাই। রমেশচন্দ্রের উপন্যাসের স্থানও এই অঞ্চল। সংসারের ভূমিকাগুলি এমন স্বাভাবিক যে, মনে হয় লেখক সমস্ত চোখে দেখিয়া লিখিয়াছেন।" (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ড. সুকুমার সেন, ১৩৭৭ সং পৃঃ ২৪৭, দ্বিতীয় খণ্ড, উনবিংস শতাব্দ)

'সংসার-কথা'র সূত্রপাত হয়েছে তালপুকুর নামের ক্ষুদ্র গ্রাম ও সেই নামের পুষ্করিনীর বর্ণনা দিয়ে। বাংলাদেশের নগণ্য একটি ক্ষুদ্র পল্লী, সেই পল্লীর অতি সাধারণ একটি দরিদ্র গৃহস্থ পরিবারের জীবনচিত্র রমেশচন্দ্র তাঁর উপন্যাসের মূল পটভূমি রূপে যথাযোগ্য বাস্তবতায় তুলে ধরেছেন।

বর্ধমান হইতে কাটোয়া পর্যন্ত যে সুন্দর পথ গিয়াছে, সেই পথের অনতিদূরে একটি বড় পুষ্করিনী আছে।........পুষ্করিণীর চারিদিকে উচ্চপাড় ঘন তাল গাছে বেষ্টিত, ...নিকটে একটি সামান্য পল্লী আছে, তাহাতে কয়েক ঘর কায়স্থ, দুই চারি ঘর ব্রাহ্মণ ও দুই চারি ঘর কুমার, এক ঘর কামার, কতকগুলি সদ্‌গোপ ও কৈবর্ত্ত বাস করে। একখানি মুদির দোকান আছে, তাহা গ্রামের লোকের সামান্য খাদ্য দ্রব্যাদি যোগায়, এবং তথা হইতে এক ক্রোশ দূরে সপ্তাহে দুইবার করিয়া একটি হাট বসে, বস্ত্রাদি আবশ্যক হইলে গ্রামের লোক সেই হাটে যায়। পুষ্করিণীর নাম 'তালপুকুর' এবং সেই নাম হইতে গ্রামটিকেও লোকে তালপুকুর গ্রাম বলে।" — এই তালপুকুর গ্রামে বিন্দুবাসিনী ও সুধাকে নিয়ে তাদের দুঃখিনীর মায়ের দিনাতিপাতের চিত্র এবং পরবর্ত্তীকালে বিন্দু ও হেমচন্দ্রের বিবাহিত জীবন, বাল-বিধবা সুধা ও শরৎচন্দ্রের প্রণয়, পরিশেষে বিবাহ— ইত্যাদি

ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে উনবিংশ শতকের গ্রামবাংলার একটি সামগ্রিক সত্যচিত্রই পাঠকের চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। কলকাতা নগরীর প্রসঙ্গ এ উপন্যাসে আছে। ঘটনাচক্রে বিন্দু ও হেমচন্দ্র সুধাকে নিয়ে সপরিবারে কলকাতাবাসী হয়, কিন্তু রমেশচন্দ্র তাদের নগরে স্থিতি দেননি। হেমচন্দ্র নিজের পল্লীভবনে পুনশ্চ প্রত্যাগম করেছে, এবং সেখানেই তাদের জীবনের যথার্থ সুখ-শান্তির নীড় গড়ে উঠেছে। এই জন্য 'সংসার' উপন্যাসে বাংলার পল্লীজীবন পরিচয়টিই মুখ্য। উনবিংশ শতাব্দীর গ্রাম বাংলা তার সমাজজীবনের বিভিন্ন দিক্‌গুলি নিয়ে এই উপন্যাসে দেখা দিয়েছে। বাংলা সাহিত্যে এর মূল্য অপরিসীম। প্রখ্যাত সাহিত্য সমালোচক এই কারণে উচ্ছ্বসিত ভাবে মন্তব্য করেছেন যে " 'সংসার' ও 'সমাজ'-এ রমেশচন্দ্র ইতিহাসের কোলাহল হইতে শান্ত পল্লীর সৌন্দর্যের মধ্যে আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখের কথায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। ....'সংসার' ও 'সমাজ'-এ তিনি পল্লী গ্রামের পারিবারিক জীবনের এমন একটি সুন্দর, রসপূর্ণ, সহানুভূতিমূলক চিত্র দিয়াছেন, যাহা বঙ্গসাহিত্যে নিতান্ত সুলভ নহে।......... মনে হয় যেন সমস্তই কেবল বাস্তব বর্ণনা, পল্লীসমাজের নিখুঁত ফটোগ্রাফ মাত্র।......কিন্তু প্রকৃতপক্ষে...........খুব উচ্চ রকমের কলাকৌশল না থাকিলে নিতান্ত সাধারণ উপাদান হইতে এত সুন্দর—. মর্মস্পর্শী উপন্যাস রচনা করা যায় না।" (ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পঞ্চম, ১৩৭২সং, পৃঃ ৫৯-৬০)

'সংসার' উপন্যাসের সূত্রপাতে তালপুকুর গ্রামের বিবরণে তৎকালীন বঙ্গপল্লীর জাতিভিত্তিক সমাজ বিন্যাসের ইঙিত পাওয়া গেছে। সেই গ্রামে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ইত্যাদি বর্ণ হিন্দুদের পাশাপাশি কামার, কুমার, সদ্‌গোপ, কৈবর্ত্তও বাস করে। প্রাচীন বৃত্তি বিভাগ তখনও গ্রামে প্রচলিত ছিল। তাই বিন্দুর পিতা বিশ পঁচিশ বিঘা জমির মালিক হয়েও "কিন্তু কায়স্থ বলিয়া আপনি চাষ করিতে পারিতেন না, লোক দিয়া চাষ করাইতেন।........" উনবিংশ শতকের পল্লীবাংলার এই সামাজিক সম্মানবোধের খেসারত দরিদ্র কায়স্থ সন্তানকে দিতে হয়েছিল। তাই লোক দিয়ে চাষ করিয়ে, জমিদারের খাজনা, জমির অন্যান্য খরচা বাদ দিয়ে তাঁর জমির মারফৎ বিশেষ লাভ হ'ত না। শুধু "ঘরের খরচের ভাতটা হইত মাত্র।" বিন্দুর পিতা হরিদাস মল্লিক সেই সময়ের গ্রামবাংলার এক সুপরিচিত নিম্ন মধ্যবিত্ত কৃষিনির্ভর বর্ণহিন্দু গৃহস্থের প্রতিনিধি।

বিন্দুর স্বামী হেমচন্দ্রও সাধারণভাবে তদানীন্তন গ্রাম বাংলার একজন সাধারণ নিম্নবিত্ত কৃষি-নির্ভর গৃহস্থের প্রতিমূর্ত্তি। কিন্তু সে আধুনিক শিক্ষা কিঞ্চিৎ পেয়েছিল। তার আচরণে, নব্য শিক্ষিত উনবিংশ শতকের আদর্শবাদী উদার চরিত্রের যুবকের পরিচয়ও ফুটে উঠেছে। পিতার মৃত্যুতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ বন্ধ করে হেমচন্দ্র গ্রামে ফিরে আসে এবং পিতার সামান্য জমিজমা মারফৎ

অন্নসংস্থান করে। 'উপন্যাসের চতুর্থ পরিচ্ছেদে 'চাষ-বাসের কথা' শীর্ষক অংশে কৃষি নির্ভর পল্লী বাঙালীর ছবিটি হেমচন্দ্রের মাধ্যমে লেখক এঁকেছেন। হেমচন্দ্র সনাতন কৈবর্ত্ত নামের কৃষককে তার জমি চাষ করার দায়িত্ব দিয়েছে। সনাতনের সঙ্গে হেমচন্দ্রের জমি ও চাষ বিষয়ক কথাবার্তায় দুটি জিনিষ স্পষ্ট হয়। প্রথমত হেমচন্দ্র ও বিন্দুর পিতার মত অতি সামান্য অবস্থার কৃষিনির্ভর পল্লীবাসী। কিছু শিক্ষা সত্ত্বেও গ্রামে উপার্জনের দ্বিতীয় রাস্তা না থাকায় হেমচন্দ্রকে সামান্য জমির আয়ে নির্ভর করতে হয়েছে। বিন্দুর পিতার মত তাকেও তৎকালীন গ্রাম সমাজের বৃত্তিবিভাগ মেনে কৈবর্ত্ত চাষী সনাতনকে দিয়ে জমি চাষ করাতে হয়। এর ফলে বছরে দু'শ আড়াইশ মন ধান হ'লেও সব রকম খরচ খরচা বাদ দিয়ে তার "একশ টাকার বেশী ঘরে ওঠেনি।"

দ্বিতীয়ত সনাতন কৈবর্ত্তকে ক্ষুদ্র চাষীও না বলে প্রান্তিক চাষী বলা যায়। কেননা, তার নিজের ছোট জমির আয়তন ৮-১০ কুড়ো তাতে পেট ভরে না। ঊনবিংশ শতকের গ্রাম বাংলার দরিদ্র কৃষকের সে প্রতিনিধি তার কণ্ঠে খাঁটি কৃষকের আর্তি শোনা গেছে হেমচন্দ্রের জমিটি ভাগে চাষ করার আর্জি জানানোর মধ্যে। 'তা বাবু সেই যে একবার বলেছিলেন, জমিটা ভাগে দেবেন, তা কি এখন ইচ্ছে আছে? যদি দেন, তবে আমাকেই দেবেন, আমি আপনার বাড়ীর চাকর, আপনার বাপের আমল থেকে ঐ জমি করছি। আপনাকে কোনও কষ্ট পেতে হবে না, কিছু দেখতে হবে না, আমি নিজের খরচে চাষবাস করব, আমার হাল, গরু সবই আছে, বছরের শেষে অর্দ্ধেক ধান মেপে গাড়ী করে আপনার বাড়ীতে পহুঁছিয়ে দেব।"— এই আধাআধি বখরা হিসাব করে জমি চাষ করতে দেওয়া বা জমিতে আধি দেওয়া অর্থাৎ ভাগচাষী প্রথা সে সময়ে ভাল ভাবেই প্রচলিত ছিল। জমির মালিকের সঙ্গে কৃষাণের সেযুগে বংশানুক্রমিক সম্পর্কের ইঙ্গিতও সনাতনের কথায় স্পষ্ট হয়েছে। এছাড়া গ্রামের ভদ্রজন হিসেবে হেমচন্দ্রদের যে চাষ করবার জন্য বাইরের লোক নিয়োগ করতে হয়, সনাতন, তার নিজের ভাষায় 'ছোটলোক' হওয়ায় নিজে চাষ করতে সক্ষম, ফলে খরচ অনেক কমে যাওয়ায় তার কিছু বেশী আয় হবে এবং 'ছেলেগুলো খেয়ে বাঁচবে'। এই কথার মধ্য দিয়ে কৃষি নির্ভর গ্রাম সমাজের তৎকালীন ছবিটি এ যুগের পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয়।

রমেশচন্দ্র কৃষিভিত্তিক বাংলার গ্রাম সমাজের কর্ষণ-ব্যস্ত একটি বৈশাখী প্রভাতের বাস্তব চিত্রও এই সঙ্গে পাঠকদের উপহার দিয়েছেন। "বৈশাখ মাসের দুই একটি বৃষ্টির পর সকল জমিই চাষ হইতেছে। প্রাতঃকালের শীতল বায়ুতে কৃষকগণ আনন্দে গান করিতে করিতে অথবা গরুকে নানারূপ নিকট সম্বন্ধবাচক কথায় উত্তেজিত করিতে করিতে চাষ দিতেছে। ক্ষেত্রের পর ক্ষেত্র, বঙ্গদেশের উর্ব্বরা ভূমির অন্ত নাই, তাহাই বাঙ্গালিদিগের প্রাণসর্ব্বস্ব। জমির পার্শ্বস্থ আইলের

উপর দিয়া অনেক জমি পার হইয়া অনেক কৃষকের কৃষিকার্য্য দেখিতে দেখিতে হেমচন্দ্র নিজ জমির দিকে যাইতে লাগিলেন।"

পল্লীবাংলার সাধারণ নিম্নবিত্ত ভদ্রগৃহ, নিম্নবিত্ত কৃষকের গৃহ এবং উচ্চবিত্ত ভদ্র পল্লীজনের গৃহ— এই তিন ধরণের গৃহ চিত্রই রমেশচন্দ্র বাস্তব সম্মতভাবে তাঁর 'সমাজ' উপন্যাসে অঙ্কিত করেছেন। এর ফলে এই তিন শ্রেণীর পল্লীবাসীর জীবনযাপনের মান ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কেমন ছিল বোঝা যায় হেমচন্দ্র, নিম্নবিত্ত ভদ্রশ্রেণীর গ্রামবাসী, তার গৃহবর্ণনা ঃ

"সেই তালপুকুর গ্রামে একটি সুন্দর পরিষ্কার ক্ষুদ্র কুটীর দেখা যাইতেছে। চারিদিকে বাঁশঝাড় ও আম কাঁঠাল প্রভৃতি দুই একটী ফলবৃক্ষ ছায়া করিয়া রহিয়াছে। বাইরে বসিবার একখানি ঘর, সেটি ছায়ায় শীতল এবং তাহার নিকটে ৫-৬টি নারিকেল বৃক্ষে ডাব হইয়াছে। সেই ঘরের পশ্চাতে ভিতর বাড়ীর উঠান, তথায়ও বৃক্ষের ছায়া পড়িয়াছে। উঠানের এক পার্শ্বে একটি মাচানের উপর লাউ গাছে লাউ হইয়াছে, অপরদিকে কাঁটা গাছ ও জঙ্গল। একখানি বড় শুইবার ঘর আছে তাহার উচ্চ রক সুন্দর ও পরিষ্কার রূপে লেপা। পার্শ্বে একটি রান্না ঘরও তাহার নিটক একটী গোয়াল ঘরে একটি মাত্র গাভী রহিয়াছে বাড়ির লোকেদের খাওয়া দাওয়া হইয়া গিয়াছে, উনুনে আগুন নিবিয়াছে, বেড়ায় দুই একখানি কাপড় শুকাইতেছে, শুইবার ঘরের রকে একটি তক্তপোষ ও দুই একটা চরকা রহিয়াছে। পশ্চাতে একটি ডোবায় কিছু জল আছে, তাহাতে কয়েকটি পিতলের বাসন পড়িয়া রহিয়াছে, এখনও মাজা হয় নাই,........বাড়ীর চতুর্দিকেই বৃক্ষ ও জঙ্গল। এই দ্বিপ্রহরের সময়ও বাড়ীটি ছায়াপূর্ণ ও শীতল।"

রাত্রিবেলায় গৃহকর্ত্তা হেমচন্দ্র গৃহে ফিরলে স্ত্রী বিন্দুবাসিনী হেমচন্দ্রের ধুলিধুসরিত পা ধোওয়ার জন্য জল, গামছা, এনে দেয়, বসবার আসন দেয়। বারান্দায় জল ছিটিয়ে আহারের আয়োজন করে। খাবার সামান্য—ভাত, ডাল মাছের ঝোল, বাড়ীর গাছের তরকারী, পালিত গোরুর দুধ, বাড়ীর গাছের ডাবের ঠাণ্ডা জল। আহারে বসে হেমচন্দ্র বিন্দুর সঙ্গে পরামর্শ করে বিন্দুর পৈত্রিক জমিজমা আদায়ের জন্য তার জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে মামলা মোকদ্দমায় যাবে কিনা অতীত দিনের সহিষ্ণু ও গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধাশীলা বঙ্গপল্লীর রমণীর মতই বিন্দু জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে গোলমাল আপোস মিটিয়ে নেওয়ার পরামর্শ দেয়। এই সংসারের স্নিগ্ধতা ও মাধুর্য, দাম্পত্য সম্পর্কের পারস্পরিক শ্রদ্ধা, ভালবাসা— পাঠকের মনে অতীত বাংলার গ্রাম জীবনের সাধারণ ভদ্র সংসারের শান্তিময় ছবিটি এঁকে যায়।

নিম্নবিত্ত ভদ্র গৃহ ছবির পাশে গ্রামের উচ্চবিত্ত ভদ্রজনের গৃহ ও গৃহ-পরিবেশ পঞ্চম পরিচ্ছেদে তালপুকুর গ্রামের ধনাঢ্য ব্যক্তি, বিন্দু ও সুধার জ্যাঠামশাইএর গৃহ বর্ণনার মাধ্যমে পাওয়া গেছে। তারিণীবাবুর "... বাড়ীর বাহিরে গোয়াল ঘর

আছে, দু-তিনটি ধানের গোলা আছে, একটী পূজার মণ্ডপ আছে ও তাহার সম্মুখে যাত্রার একখানি বড় আটচালা আছে। নাজিরবাবুর বাড়ীতে বড় ধূমধামে দুর্গাপূজা হয়, নাচ, গাওনা-বাজনা হয়, প্রসিদ্ধ যাত্রার দল বৎসর বৎসর আইসে, এবং গ্রামের লোকে সে বাটী সমাকীর্ণ হয়।..........তারিনীবাবু আপনার বসিবার জন্য বাহিরে একটী পাকাঘর করিয়াছেন, এবং বাড়ীর পার্শ্বে কতকগুলি ইঁটের পাঁজা পোড়ানো হইয়াছে, গৃহিনীর বড় ইচ্ছা যে শুইবার ঘরটীও পাকা হয়। সেই পাকা বৈঠকখানা ঘরে একটী তেলের বাতি জ্বলিতেছে, একটি বড় তক্তপোষের উপর সতরঞ্চ ও চাদর বিছানো আছে, তাহার উপর তারিনীবাবু বসিয়া ধূম সেবন করিতেছেন, পাড়ার ৪-৫ জন লোক সম্মুখে বসিয়া নানারূপ আলাপ ও গল্প রহস্য করিতেছে।........বাড়ীর ভিতর চারিদিকে বেড়া দেওয়া প্রশস্ত প্রাঙ্গন, সম্মুখে শুইবার ঘর, উচ্চ ভিটার উপর সুন্দর বড় আটচালা, তাহার এপাশে ওপাশে উচ্চভিটার উপর সুন্দর সুন্দর তিনচারিখানা চৌচালা বা পাঁচচালা ঘর। ঘরের ভিটিগুলি সুন্দররূপে লেপা, উঠান ঝাঁট দেওয়া ও পরিষ্কার, এবং তাহাব একপার্শ্বে রান্নাঘর। বাটীর পশ্চাতে একটী বড় রকম পুকুর তাহার চারিদিকে বাগান, নারিকেল, আম, কাঁটাল প্রভৃতি নানারূপ ফলের গাছ আছে।" উচ্চবিত্ত এই গৃহের গৃহিনীর অঙ্গেও উপযুক্ত স্বর্ণাভরণ, তিনি নিজের সুখ্যাতি বা ধনগৌরবের কথা শুনিতে ভালবাসেন, কিন্তু তাঁর মনটি সাদা। এই গৃহের আদরিনী কন্যাও ধনাঢ্য পরিবারে বিবাহিতা। তার অঙ্গে অলঙ্কারের আতিশয্য। উনবিংশ শতকের ধনাঢ্য জমিদার গৃহের উপযুক্ত সুন্দরী বধূ উমাতারার সাজসজ্জা ও স্বর্ণালঙ্কার। "উমাতারা অতিশয় গৌরবর্ণা; মুখখানি কাঁচা সোনার মত, এবং তাহার উপর সুবর্ণও হীরকের জ্যোতি বড় শোভা পাইতেছে।......কপালে জড়ওয়া সিঁথির কি বাহার........খোঁপায় সোনার ফুল, সোনার প্রজাপতি আর একটি হীরার প্রজাপতি। হাতে পৈচা, যবদানা, মরদানা; আর জড়ওয়া বালা, বাহুতে জড়ওয়া তাবিজ ও বাজুর কি শোভা। পিঠে পিঠঝাঁপা দুলিতেছে, কটিদেশে চন্দ্র বিনিন্দিত চন্দ্রহার। গলায় চিক, বুকের সখের সাতনর মুক্তাহার।" উমাতারা এবং হেমচন্দ্রের পারস্পরিক রসিকতা ও কথাবার্তায় পল্লী সমাজের শ্যালিকা ও ভগ্নীপতির মধুর সম্পর্কটি পরিস্ফুট হয়েছে—".........হাসিতে হাসিতে ধীরে ধীরে উমাতারা ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন,—

"ইস, আজ কি ভাগ্যি; না জানি কার মুখ দেখে উঠেছি।.........তা আজ এখানে আমাদের দর্শন দিলে কি মনে করে? বিন্দু দিদি যে বড় ছেড়েছিলেন?"

ধনীগৃহের আহার ও উপকরণ দরিদ্র গৃহস্থের আহার্য্য তালিকা থেকে জল-খাবারের আমন্ত্রণ করেছে। তার বর্ণনা ঃ

"..........খাবার সম্মুখে দুটী শামদান জ্বলিতেছে, রূপার থালে খানকত লুচি আর নানারূপ মিষ্টান্ন, চারিদিকে রূপার বাটীতে নানারকম ব্যঞ্জন ও দুগ্ধ

ক্ষীর,.........হেমচন্দ্রের কপালে এরূপ আয়োজন,...........এই রৌপ্যসামগ্রীর মূল্যে তাঁহার এক বৎসরের সাংসারিক খরচ চলিয়া যায়!"

এই দুই ভদ্র ঘরের জীবনযাপনের উপকরণ আয়োজন ও হাবভাব আচার-আচরণ কথাবার্তার পাশে গ্রামের নিম্নশ্রেণীর একটি কৃষক পরিবারের জীবনচিত্র আঁকার মাধ্যমে রমেশচন্দ্র উভয় সমাজের এইসব ব্যাপারে সুদূর পার্থক্যটিও সূচিত করতে পেরেছেন। হেমচন্দ্রের চাষ জমির কৃষক সনাতন কৈবর্ত্তের গৃহ বর্ণিত হয়েছে। সেই গৃহস্থালী বর্ণনা প্রস্ফুটিত হয়েছে সনাতন পত্নী ও সনাতনের প্রভাতী সংলাপের পটভূমিকায়। সনাতন বাংলার গ্রামাঞ্চলের শাশ্বত দরিদ্র চাষীর প্রতিনিধি। ঋণ তাদের করতে হয়, আবার ঋণ শোধও তারা সব সময়ে করতে পারে না। ফলে পাওনাদার, মহাজনের ভয়ে অনেক সময়েই মিথ্যাচার করতে হয়। রমেশচন্দ্র একটি প্রভাতের বর্ণনা দিয়েছেন, যে সময় হেমচন্দ্রকে পাওনাদার ভেবে সনাতন তার পত্নীকে মিথ্যাচার শেখাচ্ছে।

সনাতনের গৃহদৃশ্য ঃ "সনাতন কৈবর্ত্তের একখানি উচ্চ ভিত্তিওয়ালা ঘর ছিল, তাহার পার্শ্বে একখানি ঢেকির ঘর ও একখানি গোয়াল ঘর, তথায় ৪-৫টি গরু ছিল। উঠানেই উনুন, পার্শ্বে একখানি চালা আছে, বৃষ্টি বাদলের দিন সেই চালার ভিতর রান্না হয়, নচেৎ খোলা উঠানে। সম্মুখে কতকগুলা কাঁটা গাছ ও জঙ্গল, এক স্থানে একটা বড় খানা আছে, তাহাতে বৎসরের গোবর সঞ্চিত হয়, চাষের সময় উপকারে লাগে। গোয়ালঘরের পাশে গাড়ীর দুখানি চাকা ও খান দুই লাঙ্গল পড়িয়া আছে, এবং বাড়ীর পশ্চাতে একটা ডোবার ন্যায় ময়লা পুকুর আছে।......... নূতন মিউনিসিপ্যাল আইন ও নিম্ন শিক্ষা সত্ত্বেও সনাতনের প্রণয়িনী এই ডোবাতেই যে কেবল বাসন ধুইতেন এমন নহে, তাঁহার স্নান ও কাপড় কাচাও এইখানে হইত, এবং........পানের জল ও সংসারের রান্নার জলও এই পুকুরের।" (চতুর্থ পরিচ্ছেদ)। দরিদ্র প্রায় অশিক্ষিত গ্রাম্য কৃষকের এই বাস্তব জীবন ছবি এই উপন্যাসের অন্যতম প্রাপ্তি। সনাতন ও তার পত্নীর প্রভাতী সংলাপ ঃ

"সনাতনের তখন নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে,........বলিল, 'এতবেলা হ'ল এখনও মাগীর উঠা হ'ল না, এত ডাকাডাকি করছি তবুও হারামজাদীর সাড়া নেই, এইবার সাড়া করাচ্ছি, দুটো গুঁতো দিলেই ঠিক হবে।"..........সনাতন পত্নী ....বলিলেন, "কি হয়েছে কি? সকাল থেকে উঠে বাপ মা তুলে গাল দিচ্ছ কেন, মাতাল হয়েছ নাকি?— দেখ না, মিনষের মরণ আর কি?— উভয়ের সংলাপের ভাষা ও শব্দ ব্যবহারে গ্রামের নিম্নশ্রেণীর মানুষের প্রাত্যহিক ভাষা শব্দের ছবিটি স্পষ্ট হয়েছে।

সনাতনের মিথ্যাচার ঃ "গলাটা মহাজনের গলার ন্যায়, অতএব বুদ্ধিমান সনাতন সহসা উঠিল না। .... একটা উপায় করিতে হইল। ......প্রণয়িনীকে

ডাকিল......বলি ঐ দরজায় কে হাঁকাহাঁকি করছে একবার গিয়ে দেখ না; যদি হারান সিকদার হয় তবে বলিস আমি ঘরে নেই।"

বাংলার পল্লীসমাজের রূপচিত্র রমেশচন্দ্র সরলভাবেই এঁকেছেন। সমালোচকের যথার্থ অভিমত এই যে, সামাজিক উপন্যাসে রমেশচন্দ্রের বিশেষ গুণ তাঁহার পর্যবেক্ষণ-শক্তি ও পল্লীগ্রামের দুঃখ দারিদ্র্যপূর্ণ জীবনের প্রতি করুণ ও অকৃত্রিম সহানুভূতি। তাঁহার সামাজিক উপন্যাসে কোন গভীর বিশ্লেষণ নাই. কেননা, তিনি যে সমস্ত চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে কোন বিশ্লেষণযোগ্য জটিলতা নাই। শরৎচন্দ্র তাঁহার 'পল্লীসমাজ' এ যে গভীর স্তরে অবতরণ করিয়াছেন, তাহা রমেশচন্দ্রের ক্ষমতার অতীত।......শরৎচদ্র তাঁহার পল্লী সমাজের বিকারগুলিকে অতি সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন; রমেশচন্দ্র তাহার স্বাভাবিক সুস্থ অবস্থারই বর্ণনা করিয়াছেন, বিকৃতির দিকটা কেবল উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন, তাহাকে ফুটাইয়া তোলেন নাই। (ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, ১৩৭২ সং, পৃঃ ৬৩)

একথা ঠিক যে রমেশচন্দ্র পল্লীসমাজের জটিলতার নানা চিত্র এঁকেছেন, সমস্যার কথা তুলেছেন, কিন্তু তার গভীরতায় অবগাহণ করে মানবমনের দ্বন্দ্ব দাহ প্রকাশ করেননি। ফলে উনবিংশ শতকের বাংলার পল্লীসমাজের ভাল-মন্দ সমস্ত শ্রেণীর চরিত্রের সাধারণ পরিচয় তাঁর উপন্যাস আমরা পাই, পল্লীর সমস্যাও বাস্তবসম্মতভাবে চোখের সামনে দৃশ্যমান হয়, কিন্তু সে সবই শেষ পর্যন্ত সরল সমাধানে মিশে যায়।

যেমন, উনবিংশ শতকের বাংলার সামগ্রিক সমাজ-সমস্যার অন্যতম প্রধান কৌলীন্য প্রথা, পুরুষের বহুবিবাহ প্রথা, বৃদ্ধ পুরুষের সঙ্গে বালিকা কন্যার বিবাহ প্রথা, পণপ্রথা, স্বামী গৃহে বধূদের লাঞ্ছনা কখনো শাশুড়ী-ননদের হাতে, কখনো বা মাতাল চরিত্রহীন স্বামীর হাতে এ সবই অনিবার্যভাবে গ্রাম বাংলারও সামাজিক সমস্যা ছিল। গ্রাম-সমাজের এই দিকগুলি 'সংসার' এবং 'সমাজ' উপন্যাসে বিধৃত হয়েছে। 'সংসার-কথা'য় বিন্দুবাসিনীর গায়ের রঙ কালো এবং তারা নির্ধন হওয়ায় তার সুপাত্র মেলা ভার হয়ে উঠেছিল। তখন ঘটক-ঘটকদের বিবাহ ব্যাপারে বিশেষ প্রাধান্য ছিল। সেই সূত্রে জানা গেছে ঘোষদের বাড়ির আট বৎসর বয়স্কা কালীতারার বিবাহ হয়েছে চল্লিশ বছরের 'দোজবরে' পাত্রের সঙ্গে। অর্থকৌলীন্যে ভুলে তারিনীবাবুর ময়ে উমাতারাকে বিয়ে দিয়েছেন ধনপুরের বিখ্যাত ও ধন্যাঢ্য জমিদারপুত্র ধনঞ্জয়ের সঙ্গে বিবাহ দিয়েছে, কিন্তু ধনঞ্জয়, কলকাতার শিক্ষা লাভের জন্য গিয়ে সেখানকার নাগরিক লাম্পট্য ও মদ্যাসক্তি টুকু লাভ করে। এরপর দেখা কলকাতায় বিশাল বাগানবাড়ী নিয়ে ধনঞ্জয় যথেচ্ছ উশৃঙ্খলতায় মগ্ন হয় এবং স্ত্রী উমাতারার প্রতি একান্ত উদাসীন হয়েছে। সেই প্রেমহীন জীবন সহ্য করতে না পেরে উমাতারা অবশেষে একদিন গৃহত্যাগ করে।

উপন্যাসের শেষে অনুতপ্ত স্বামীর সঙ্গে সন্ন্যাসী উমাতারার মিলন হয় বটে, কিন্তু কাঞ্চন কৌলীন্যে অভিশাপ, বিশেষত উনবিংশ শতকের জমিদারদের কলকাতায় এসে বিলাসিতা, উশৃঙ্খলতা, লাম্পট্য, মদ্যপান ও বেশ্যাগমনের যে বাস্তব বর্ণনা কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম পেঁচার নক্সা'য় আছে— "পাড়া গেঁয়ে দুই একজন জমিদার প্রায় বারোমাস এখানেই কাটান। দুকুর ব্যালা কেটিং গাড়ি চড়া. ...মাথায় ক্রোপের চাদর জড়ানো, জন-দশ-বারো মোসাহেব সঙ্গে, বাঈজানের ভেড়ুয়ার মত পোষাক, গলায় মুক্তার মালা— ... বিসর্জন, বারোইপরি, খ্যামটা নাচ আর ঝুমুরের প্রধান ভক্ত, মধ্যে মধ্যে খুনী মামলার গ্রেপ্তারী ও মহাজনের ডিক্রীর দরুন গা ঢাকা দেন। রবিবার, পালা-পার্ব্বণ বিসর্জন আর স্নানযাত্রায় সেজেগুঁজে গাড়ি চড়ে বেরোন।"— ধনপুরের ধনঞ্জয়ের মধ্যে হুবহু এর প্রতিমূর্ত্তি না দেখলেও, তার ধরণটিও প্রায় এই ধরণের। রমেশচন্দ্র, পাড়াগাঁর ধনশালী জমিদার পুত্র ধনঞ্জয়কে অজস্র বিলাস সম্পদের মধ্যে, মদ্যপ ও বেশ্যাসক্ত কিন্তু অভিজাত নাগরিক বন্ধু বা মোসাহেব পরিবৃত অবস্থায় দেখিয়েছেন।

উনবিংশ শতকের গ্রাম-সমাজে প্রচলিত কৌলিন্য প্রথার বিষময় ফল রূপে কালীতারার প্রসঙ্গ ইতিপূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে। কালীতারায় দুঃখময় জীবনযাপন প্রসঙ্গে তার সহোদর শরৎ বলেছে, "... কিন্তু বরেদের কুল ভাল, লোকে বললে বর্দ্ধমান জেলায় এরূপ কুল পাওয়া দুষ্কর, পাড়ার ব্রাহ্মণ পুরোহিত সকলেই জেদ করতে লাগলেন, বাবা তাতে মত দিলেন. ... আমার ভগ্নীপতির বয়স এখন প্রায় পঞ্চাশ বৎসর, তিনি রোগাক্রান্ত ও জীর্ণ, তাঁর সংসারের অনেক দাস-দাসীর মধ্যে দিদি একজন দাসী মাত্র।"

কৌলীন্য প্রথার অন্যতম কুফল বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহ। বর্ণ হিন্দুদের মধ্যে পল্লীসমাজে এই দুটি প্রথা উনবিংশ শতকে অতি সাধারণ অতি প্রচলিত ব্যাপার ছিল। সেই ঘটনাই সমাজ উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে বিন্দুর জেঠামশায় পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক তারিণীবাবুর সঙ্গে নয় বৎসরের বালিকা গোপবালার বিবাহের মধ্যে দিয়ে। এ প্রসঙ্গে রমেশচন্দ্র গ্রামস্থ দলপতি ও সমাজপতিদের সাগ্রহ অভিমত উপন্যাসে দিয়েছেন। 'দলপতিও সমাজপতিগণ সর্ব্বদাই বলিতেন, তারিণীবাবুর এমনই কি বয়স হইয়াছে, এই বিবাহের পরিপক্ক বয়স। ... পুর্নবার দার পরিগ্রহ করুণ, নববধু ধরে আনুন, আশু পুত্র মুখদর্শন করিয়া শান্তি লাভ করুণ। ঐ মিত্রদের বাড়িতে নয় বৎসরের সুন্দরী কন্যা আছে, ... কন্যার পিতৃকুল এরূপ সম্বন্ধে উদ্ধার হইয়া যাইবে।" সেযুগে গ্রাম-সমাজে 'বংশরক্ষা' ব্যাপারটি মানুষের ধর্মরক্ষার মতই অবশ্য কর্তব্যকর্ম ছিল। তারিণীবাবুর বন্ধু বা আত্মীয়বর্গ এবং তিনি নিজেও এই বংশরক্ষার দোহাই পুর্নবিবাহে দিয়েছিলেন। "মল্লিকবংশ দীপশূন্য হইবে"—এই ভয়েই যেন তারিণীবাবু দ্বিতীয় দারপরিগ্রহরূপ কষ্ট স্বীকারে—প্রবৃত্ত হয়েছেন, এমন ভাবটি দেখান হয়েছে।

বিধবাবিবাহ আন্দোলন উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজ-সংস্কার মূলক আন্দোলন। বিদ্যাসাগরের অক্লান্ত চেষ্টা ও অধ্যবসায়ে বিধবা বিবাহ আইন পাশ হয়, এবং সমস্ত বাংলাদেশের সমাজ চৈতন্যের মূলধার এই আন্দোলন টান দেয়। প্রবল প্রতিক্রিয়া এর স্বপক্ষে বিপক্ষে সে যুগে ঘটেছিল। তৎকালীন সাহিত্যে তো এর ছাপ পড়েছিলই, সমগ্র বাঙলার জীবনে বিধবাবিবাহ আন্দোলন বিপুলভাবে আলোড়ন এনেছিল। কিন্তু বিদ্যাসাগরেব চেষ্টায় এবং সমকালীন শিক্ষিত প্রগতিশীল বাঙালীর আন্তরিক আগ্রহ সত্ত্বেও বিধবাবিববাহ কিন্তু সমাজে সাধারণভাবে প্রচলিত হয়নি। স্ত্রীশিক্ষা, বাল্য-বিবাহ বন্ধে সাধারণ মানুষের আগ্রহ ক্রমশ সৃষ্টি হলেও বিধবাবিবাহের প্রতি খুব সহজ মনোভাব এই বিংশ শতকের প্রান্তভাগেও বড় একটা দেখা যায় না। সমালোচক যথার্থই বলেছেন— "... এই আন্দোলন বিশেষ সফল হয়েছিল বলা যায় না। আইন প্রণয়ন করে বিধবা-বিবাহকে বৈধ ঘোষণা করলেও হিন্দু সমাজের উচ্চশ্রেণীর লোকদের মধ্যে বিধবা বিবাহ আজও তেমন আদৃত হয়নি। এবং এরূপ বিবাহ কোথাও ঘটলে সমাজে আজও তা আলোচনার বিষয় হয়ে থাকে।" (উনিশ শতকের সমাজ ও সংস্কৃতি, অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, ১৯৭১সং, পৃঃ ৬৯-৭০)

প্রগতিশীল চেতনাবাহী হওয়া সত্ত্বেও এদেশে বিধবা বিবাহ যে খুব বেশী প্রচলিত বা জনপ্রিয় হয়নি সেকথা প্রখ্যাত সমাজ তাত্ত্বিকেরাও বলেছেন। "কিন্তু এই আইন পাশ হওয়া সত্ত্বেও বিধবা বিবাহ সমাজে খুব প্রসারলাভ করে নাই।" (রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড, আধুনিক যুগ মাঘ, ১৩৮১ সং, পৃঃ ৩৪৫)

সুতরাং উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে বাংলার গ্রাম সমাজে যে বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধে তীব্র অভিমত সাধারণ জনের মধ্যে প্রকাশিত হবে, এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। 'সংসার' উপন্যাসে সমাজ সংস্কারক সত্তার প্রাধান্য নিয়ে রমেশচন্দ্র শরৎ ও সুধার বিবাহ দিয়েছেন। শরৎ আধুনিক শিক্ষিত যুবক প্রগতিশীল যুক্তিবাদী হেমচন্দ্রেরও বিধবা শ্যালিকা সুধার সঙ্গে বন্ধুস্থানীয় শরতের বিবাহে কোনো আপত্তি ঘটেনি। রমেশচন্দ্র শরতের বৃদ্ধা মায়ের এ বিষয়ে প্রাথমিক সংস্কার বশত আপত্তি নির্দেশ করলেও, পরবর্তীতে তিনি মত দিয়েছেন, শরৎ ও সুধার বিবাহ হয়েছে। তারা গ্রামের বাড়িতেই বসবাস করেছে এবং রমেশচন্দ্র অবলীলাক্রমে বর্ণনা করেছেন এ বিষয়ে গ্রামস্থ লোকেদের আপত্তি ও সমাজপতিদের বিরুদ্ধতা হেমচন্দ্র ও শরৎ অগ্রাহ্য করেছে। মীমাংসা হইল যে শরৎ প্রায়শ্চিত্ত করিবে, কিন্তু শরৎ কলেজের ছেলে, তিনি বলিলেন "... আমি ইহার প্রায়শ্চিত্ত করিব না। শেষে শরতের মাতা একদিন ব্রাহ্মণ খাওয়াইয়া দিলেন।"

গ্রাম সমাজের সে যুগের পটভূমিকায় এ ব্যাপারটি কিছু অভাবিত। আবার ধীরে ধীরে গ্রামের সকলের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক সৃষ্টি হওয়ার ব্যাপারটিও ঠিক বাস্তব সম্মত ততখানি নয়, যতখানি আদর্শবাদী সমাজসংস্কারক রমেশচন্দ্রের ইচ্ছার সৃষ্টি। সনাতনের স্ত্রীই প্রথমে স্নেহের টানে বিন্দুদের সঙ্গে পূর্ব সম্পর্কে ফিরে আসে। এরপর "গোয়ালিনী .... ধোপানী, নাপিতানী ...পুনর্বার ...কাজ আরম্ভ করিল।"

ঔপন্যাসিক মন্তব্য করেছেন, "এখন দেশে উচ্চশিক্ষার বিস্তার হইয়াছে, পুরাতন রীতি-নীতি বজায় রাখিয়া যত দূর সম্ভব সমাজের সংস্কার আরম্ভ হইয়াছে, এখন দলাদলি করিয়া "একঘরে করিবার ভয় আর বড় একটা নাই।" (চতুর্বিংশৎ পরিচ্ছেদ)

কিন্তু গ্রাম সমাজের সেই যুগ সম্বন্ধে এটি যথার্থ চিত্র নয়। শরৎচন্দ্রের [illegible] বিংশ শতকের; রমেশচন্দ্রের 'সংসার' উপন্যাসের প্রায় ত্রিশ বৎসর পরেও 'পল্লীসমাজে' (১৯১৬) বাংলার পল্লীসমাজের এই অনড় প্রথাকে সবল করবার দুঃসাহস দেখাতে পারেননি। রমা জমিদার কন্যা ও ভূসম্পত্তির মালিক হয়েও রমার হৃদয় [illegible] শরৎচন্দ্র প্রতিষ্ঠা দিতে পারেননি। সেক্ষেত্রে রমেশচন্দ্র অবলীলাক্রমে বালবিধবা সুধার বিবাহ সংঘটন করিয়েছেন। এই ব্যাপারটি [illegible] না হলেও রমেশচন্দ্র কিন্তু সুধার বিবাহ ব্যাপারে সামাজিক আন্দোলনের কিছু সত্যমূলক চিত্র না দিয়ে পারেননি। যেমন, (ক) শরৎ সুধাকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক এই সংবাদ কালীতারার শ্বশুরালয়ে পৌঁছলে পর [illegible] শাশুড়ীর সরল প্রতিক্রিয়ার বর্ণনা। "মেজোটি একেবারে [illegible] বলিলেন, ... ও পোড়ারমুখী, ও জ্ঞানমার্গে [illegible] এই দেশের মধ্যে ছিল না? ... মর মর মর! আমাদের কুলে এই [illegible] মেয়ে! বাপ শ্বশুরকুলটা একেবারে ডোবালি [illegible] তোরই একদিন কি আমারই একদিন। নোড়া দিয়ে [illegible] তোর পিঠে নুড়ো খেংরা ভাঙবো না? মাথায় [illegible] ঝেঁটা মেরে যদি বের করে না দি, তবে আমি কায়েতের মেয়ে নই।"

(খ) কালীতারা বিন্দুর কাছে কাকুতি মিনতি জানিয়ে কেঁদে কেটে চিঠি লিখেছে: ". বিন্দুদিদি এ কাজটি করিও না। .. একাজ হইলে.. শাশুড়ীরা আমাকে আস্ত রাখিবে না, .."

(গ) বিন্দুর জেঠাইমা লোক দিয়ে বলে পাঠালেন: "বিন্দু ... বুড়ি জেঠাইমাকে এই বয়সে খুন করিসনি, মল্লিক বংশ একেবারে কলঙ্কে ডুবাস নি। .. বাপ-মার কুল নরকে ডুবাস নি। ..."

সমালোচক বলেছেন, গ্রামীণ সমাজের প্রভাব উনিশ শতকের প্রথমার্দ্ধে

কলকাতা সমাজের ওপর যথেষ্টই ছিল। "কলকাতা তখন বহু লোকের কর্মস্থান হলেও স্থায়ী নিবাস (দেশ) বলে গণ্য হত না। এইসব লোকেরা তাঁদের গ্রামীণ সমাজের রীতিনীতি শহরেও অনুসরণ করার চেষ্টা করতেন।" (অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, উনিশ শতকের সমাজ ও সংস্কৃতি, ১৯৭১সং, পৃ: ৯)

'সংসার' উপন্যাসে গ্রামীণ সমাজের জাত-পাত বিচারের রীতিনীতি ও গ্রামীণ সংস্কারের প্রভাব নাগরিক জীবনেও প্রতিফলিত হতে দেখা গেছে শরৎ সুধার বিবাহ প্রস্তাব প্রসঙ্গে। দানীর মুখ থেকে কানাকানি হয়ে সংবাদটি বিন্দুর ধনী প্রতিবেশী দেবীবাবুর স্ত্রীর কানে পৌঁছলে তিনি গ্রাম্য জাত্যাভিমানে কটুবাক্য বর্ষণ করেন।"এখন ত আর ভদ্র ইতর বাচ-বিচার নেই, যত ছোট লোক পাড়া গা থেকে এসে কায়েত বলে পরিচয় দেয়। অমনি কায়েত হয়ে যায়। ... ঐ বিধবা ছুঁড়িটাকে আবার পাড়ওয়ালা কাপড় পরান হয়, ... যেমন জাত তেমনি আচরণ, হাড়ি মুচিদের ঘরে আর কি হবে? ঐ যে মুচুনমানদের বিধবার নিকে হয় না? এ তাই লো তাই?" শ্যামার মা নিন্দা করে বলেছে, "তা না ত কি বোন, ওরা আবার কায়েত! ... ওমা ঐ ছুঁড়িটা আবার একাদশীর দিন জলটল খায়, গায়ে তেল মাখে, মাছ না হলে ভাত খাওয়া হয় না, ছি! ছি! ছি! .."

বিধবার বিয়ে ব্যাপারটি যে কলকাতার জনমানসেও সাধারণভাবে নিন্দিত ছিল, সে কথাটি রমেশচন্দ্রের বর্ণনাতে স্পষ্ট হয়েছে এইরকম নানা ভাবে। যেমন, গ্রাম্য নারী স্বভাব-রীতি অনুযায়ী মেয়ে মজলিশের উপরোক্ত পরচর্চা জনিত আলোচনায় আবার ঝি-বৌদের পাতকুয়াতলায় জল নিতে এসে জড় মর হইয়া কানাকানির মাধ্যমে। বৌ-ঝিরা পরস্পরের মধ্যে বিধবা-বিবাহ সম্পর্কে নানাবিধ মত দিয়েছে এবং অবধারিতভাবে গ্রাম্য বৌ-ঝিদের মতই পরচর্চা করেছে। " ... ওলো ঐ যে হেম বলে পাড়াগাঁ থেকে এসেছে, সেই তার স্ত্রী আর শ্যালী নাকি বিধবা, তার আবার শরৎবাবুর সঙ্গে বিয়ে হবে।

তৃতীয়া। দূর পোড়াকপালী! তাও কি হয় লো, বিধবার আবার বিয়ে হয়?

দ্বিতীয়া। তা হবে না কেন; ঐ যে বিদ্যাসাগর বলে বড় পণ্ডিত আছে... ঐ সেই নাকি বলেছে বিধবার বিয়ে হয়। ...

প্রথমা! ... তা শরৎবাবু শুনেছি ভাল ছেলে, তিনি এমন করেন কেন?

দ্বিতীযা। ... ভাল ছেলে হলে কিং হয়, ফুটফুটে মেয়েটী দেখেছে মন ভুলে গেছে। ...

দ্বিতীয়া। ... ওলো এদের কথা লো! বলি বিদ্যাসুন্দর পড়িছিস? এ তাই লো তাই। এখনকার ছেলেরা সব সুড়ঙ্গ কাটতে শিখেছে দেখিস লো, সাবধান।"

এই মেয়েলি পরচর্চায় গ্রাম্য নারী সমাজের স্বভাব লক্ষণ যেমন স্পষ্ট প্রতিফলিত তেমনই দাসী মহলের মধ্যে এই ঘটনা নিয়ে হুলুস্থুল পড়ার মধ্যেও গ্রাম্য নারী স্বভাব প্রতিষ্ঠিত। একটা কথাকে নিয়ে বাড়িয়ে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে,

তিলকে তালে পরিণত করার গ্রাম্য স্বভাব এইসব বর্ণনায় ভাল ভাবেই ঔপন্যাসিক ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। এবং এসব ক্ষেত্রে প্রায়ই কানাকানি গুজবে, সত্যের মধ্যে মিথ্যা বহুল পরিমাণে দেশে, এবং গুজব রটনাকারীরা অবলীলাক্রমে রটনার মধ্যে অশ্লীল ইঙ্গিতও দিতে ছাড়ে না। কাজেই শরৎ কর্তৃক সুধাকে বিবাহ করার প্রস্তাবে রটনাকারীরা এর মধ্যে ঘোরতর দুর্নীতি আবিষ্কার করেছে। বিশেষতঃ দাসীরা অশিক্ষিতা ও অমার্জিত স্বভাবেরই সাধারণত হয়ে থাকত।

' ... সব ঠিকঠাক হয়ে গেছে, পশুর হয়ে গেছে, হেমবাবু সেকরাকে গয়না গড়াতে দিয়েছে, ...বৃদ্ধা। এই শুনবি আয়, কানে কানে বলি। ... 'বলি শুনিসনি? হেমবাবুর শ্যালী যে পোয়াতী।"

এই কলঙ্ক কথা হেমচন্দ্রের প্রতিবেশীরাও সাগ্রহে বিশ্বাস করেছে এবং তারা দল বেঁধে হেমচন্দ্রকে "সুপরামর্শ" দিতে তার বাড়িতে এসেছে। এই সব প্রবীণ ও নবীন পরামর্শদাতা; সমাজপতি ও পণ্ডিতবর্গ যেভাবে অপরের সাংসারিক বা পারিবারিক ব্যাপারে মাথা ঘামিয়েছে, বা আগ্রহ প্রকাশ করেছে সেই আগ্রহ কৌতুহল এবং অযাচিত উপদেশ প্রবণতাকে গ্রাম্য স্বভাব লক্ষণই বলা যায়। রমেশচন্দ্র, শরৎ ও মেহচন্দ্রের তালপুকুরের প্রকৃতি গ্রাম সমাজকে এই বিবাহে প্রতিবন্ধকতা করার মত ক্ষমতা দেননি ঠিক, কিন্তু কলকাতা শহরে বসেই হেমচন্দ্র ও শরৎ যে প্রতিবন্ধকতা পেয়েছে, সেই বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায় রমেশচন্দ্র সমাজ চেতনা সম্পর্কে যথেষ্টই অবহিত ছিলেন।

'তালপুকুর' গ্রামটি যথার্থই বাংলাদেশের গত শতাব্দীর একটি শান্ত স্নিগ্ধ সরল গ্রামের প্রতিচ্ছবি। এখানে জীবন জটিল নয়, মানুষে মানুষে স্নেহ-প্রীতি ভালাসার সম্পর্ক সুগভীরভাবে রয়েছে। গ্রামে জাতভেদ আছে, বৃত্তি অনুযায়ী জীবনযাপন রয়েছে, পরচর্চা-পরনিন্দা রয়েছে, ধনীর সঙ্গে দরিদ্রের সুদুর পার্থক্য রয়েছে, সামাজিক জোট পাকানো আছে, কিন্তু হৃদ্যতার বন্ধনটুকুও আছে। 'সংসার' বা 'সমাজ' উপন্যাসে সাধারণ সরল নরনারীকেই আমরা প্রধানত দেখি। এখানে হেমচন্দ্র, বিন্দু, সুধা, বিন্দুর জেঠামশাই তারিণীবাবু, জেঠাইমা, উমা বা কালীতারা এমনকি সনাতন কৈবর্ত্ত ও তার স্ত্রীও এই সহজ রূপের জন্যই খাটি বঙ্গপল্লীর প্রত্যক্ষ সামাজিক চরিত্র হয়ে উঠেছে। তারিণীবাবু উনবিংশ শতকের সুপরিচিত গ্রাম্য চরিত্র। যারা অর্থ-উপার্জনে শহরে যায়, কিন্তু মূল ঘরবাড়ী, জোত-জমা, সংসার আছে গ্রামে। সমাজতাত্ত্বিকের ভাষায় "...গ্রামের জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগী, যাঁরা শহরমুখী হয়েছেন এবং সহরে মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্ত শ্রেণীতে গৃহীত হয়েছেন, তাঁরাও সম্পূর্ণরূপে 'Urbanised' হননি। শহরমুখী প্রায় সকল শ্রেণীর লোকের এক পা ছিল গ্রামে, এক পা শহরে।" (বিনয় ঘোষ, বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা, ১৮০০-১৯০০, 'সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজ চিত্র' গ্রন্থমালার শেষ পঞ্চম খণ্ড। জুন, ১৯৭০ সং, পৃঃ ৪৯) তারিণীবাবুকে ঠিক এই শ্রেণীর নগরবাসী বলা

যাবে না, কেননা, তিনি কলকাতায় না, বর্ধমানে 'নাজি'বের কাজ করেন। সেখানে সংসার নিয়ে যাননি। তাঁর মূল জীবনযাপন গ্রামেই। তবুও, তিনি উনবিংশ শতকের সেই সব শহরমুখী চাকুরীজীবীদের অন্যতম, যারা শহরে অর্থ উপার্জনে যান, কিন্তু গ্রামের মূল টান ছাড়তে পারেন না। তারিণীবাবুর গ্রামের বাড়িতে প্রচুর জাঁক-জমকের সঙ্গে বিভিন্ন পূজা-পার্বণ হয়, যাত্রা গান হয়। তিনি বৈঠকখানা পাকা ইটের তৈরি করেছেন। তাঁর গৃহিণীর ইচ্ছা শয়ন কক্ষটিও পাকা হক, তাই ইঁটের পাঁজা কবা হয়েছে। তারিণীবাবু গ্রামে প্রচুর ভূ-সম্পত্তি করেছেন। তাঁর বিষয় বুদ্ধি বুদ্ধিমান গ্রামবাসীর মতই। জমিজমার হিসেবে তিনি ভালই বোঝেন। ভাই এর জমিটি অক্লেশে বিধবা ভ্রাতৃবধুর কাছ থেকে দখল করেছেন। বিন্দুর স্বামী হেমচন্দ্র স্ত্রীর পৈত্রিক জমিজমা উদ্ধারের চেষ্টা করলে তাবিণীবাবু অনায়াসে সেই জমি 'এজমালি' সম্পত্তি বলে উল্লেখ করেছেন। ভাই এর জমি গ্রাস করলেও তার বাইরের আচরণটি হেমচন্দ্র বা বিন্দুর প্রতি সদয়। তিনি মিষ্ট কথায় হেমচন্দ্রকে গৃহে আহবান করেছেন। আবার মেহচন্দ্রের স্ত্রীর পৈত্রিক বিষয় উদ্ধারের প্রচেষ্টা বা তার বিষয় বুদ্ধি দেখে ভিতরে ভিতরে ক্রুদ্ধ হলেও বাইরে প্রকাশ করেননি। কিন্তু রাত্রে শোওয়ার সময় প্রাণভরে হেমকে গালাগালি দিয়েছেন। তারিণীবাবু অতি সাধারণ গ্রাম্য চরিত্র হিসেবেই উপন্যাসে চিত্রিত। গ্রামবাংলার অসংখ্য বিষয় বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের তিনি একজন। আবার, বৃদ্ধ অবস্থায় বালিকা বধুর লোভে তিনি নির্দ্বিধায় দ্বিতীয়বার বিবাহে ইচ্ছুক হন এবং বংশরক্ষার অজুহাত দেন। 'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্য' হলে সচরাচর যা হয়, তারিণীবাবুর ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে! তিনি নববধুকে সমস্ত বিষয়-আশয় লিখে দিয়েছেন। কিন্তু 'নাজির' হিসেবে যে বুদ্ধিটুকু ছিল শেষ পর্যন্ত তার সাহয্যে তিনি ঐ দলিল নাকচ করে পুনরায় বিষয়-সম্পত্তি বিন্দুবাসিনী ও সুধাকে উইল করে দিয়ে গেছেন।

গ্রামের নারী সমাজের পরিবার জীবনে লাঞ্ছনা ও গঞ্জনার চিত্র উনবিংশ শতকে ছিল বাংলাদেশের অতি স্বাভাবিক চিত্র। পুরুষ বিবাহ করে স্ত্রী ঘরে আনে গৃহকর্মের জন্য, সন্তান লাভ ও তার লালন পালনের জন্য। স্বামী ও বৃহৎ পরিবারের সেবা করা ও মনস্তুষ্টি ঘটানোই স্ত্রীর একমাত্র কর্তব্য কর্ম। তার স্বাধীন সত্তা বলে কিছু থাকতে নেই। সেবাধর্মে স্বামী সন্তুষ্ট হলে তার জীবন সার্থক, নতুবা যে কোনো মুহূর্তে সপত্নী পাওয়ার সম্ভবনা। স্বামীর কাছ থেকে লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, তো বটেই, শাশুড়ী ননদের কাছ থেকেও গৃহবধুদের সেসব ভোগ করতে হত। সারা দিনমান অবিশ্রান্ত কাজই ছিল তখনকার সাধারণ ঘরের বধূদের যোগ্যতার মাপকাঠি।

শরতের ভগ্নী কালীতারার সাংসারিক জীবনের এই চিত্র আমরা 'সংসার' উপন্যাসে বর্ণিত হতে দেখেছি কালীতারার মুখ থেকে অথবা তার ভ্রাতা শরতের বর্ণনা থেকে।

কালীতারা নিজের সম্পর্কে বলেছে, " আমাদের ... বৃহৎ সংসার, অনেক কাজকর্ম আছে, আর আমাদের যে ঘর তাতে চাকর দাসী রাখা প্রথা নেই। কাজেই আমরা কেউ এলে কাজ চলবে কেমন করে বল? এই এবার এসেছি, আমার এক বড় ননদ আছে, তাকে কত মিনতি করে আমার কাজগুলি করতে বলে এসেছি। ... ঝি রাখবেন কেমন করে বল, আমাদের বাড়ির ত সে রীতি নয়, বাইরের লোকেদের কি ছুঁতে আছে? কাজেই বৌদের সব করতে হয়।" (নবম পর্ব)

শরৎ কালীতারা সম্পর্কে মন্তব্য করেছে ঃ

"প্রাতঃকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজকর্ম করেন. দু'বেলা দুপেট খেতে পান, দিদি তাতেই সন্তুষ্ট, তাঁর চিত্তে অন্য কোনও আশা নেই। ... "

'সমাজ' উপন্যাসে গ্রামীণ এক দাদামশাই চরিত্রের মাধ্যমে লেখক গৃহের স্ত্রী সম্পর্কে ঐ ধরনের সমাজ চেতনা প্রকাশ করেছেন দাদামশাই শরৎকে স্ত্রী সম্বন্ধে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছেন আধুনিক কালের শিক্ষিত ছেলেরা 'বউকে মাথায় করে' রেখে তাদের নষ্ট করে দিচ্ছে। তাঁর মতে 'সকাল থেকে উঠে বাসনমাজা, ঘরঝাঁট দেওয়া. কুটনো কোটা, বাটনা বাঁটা, রাঁধা, বাড়া, পুরুষদের খাওয়ানো, ছেলেদের খাওয়ানো এসব কাজ হলে তবে বৌয়েরা মুখে জল দিতে পারলে সে বৌ হিসেবে যথার্থ তৈরী হতে পেরেছে বলা যাবে।

দাদাঠাকুর এইরকম এক 'খাঁটি বৌ' তৈরি কারী 'ঘোষালের পো'র উল্লেখ করেছেন। " ... ঠিক যেন ময়না পাখী পড়িয়েছে, ঘোষালের পো যা হুকুম দিবে বৌমা টুঁ শব্দ না করেই তাই করবে! বৌকে ত এমন তৈয়ের করেনি! মাঘ মাসের শীতে দিখিছি কাঁপতে কাঁপতে রাত্রি ৮টার সময় ঘাটে বসিয়া বাসন মাজিতেছে, আর চৈত্র মাসের ঠিক দুই প্রহরের রোদে দেখিয়াছি এক কোলে ছেলে এক কোলে কলসী করিয়া পুকুরঘাটে দশবার উঠা নাম করিতেছে! স্বামীর নাওযা-খাওয়া হইলে, ছেলেরা দুই প্রহরের বেলায় ঘুমাইলে তবে বৌ মা স্নান করিতে পায়, মুখে একটু জল দিতে পায়। একে বলে হিন্দু বাড়ির বৌ। ... মেয়ে মানুষের আবার সুখ কি? পুরুষের লাথি ঝেঁটা খেলেই তার সুখ। ... ঘোষালের পো ঘুম থেকে উঠতে না উঠতে গরম দুধটুকু প্রস্তুত, বেড়াইয়া না আসিতে আসিতে বৌমা পা ধুইবার জল লইয়া হাজির, স্নান না হইতে হইতে গরম ভাত প্রস্তুতি! একটু এদিক ওদিক হউক দেখি, ... বৌমা সেদিন চৌদ্দ পুরুষের প্রশংসা শুনিবেন, তাঁহার সেদিন ভাত খাইতে হইবে না! সেদিন বৌমার নাকি শরীর খারাপ ছিল, রাঁধিতে একটু দেরী হয়েছিল, ঘোষালের পো গলা সাড়া দিয়া বলিলেন, বৌয়ের যদি বাড়ির কাজ একলা করিতে এতই কষ্ট হয়, তা হইলে আর একটি বউ আনাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কথাটা শুনিয়া বৌমা নাকি আছাড় খেয়ে কেঁদে ছিল, তার পরদিন ৪টা রাত্রির সময় রান্না চড়িয়ে দিয়েছিল!

... আমাদের হিন্দু ঘরের রীতি এই, ... এ বৌটা অধিকদিন টিকেবে না, ঘোষালের পো গোপনে নাকি এদিক ওদিক ঘটকী পাঠাইতেছে।" (একাদশ পরিচ্ছেদ, 'সমাজ')।

'ঘোষালের পো'র মত এরকম 'পাকা ছেলে' সেযুগে পল্লীবাংলার প্রায় প্রতি ঘরেই দেখা যেত। প্রখ্যাত সমাজতাত্ত্বিক ও সমালোচকের গ্রন্থে রামমোহন রায়ের বিখ্যাত প্রবন্ধের কতকাংশ উদ্ধৃত হয়েছে, যেখানে রামমোহন সাধারণভাবে বাংলাদেশের স্ত্রীজাতির পূর্বাবস্থার বর্ণনা করেছেন, সেই বর্ণনার সঙ্গে রমেশচন্দ্রের উপরি লিখিত 'ঘোষালের পোর স্ত্রীর লাঞ্ছনার মিল আছে। যেমন— "... বিবাহের সময় স্ত্রীকে অর্দ্ধাঙ্গিনী বলিয়া স্বীকার করেন কিন্তু তাহাদের সহিত পশুর অধম ব্যবহার করেন। স্বামী গৃহে প্রায় সকলের পত্নী দাস্যবৃত্তি করে অর্থাৎ অতি প্রাতে কি শীতকালে কি বর্ষাতে স্থান মার্জ্জন, ভোজনাদি পাত্র মার্জ্জন, গৃহ লেপনাদি তাবৎ কর্ম্ম করিয়া থাকে; এবং ঐ বৃহৎ পরিবারের সূপকাবের কর্ম্ম বিনা বেতনে দিবসে ও রাত্রিতে করে। ... যদি কোন অংশে ক্রুটি হয় তবে তাহাদের স্বামী, শাশুড়ী, দেবর প্রভৃতি কি কি তিরস্কার না করেন। এ সকলই স্ত্রীলোকেরা ধর্ম্ম ভয়ে সহ্য করে, আর সকলের ভোজন হইলে ব্যঞ্জনাদি উদর পূরণের যোগ্য অথবা অযোগ্য যৎ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকে তাহা সন্তোষ পূর্ব্বক আহার করিয়া কালযাপন করে। আর দরিদ্র ব্রাহ্মণ কায়স্থ বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা গো-সেবাদি কর্ম্ম করে, পাকাদির নিমিত্ত গোময়ের ঘসি স্বহস্তে দেয়, বৈকালে পুষ্করিণী অথবা নদী হইতে জল আনয়ন করে, রাত্রিতে শয্যাদি করা যাহা ভৃত্যের কর্ম্ম তাহাও করে, মধ্যে মধ্যে কিঞ্চিৎ ক্রুটি হইলে তিরস্কার পায়। ... (সূত্র, রমেশচন্দ্র মজুমদার বাংলা দেশের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড, আধুনিক যুগ, মাঘ, ১৩৮১ সং, পৃঃ ৩১৪-৩১৫) উনবিংশ শতকের প্রথম ভাগে রামমোহন বাংলার সামগ্রিক নারী সমাজের যে দুর্দশায় কথা লিপিবদ্ধ করেছিলেন, শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধের বঙ্গ পল্লীর নারীদের দুঃখ লাঞ্ছনার সঙ্গেও তা অভিন্ন দেখা যাচ্ছে।

কালীতারা তার স্বামীগৃহের মূল গৃহিণী শাশুড়ীর দৈনন্দিন যে কর্মতালিকা দিয়েছে, তার সঙ্গে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে সম্পন্ন নিষ্ঠাবান হিন্দু গৃহস্থের গৃহিণীর জীবনযাত্রা কেমন ছিল, সে বিষয়ে ১৮৫৬ সালের ১১ নভেম্বর তারিখের 'সংবাদ ভাস্কর' নামক সংবাদপত্রে উদ্ধৃত বর্ণনার যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। পাশাপাশি দুটি বর্ণনা রাখা হ'ল। —"আন্দুল নিবাসী ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক মহাশয়ের স্ত্রী ... প্রতিদিবস ... প্রাতঃকালে ... গঙ্গাজলে প্রাতঃস্নান করিয়া— পূজাগারে প্রবেশ করেন, বেলা দুই প্রহর পর্যন্ত যথোপচারে পূজা, জপ সাঙ্গ করিয়া বাইরে আইসেন, সেই সময়ে দাসী সকল নিকটে থাকে জিজ্ঞাসা করেন রন্ধনাদির কি কি ব্যবস্থা হইয়াছে ... বেলা দুই প্রহর তিন ঘন্টা পর্যন্ত অনুসন্ধান করেন সকলের আহারাদি হইয়াছে কিনা, তৎপরে শেষ বেলায় নিয়মিত যৎ

কিঞ্চিৎ আহার করেন, এই আহারেই আহার, রাত্রিতে কিঞ্চিৎ দুগ্ধ পান মাত্র, ... (সূত্র, রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলা দেশের ইতিহাস, মাঘ ১৩৮১ সং, তৃতীয় খণ্ড আধুনিক যুগ পৃ: ৩১৩-৩১৪)

কালীতারার বর্ণনা ঃ " ... যদিও তাঁর সত্তর বছর বয়েস হয়েছে, এখনও বেশ শক্ত আছেন। ... তিনিই আমাদের গিন্নী। ... কি গ্রীষ্ম কি শীত বারো মাস তিনি ভোরের বেলা স্নান করে ঠাকুর ঘরে পূজো করতে বসেন। ... দু ঘন্টা পরে পূজো থেকে উঠে কার খাওয়া হয়েছে, না হয়েছে সব তদারক করে শেষে দুপুরের পর আপনি দুটি খেয়ে একটু বিশ্রাম করেন। অপরাহ্নে উঠে আবার কাজকর্মে মন দেন— যতক্ষণ না রাত্রির খাওয়া দাওয়া শেষ করে সকলে শুতে যায়।"

বাংলার পল্লীসমাজের ভদ্র নরনারী ব্যতীত অপেক্ষাকৃত নিম্নবর্ণের স্ত্রীপুরুষের সহজ চিত্রাঙ্কন করেছেন লেখক 'সংসার' বা 'সমাজ' উপন্যাসে। 'সংসার কথা'য় সনাতন যেমন হেমচন্দ্রের অনুগত এক কৃষক চরিত্র, তেমনই তার পত্নী ও বিন্দু ও সুধার প্রতি পরম স্নেহপ্রবণ ও অনুগতা। তার স্নেহ পরায়ণ মনটি এবং অতি সরল গ্রাম্যতা একাধিকবার এ উপন্যাসে অভিব্যক্ত হয়েছে। স্বামীর সঙ্গে সে কলহ পরায়ণা। কিন্তু বিন্দুও সুধার কাছে তার ভিন্নরূপ। বিন্দুও তাকে বাল্যকালাবধি চেনে ও কৈবর্ত্ত দিদি সম্বোধন করে। শরতের পরামর্শে হেমচন্দ্র সপরিবারে কলকাতায় যাবে খবর জেনে ভোর বেলাতেই সনাতন-পত্নী বিন্দুর কাছে এসে হাজির হয়েছে এবং বহু ভনিতা ও চোখের জল বর্ষণ করে তারপর বিন্দুকে কলকাতা না যাওয়ার জন্য ব্যাকুল অনুরোধ করেছে। তার অজস্র ভনিতা বিন্দুর ধৈর্যচ্যুতি যখন ঘটিয়েছে, তখন কোনো রকমে আসল কথাটি বলেছে।" দিদি ঠাকরুণ তোমরা নাকি সকলে আমাদের ছেড়ে কলকেতায় চলে যাচ্ছ?" সনাতন পত্নীর সরল ভালবাসা প্রকাশিত হয়েছে এইভাবে ঃ "... তোমাকে আর দেখতে পার না? সুধাদিদি আমাকে এত ভালবাসে; সে সুধাদিদিকে কোথায় নিয়ে যাবে গো?"-ইত্যাদি।

কলকাতা শহর সম্বন্ধে ঊনিবিংশ শতকের নিভৃত বঙ্গপল্লীর এক কৃষক রমণীর স্বাভাবিক ভীতি ও অজ্ঞতা, কলকাতা সম্বন্ধে শ্রুত নানা অবাস্তব রটনা, কলকাতার নবশিক্ষিত যুবক সম্প্রদায় সম্পর্কে ও নানাবিধ বিচিত্র রটনায়; তাদের অন্ধবিশ্বাস অতি সরলভাবেই সনাতন পত্নী বিন্দুর কাছে অশ্রুপাতের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্ত করেছে। "ছি—দিদি; সেখানেও যায়! শুনেছি কলকেতায় গেলে জাত থাকে না, কিছু জাত বিচের নেই, হিঁদু মুচুনমানে বিচের নেই, সে দেশেও যায়! ... শরৎ বাবুর কি ... উনি কালেজে পড়েন। ... কালেজের ছেলে সব করতে পারে। শুনেছি কালেজের ছেলে সাগর পার হয়ে বিলেত যায়। ওমা! তারা ত জেন্ত মানুষের গলায় ছুরি দিতে পারে! হেঁ দিদি, বিলেত কোথায়? সেই যে গঙ্গা

সাগরের গল্প শুনি, তারও নাকি পার যেতে হয়? শুনেছি নাকি লঙ্কায় যেতে হয়।" ... তা লঙ্কা থেকে কি আর মানুষে ফিরে আসে, তারা রাক্কস হয়ে আসে, শুনেছি তারা জেন্ত মানুষের গলায় ছুরি দেয়। ..." সনাতন পত্নীর চিনিপাতা দৈ খেতে সুধা ভালবাসে, তাই সে মনে করে সেই দইটুকু নিয়ে এসেছে। এই আন্তরিকতাটুকু যেমন একান্তই পল্লীজীবন সম্ভব, তেমনই, কলকাতা ভীতি, কলকাতায় কলেজে পড়া ছাত্র সম্পর্কে ভীতি, বিলেত যাত্রা সম্বন্ধে ভীতি এবং গ্রাম ছেড়ে বিদেশ যাত্রার মধ্যেই তার যে একান্ত অনিচ্ছা— এটিও বিন্দু ও সুধার প্রতি তার ভালবাসার একান্তই পল্লীজীবন থেকেই গড়ে উঠেছে। বিন্দুদের প্রতি এই ঐকান্তিক ভালবাসার টানেই সনাতন পত্নী, বিধবা সুধার বিবাহের মত গ্রাম সমাজের পক্ষে নিতান্ত গর্হিত অন্যায় কাজ করা সত্ত্বেও এবং এ বিষয়ে গ্রামের বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও সর্বপ্রথম বিন্দুর কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। অভিযোগ করেছে, কিন্তু তাদের ছাড়তে পারেনি।

জাতিভেদ, বর্ণভেদ প্রথা উনবিংশ শতকের গ্রাম বাংলায় অতি দৃঢ়মূল হয়েই বর্তমান ছিল। "বাংলা দেশের হিন্দুসমাজ ... অন্ততঃ খ্রীষ্টীয় ১২শ ১৩শ শতাব্দী হতেই সুবিদিত চর্তুবর্ণের পরিবর্তে মাত্র দুই বর্ণ, ব্রাহ্মণ ও শূদ্র নিয়ে গঠিত হয়েছিল। বৃহদ্ধর্মপুরাণ ও ব্রহ্মবৈববর্ত পুরাণ (১২শ হতে ১৪শ শতাব্দীর মধ্যে রচিত), এই দুই প্রামাণ্য গ্রন্থের সাক্ষ্যই এ বিষয়ে এক। ... স্মৃতিশাস্ত্রকার রঘুনন্দন ও উপরোক্ত দুই পুরাণের অনুসরণ করে কলিতে বৈদ্যদের শূদ্রতুল্য বলে ঘোষণা করে গেছেন (কলৌ বৈদ্য ঃ শূদ্রবৎ)। তাঁর রচিত শাস্ত্র পড়ে ধারণা হয় সে যুগে বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র মাত্র এই দুটি প্রধান বর্ণেরই অস্তিত্ব ছিল। বৈদ্যজাতির সম্বন্ধে উপরে যা বলা হল কায়স্থদের সম্বন্ধেও সে কথা সমভাবে প্রযোজ্য। সুপণ্ডিত Hutton সাহেব তাঁর Caste in India বই-এ দেখিয়েছেন যে অষ্টাদশ শতকেও বাঙালী কায়স্থেরা সৎশূদ্র বলে বিবেচিত হতেন, তার চেয়ে উচ্চে তাঁদের স্থান সমাজ স্বীকার করেনি। তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে শূদ্রের পর্যায়ভুক্ত হলেও বৈদ্য কায়স্থদের স্থান বাঙালী হিন্দু সমাজে বহুদিন ধরে ব্রাহ্মণদের পরেই নির্দিষ্ট ছিল। ... অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে কলকাতার হিন্দু সমাজেও কায়স্থ ও সুবর্ণ-বণিক জাতির প্রভাব প্রতিপত্তি ব্রাহ্মণদের চেয়ে কিছু বেশি ছিল বলেই মনে হয়। কিন্তু এই সব প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী লোকেরাও বর্ণ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের প্রাপ্য সামাজিক মর্যাদা দিতে সে যুগে কুণ্ঠিত হতেন না। চৈতন্যদেব নিজে প্রেমভক্তির অধিকারে জাতি ও সম্প্রদায় ভেদ অগ্রাহ্য করেন কিন্তু আহার ও সামাজিক ব্যাপারে জাতিভেদবে অস্বীকার করতে পারেননি। ... সমাজের বৃহত্তর অংশ জাতিভেদ প্রথা ও ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্যকে স্বীকার করে নিয়েছিল এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।"

(অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, উনিশ শতকের সমাজ ও সংস্কৃতি, সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

সং, পৃঃ ১-৩)।

বহু প্রাচীন কাল থেকে আগত জাতিভেদ প্রথা, ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্য বাংলার জনজীবনে দৃঢ়মূল হয়েছিল, উনবিংশ শতকের আধুনিক ইংরোজী শিক্ষা প্রববর্তনে বাঙালীর ভাব জগতে যে প্রগতিশীলতা এসেছিল, তার ফলে জাতিভেদের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে উঠতে থাকে। নানা পরিবর্তন ঘটতে থাকে। কলকাতার হিন্দুদের মধ্যে জাতিগত আচার ত্যাগের প্রবণতা দেখা গিয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, জাতিগত সংস্কার বা জাত্যাভিমান উনবিংশ শতাব্দীতে সাধারণভাবে বাঙালীর চেতনা থেকে দূর হয়নি। এবং জাতিগত আচার বিচারের প্রাবল্য কলকাতার তুলনায় বলা বাহুল্য গ্রামাঞ্চলে অনেক বেশি প্রবল ছিল। সাধারণ লোক সমাজ তো বটেই এমনকি অনেক সমাজসংস্কারক ও উদার মতাবলম্বী নেতারাও জাতিগত আচার বিচার মেনে চলতেন। রাজা রামমোহন রায় উপবীত আমৃত্যু ধারণ করেন। সমুদ্র-যাত্রায় ব্রাহ্মণ পাচক সঙ্গে নিয়েছিলেন। পরিণত বয়সে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও রক্ষণশীল হয়ে পড়েন। মহর্ষি তাঁর দৌহিত্র জ্যোৎস্নানাথ ঘোষালের (স্বর্ণ-কুমারী দেবীর পুত্র) কুচবিহার রাজপরিবারে অসবর্ণ বিবাহে সমাহিত হন। (সূত্র, সরলা দেবী, জীবনের ঝরা পাতা)। ব্রাহ্ম সমাজের বিশিষ্ট নেতা ও চিন্তাবিদ অক্ষয়কুমার দত্ত জাতিভেদ প্রথার অবসানের সময় তখনও আসেনি একথা মনে করতেন।

শহরাঞ্চলে, প্রগতিশীল ব্যক্তিদের মধ্যেও যখন জাতিভেদ প্রথার প্রবল বিরোধিতা ছিল না, বরং প্রথার প্রতি মান্যতাই ছিল সেক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চলের সমাজ চেতনায় যে জাতিভেদ প্রথা সুগভীরভাবে রক্ষিত থাকবে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহে অভিমত দেওয়া যায়। যথার্থই, উনবিংশ শতকের বাংলাদেশে জাতিভেদ প্রথা গ্রামাঞ্চলের সমাজ ব্যবস্থায় একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। এই জাতিভেদ প্রথার সঙ্গে ওতপ্রোত জড়িত থাকত বিবাহাদি ব্যাপার। বিবাহের ক্ষেত্রে স্ব স্ব জাতি ও বর্ণে বিবাহই সিদ্ধ ছিল। এমনকি কৌলীন্য প্রথা থাকবার ফলে, একই জাতের মধ্যেও নানা বিভাগ ছিল এবং সেক্ষেত্রেও বিবাহ ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতা ছিল। কুলীন, ক্ষত্রিয়, ভঙ্গ—এসব ভাগ তো ছিলই এমনকি, রাঢ়ি বরেন্দ্রী, এই রকম বিভাগ ও বিবাহের প্রতিবন্ধক হত।

বাংলাদেশের গ্রামসমাজে উনবিংশ শতকে যখন জাতিভেদের প্রবল গোঁড়ামি বর্তমান ছিল, যখন সমাজের নিম্ন বর্ণেরাও নির্বিবাদে উচ্চবর্ণের আধিপত্য মেনে নিত, সেই সময়ের পটভূমিকায় রমেশচন্দ্র 'সংসার'—উপন্যাসের পরিশিষ্ট 'সমাজ' উপন্যাসে জাতি ও বর্ণ ভেদ প্রথা ভঙ্গকারী একটি বিবাহ সংঘটিত করেছেন। রমনীকান্ত ব্রাহ্মণ হয়েও এই উপন্যাসে তাঁর পুত্র দেবীপ্রসাদের সঙ্গে কায়স্থ হেমচন্দ্রের কন্যা সুশীলার বিবাহ দিয়েছেন। ‘‘অনেকদিন পূর্বে রমণীবাবু হেমচন্দ্রের নিকট আপন জীবন ইতিহাস ব্যাখ্যা করিবার সময় ভিন্ন জাতির মধ্যে

বিবাহ বিধেয় কিনা, সে বিষয়ে হেমবাবুর মত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। হেমবাবু এখন সে প্রশ্নের অর্থ বুঝিলেন। তিনি সানন্দে অশ্রুপূর্ণ লোচনে যুবা দেবী প্রসাদের সহিত সুশীলা মাতার বিবাহ দিতে সম্মত হইলেন।' (সমাজ, ত্রিংশ পরিচ্ছেদ) স্পষ্টতই সমাজ সংস্কারকের মন নিয়ে রমেশচন্দ্র তার রচনায় এই উচ্চ ভাবাদর্শ জাত অসবর্ণ বিবাহের মত বৈপ্লবিক ঘটনাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এবং এই বিবাহ ঘটেছে পাত্র-পাত্রীর প্রেম বশত নয়, অভিভাবকের ইচ্ছায়। মহৎ-আদর্শ রূপায়িত হলেও পল্লী সমাজে সে সময় যেহেতু অসবর্ণ বিবাহ একান্ত অসম্ভব ছিল, সেহেতু এ ব্যাপারটি বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য সম্ভবত রমেশচন্দ্র দেখিয়েছেন, জমিদার রমণীকান্ত গ্রামের ইতরভদ্র সকলকে বস্ত্র, মিষ্টান্ন ও নানারূপ উপহার বিতরণ করিলেন," এর ফলে "... গ্রামে নূতন জমিদারের জয় জয়কার হইতে লাগিল। জমিদার গৃহে ও পুকুরঘাটেও যোগমায়ার চরিত্র সমালোচনা কিছু দিন স্থগিত রহিল!" কিন্তু অসবর্ণ বিবাহের বিরুদ্ধে গ্রামের জনমত কিন্তু পূর্ব্ববৎ বিরূপই থাকল। যথারীতি গ্রামের নারীসমাজ পুকুরঘাটে জল আনবার সময় বিরাট মজলিস বসিয়ে তুমুলভাবে এ বিষয়ে সমালোচনা, নিন্দা, বিস্ময় প্রকাশ করেছে। ব্রাহ্মণের সঙ্গে কায়স্থ কন্যার বিবাহ সংবাদ শুনে 'স্বর্ণ কুমারী'র উক্তি— 'দুর পোড়াকপালী! তাও কি হয় লো? আমরা যে বামুন লো, আমরা যে দেবী লো! আমাদের সঙ্গে কি কায়েতের বিয়ে কখনও হয়?" ...

"প্রাচীনাগণ নূতন তসর ও গরদের কাপড় পড়িয়া অনুগ্রহ করিয়া বলিলেন, "না, বাছা যোগমায়ার মায়া দয়া আছে, ... তবে কপাল মন্দ, ... নিতান্ত ভাঙ্গা কপাল, নৈলে কি বামুনের ঘরের বৌ হইয়া কায়েতের সঙ্গে সম্বন্ধ করে?" (ত্রিংশ পরিচ্ছেদ)। "গ্রামের পণ্ডিতাভিমানী শাস্ত্রজ্ঞগণ দলবদ্ধ হইয়া একদিন রমণীবাবুর নিকট গিয়া এরূপ গর্হিত সম্বন্ধ করিতে নিষেধ করিলেন, সমাজের আদেশ লইয়া শাস্ত্র সম্মত কাজ করা ভাল, এইরূপ নানা তর্ক করিলেন। ... "ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ বিদায় হইলে কালকাতা হইতে কামিনীকান্ত বাবুর প্রেরিত কয়েকজন মহাসন্ত্রান্ত পরামর্শদাতা" রাও এসে এ বিবাহে কামিনীকান্ত বাবুর নিষেধ শোনালেন।

এরপর, " ... তালপুকুর ও সনাতনবাটীর দলপতিগণ সমবেত হইয়া এ কার্য নিষেধ করিবার জন্য রমণীকান্ত বাবুর নিকট আসিলেন, তালপুকুরের ঘোষালের পো তাঁহাদের বক্তা। ..." (ত্রিংশ পরিচ্ছেদ)

এই প্রতিকূলতার চিত্রটি যথার্থ বাস্তব সম্মত ভাবেই রমেশচন্দ্র চিত্রিত করেছেন। গ্রাম সমাজের মনোভাবটি এই সব আলোচনা ও বাদানুবাদের মধ্যে দিয়ে স্পষ্ট হয়েছে। শরতের সঙ্গে বালবিধবা সুধার বিবাহের জন্য এবং কন্যা সুশীলার অসবর্ণ-বিবাহ সংঘটনের জন্য গ্রামসমাজ কর্তৃক বিন্দু ও হেমচন্দ্র একঘরে হয়েছে। এই ঘটনাটি বাস্তব সম্মত। কিন্তু সেই সঙ্গে ঔপন্যাসিক একথাও বলতে

চেয়েছেন, বিন্দুরা দরিদ্র তাই এই সামাজিক অত্যাচার। কিন্তু ধনী কুটুম্ব হওয়ায় দরিদ্র বিন্দুর মর্যাদা সহস্রগুণ রাতারাতি বর্দ্ধিত হয়েছে। সমাজে, তা সে নগরই হোক বা গ্রামই হোক, অর্থসম্পদেরই যেন জয়জয়কার, হয়ত সমাজজীবনের চিত্রকার ঔপন্যাসিক রমেশচন্দ্র এ ইঙ্গিতটিও করতে চেয়েছেন। "বিন্দুবাসিনী দরিদ্র, বিন্দুবাসিনীকে লোকে একঘরে করিয়াছে," ... কিন্তু আজি দেশের জমিদারের একমাত্র পুত্রের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ হইবে, বিন্দুবাসিনী জমিদারের কুটুম্বিনী হইবেন, সুশীলা জমিদারগৃহের গৃহিনী হইবেন, সুতরাং দেশের মেয়ে আজ বিন্দুর বাড়ি ছাইয়া ফেলিয়াছে। ... প্রাতঃকালের সূর্যরশ্মিতে যেমন নানা বৃক্ষ হইতে শত শত পক্ষী আসিয়া গগন ছাইয়া ফেলে, — বিন্দুবাসিনীর সৌভাগ্য দিনের উদয়ে জ্ঞাতি কুটুম্বগণ সেইরূপ চারিদিক হইতে আসিয়া দরিদ্রের ক্ষুদ্রকুটীর ছাইয়া ফেলিলেন। (ত্রিংশ পরিচ্ছেদ)

আদর্শবাদী মনোভাব নিয়ে অসবর্ণ বিবাহের আয়োজন করলেও বাংলা দেশের পল্লী সমাজের বিবাহের বিবিধ মেয়েলি আচার আচরণ, রস রসিকতার চিত্রটি রমেশচন্দ্র অতি স্বাভাবিক রূপেই আঁকতে পেরেছেন। যেমন— বিবাহ সভার বর্ণনা ঃ "বর ভিতর বাটীতে গেলেন। অমনি শত নারীর কণ্ঠ নিঃসৃত "হুলু" ধ্বনিতে বাটী শব্দিত হইল, ঘন ঘন শঙ্খনিনাদে গ্রাম পূর্ণ হইল। ... পতিপুত্রবতী নারীগণ বড় আনন্দের সহিত এই শুভকার্যে যোগ দিলেন এবং সুন্দর বরটিকে ঘিরিয়া নানা হাস্য পরিহাস করিতে করিতে স্ত্রী-আচার সম্পাদন করিলেন। অবগুণ্ঠনবতী সুশীলাকে সাতবার বরের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করান হইল এবং সুশীলার বয়স্কা দুই একজন রসিকা বালিকা সুন্দর বরের কান দুটি একবার মলিয়া দিল।" বরকে ঘিরে বঙ্গ-ললনাদের রস-বসিকতা গ্রাম সমাজে অতি প্রচলিত আমোদের ব্যাপার ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের 'ইন্দিরা'য় ইন্দিরার স্বামীকে নিয়ে কাহিনীর শেষাংশে যে ধরনের রঙ্গ-রসিকতা তার শ্যালিকা ও পাড়া প্রতিবেশিরী করেছে, সেরকম বিস্তারিত বর্ণনায় রমেশচন্দ্র যান নি, কিন্তু এই প্রাচীন গ্রাম্য প্রথাটি তিনি সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিতে ব্যক্ত করেছেন। " ... বেচারা দেবীপ্রসাদ চিরকাল বিদেশে বাস করিয়াছে, বঙ্গ মহিলাগণ কিরূপ সামগ্রী এই তাহার প্রথম পরিচয়। ... দেবীপ্রসাদ ... এরূপ বিষম বিপদে কখনও পড়ে নাই! শুনিয়াছি, সে রাত্রির রঙ্গরস, হাস্যপরিহাস ও সঙ্গীত ধ্বনি সেই ক্ষুদ্র কুটীর অতিক্রম করিয়া চারিদিকে শ্রুত হইল, এবং তাল পুকুরের সুন্দরীদিগের চতুরতা প্রকটিত করিল। শুনিয়াছি রাত্রি তিনটার পর বেচারা দেবীপ্রসাদ সুন্দরীদিগের পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিল,— তখন সুন্দরীগণ ক্ষমা করিলেন,—দেবীপ্রসাদ দুই ঘন্টা নিদ্রা যাইয়া প্রাণে বাঁচিল।"

উনবিংশ শতকের হিন্দু সমাজে স্ত্রীজাতির প্রতি যে দুর্বিসহ লাঞ্ছনা ঘটত, যেভাবে সমাজে নারীজাতি উৎপীড়িত হতেন, রমেশচন্দ্রের 'সংসার' ও সমাজে প্রধানত তারই প্রতিচ্ছবি তুলে ধরা হয়েছে। সেই সঙ্গে 'সমাজে' অসবর্ণ বিবাহ ও 'সংসারে' বিধবা বিবাহের যৌক্তিকতা দেখানো হয়েছে। এই সমাজ ছবির সত্যরূপ রমেশচন্দ্র উনবিংশ শতকের গ্রামবাংলার জীবনপট অবলম্বনে উদঘাটিত করেছেন। তার ফলে তাঁর এই দুটি সামাজিক উপন্যাসে তদানীন্তন পল্লীবাংলার সমাজজীবনের একটা সামগ্রিক পরিচয় তার খুঁটিনাটি সহ, একান্ত জীবন্ত হয়ে উঠেছে। উনবিংশ শতকের গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষ, তার ধনী-নির্ধন নারী, পুরুষ, তাদের আচার-আচরণ, সারল্য ও আন্তরিকতা— স্নিগ্ধ বর্ণে রঞ্জিত হয়ে রমেশচন্দ্রের সমাজ সংস্কারক চেতনার মধ্য দিয়ে প্রধান হয়ে উঠেছে।

বঙ্কিম সমসাময়িক বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক ও তাঁদের উপন্যাসে চিত্রিত বঙ্গ পল্লী সমাজ

ক. তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৪৩-'৯১)

বঙ্কিমচন্দ্রের সুদীর্ঘ ত্রিশ বছরেরও বেশী ঔপন্যাসিক জীবনের মধ্যে বাংলা সাহিত্যে একাধিক বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক আর্বিভূত হয়েছেন। বঙ্কিমের আলোক সামান্য প্রতিভা তাঁদের না থাকলেও তাঁদের কীর্তি ও অস্বীকার্য নয়। বঙ্কিম সমসাময়িক বিশিষ্ট দুজন ঔপন্যাসিক হলেন যথাক্রমে তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও রমেশচন্দ্র দত্ত।

তারকনাথ, বাংলা উপন্যাসের ধারায় তাঁর একটি মাত্র উপন্যাস 'স্বর্ণলতা'র জন্য চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। অন্যান্য উপন্যাস লিখলেও 'স্বর্ণলতা'ই তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহিত্য সাধনার একমাত্র পরিচায়ক বলা যায়। এই উপন্যাসটির প্রধান বিশেষত্ব এই যে, বঙ্কিম প্রদর্শিত ঐতিহাসিক রোমান্সের পথ অথবা, মানব হৃদয়ের সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম ভাব বৈচিত্র্যের শাখায়িত জটিলতার পথ — কোনোটিই অবলম্বন না করে এই উপন্যাস রচিত হয়েছে সাধারণ গ্রামবাংলার নর-নারীর জীবনকথাকে অবলম্বন করে। গ্রামবাংলার সহজ, সাধারণ নগন্য পরিবারজীবন তার অজটিল সমস্যা, বাংলার পল্লীগ্রামের নিজস্ব বৈশিষ্ট অতি সারল্যের সঙ্গে এবং সত্যমূলকভাবে লেখক এখানে উপস্থিত করেছেন। বিশিষ্ট্য সাহিত্য

সমালোচকের মন্তব্য এই যে, "বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে সাধারণ বাঙালীর প্রতিদিনের জীবনের কথা উঠে নাই। সে কথা উঠিল তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা'য় .... ইহার পূর্বে আমাদের এই চিরপীড়িত; ধৈর্যশীল, স্বজনবৎসল, বাস্তুভিটাবলম্বী, প্রচণ্ড কর্মশীল পৃথিবীর এক নিভৃত প্রান্তবাসী শান্ত বাঙালীর কাহিনী" কেহ লেখে নাই। (ডঃ সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, উনবিংশ শতাব্দ, ১৩৭৭ সং, পৃ: ২৪০-২৪১)

গ্রামবাংলার জীবনপটে 'স্বর্ণলতা'র কাহিনী গড়ে উঠেছে। কলকাতা নগরীর প্রসঙ্গ এলেও কলকাতা বা নাগরিক জীবন ভাবনা অপেক্ষা পল্লীবাংলার জীবন বোধই এ উপন্যাসে প্রাধান্য পেয়েছে। উনবিংশ শতকের পল্লীবাংলার মধ্যবিত্ত একান্নবর্ত্তী পরিবার জীবন, সেই পরিবারের ভাঙন, পল্লীবাসীর জীবিকার্থে কলকাতা নগর যাত্রা, তার অবর্তমানে সেই সংসারের দুর্দশা, অতি সহজ সাবলীলভাবে এখানে চিত্রিত হয়েছে, 'স্বর্ণলতা'য় সরলার মৃত্যুর পর তার পুত্র গোপালের বয়ঃপ্রাপ্তি, শিক্ষা ও বিবাহের চিত্র উপন্যাসের দ্বিতীয়ার্দ্ধে পরিস্ফুটিত হয়েছে। উপন্যাসে সত্যের জয় ও অধর্মের পরাজয় মূলক নীতিবাদ ও প্রদর্শিত হয়েছে ঘটনা কাহিনী মারফৎ। কিন্তু এই উপন্যাসের প্রধান আস্বাদ্য বাংলার পল্লী জীবন রস। তারকনাথ তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে উপন্যাসের কাহিনী ও চরিত্র অঙ্কন করেছেন। দার্জিলিং বিভাগের ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট অব ভ্যাকসিনেশান হিসেবে সরকারী কাজে তাঁকে বাংলার ঐ সব অঞ্চলের গ্রামে গ্রামে ঘুরতে হয়েছিল। সে সময় তিনি যা প্রত্যক্ষ করেছেন. যথাযথভাবে সেই অভিজ্ঞতা থেকেই লিপিবদ্ধ করেছিলেন 'স্বর্ণলতা' উপন্যাস কাহিনী, উপন্যাসটি সম্বন্ধে তিনি দিনলিপিতে লিখেছেন ঃ 'Finished my tale in the evening at about 8P.M... Monday, 7th July, 1873 some charactars of my novel are from real life .... My Friend Suresh and Paresh- two figures under the name of Ramesh and Debesh. 11th July 1873" (সূত্র, ভূমিকা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত 'স্বর্ণলতা', তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ১৩৭০ সং)

'স্বর্ণলতা' বিপুল জনপ্রিয়তা পাঠকমহলে অর্জন করে। লেখকের জীবদ্দশায় গ্রন্থটির সপ্তম সংস্করণ প্রকাশ (১৮৮৯) এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সমালোচকের মতে "পুরোপুরি বাস্তবদৃষ্টি লইয়া উপন্যাস রচনা বাঙ্গালায় এই প্রথম........বঙ্কিমের উপন্যাসে যে বাঙ্গালী জীবনের ছবি আঁকা হইয়াছে তাহা কল্পনা চিত্র, তারকনাথের স্বর্ণলতায় যে ছবি আঁকা হইয়াছে, তাহা দৃষ্টি চিত্র।" (ড. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, উনবিংশ শতাব্দ, ১৩৭৭ সং পৃঃ ২৪১)।

'স্বর্ণলতা'কে উনবিংশ শতকের গ্রাম বাংলার মধ্যবিত্ত সমাজজীবনের খাঁটি একটি দলিল বলা যেতে পারে অনায়াসে। বাংলার গ্রাম সমাজের পরিবর্তনের গতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ১৭৯৬ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিশ কর্ত্তৃক চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্ত্তনের ফলে বাংলার ভূমি অর্থনীতিতে প্রবল পরিবর্ত্তন হয়, এছাড়াও ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্ত্তন ও চাকুরীজীবী সম্প্রদায়ের সৃষ্টির ফলে দেশবাসী ক্রমশ নগরমুখী হতে থাকে। নাগরিক জীবনে বাংলায় প্রবল ও দ্রুত পরিবর্ত্তন ঘটলেও গ্রাম সমাজে ধীরে ধীরে পরিবর্তন ঘটে। চাকুরীজীবী হয়ে নগরে থাকতে হওয়ায় ক্রমশ বাঙালী তার গ্রাম সংসার থেকে ভিন্ন হয়ে স্ত্রীপুত্র নিয়ে নগরে স্বাধীন ভাবে থাকতে শুরু করে। তবে গ্রামের সঙ্গেও সংযোগ লুপ্ত হয় না। পূজা-পার্বণে, বিবাহ-উৎসবাদিতে তারা গ্রামে সম্মিলিত হত। কিন্তু এই ব্যবস্থার ফলে বাংলার প্রাচীন পরিবার জীবন প্রথা একান্নবর্ত্তী সংসারগুলি ভেঙে যেতে থাকে। কেননা, রুজি-রোজগারের চেষ্টায় গৃহের পুরুষ-মানুষকে বাইরে বেরোতে হচ্ছে। পুরানো দিনের কৃষিভিত্তিক সমাজজীবনের বিনষ্টি নির্দিষ্ট কৌলিক বৃত্তির প্রতি অনীহা ও পরিবর্ত্তন, এর ফলে ধীরে ধীরে গ্রামেও দেখা গেল, সাবেক প্রথা, সংসারে একজন অন্ন উপার্জন করবে এবং তাকে ঘিরে পরিবারের অন্যান্য সকলে বেঁচে থাকবে, এর অন্যথা ঘটতে শুরু করল। গ্রামে কৃষি বা কুটির শিল্প দ্বারা জীবিকা অর্জ্জনের ব্যবস্থা না হওয়াতে দলে দলে লোক ক্রমশ এই সব কার্যের লোভে শহরে আসিতে আরম্ভ করিল। গ্রামের তুলনায় শহরে জীবন-যাত্রার উপায় সহজলভ্য হওয়ায় গ্রামবাসীর সংখ্যা কমিল এবং নগর ও নগরবাসীর সংখ্যা বাড়িতে লাগিল।.......... ইহার ফলে ধীরে ধীরে সবার অলক্ষ্যে যে বাঙ্গালী হিন্দু সমাজ ছিল গ্রাম ও পরিবারকেন্দ্রিক, তাহা পুরাপুরি নগর ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক হইয়া উঠিল।.........গ্রাম্য সমাজের গুরুতর পরিবর্তন হইয়াছিল এবং এই পরিবর্তনের কারণ প্রধানত দুইটি। প্রথমত, নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায় চাকুরীজীবী, সুতরাং কলিকাতা ও অন্যান্য শহরের দিকেই তাহাদের আকর্ষণ বাড়িল এবং গ্রামে বাস ক্রমে ক্রমে কমিতে লাগিল। ....ক্রমে ক্রমে অনেকটা পাশ্চাত্ত্য প্রভাবে, স্ত্রীর মর্যাদা ও সাংসারিক প্রতিষ্ঠার উন্নতি হওয়ায় চাকুরীজীবীরা সস্ত্রীক শহরে বাস করিতে লাগিলেন। ইহার ফলে গ্রামের সহিত সম্পর্ক কমিতে লাগিল এবং একান্নবর্ত্তী পরিবারের বন্ধন শিথিল হইয়া আসিল। এই দুইটি গুরুতর পরিবর্ত্তনের সূচনা হয় উনিশ শতকের শেষার্দ্ধে এবং বিশ শতকের প্রথম হইতে ইহা বাংলার সামাজিক জীবনে বিশেষভাবে পরিপুষ্ট হইয়া ওঠে।" (রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলা দেশের ইতিহাস। তৃতীয় খণ্ড, আঃ যুগ, ১৩৮১ সং, পৃঃ ২৬০-৬১)

স্বর্ণলতার কাহিনী মূলত দাঁড়িয়ে আছে, দুই ভাইএর একান্নবর্ত্তী পরিবার জীবন ভেঙে যাওয়ার করুণ ঘটনার ওপরে। এখানে বড় ভাই শশীভূষণ, তৎকালীন গ্রাম্য

জমিদারের কর্মচারী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। উনবিংশ শতকে বাঙালীর জীবনে আধুনিক বিদ্যাশিক্ষার গুরুত্ব সৃষ্টি হয়ে গেছে। বুদ্ধিমান শশীভূষণ '১৬-১৭ বৎসর বয়ঃক্রম কালেই' কিছু লেখাপড়া শিখে জমিদারের সরকারে মাসিক পাঁচ টাকা বেতনের একটি কর্ম্ম পাইয়াছিলেন। তৎকালীন জমিদারী কর্মচারীদের যে নির্দিষ্ট বেতন ছাড়াও উপরি রোজগারের বিশেষ অবকাশ ছিল, সেকথাও লেখক স্পষ্টই জানিয়েছেন ঃ "জমিদারের সরকারে কার্য্যের বেতন নামমাত্র। বোধ হয়, বেতন না থাকিলেও অনেকে জমিদারের সরকারে কার্য্য করিতে অসম্মত হন না। ফলত শশীভূষণের বিলক্ষণ প্রাপ্তি ছিল। সুতরাং অতি অল্প দিনের মধ্যেই তিনি একজন সঙ্গতিপন্ন লোক হইয়া উঠিলেন।" স্বর্ণলতার প্রতিটি চরিত্রই লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে সৃষ্টি। তাই প্রত্যেকেই সত্যমূলক। লেখক উপন্যাসের ভূমিকাতেও স্বয়ং লিখেছেন ঃ "কথাপি তোষয়েদ বিজ্ঞং যদ্যসৌ তথ্যবদ্ ভবেৎ"। শশীভূষণ যেমন উনবিংশ শতকের একশ্রেণীর অসাধু বাঙালী জমিদার কর্ম্মচারীর প্রতিনিধি, তেমনই, তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিধূভূষণ সে সময়ের অলস, কর্মবিমুখ, বিদ্যাহীন জ্যেষ্ঠ সহোদরের অন্নপুষ্ট সরল বাঙালী যুবকশ্রেণীর প্রতিনিধি।

বিদ্যালাভ না ঘটলে বা অর্থ উপার্জন করতে না শিখলেও তৎকালীন গ্রামবাংলার সামাজিক প্রথানুযায়ী বিধুভূষণের কুলীনসন্তান হওয়ায় মাত্র পনের বৎসর বয়সেই বিবাহ হয়। এবং বেকার পরনির্ভর গ্রাম্য যুবক বিধুভূষণ পুত্র সন্তানেরও জনক হয়। সাহিত্য সমালোচক লিখেছেন ঃ 'চোখকান বুঝিয়া কায়ক্লেশে দুমুঠা খাইয়া এবাড়ি ওবাড়ি ঘুরিয়া এপাড়া ওপাড়া বেড়াইয়া কোনরকমে দিন কাটাইয়া দেওয়াই সেকালের পল্লীবাসী শতকরা নব্বই জন বাঙ্গালী যুবকের কাম্য না হইলেও ভাগ্য ছিল। এইরূপ নির্ব্বিবাদ জীবনেও কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন শান্তি ঘটিয়া উঠিত না। তুচ্ছ কারণে উৎক্ষিপ্ত পারিবারিক অশান্তি প্রধূমিত হইয়া শান্তিপূর্ণ স্নেহচ্ছায়া নিবিড় পল্লী নীড়কে দগ্ধাবশেষ করিয়া দিত। একদা বাঙ্গালীর সংসারে যে একান্নবর্ত্তিতা সুখ-সৌভাগ্যের সেতু ছিল তাহাই এখন নিদারুণ অশান্তির হেতু হইতেছে, এই সমস্যাই স্বর্ণলতায় মুখর।" (ড. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, উনবিংশ শতাব্দ, ১৩৭৭ সং, পৃঃ ২৪১)

বিধূভুষণ সেই পল্লীবাসী শতকরা নব্বই জন পল্লী যুবকের অন্যতম, যাকে নিশ্চিত আলস্যের নীড় থেকে ভ্রষ্ট হয়ে অর্থ উপার্জনের জন্য কলকাতা শহরের দিকে যাত্রা করতে হয়েছে। বিধূভূষণ, তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শশীভূষণের অন্নে স্ত্রীপুত্রসহ পালিত হচ্ছিল এবং সে নিজে উপার্জন করা বা স্ত্রী পুত্র পালন সম্পর্কে একেবারেই উদাসীন ছিল। ঔপন্যাসিক লিখেছেন ঃ বিধুভূষণ সমস্ত দিনই পাড়ায় থাকিতেন। আহারের সময় কেবল বাটীতে পদার্পণ করিতেন। গৃহকার্য দেখিতেন

না; এক পয়সা উপার্জ্জনের ক্ষমতা ছিল না। বাদ্য, গীত এবং তাস-পাশাতেই তাঁহার সময় অতিবাহিত হইত।

কিন্তু সামান্য কারণে গৃহবিবাদ হ'ল। উপার্জনশীল শশীভূষণের পত্নী প্রমদা নিজের স্বার্থ সম্পর্কে ঘোরতর সচেতনতায় বিধূভূষণের সংসার প্রতিপালন করার বিরুদ্ধে ছিল। '.........তাহাদিগের মাতার পরলোক গমনের পর শশীভূষণের স্ত্রী স্বামীকে স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিলেন যে, এক সংসারে আর অধিক কাল থাকা আয় ব্যয় সম্বন্ধে সুবিধার বিষয় নহে।'' তারকনাথ বাঙালীর পরিবার জীবনের সত্য সংবাদটি অবগত ছিলেন। ভাই এ ভাই এ বিবাদের মূলে বেশীর ভাগ সময়েই থাকে স্ত্রীদের বিরূপ মনোভাব। শশীভূষণ ও বিধূভূষণের সম্পর্ক নষ্টের মূলও শশীভূষণের স্ত্রী প্রমদার ঈর্ষা বিদ্বেষ। ''শশীভূষণ তথাচ হঠাৎ কোন অসদ্ভাব প্রকাশ করেন নাই। হাজার হউক, তবু দুই ভাই।.....সহস্র বিবাদ হইলেও পরস্পরের প্রতি একেবারে স্নেহশূন্য হয় না। কিন্তু তাঁহাদেব স্ত্রীলোকদের মধ্যে ত আর সে রক্তের টান নাই। তাই একদিন বিধূভূষণকে রাস্তায় নামতে হল, শশীভূষণ নিজের স্ত্রী প্রমদার মিথ্যা অভিযোগ শুনে একান্নবর্ত্তী পরিবার ভেঙে দিয়েছে ঃ ''... ...আর একত্র থেকে কলহ বিবাদ বরদাস্ত হয় না। যদি পৃথক হলে ঝগড়ার শেষ হয়, এই ভেবেই পৃথক হতে বলেছি।' .

'স্বর্ণলতা'র অষ্টম পরিচ্ছেদের সূত্রপাতে কৃষ্ণনগর থেকে কলকাতা যাওয়ার রাস্তায় হাঁসখালি নামক স্থানের কাছাকাছি একটি বৃক্ষমূলে একটি পথশ্রান্ত পথিককে দেখা গেছে। সে বিধুভূষণ। উনিশ শতকের শেষ ভাগের গ্রাম বাংলার অন্যতম বেকার গৃহী পুরুষ ও ভাগ্যান্বেষণে কলকাতা শহরের অভিমুখী হয়েছে। তার সঙ্গে সেই খানে সাক্ষাৎ ঘটেছে তৎকালীন পল্লীবাংলার আর একটি পুরুষ চরিত্র নীলকমলের। নীলকমল উপন্যাসের কমেডি চরিত্র হলেও তার মাধ্যমে বাংলার পল্লীসমাজের পরিবর্তনের ধারা সম্বন্ধে পাঠক সচেতন হতে পারেন। নীলকমল জাতিতে ঘোষ বা দুগ্ধ ব্যবসায়ী। তার দাদা কৃষ্ণকমল পাড়ার লোকের গাভী দোহন করে। নীলকমল তার দুই ভাই ও মাতার সঙ্গে এক সংসারে পালিত। কিন্তু সে দাদার পয়সা চুরি করে; সংসারের কাজকর্ম বা জাতি ব্যবসায়ে তার মন নেই। বেহালা বাদন ও গান করা তার প্রধান আগ্রহ। 'উপায়ান্তর না দেখিয়া কৃষ্ণ নীলকমলকে বাটী হইতে বহিস্কৃত করিয়া দেয়'। এইভাবে জাত ব্যবসা ত্যাগকারী, বুদ্ধিহীন গ্রাম্য পুরুষ নীলকমলও গৃহ থেকে বিতাড়িত হয়ে গীতবাদ্যের মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের আকাঙ্খায় কলকাতামুখী হয়েছে। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ গ্রামবাংলার ওপর এইরকম বিপুল প্রভাব ফেলেছিল নগর কলকাতা।

উনবিংশ শতকের গ্রামবাংলায় নানা কারণে নাগরিক জীবনের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। শহরের জীবনযাত্রার হাওয়া নানা পথে, নানা রকমের লোকের মুখে

মুখে গ্রামে বয়ে যায়। শহরের মন গ্রামের মনের উপর ভর করে। বাংলার গ্রাম শহরের প্রভাব মুক্ত থাকতে পারে না।" (বিনয় ঘোষ, বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা, ১৮০০-১৯০০, প্রথম প্রকাশ জুন ১৯৭০ পৃ: ৪৯-৫০) বাংলার সামাজিক ইতিহাসের বিশ্লেষক উনবিংশ শতকের প্রখ্যাত সাময়িক পত্র 'সোমপ্রকাশে'র ২০শে জ্যৈষ্ঠ্য, ১২৭৫ সংখ্যার মন্তব্য উদ্ধৃত করে পল্লীগ্রামের দুটি পরিবর্ত্তনের কথা জানিয়েছেন। তার মধ্যে একটি হল মাদক দ্রব্য। "মাদক দ্রব্য সেবনের সমধিক প্রাদুর্ভাব"। (বিনয় ঘোষ, বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা। ১৮০০-১৯০০, ১৯৭০ সং, পৃঃ ৫০)

'স্বর্ণলতা'য় পল্লীবাংলা সাধারণ জীবনে এই মাদক দ্রব্য সেবনের প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে গদাধরচন্দ্র চরিত্রটির উল্লেখ করা যায়। কমেডির প্রয়োজনে চরিত্রটি সৃষ্টি হলেও সমাজ-তাত্ত্বিকের বিশ্লেষণ অনুযায়ী গদাধরচন্দ্রকেও দেখা যায়, সে কি পরিমাণে মাদকদ্রব্যে আসক্ত। সে 'ব্রান্ডি' ও রামের পার্থক্য ভালই বোঝে। পান করিয়াই একবার মুখ বক্র করিলেন। এবং অস্পষ্ট স্বরে কহিলেন, "শালা রামঢনা ব্রাণ্ডি ডেবে তা না ডিয়ে রোম দিয়েছে।' এরপর রমেশ নামের পুলিস কনস্টেবলের সঙ্গে বসে পুনরায় মদ্যপান করেছে। তাদের অন্যায় কাজের সঙ্গে এই মদ্যপান সঙ্গতভাবেই যুক্ত হয়েছে।

মদ্যপানের কুফল দেখাতে না চাইলেও শশীভূষণের মনিব, জমিদার বাবুটি তার উশৃঙ্খলতা ও মদ্যপানের জন্য যে বিষয়সম্পত্তি হারাতে বসেছে সেটি তারকনাথ স্পষ্টই দেখিয়েছেন। শশীভূষণের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইয়া এক্ষণে বাবুর বাটীতে সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়াছেন। তাঁহার উপর বাবুর বিশ্বাস অসীম, তিনিই এখন জমিদার বলিলে হয়। বাবু বেশভূষা ও সুরার খরচ পাইয়াই সন্তুষ্ট থাকেন। এই জমিদারের বিরুদ্ধে দরখাস্ত পেয়ে ম্যাজিস্ট্রেট অনুমোদনে এলে দেখা গেল— "মেজেষ্টার সাহেব আসিবেন বলিয়া বাবু আজি স্বয়ং কাজকর্ম করিতেছেন। তাঁহার চক্ষু রক্তবর্ণ, নাসিকার অগ্রভাগ কিঞ্চিৎ স্বীকৃত ও জবাফুলের মত লাল। কথা কহিতে গেলে কথা স্পষ্ট নির্গত হয় না। অনবরত পাখার বাতাস করিতেছেন, তথাপি মুখে মাছি বসা নিবারণ করিতে পারিতেছেন না।"(পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ)।

এই রমক আর একজন গ্রাম্য জমিদার ও তার মদ্যাসক্তির পরিচয় রেখেছেন লেখক অষ্টম পরিচ্ছেদে। বিধুভূষণ রাজবাটিতে সাহায্য প্রার্থনায় গিয়ে দেখলেন 'বাবু' ঘুমাচ্ছেন। সন্ধ্যাগমে জাগরণের পর 'বাবু' তাঁর ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করেন আজ শনিবার মনে আছে ত? শ্যামবাবু, চন্দ্রবাবু আর আর সকলে আসবেন তার জোগাড় আছে ত? "জোগাড় আর কি? ওই এক বোতল পোর্ট আছে আর এক বোতল শেরি।" এই সব বর্ণনা বা সংলাপের মাধ্যমে এটা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় সে, উপন্যাস রচনাকালীন সময়ে গ্রামবাংলার সমাজে মদ্যাসক্তি কি প্রবলভাবে

সঞ্চারিত হয়েছিল। কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁর 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'য় 'পাড়াগেঁয়ে দুই একজন জমিদার সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন— "..........দেখলেই চেনা যায় যে ইনি একজন বনগাঁর শেয়ালরাজা, বুদ্ধিতে কাশ্মিরী গাধার বেহদ্দ-বিদ্যায় মূর্ত্তিমান মা!......" এই মন্তব্য স্বর্ণলতায় চিত্রিত দুই জমিদার বাবু সম্পর্কেও প্রয়োগ করা যেতে পারে।

'স্বর্ণলতা'য় তারকনাথ বক্রকটাক্ষে তদানীন্তন পল্লীসমাজের পুলিশ কর্মচারীদের অসাধুতার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। গদাধরচন্দ্রের জাল-জুয়াচুরীর সঙ্গী কনস্টেবল রমেশ বিধুভূষণের পাঠানো টাকার সিংহভাগ গদাধরচন্দ্রের কাছ থেকে আদায় করে, প্রমদাকে গৃহত্যাগের সুযোগ করে নিয়ে অর্থ আদায় করে, দারোগার মদে আফিং মিশিয়ে দেয়, অথচ, কথায় কথায় জানায় "আমরা পুলিশের লোক, আমাদের কি অল্প কাজ" কিম্বা 'আমরা পুলিশের লোক, কত ব্যাটা আমাদের পায় ধরে থাকে!" দারোগা পুলিশের অত্যাচারের দিকটি বর্ণিত না হলেও কিছু কিছু পুলিশ কর্ম্মচারীর চারিত্রিক স্খলন-চিত্র গ্রাম-বাংলার প্রেক্ষাপটে তারকনাথ ভালভাবেই এঁকেছেন, রমেশের মদ্যপান ছাড়াও স্বয়ং দারোগাকে মদ্যাসক্ত দেখিয়েছেন, এ প্রসঙ্গেও তারকনাথ দীনবন্ধু নামধারী দারোগার মুখের কথা থেকে পুলিশ বিভাগের ঘুষখোর কর্মচারীদের স্বরূপ সম্পর্কে কটাক্ষ করেছেন : "......আমি কোন সরকারী লোক দিয়া নিজের কাজ করিয়ে লই না।.......তুমি ভাই, আজ রামটানার দোকান থেকে আদ পোয়া এনে দিতে পার? বড় শীত শীত করছে।..........দারোগাবাবু ....অল্প অল্প করিয়া সেটুকু সেবন করিলেন।" দারোগাবাবু পুনরায় মদ চাইলেন এবং রমেশ সেই সুযোগে তাতে আফিং মিশিয়েছে। অসৎ, দুর্নীতিপরায়ণ পুলিশ কর্মচারীদের চরিত্র এইভাবে উপন্যাসে ফুটে উঠেছে।

'স্বর্ণলতা' বাঙালীর গ্রাম-কেন্দ্রিক পরিবার জীবনের একটি অনবদ্য বাস্তব চিত্র কথা। পল্লীগ্রামের দুই ভায়ের একান্নবর্ত্তী সংসার। উপার্জনশীল বড় ভাইএর স্ত্রীর আত্মাভিমান, স্বার্থপরতা, ছোট জা দেবর ও দেবর-পুত্রের সঙ্গে নিষ্ঠুরতা, একান্নবর্তী সংসার ভেঙে দেওয়ার ছলচাতুরী, গ্রাম্য নারীসুলভ ঈর্ষা, কলহ, মিথ্যা লাগানো— এসব কিছু প্রমদা চরিত্রের মধ্য দিয়ে স্ফুটমান। পল্লীবাংলার শান্ত নিরীহ পরমুখাপেক্ষী স্বভাবভীরু নারীর প্রতিমূর্তি সরলা। স্বামী উপার্জনশীল না হওয়ায় তার লাঞ্ছনা, তথাপি স্বামীর বিদেশগমনে তার মনে হয়েছে, "দিদি দাসী হইয়া থাকিলে যদি সুখ না করিয়া চারটি চারটি খেতে দিত আমি তাহাও হইতে পারিতাম," গ্রাম বাংলার সাবেক ধরণের সাধ্বী সর্বংসহা স্ত্রী হিসেবে সরলা চরিত্র জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

পল্লীবাংলার সমাজে অনেক পরিবার জীবনেই বিশ্বস্ত দাস-দাসী চরিত্র পুরোনো দিনে যথেষ্ট দেখা যেত। রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত 'পুরাতন ভৃত্য' কবিতার

কেষ্ট এই ধরণের একটি বিশেষ চরিত্র-প্রতিনিধি। বিংশ শতকের মধ্যভাগে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রূপো কাকাও প্রায় এই রকম চরিত্র। 'স্বর্ণলতা'র 'শ্যামা' চরিত্রটি সকলের মধ্যে অন্যনা। যে যেমন বাস্তব, তেমনি মহৎ মানবিকতা গুণ যুক্ত। 'শ্যামা' একান্নবর্তী পরিবারের দাসী হলেও, সংসার বিভাগের পর সরলার কাছেই এসেছে। প্রথমত সরলার ব্যবহারে ও দ্বিতীয়ত বিধুভূষণের পুত্র গোপালের প্রতি মমতায়। শ্যামারও সন্তান ছিল, তার নামও ছিল গোপাল— এই কারণে গোপালের প্রতি তার অপত্যস্নেহ এই কথা সে সরলাকে জানানোর ফলে চরিত্রটি বাস্তবতা গুণ পেয়েছে। পরবর্ত্তী জীবনে গোপাল ও স্বর্ণলতা তাদের সংসারে শ্যামাকে গৃহিনীর মর্যাদা দিয়েছিল— এরকম ঘটনা পল্লীবাংলার সমাজ মানসিকতার নিজস্ব লক্ষণ। নাগরিক জীবনে এমনটি ঘটা সম্ভব হয় না।

পল্লীগ্রামের নারীদের স্বাভাবিক ঘোঁট-পাকানো, পরনিন্দা, পরচর্চার ব্যাপারটিও তারকনাথ তাঁর উপন্যাসে সত্যমূলকভাবেই বিবৃত করেছেন। সাহিত্যের ইতিহাসকার যে মন্তব্য করেছেন এই উপন্যাসের "পাত্রপাত্রীরা সব সাধারণ পাঁচ পাঁচি মানুষ, তাহাদের মধ্য দিয়ে লেখক কোন উদার ভাব অথবা সুগভীর তত্ত্ব ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করেন নাই।"— একথা সম্পূর্ণ সত্য। পাড়াগাঁর নারীরা কোনো ব্যাপারে সহসা একমত হয়ে একজনকে সমর্থন করে তার পক্ষ নেয় ও অপব জনকে হেয় প্রতিপন্ন করে। পরনিন্দা, পরচর্চা অপরের সাংসারিক ব্যাপারে নাক গলানো — এ সমস্তই গ্রাম্য সমাজের স্বভাব লক্ষণ। প্রমদা এবং সরলার বাক্‌বিতণ্ডায় তাদের পাড়া প্রতিবেশিনীরা এই স্বভাবের পরিচয় দিয়েছে। প্রমদার সরলাকে বিনাদোষে কটু কথা বলা এবং ছদ্মক্রন্দনে এই নারীরা নির্দ্বিধায় প্রমদার পক্ষ নিয়েছে। অবশ্য লেখক এজন্য তাদের নিজ স্বার্থবুদ্ধির ইঙ্গিত করতেও ছাড়েননি। "........যাঁরা সময়ে সময়ে প্রমদা বড় ঘরের মেয়ে, কেমন শান্ত, কেমন সুন্দর মুখখানি, ...ইত্যাদি অপক্ষপাতী সত্যকথা বলিয়া দরকার মত নুনটুকু, তেলটুকু লইয়া যান, তঁহারা প্রমদার রোদনে একেবারে গলিয়া গেলেন। কেহ কাঁদিতে লাগিলেন, দু একজন সরলাকে তিরস্কার করিতেও ক্রটি করিলেন না। একজন.......কহিলেন, ঠিক কথা বলবো তার আর ভয় কি? সরলার বড় লম্বা লম্বা কথা, ওর সোয়ামী রোজগার করে, তবু প্রমদার মুখে একটু উঁচু কথা কেহ শুনতে পায় না। একটা শৃগাল ডাকিয়া উঠিলে জঙ্গলের সব শৃগাল যেমন ডাকিয়া উঠে, তেমনি তথায় যত বিধবা উপস্থিত ছিলেন, সকলেই দিগম্বরীর মতে মত দিয়া সরলার নিন্দা করিতে লাগিলেন।......সরলার কথা কহিতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে সমুদায় স্ত্রীলোকের চরিত্র সমালোচনা কবিলেন। পরিশেষ স্থির হইল যে, এ কেলে মেয়ে একটিও ভাল নয় (প্রমদা ছাড়া)।" এই অংশটির সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষ উপন্যাসের দেবেন্দ্রনাথের হরিদাসী বেঞ্চবী ছদ্মবেশ দেখে ও তার গান শুনে অন্তঃপুরের নারীদের সমবেত সমালোচনা, নিন্দা, বিতর্ক ও

শেষ পর্যন্ত তার সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিন্দাসূচক অভিমত প্রদান, বর্ণনার বিশেষ সাদৃশ রয়েছে।

'স্বর্ণলতা'য় বাংলার পল্লীগ্রামের পারিবারিক জীবনচিত্রের বর্ণনার মধ্যে স্বাভাবিক ভাবেই এসেছে তৎকালীন সামাজিক রীতিনীতির উল্লেখ। তার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার তৎকালীন গ্রামীণ পাঠশালা ও শিক্ষাদান পদ্ধতি সেই সঙ্গে পাঠশালার গুরুমশাই প্রসঙ্গ। বিধুভূষণের পুত্র গোপালের পাঠশালায় শিক্ষা প্রসঙ্গে এই বাস্তব চিত্রটি তারকনাথ বর্ণনা করেছেন। সে সময়ে গ্রামের কোনো সমৃদ্ধ ব্যক্তির গৃহে পাঠশালা খুলে শিক্ষক মশায় পড়াতেন। শিক্ষককে 'গুরুমশায়' বলা হত। তারকনাথ কৃত বর্ণনা ঃ ''রামচন্দ্র ঘোষের চণ্ডীমণ্ডপে পাঠশালা বসে। পাঠশালায় ষাট-সত্তর জন বালকে লেখে। বালকেরা সকলে সারি সারি বসিয়া আছে, তন্মধ্যে গুরুমহাশায় হুঁকো কলিকা বেত্র পরিবেষ্টিত হইয়া অপূর্ব শোভা সম্পাদন করিতেছেন এবং মধ্যে মধ্যে চণ্ডীমণ্ডপের মেজের উপর বেত্রাঘাত পূর্বক 'প'ড়ে লেখ্, প'ড়ে লেখ্' বলিয়া সিংহনাদ করিতেছেন। বালকেরা ....কেহ কেহ পঞ্চমে তুলিয়া ''ক লেখ খ লেখ'' করিতেছে, কেহ কেহ উচ্চৈঃস্বরে 'রামকৃষ্ণ পরামাণিক' 'জন্মেজয় মিত্র' ইত্যাদি যুক্তাক্ষরে নাম লিখিতেছে।...........'' এই পাঠশালায় ছাত্রদের প্রহার করা গুরুমশায়দের যেন অত্যাবশ্যক কর্ম ছিল। ছাত্ররা শিক্ষকের মনস্তুষ্টির জন্য বাড়ী থেকে তামাক, সুপারী বা অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করে এনে তাঁকে দিত। মনোমত হলে ছাত্রের অদৃষ্টে প্রহার জুটত না। দেরী করে আসায় নিধিরাম নামক পড়ুয়াটি গুরুমশায়কে বাড়ী থেকে সংগৃহীত তামাক ঘুষ দিয়েছে, কিন্তু গুরুমশায়ের সেই স্বাদ পছন্দ না হওয়ায় নিধির কপালে বেত্রাঘাত জুটেছে। সে যুগে পল্লীগ্রামের এই গুরুমশায়েরা শিক্ষক হিসেবে সরকারী বেতন বর্ত্তমান কালের মত পেতেন না। ছাত্রদের কাছ থেকে তাঁরা যথাসম্ভব পয়সা আদায় করতেন। এর মধ্যে বিভিন্ন পূজা-পার্বণ উপলক্ষে 'পার্ব্বণী' আদায় ছিল অন্যতম। তারকনাথের বর্ণনায় গুরুমশায়দের এই বিশেষ লক্ষণ বাস্তব-সম্মতভাবে ফুটেছে। ''পাঁজিতে যত পার্ব্বণ আছে, গুরুমশায় তার প্রতি পার্ব্বণে পয়সা আদায় করেন। যদি বাপ মা না দিতে চান, গুরুমশায় বালকদিগকে চুরি করিয়া আনিতে শিখাইয়া দেন। ....দোলের পার্ব্বণী যাহারা যাহারা আনিয়াছিল, গুরুমশায়কে দিল। গোপাল দিতে পারিল না গুরুমহাশয় গোপালকে ডাকিয়া কহিলেন, 'গোপাল, তোমার পয়সা কোথায়?''......গুরুমহাশয় বলিলেন, ''তুমি আজ তিন দিন দেবো দেবো বলে দিতে পারলে না, কাল যদি না পাই, তবে তোমাকে নিধের মতন করবো।''

ঊনবিংশ শতকের গ্রামবাংলায় বিদেশ ভ্রমণে সাধারণ দরিদ্র মানুষ পদব্রজেই গমন করত। বিধুভূষণ ও নীলকমলকেও এই রকম পার্থক্য হিসাবেই এ উপন্যাসে

দেখানো হয়েছে। সে সময় দেশে এই রকম পার্থক্যদের জন্য গ্রামে গঞ্জে রাত্রি বেলায় আশ্রয়ের জন্য বাজারের মুদি দোকান কিম্বা কোনো গৃহস্থ ঘরে থাকার ব্যবস্থা নিয়মের মধ্যেই ছিল। 'স্বর্ণলতা'র দশম পরিচ্ছেদে দেখা যায় সন্ধ্যাবেলা নীলকমল ও বিধুভূষণ এক বাজারে এসে উপস্থিত হয়ে একটি মুদির ঘরে আশ্রয় নিয়েছে। সেখানে আরও দুজন আশ্রয় নিয়েছিল। গ্রাম সমাজে জাতিভেদ প্রথা প্রবল ছিল, ব্রাহ্মণের সম্মান ছিল। মুদীর স্ত্রী বিধুভূষণকে ঘরে স্থান দিয়েছে, কিন্তু 'শূদ্র' হওয়ায় নীলকমলকে গাছতলায় স্থান নির্দেশ করেছে। ব্রাহ্মণ পথিকের প্রতি আতিথেয়তা গৃহস্থ বা দোকানীর অবশ্য কর্ম ছিল। তাই মুদীর স্ত্রীর যথাযথ আপ্যায়ন না করায় বিধুভূষণ ক্রুদ্ধ হ'য়ে চলে যাওয়ার উপক্রম করায় মুদী উপস্থিত হ'য়ে তাকে শান্ত করে এবং যথাবিহিত আপ্যায়ণের ব্যবস্থা করে।

ব্রাহ্মধর্ম কলকাতা বা অন্যান্য কিছু নগর জীবনে জনপ্রিয়তা পেলেও সাধারণভাবে বাংলাদেশের গ্রাম সমাজে ব্রাহ্মদের সম্পর্কে যে বিরূপতা বেশ প্রবল ছিল সেটি এ উপন্যাসে তারকনাথ দশম পরিচ্ছেদে বুঝিয়ে দিয়েছেন। এই পরিচ্ছেদে রাত্রিবেলায় পথক্লান্ত বিধুভূষণ ও নীলকমল বাজারের এক মুদীগৃহে আশ্রয় নিতে গেলে সেখানে আরও দুজন অতিথিকে দেখে। এই অতিথিদ্বয়কে মুদীর স্ত্রী ব্রাহ্মণ পরিচয় দিলেও প্রকৃপক্ষে তারা ছিল কলকাতার কলেজের পড়ুয়া ব্রাহ্ম তরুণ। তাদের উপাসনা ও আচরণ ব্যাপারে মুদীর প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে এবং স্বয়ং লেখক মন্তব্য দ্বারা ব্রাহ্ম বিরূপতা প্রকাশ করেছেন। মুদী বিস্মিত ও রাগত হইয়া তাহার স্ত্রীকে কহিল, "ওদের আমার ঘরে কে জায়গা দিলে? ওরা ব্রাহ্মণ তোরে কে বললে; দেখ্‌তে পাচ্ছিস নে, সব ধর্ম্মঘট করেছে? ওদের কি জাত আছে?" পরে ব্রাহ্মদ্বয়ের প্রতি, "ওগো আপনারা ব্রাহ্মণই হও আর যাই হও, এখন ওটো। আমার ঘরে রান্নার জায়গা হবে না, আমি হিন্দু মানুষ, ধর্ম্মঘট টট্ কিছু বুঝি নে। ওটো ওটো।"

পল্লীবাংলার একাধিক প্রবাদ প্রবচন তারকনাথ তাঁর এই রচনায় সুপ্রয়োগ করেছেন। যেমন (ক) প্রমদার পক্ষপাতী পল্লীরমণীদের সমস্বর কে 'সব শেয়ালের এক রা' এই প্রবচন অনুযায়ী ব্যাখ্যা ঃ 'একটা শৃগাল ডাকিয়া উঠিলে জঙ্গলের সব শৃগাল যেমন ডাকিয়া উঠে, তেমনি তথায় যত বিধবা উপস্থিত ছিলেন, সকলেই দিগম্বরীর মতে মত দিয়া সরলার নিন্দা করিতে লাগিলেন।" (খ) 'ভাগের মা গঙ্গা পায় না' এই প্রবচনটি শ্যামা প্রয়োগ করেছে, শশীভূষণ ও বিধুভূষণের পৃথকান্ন হওয়ার কথা শুনে। "তবে আমি কোন দিকে যাব? ভাগগি আমি বাবুদের মা নই। মা হ'লে ত আমার গঙ্গা পাওয়া ভার হ'ত।" (গ) নীলকমলের মুখে "রাত্রে নদী পার হয়, দিনের বোলায় কাগের ডাকে মূর্চ্ছ যায়।" এছাড়া বেনাবনে মুক্তা ছড়ানো, মুড়ি মিশ্রির সমান দর, কাগের পাছে ফিঙ্গে লাগে প্রভৃতি প্রবাদ প্রবচন উপন্যাসের পল্লী জীবনরসকে ঘনীভূত করেছে।

পুরাণ চেতনা, পল্লীসমাজের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। বাংলার গ্রাম সমাজে স্মৃতি শাস্ত্র পুরাণের বিশেষ প্রভাব দীর্ঘদিন ক্রিয়াশীল ছিল। ঊনবিংশ শতকের গ্রামীণ মানুষ হিসেবে 'স্বর্ণলতা' উপন্যাসে নীলকমল সেই রকম পুরাণ কথায় বিশ্বাসী তারকনাথ নীলকমলের মত প্রায় অশিক্ষিত পাগলাটে গ্রাম্য পুরুষের মুখে একটি বিশেষ পুরাণ কাহিনী মারফৎ কর্মসূত্র অভিধেয় গভীর হিন্দুশাস্ত্র বিশ্বাসের খবর শুনিয়ে জনজীবনে এই বিশ্বাস কত প্রবল ছিল সেটি বুঝিয়েছেন ষোড়শ পরিচ্ছেদে। "নীলকমল............ ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া পরে কহিল, "দাদাঠাকুর, যার যা কপালে থাকে কেউ খণ্ডণ করতে পারে না। আমি তার এক গল্প জানি। ....বিধুভূষণ নীলকমলের গল্প শুনিয়া কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেন, এবং কিঞ্চিৎ চিন্তাকুলও হইলেন।

'স্বর্ণলতা'র কথাবস্তু যেমন ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধের সাধারণ পল্লী বাঙালীর সমাজ ও পরিবার জীবনের পটভূমি অবলম্বনে গড়ে উঠেছে, তেমনই সেই সময়ের পল্লীজীবন তার অজস্র খুঁটিনাটি সহ এ কাহিনীতে রস সঞ্চার করেছে। লেখকের বাস্তব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফসল এই উপন্যাস, স্বয়ং উপন্যাসের ভূমিকা পত্রে Fictions to please should wear the face of truth হোরেসের উক্তির এই উদ্ধৃতি দ্বারা তাঁর বাস্তবধর্মী উপন্যাস রচনায় বিশ্বাসী মনোভাবটি প্রমাণ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের জাঁকজমকময় ঐতিহাসিক রোমান্স বা গভীর ভাবধর্মী উপন্যাস সমূহের ঔজ্জ্বল্যের ধারায় বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে তারকনাথের স্বর্ণলতা একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর রচনা। স্বর্ণলতাকে কোনো কোনো সাহিত্য-সমালোচক 'স্বসমাজ নির্ভর প্রথম সার্থক উপন্যাস ও বাঙালাদেশের প্রথম সামাজিক উপন্যাস রূপেও নির্দিষ্ট করেছেন। (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্যসাধক চরিতমালা-৫৭, ১৯৪৬, পৃঃ ২২)

পঞ্চম অধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে পল্লী

ভূমিকা

বাংলার পল্লী ও জনজীবন রবীন্দ্রনাথের মনে গভীর ও ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল। তাঁর অসংখ্য চিঠিপত্র, প্রবন্ধ, আলোচনায় তিনি বঙ্গ পল্লীর প্রকৃতি রূপচিত্র, মানবজীবন চিত্র ও তার সামাজিক রূপাবয়ব নিয়ে এবং বহু বিচিত্র সমস্যা নিয়ে নিজের আত্যন্তিক আকুলতাও প্রকাশ করেছেন। পল্লীবাসীর দুঃখ বেদনা, পল্লী সমাজের একান্ত অনগ্রসরতা, তার অর্থনৈতিক দুরবস্থা ইত্যাদির প্রতিকার চেতনাও রবীন্দ্রনাথের লেখালেখিতে পরিস্ফুট হয়েছে। এমন কি রবীন্দ্রনাথ গ্রাম কেন্দ্রিক (তাঁর জমিদারীতে ও শান্তিনিকেতনের পার্শ্ববর্তী সুরুলে) বহু কর্ম প্রচেষ্টার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর কাব্য-কবিতা, সোনার তরী, চিত্রা, চৈতালীতে তাঁর সাধনা হিতবাদী যুগের ছোটগল্পগুলির অনেকগুলিতে পল্লী বাংলার দৃশ্যরূপ পল্লীর মানুষগুলিরও সমাজজীবনের এক একটা স্পষ্ট পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়েছে।

কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে, রবীন্দ্রনাথের পল্লীচেতনা বা পল্লী মনস্কতা তাঁর কোনো উপন্যাসেই কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ঘটনা কাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ করেনি। পল্লীসমাজ তাঁর উপন্যাসে একটি পূর্ণ রূপ ধরে তাৎপর্য মণ্ডিত চরিত্রায়ন পায় নি! তাঁর অসমাপ্ত প্রথম উপন্যাস 'করুণা' (প্রকাশকাল, আশ্বিন ১২৪৮— ভাদ্র ১২৮৫, ভারতী পত্রিকায়) থেকে শুরু করে শেষ উপন্যাস (৫ই জুন ১৯৩৪ এ সিংহলে লেখা) চার অধ্যায় — সবগুলিতেই হয় নরনারীর অর্ন্তলোকের জটিল ভাবরহস্য বিশ্লেষণ বা বিশেষ আদর্শ ও ভাববাদের রূপায়ণই ঘটিয়েছেন। পল্লীজীবন, পল্লীচরিত্র এক কথায় পল্লীর হৃদ্‌স্পন্দন কোথাও মুখ্য হয়ে ওঠেনি। রবীন্দ্র-উপন্যাসে পল্লী এসেছে ঘটনা ও চরিত্রের পরিবেশ পট রচনার জন্য। কখনও কখনও নরনারীর অর্ন্তলোকের ভাব-উদ্‌ঘাটক হতে সামান্য সাহায্য করেছে কিম্বা আদর্শবাদকে পরিস্ফুটনে সহায়ক হয়েছে। চিত্র হিসেবেই রবীন্দ্র উপন্যাস ধারায় বাংলার পল্লীগ্রাম ও সমাজের প্রধান উপস্থিতি।

(এক) রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন পত্রে, প্রবন্ধে ও আলোচনায় বাংলার পল্লী বিষয়ক অনুভব।

রবীন্দ্রনাথ ১৮৮৬ খ্রীঃ ৩০শে এপ্রিল শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে তাঁর 'ফুলজানি' উপন্যাসখানি সম্পর্কে লেখা পত্রটিতে দেশের সমসাময়িক পরিচয় সামগ্রিকভাবে

প্রকাশ পায়। "আমাদের চির পরিচিত বাংলাদেশের একটি সজীবমূর্ত্তি জাগ্রত করে তুলতে হবে।" কিম্বা লেখার মধ্যে দিয়ে যেন, ভারতবর্ষের পূর্ব বিভাগের জিয়োগ্রাফির প্রতি বিশ্বাস জন্মায়। অথবা উপন্যাসে বাঙালী নরনারী 'প্রতিদিন গৃহের মধ্যে যে রকম কথা কয় ও যেরকম কাজ করে,' তার পরিচয় যেন ফুটে ওঠে।

শ্রীশচন্দ্রকে লেখা ফুলজানি বিষয়ক পরবর্তী পত্রে কবি আরো লিখেছিলেন, উপন্যাসে কোনোরকম নভেলি মিথ্যা ছায়া থাকবে না। (অর্থাৎ রোমান্সের আতিশয্য সম্বন্ধে বিরূপতা)। বিষয়বস্তু নির্বাচনে ও উপস্থাপনায় কোনোরকম ঐতিহাসিক বা ঔপদেশিক বিড়ম্বনায় যাওয়ায় বদলে "সরল মানব-হৃদয়ের মধ্যে যে গভীরতা আছে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখপূর্ণ মানবের দৈনন্দিন জীবনের যে চিরানন্দময় ইতিহাস— সেটি সৃজনেরই তিনি পক্ষপাতী। আরও জানিয়েছিলেন কাহিনীর বিষয়বস্তু যেন হয় "বাংলার অর্ন্তদেশবাসী নিতান্ত বাঙালীদের সুখ-দুঃখের কথা।

বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক লিখেছেন ঃ

"শ্রীশচন্দ্রের 'শক্তিকানন" প্রকাশিত হইলে রবীন্দ্রনাথ লেখককে এক চিঠিতে লিখিয়াছিলেন ঃ আপনার লেখা আমার ভারি ভাল লাগে। ওর মধ্যে কোন নভেলি মিথ্যা ছায়া নেই......... আপনি কোন রকম ঐতিহাসিক ঔপদেশিক বিড়ম্বনায় যাবেন না— সরল মানব হৃদয়ের মধ্যে যে গভীরতা আছে— এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখপূর্ণ মানবের দৈনন্দিন জীবনের যে নিরানন্দময ইতিহাস তাই আপনি দেখাবেন। শীতল ছায়া, আম কাঁঠালের বন, পুকুরের পাড়, কোকিলের ডাক, শান্তিময় প্রভাত এবং সন্ধ্যা এর মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে তরল কলধ্বনি তুলে, বিরহ-মিলন হাসি-কান্না নিয়ে যে মানব জীবনস্রোত অবিশ্রান্ত প্রবাহিত হচ্ছে তাই আপনি আপনার ছবির মধ্যে আনবেন।' (ড. সুকুমার সেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, উনবিংশ শতাব্দ ষষ্ঠ সংস্করণ ১৩৭৭, পৃ- ২৫৮)

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ চিন্তায় বাংলার পল্লীগ্রাম একটি প্রধান স্থান গ্রহণ করে আছে। কবি ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিলেত যান। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে প্রত্যাবর্ত্তনে করেন। বিলেতের মুক্ত স্বাধীন নরনারী এবং তাদের কর্ম প্রবাহে সমৃদ্ধ দেশ দেখে স্বদেশের বিপুল অনগ্রসরতা ও সহস্র ত্রুটি বিচ্যুতি তাঁর চোখে পড়ে এবং এগুলির সমাধানের জন্য নিজের অভিমত যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করেন। তিনি দ্বিতীয়বার আড়াই মাসের জন্য বিলেত যান ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে। দেশে প্রত্যাবর্ত্তনের পরপরই তাঁকে জমিদারী তদারকের জন্য উত্তর ও পূর্ববঙ্গের সুবিস্তৃত পল্লী অঞ্চলে দীর্ঘকালের জন্য অবস্থান করতে হয়। পাতিসর, শিলাইদহ, কুষ্টিয়া কালিগ্রাম প্রভৃতি পল্লী অঞ্চলে জমিদারী কার্যোপলক্ষে বসবাস রবীন্দ্রজীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। "দেশ মাটিতে তৈরী নয়, দেশ মানুষে তৈরী'— দেশের বৃহৎ জনজীবনের সঙ্গে কবির

পরিচয় ঘটল এবার, এইখানে। বাংলার বৃহত্তর কৃষক সমাজের এবং সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙালী গ্রামবাসীর বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সংস্পর্শে এসে কবি তাদের দৈন্যদুর্দশাময় দুঃখী জীনযাত্রার নিবিড় পরিচয় পেলেন। দেশের 'অন্তর্জীবনে'র প্রত্যক্ষ পরিচয় পেয়ে তিনি উপলব্ধি করতে পেয়েছিলেন, দেশের বৃহত্তর জনসমাজ কিরকম অস্বাস্থ্যকর বিরুদ্ধ পরিবেশে অশিক্ষা আর দারিদ্র্যের মধ্যে কালাতিপাত করছে। এদেশের উন্নতি সেই জন্যই সুদূর পরাহত। পরবর্ত্তী কালে কবি এই সম্পর্কে নিজেই বলেছেন ঃ আমার জীবনের অনেক দিন নগরের বাইরে, পল্লীগ্রামের সুখ-দুঃখের ভিতর দিয়ে কেটেছে, তখনই আমি আমাদের দেশের সত্যিকার রূপ কোথায় তা অনুভব করতে পেরেছি। যখন আমি পদ্মানদীর তীরে গিয়ে বাস করেছিলাম, তখন গ্রামের লোকদের অভাব অভিযোগ এবং কত বড় অভাগা যে তারা, তা নিত্য চোখের সম্মুখে দেখে আমার হৃদয়ে একটা বেদনা জেগেছিল। এই সব গ্রামবাসীরা যে কত অসহায় তা আমি বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিলাম। তখন পল্লী গ্রামের মানুষের জীবনের যে পরিচয় পেয়েছিলাম তাতে এই অনুভব করেছিলাম যে, আমাদের জীবনের ভিত্তি রয়েছে পল্লীতে।........গ্রামের লোকদের খাদ্য নেই, স্বাস্থ্য নেই, তারা শুধু একান্ত অসহায়ভাবে করুন নয়নে চেয়ে থাকে। তাদের সেই বেদনা, সেই অসহায় ভাব আমার অন্তরকে একান্তভাবে স্পর্শ করেছিল।" (পল্লীপ্রকৃতি, ১৯৬২ সংস্করণ, পৃ- ১৬৫)

গ্রামের দরিদ্র কৃষিজীবী প্রজাদের ওপর তাঁর সহানুভুতির প্রগাঢ়তা ব্যঞ্জিত হয়েছে সে সময়কার চিঠিপত্রে। "প্রজারা যখন সসম্ভ্রম কাতরভাবে দরবার করে, এবং আমলারা বিনীত করজোড়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তখন আমার মনে হয় এদের চেয়ে আমি এমন কি মস্তলোক যে আমি একটু ইঙ্গিত করলেই এদের জীবন রক্ষা এবং আমি একটু বিমুখ হলেই এদের সর্বনাশ হ'য়ে যেতে পারে।....... আমি এদের হর্তাকর্তা বিধাতা, এর চেয়ে অদ্ভুত আর কি হ'তে পারে........।'

সমকালীন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ গ্রামের সুখ-দুঃখ নিয়ে ভাববার বা গ্রামের উন্নতি করার সুনির্দিষ্ট কোন পরিকল্পনা নিতে পারেন নি, সে সময় রবীন্দ্রনাথকেই আমরা সংসারের তীরে সমাজসেবীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখলাম।"

(শ্রীমন্ত কুমার জানা, রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ চিন্তা, পৃ- ১৩০)

সাধারণ জনসমাজের দুঃখ দুর্দশা দূর করার জন্য রবীন্দ্রনাথ সোস্যালিজমের পক্ষেও ঈষৎ ঝুকে পড়েছিলেন। কবি মন্তব্য করেছিলেন ঃ "সোস্যালিজম সকলের মধ্যে ধনের সমবিভাগ করিয়া দিয়া পুনশ্চ সকলকে এক তন্ত্রের মধ্যে বাঁধিতে চাহে এবং এই উপায়ে সকলকে যথাসম্ভব স্বাধীনতার অধিকারী করিতে চাহে, মানব সমাজে ঐক্য এবং স্বাধীনতার সামঞ্জস্য ইহার উদ্দেশ্য" (দ্রঃ ১২৯৮

মাঘ, ভারতী ও ১২৯৯ জ্যৈষ্ঠ সাময়িক সার সংগ্রহ বিভাগ)

রবীন্দ্রনাথ গ্রাম সেবার আদর্শকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্রের পল্লী সমাজের বিশ্বেশ্বরী শিক্ষিত রমেশকে যে কথা বলেছিলেন, সে যেন গ্রাম ছেড়ে না যায়, গ্রামের অজ্ঞানতা দূর করার চেষ্টা করে, রবীন্দ্রনাথ সেই গ্রামে ফিরে আসবার জন্য শিক্ষিতদের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন।

তাঁর বিশ্বাস ছিল 'শিক্ষিতদের' মাটির ঘরে ঘরে গিয়ে প্রীতির স্পর্শে আত্মমর্যাদার দীক্ষায় দেশের মানুষকে জাগাতে হবে। কেননা, "পল্লীগ্রামের স্ফুরনেই দেশের জন্মান্তর রূপান্তর ঘটবে।" (রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচিন্তা-শ্রীমন্ত কুমার জানা, পৃ- ১১৭ সাহিত্য বিহার সং, মে ১৯৮৬)

রবীন্দ্রনাথ ১৯০৪ খ্রী: 'স্বদেশীসমাজ' শীর্ষক প্রবন্ধে দেশবাসীর কাছে তাঁর পল্লী সংগঠনের আদর্শ তথা নিজের সৃষ্টিশীল স্বদেশচিন্তার কথা তুলে ধরেছিলেন। পল্লী বিষয়ে এই গঠনমূলক চিন্তা রবীন্দ্রনাথের চিরকাল চেতনার কেন্দ্র বিন্দুতে ছিল। এই প্রবন্ধে প্রথম শোনা গেল পল্লীসেবার গঠনমূলক কার্য পদ্ধতির দ্বারা জাতিকে সংঘবদ্ধ করে একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ ও স্বতন্ত্র শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলার কথা। বিদেশী সরকারের সঙ্গে বিরোধিতা না করে সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজন মিটানোর ভার, আত্মশক্তি ও আত্মচেষ্টার দ্বারা পল্লীর প্রত্যেক মানুষকে নিতে হবে। সালিসী প্রথার দ্বারা বিবাদ বিসম্বাদ মিটাবার ব্যবস্থা, স্বদেশী বিদ্যালয় স্থাপন, গ্রামীণ চালাঘর স্বাস্থ্যরক্ষা, রাস্তাঘাট নির্মাণ, কুটির শিল্পে আত্মনিয়োগ, সমবায় প্রথা প্রচলন, গোরক্ষা শান্তিরক্ষার জন্য স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন, কৃষি উন্নয়নে যন্ত্রের ব্যবহার, শস্যভাণ্ডার স্থাপন, সমাজপতি নির্বাচন— এবং বৎসরে অন্তত একবার মেলা প্রবর্ত্তন এসব কথা কবি যুক্তিপূর্ণ ভাবে বুঝিয়েছেন ঃ

"আমাদের দেশ প্রধানত পল্লীবাসী। এই পল্লী মাঝে মাঝে যখন আপনার নাড়ীর মধ্যে বাহিরের বৃহৎ জগতের রক্ত লোলে অনুভব করিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠে, তখন মেলাই তাহার প্রধান উপায়।........ প্রত্যেক জেলার ভদ্র শিক্ষিত সম্প্রদায় তাহাদের জেলার মেলাগুলিকে যদি নবভাবে জাগ্রত নব প্রাণে সজীব করিয়া তুলিতে পারেন, ইহার মধ্যে দেশের শিক্ষিতগণ যদি তাহাদের হৃদয় সঞ্চার করিয়া দেন, এই সকল মেলার যদি তাঁহারা হিন্দু মুসলমানের সদ্ভাব স্থাপন করেন কোন প্রকার নিস্ফল পলিটিক্সের সংশ্রব না রাখিয়া বিদ্যালয়, পথঘাট, জলাশয়, গোচরভূমি প্রভৃতি সম্বন্ধে জেলার যে সমস্ত অভাব আছে তাহার প্রতিকারের পরামর্শ করেন, তবে অতি অল্পকালের মধ্যে স্বদেশকে যথার্থই সচেষ্ট করিয়া তুলিতে পারেন। (স্বদেশী সমাজ ১৯৬২ সং, পৃ- ১২-১৩)।

রবীন্দ্রনাথ ৯ই ভাদ্র ১৩১২ তে 'অবস্থা ও ব্যবস্থা' নামে বঙ্গভঙ্গ রোধের উদ্দেশ্যে বয়কট আন্দোলন সম্পর্কিত প্রবন্ধে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে ইংরেজ প্রভাব

মুক্ত করে স্বদেশী পঞ্চায়েতে পরিণত করার আহবান ও জানিয়েছিলেন। "........আমাদের গ্রামের স্বকীয় শাসনকার্য আমাদিগকে নিজের হাতে লইতে হইবে। সরকারী পঞ্চায়েতের মুষ্ঠি আমাদের পল্লীর কণ্ঠে দৃঢ় হইবার পূর্বেই আমাদের নিজের পল্লী-পঞ্চায়েতকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে।.........." "...........আপনার পরিবার প্রতিবেশী ও পল্লীকে লইয়া সুখ স্বাস্থ্য শিক্ষা বিধান সম্বন্ধে একটি স্বকীয় শাসনজাল বিস্তার করিব।........." (রবীন্দ্র রচনাবলী ১৩৪৭ সং) অবস্থা ও ব্যবস্থা পৃ- ৬১৬, ৬১৭ ৩য় খণ্ড) রবীন্দ্রনাথ ব্যাধি ও প্রতিকার (প্রবাসী ১৩১৪ শ্রাবণ)

প্রবন্ধে হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা আলোচনা করার পরে স্বদেশী আন্দোলনের মূল ত্রুটি হিসেবে পল্লীর সঙ্গে নেতৃবৃন্দের যথার্থ হৃদয়ের সম্পর্ক না থাকাকে স্পষ্ট চিহ্নিত করেছিলেন। ভুয়োদর্শী কবি বলেছেন ঃ সাধারণ মানুষই দেশের প্রধান শক্তি। তাদের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা নিয়ে গ্রামে গ্রামে শিক্ষা স্বাস্থ্য-সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক উন্নতির চেষ্টা করতে হবে। "যে কোন একটি পল্লীর মাঝখানে বসিয়া যাহাকে কোনদিন ডাকিয়া কথা কহে নাই, তাহাকে জ্ঞান দাও, আনন্দ দাও, আশা দাও, তাহার সেবা কর, তাহাকে জানিতে দাও মানুষ বলিয়া তাহার মাহাত্ম্য আছে, সে জগৎ সংসারের অবজ্ঞার অধিকারী নহে।......তাহাকে অন্যায় হইতে, অনশন হইতে, অঙ্গ সংস্কার হইতে রক্ষা করো।......" (রবীন্দ্র রচনাবলী, ১০ম খণ্ড (১৩৫৭ সং) পৃ- ৬৩২)।

১৯১৪ খ্রীঃ বাংলাদেশে বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলী' নামে একটি সমাজ-সংস্কার প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন ডাঃ দ্বিজেন্দ্রলাল মৈত্র প্রমুখ ব্যক্তিরা। মণ্ডলীর অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ কর্মযজ্ঞ (১৩২১ ফাল্গুন) ও পল্লীর উন্নতি (১৩২২ বৈশাখ) নামক দুটি প্রবন্ধে পল্লীউন্নয়নে আত্মনিয়োগ করার জন্য যুবকদের আহবান জানান। এবং পল্লীউন্নয়নের কর্মসূচী তুলে ধরেন। আমার প্রস্তাব এই যে, বাংলাদেশের যেখানে হোক একটি গ্রাম আমরা হাতে নিয়ে তাকে আত্মশাসনের শক্তিতে সম্পূর্ণ উদ্বোধিত করে তুলি। সে গ্রামের রাস্তাঘাট, তার ঘর-বাড়ির পরিপাট্য, তার পাঠশালা, তার সাহিত্যচর্চা ও আমোদ প্রমোদ, তার রোগী পরিচর্যা ও চিকিৎসা, তার বিবাদ নিষ্পত্তি প্রভৃতি সমস্ত কার্যভার সুবিহিত নিয়মে গ্রামবাসীদের দ্বারা শাসন করবার উদ্যোগ আমরা করি।......পল্লীগ্রামে নানা স্থানেই দাতব্য চিকিৎসালয় এবং মাইনর ও এনট্রেন্স স্কুল আছে। যাঁরা পল্লী গঠনের ভার গ্রহণ করবেন তাঁরা যদি এই রকম একটা কাজ নিয়ে পল্লীর চিত্ত ক্রমে উদ্বোধিত করার চেষ্টা করেন তবে তাঁরা সহজেই ফললাভ করতে পারবেন এই আমার বিশ্বাস। অকস্মাৎ অকারণে পল্লীর হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ লাভ করা দুঃসাধ্য। ডাক্তার এবং শিক্ষকের পক্ষে গ্রামের লোকের সঙ্গে যথার্থ ভাবে ঘনিষ্ঠতা করা সহজ। তাঁরা যদি ব্যবসায়ের সঙ্গে লোকহিতকে মিলিত করতে পারেন, তবে পল্লী সম্বন্ধে যে সমস্ত

সমস্যা আছে তার সহজ মীমাংসা হয়ে যাবে।" (পল্লী প্রকৃতি, ১৯৬২ সং পল্লীর উন্নতি)

১৯১৮ খ্রীঃ যখন কুখ্যাত রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে মহাত্মা গান্ধী সত্যাগ্রহ আন্দোলনের ডাক দিলেন, ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সেই উত্তাল দিনেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমবায় (১৩২৫ শ্রাবণ) প্রবন্ধে গ্রামোন্নয়ন ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের প্রশ্নটিকে দেশের রাজনৈতিক সমস্যার উর্দ্ধে স্থান দিয়ে লিখেছিলেন। তিনি গ্রামের কৃষি ও অর্থনৈতিক পুর্নগঠনের ক্ষেত্রে সমবায় প্রচেষ্টাকে সুগঠিত ও বেগবান করার আহ্বান জানালেন। গ্রামের মানুষের দারিদ্র্যের কারণ সংঘশক্তির অভাব এবং অবস্থা বৈগুন্যেও শিক্ষাভাবে চাষে প্রয়োজনের বেশী শ্রমদান। রবীন্দ্রনাথ কৃষি ক্ষেত্রে নতুন যুগের প্রথানুসারী হয়ে যন্ত্রের প্রচলন করতে চাইলেন।

তিনি বললেন, "......... যেমন একদিন হাতিয়ারের কাছে শুধু হাতকে হারমানিতে হইয়াছে তেমনি কলের কাছে আজ শুধু হাতিয়ারকে হার মানিতে হইল।

একথা আজ আমাদের চাষীদেরও ভাবিবার দিন আসিয়াছে। নইলে তাহারা বাঁচিবে না। ....য়ুরোপ আমেরিকার সকল চাষীই এই পথেই স্তুহু করিয়া চলিয়াছে। তাহারা কলে আবাদ করে, কলে ফসল কাটে, কলে আঁটি বাঁধে, কলে গোলা বোঝাই করে।" (সমবায় নীতি, ১৩৬৭ সং, সমবায়)।

বিচিত্রমুখী কর্মের বিকাশে দেশকে ব্যাপ্ত করে এবং সমৃদ্ধ করে তুলতে হলে প্রথমে শুষ্ক পল্লীতে প্রাণ জাগাতে হবে। ময়মনসিংহের জনসাধারণের অভিনন্দনের উত্তরে কবি একথাই প্রধানভাবে বলেছিলেন ঃ "........প্রাণের ক্ষেত্র যেখানে, জ্ঞানী যেখানে জন্মলাভ করেছে, সমাজের ব্যবস্থা হয় সেখানে, সেই পল্লীর প্রাণকে প্রকাশিত করো— তাহলেই আমি বিশ্বাস কবি সমস্ত সমস্যা দুর হবে। (পল্লী প্রকৃতি, ১৩৬৮ সং, প্রতিভাষণ ১৯২৬)।

পরাধীন ভারতে পল্লীর কৃষকের নিদারুণ সমস্যা ও তার প্রতি দেশীয় রাজনীতির উপেক্ষা ও ঔদাসীন্যকে তীব্র সমালোচনা করে কবি লিখেছিলেন ঃ "........আর দেশে যখন এই প্রগল্‌ভ বাগবার্তা বায়ুমণ্ডলের উর্দ্ধ স্তরে বিচিত্র বাষ্পলীলা রচনায় নিযুক্ত, তখন দেশের যারা মাটির মানুষ তারা সনাতন নিয়মে জন্মাচ্ছে, মরছে, চাষ করছে, কাপড় বুনছে, নিজের রক্তমাংসে সর্বপ্রকার শ্বাপদ মানুষের আহার জোগাচ্ছে, যে দেবতা তাদের ছোঁয়া লাগলে অশুচি হন, মন্দির প্রাঙ্গনের বাইরে সেই দেবতাকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করছে, মাতৃভাষায় কাঁদছে হাসছে, ... দেশের সেই পোলিটিশান আর দেশের সর্বসাধারণ উভয়ের মধ্যে আসীম দূরত্ব। ...." (কালান্তর ১৩৫৫ সং) রায়তের কথা (১৩৩৩ পৃ ২৯১-৯২)।

গ্রামের কৃষি জীবনের খুঁটিনাটি জটিল সমস্যার সঙ্গে কবির গভীর অভিজ্ঞতা ও বিস্তৃত পরিচয়ের কথা কালান্তরের 'রায়তের কথা' প্রবন্ধে পাওয়া যায়। গ্রামের জমিদার-মহাজন-জোতদার ছোট ছোট রায়ত চাষাদের যে কি রকম নির্মম শোষণ করে সেকথা কঠিন তিরস্কারের কণ্ঠে ব্যক্ত করতে দ্বিধা করেন নি। ".......রায়ত খাদক; রায়তের ক্ষুধা যে কত সর্বনেশে তার পরিচয় আমার জানা আছে।...... জাল জালিয়াতি, মিথ্যা-মকদ্দমা, ঘরজ্বালানো, ফসল তছরূপ,— কোনো বিভীষিকায় তাদের সংকোচ নেই। ....দুর্বল রায়তের ছোটো ছোটো জমি ছলে বলে কৌশলে আত্মসাৎ করে প্রবল রায়ত ক্রমে জমিদার হয়ে উঠতে থাকে।"

অন্যায় শোষণ ও অত্যাচারী জমিদারী শাসন প্রথার বিরুদ্ধচারী ছিলেন কবি। তাঁর প্রধান বক্তব্য ছিল জমিদার ও অধঃস্তন মধ্যসত্ত্বভোগীদের জুলুম ও ভয়াবহ অত্যাচার থেকে কৃষকদের রক্ষা করতেই হবে। জমিতে রায়তদের স্বত্ত্বাধিকার স্বীকার করে নিয়ে চাষীর সামগ্রিক মুক্তি ও গ্রামে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। পল্লীর দুরবস্থা রোধে তাঁর কাছে সমবায় প্রথার প্রচলন করা বিশেষ কার্যকরী বলে বিশ্বাস হয়েছিল, কারণ এই যৌথ মালিকানা দ্বারা বহুভাবে প্রচেষ্টার সার্থকতা আসে এবং ব্যক্তিচিত্তের সংকীর্ণতা ও একক স্বার্থচিন্তা দূর হয়ে পারস্পরিক হৃদ্যতার সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

গ্রামের লোকেরা যে নগরায়ণের ফলেই শোষিত ও বঞ্চিত হচ্ছে, গ্রাম সমাজের এই করুণ ক্ষয়ের দিকটি রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বুঝেছিলেন। 'আজ ধনীরা শহরে এসে ধন ভোগ করছে বলেই সাধারণ লোকেরা আপন ভাগ্যের কার্পণ্য নিয়ে হাহাকার করছে।.....''(সমবায় নীতি ১৩৭০, ভারতবর্ষের সমবায়ের বিশিষ্টতা) গ্রাম সমাজে এ যুগে যে পুরানো সরল জীবনযাত্রা প্রণালী লয় হয়ে জটিল হয়ে যাচ্ছে, এ কথা তিনি জানতেন। আমাদের দেশে ব্যয়ের বৃদ্ধি ও আয়ের সংকীর্ণতা বেড়ে গেছে। এ সময় তিনি রাশিয়া পরিভ্রমণ করেন (১৯৩০, ১১ সেপ্টেম্বর যাত্রা) কবিকে মুগ্ধ করেছিল রাশিয়ার নিম্নশ্রেণীর মানুষদের আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মমর্যাদা লাভ। মানুষে মানুষে বৈষম্য দূরীকরণ এবং শহর গ্রামের বৈপরীত্য ঘোচানোর উদ্যম। লোকশিক্ষার দ্বারা রাশিয়া শোষিত, উৎপীড়িত পরিত্যক্ত মানুষকে কাজে লাগিয়েছে। মানুষের অবরুদ্ধ ঐশ্বর্য আত্মপ্রকাশ করে জীবনের জয়ধ্বজা তুলে ধরেছে। রবীন্দ্রনাথও যুগ-যুগান্তর শৃঙ্খলিত গণমানসের মুক্তির পথ খুঁজেছেন, পাননি। রাশিয়া ভ্রমণ থেকে তিনি তাঁর পথ পেয়ে গেলেন যেন। তিনি লিখলেন ঃ 'আমাদের দেশের রাষ্ট্রীয় উন্নতিকে যদি আমরা সত্য করতে চাই তাহলে সব আগে আমাদের এই তলার লোকদের মানুষ করতে হবে।' (রাশিয়ার চিঠি, পত্র নং ৪)।

রাশিয়ার লোকসাহিত্য, লোকসঙ্গীত ও লোকশিক্ষা প্রভৃতি সংগ্রহ ও উপযুক্ত মূল্যায়নের উদ্যম কবিকে প্রগাঢ়ভাবে প্রভাবিত করেছিল। দেশের সাধারণ চাষীদের, কর্মীদের তৈরী শিল্পবস্তু যা পূর্বকালে স্বীকৃতি পায়নি, সেগুলি এখন যথার্থ মূল্য পাচ্ছে। ছবি, লোকসাহিত্য, লোকসঙ্গীত নিয়ে কাজ হচ্ছে— এ কবিকে লোকসংস্কৃতিচর্চার প্রতি আরও আগ্রহী করে তোলে। কবি শ্রেণী বৈষম্য ও শহর-গ্রামের প্রভেদ মুছে পল্লী উন্নয়নের জন্য দেশবাসীকে এগিয়ে যেতে আহবান জানালেন।......মানুষের শক্তির এই নূন্যতম বিকাশকে গ্রামে গ্রামে আনা চাই।" (পল্লী প্রকৃতি, ১৯৬১ পল্লীপ্রকৃতি ১৯৩৪)।

জীবনকে বাদ দিয়ে কোন আদর্শের চর্চা চলতে পারে না। তেমনি মহাজাতীয়তার যে সাধনা তা মানুষকে নিয়েই এদেশের মানুষের কথা আলোচনায় প্রথমেই বলতে হয় ভারতবর্ষীয় সমাজের কথা। ভারতবর্ষ পল্লীপ্রধান, পল্লীকে কেন্দ্র করেই সমাজসত্তার অভিব্যক্তি। ইংরেজ শাসনের সময় থেকে পল্লীর প্রাণধারা শুকিয়ে যেতে থাকে নানা কারণে। কবির কথায় ঃ "পাশ্চাত্ত্য রাজার শাসনে এইখানে ভারতবর্ষ আঘাত পেয়েছে। গ্রামে গ্রামে তার যে সামাজিক স্বরাজ পরিব্যাপ্ত ছিল, রাজশাসন তাকে অধিকার করলে। যখন থেকে এই অধিকার পাকা হয়ে উঠল তখন থেকে গ্রামে গ্রামে দীঘিতে গেল জল শুকিয়ে, জীর্ণ মন্দিরে, শূন্য অতিথিশালায় উঠল অশত্থ গাছ, জাল-জালিয়াতি মিথ্যা-মকদ্দমাকে বাধা দেবার কিছু রইল না, রোগে, তাপে দৈন্যে অজ্ঞান অধর্মে সমস্ত দেশ রসাতলে তলিয়ে গেল। (কালান্তর, রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক মত)

তাই পল্লী উন্নয়ণ ছিল কবির স্বদেশ চিন্তার কেন্দ্রগত বৈশিষ্ট্য। মানুষকে বাদ দিয়ে দেশ নেই। দেশের জনবল একটি প্রধান শক্তি। সুতরাং পল্লীবাসী সাধারণ মানুষের উন্নতিকে দেশের শ্রী ও শক্তির বৃদ্ধি। আর কবির কাছে জনজাগরণের সর্বপ্রথম পন্থা বোধ হয়েছিল আপামর জনতার মধ্যে শিক্ষাবিস্তার। ইংরেজ শাসনে নগরকে কেন্দ্র করেই শিক্ষায়তন গড়ে ওঠে। পল্লী উপেক্ষিত হতে থাকে। এর ফলেই দেশে নানা দৈন্য উদ্ভুত হয়। চিত্তোৎকর্ষ সাধিত হয় না। এজন্য গ্রামের মধ্যে ব্যাপকভাবে শিক্ষা বিস্তার কবির ঐকান্তিক আগ্রহ ও আকাঙ্খার বস্তু হয়ে উঠেছিল। বর্তমানে সরকার পল্লীর শিক্ষার জন্য গ্রামে গ্রামে যে বিভিন্ন ধরণের শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টিত হচ্ছেন, রবীন্দ্রনাথ শতাব্দীর গোড়া থেকেই সেকথা বলে দিয়েছিলেন এবং স্বয়ং নিজের সীমাবদ্ধ ক্ষমতায় গ্রাম-জীবনে শিক্ষা বিস্তারের যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন।

পল্লীবাসীর শিক্ষা সমস্যার পরই ওঠে তার অর্থনৈতিক দিকের কথা। পল্লীময় ভারতবর্ষের মূল অর্থনীতি কৃষি কেন্দ্রিক। গ্রামের কৃষককে কৃষিকার্যের সুব্যবস্থা ও শস্যোৎপাদন বৃদ্ধির সুযোগ এনে দিলেই দেশের সামগ্রিক আর্থিক উন্নতি ঘটবে,

গ্রামের কৃষকের উন্নতির তথা দেশের অর্থনৈতিক সাফল্যের জন্য রবীন্দ্রনাথ চাষী সমবায়ের দিকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন, পল্লী গঠনের জন্য নানা উন্নয়ণমূলক কর্মসূচির উদ্যম নিয়েছিলেন।

গ্রামে গ্রামে বিজ্ঞানচেতনা, বিজ্ঞান-দৃষ্টির প্রয়োগ চেয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ, এইভাবে পল্লীকে ধ্বংস ও অবক্ষয় থেকে বাঁচিয়ে তার উন্নয়ন প্রচেষ্টার মাধ্যমেই গোটা দেশ সঞ্জীবিত হবে, এই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল কবির মনে। তিনি দেশের রাজনীতি, রাষ্ট্রযন্ত্র কোথা থেকেও যথাযথ সাহায্য না পেয়ে একা নিজ উদ্যোগেই পল্লী সঞ্জীবনে এগিয়ে এসেছিলেন। তিনি নিজে স্বীকার করেছেন ঃ শিক্ষাসংস্কার ও পল্লী-সঞ্জীবনই আমার জীবনের প্রধান কাজ।" ('পল্লীপ্রকৃতি', পঞ্চম সংখ্যক পত্র)

'কর্ম ও কথায় সত্য আত্মীয়তা অর্জন করেছিলেন কবি নিজ জমিদারী এলাকায় গ্রামসংস্কার কাযে ব্যাপৃত হয়ে। তৎকালীন বঙ্গ পল্লীর শোচনীয় অবস্থা দর্শনে কবি সচেতন সমাজবোধে তার জ্বলন্ত বাস্তব রূপ বর্ণনা করেছিলেন ঃ গ্রামের মধ্যে চেষ্টার কোন লক্ষণ নাই। জলাশয় পূর্বে ছিল আজ তাহা বুজিয়া আসিতেছে, কেননা দেশের স্বাভাবিক কাজ বন্ধ। যে গোচারণের মাঠ ছিল তাহা রক্ষণের কোনো উপায় নাই।........জঙ্গল বাড়িয়া ম্যালেরিয়া নিদারুণ হইতেছে, দুর্ভিক্ষ ফিরিয়া আসিতেছে,...........তাহার পর যা খাইয়া শরীর বল পায় ও ব্যাধিকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে তাহার কি অবস্থা।

ঘি দূষিত, দুধ দুর্মূল্য, মৎস দুর্লভ, তৈল বিষাক্ত, অন্ন নাই, স্বাস্থ্য নাই, আনন্দ নাই, ভরসা নাই, পরস্পরের সহযোগিতা নাই, আঘাত উপস্থিত হইলে মাথা পাতিয়া লই, মৃত্যু উপস্থিত হইলে নিচেষ্ট হইয়া মরি, অবিচার হইলে নিজের অদৃষ্টকেই দোষী করি এবং আত্মীয়ের বিপদ উপস্থিত হইলে দৈবের উপর তাহার ভার সমর্পণ করিয়া বসিয়া থাকি। (সমূহ, পাবনা, প্রাদেশিক সম্মেলনীর অভিভাষণ)

পল্লী সংস্কারে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত উদ্যোগ

রবীন্দ্রানাথ ব্যক্তিগত জীবনসাধনা দিয়ে বঙ্গ পল্লী সঞ্জীবনের কাজে উদ্যোগ নিয়ে শিলাইদহের জমিদারীতে কুষ্টিয়ায় 'তাঁতের কারখানা' বা বয়ন বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৯০৫ সালে ঋণগ্রস্ত বিপন্ন গ্রামবাসীকে রক্ষা করার জন্য সামান্য সুদে ধনদানের পরিকল্পনা করে কবি পাতিসর কৃষি ব্যাঙ্ক স্থাপন করেন। তাঁর নোবেল পুরস্কারের এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা এই ব্যাঙ্কে রেখেছিলেন। শিলাইদহে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষি আবাদের চেষ্টা করেন। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে

কালগ্রামের এক মুসলমান তাঁতিকে শান্তিনিকেতনে ভাল তাঁত বোনার প্রশিক্ষণ দিয়ে নিয়ে এসে তাঁকে শিক্ষক করে এক বয়ন শিক্ষার বিদ্যালয় খুলেছিলেন। এছাড়া, বোলপুরের মত ধানভানা কল, কিম্বা পটারীর শিল্প, ছাতা তৈরি করানো, ছাদের জন্য খোলা তৈরি করার চিন্তা— এসবও তাঁর পরিকল্পনা মধ্যে ছিল।

কবি তাঁর গ্রামীণ প্রজাদের মামলা-মোকদ্দমা কোর্ট কাছারির জটিলতা থেকে বাঁচাবার জন্য নিজেদের মধ্যে সালিসী বিচারের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করেন। বিরাহিমপুর ও কালিগ্রাম পরগণায় কয়েকটি গ্রাম নিয়ে এক একটি বিচারসভা স্থাপিত হয়। কালিগ্রাম পরগণায়ায় তিনি সমস্ত প্রজাদের মিলিত সমিতি 'কালিগ্রাম হিতৈষী সভা'র পত্তন করান। এই সমিতি ছিল গ্রামোন্নতির জন্য। প্রজারা স্বেচ্ছায় চাঁদা দিয়ে এই সভার মারফৎ বহু গ্রামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও চিকিৎসালয় স্থাপিত করে। তাছাড়া জঙ্গল পরিস্কার, পথঘাট নির্মাণ, পুকুর সংস্কার, গ্রামশিল্প প্রচলন, চাষের উন্নতি, মাছের ব্যবস্থা, জলকষ্ট নিবারণ, সালিশী বিচার ও দুর্ভিক্ষের জন্য ধর্মগোলা স্থাপন প্রভৃতি নানাবিধ কাজ সমিতি করে।

কবি শান্তিনিকেতনের পার্শ্ববর্ত্তী সুরুলে পল্লী উন্নয়ণের গবেষণা করায় আগ্রহী হন। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে এখানে কবি নিজের কেনা বাড়িতে পুত্র রবীন্দ্রনাথ মারফৎ গ্রামসংস্কার কাজের পত্তন করেন, তবে এখানে একাজ বেশিদিন চলেনি।

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে ড. দ্বিজেন্দ্রলাল মৈত্রের প্রচেষ্টায় ও কবির প্রেরণায় বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলী নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। এখানে বক্তৃতায় কবি শিক্ষিত যুবকদের গ্রামে কাজ করার আহবান জানালে, অতুল সেন নামক এক যুবক উদ্বুদ্ধ হন। তাঁর চেষ্টায় কবির জমিদারী এলাকার গ্রামে কবির আদর্শ স্বদেশী সমাজের রূপ মূর্ত্ত হয়। এই উদ্যোগে পতিসর, কামতা ও রাতোয়ালে তিনটি হাসপাতাল ও ঔষধালয় স্থাপিত হয়, এবং বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণের ব্যবস্থা হয়, এছাড়া শিশু ও বয়োবৃদ্ধ সকলের জন্য দিন ও রাতের দুশোটির বেশি নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় খোলা হয়। অতুল সেনের সুপরিকল্পনায় চাষীরা পুকুর প্রতিষ্ঠা, কূপ কূয়ো খোঁড়া, রাস্তা তৈরি ও মেরামত করা, জঙ্গল পরিস্কার করা প্রভৃতি ব্যয়সাধ্য কাজ বিনা পারিশ্রমিকে খেটে করে দেন।

জমিদারী এলাকায় গ্রামোন্নয়নের কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর রবীন্দ্রনাথ সুরুলের বাড়ী থেকে এ প্রচেষ্টা চালান। এটি কেন্দ্র করেই শ্রীনিকেতনের সৃষ্টি। ১৯২২ খ্রীঃ বিশ্বভারতীর পল্লী উন্নয়ন কেন্দ্র সুরুলের কুঠিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর কাজ গ্রামবাসীদের সেবা, শিক্ষা ও নেতৃত্ব। এককথায় পল্লীর স্বয়ং সম্পূর্ণতা লাভ করা এবং হৃতশ্রী ফিরে পাওয়া।

কবি একদল সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে গ্রামজীবনে গ্রামসংস্কারের পরিকল্পনা ও উন্নত সমাজ গঠনের আদর্শ তুলে ধরার জন্য একদল স্বাবলম্বী

শিক্ষিত যুবক দল তৈরি করতে চেয়েছিলেন শান্তিনিকেতনের একপ্রান্তে 'শিক্ষাসত্র' স্থাপন করে এটি স্থাপিত হয় ১৯২৪ খ্রীঃ।

১৯২৮ খ্রীঃ শ্রীনিকেতনে হলকর্ষণ উৎসব অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তনের মাধ্যমে কবি শুধু লোকজীবন ও লোকসংস্কৃতির সঙ্গে তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তির সংযোগ স্থাপনের প্রয়াসমাত্র করতে চাননি। তিনি এর দ্বারা উপেক্ষিত অবহেলিত কৃষি সমস্যার প্রতি দেশের লোকের দৃষ্টি আকর্ষণই মুখ্যত করতে চেয়েছিলেন।

কবি গ্রামের ক্ষুদ্র ও কুটিবশিল্প পুনরুজ্জীবনে আন্তরিক প্রয়াস করেন। বাংলার যে কুটির শিল্প যন্ত্রচালিত শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হেরে যাচ্ছে তাকেই স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠা করার কর্মদ্যোগ নিল শ্রীনিকেতন। এখানে কৃষি কাজ পশুপক্ষী পালন, তাঁতের কল, কাঠের কাজ প্রভৃতির সঙ্গে কুটির শিল্পের প্রবর্ত্তন হয়। ১৯৩৮ খ্রীঃ শ্রীনিকেতন শিল্পভাণ্ডারের যে স্থায়ী ভাণ্ডার খোলা হয় তা উদ্‌ঘাটন করেন সুভাষচন্দ্র। পল্লীর কৃষ্টি সংস্কৃতি সাহিত্যের গভীর অনুযায়ী ছিলেন তাই এর অনাদব ও এর হতমানের জন্য দুঃখিত ছিলেন। এর পুনরুদ্ধারে চেষ্টা করে গেছেন জীবনভর। তাঁর কথায় ঃ সকল দেশেই পল্লী-সাহিত্য, পল্লীশিল্প, পল্লীগান, পল্লীনৃত্য নানা আকারে স্বতঃ স্ফূর্তিতে দেখা দিয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে আধুনিক কালে বাইরে পল্লীর জলাশয় যেমন শুকিয়েছে, কলুষিত হয়েছে, অন্তরে তার জীবনের আনন্দ উৎসেরও সেই দশা।......... আমার ইচ্ছা ছিল সৃষ্টির সেই আনন্দ প্রবাহ পল্লীর শুষ্ক চিত্তভূমিকে অভিষিক্ত করতে সাহায্য করব, নানা দিকে তার আত্মপ্রকাশের নানা পথ খুলে যাবে ঃ

ভারতবর্ষের বিচিত্র জীবনধারা পল্লীতেই প্রবাহিত। একথা রবীন্দ্রনাথ মনপ্রাণ দিয়ে জানতেন। এবং পল্লী জাগরণেই ভারতের উন্নতি এই পরম সত্য কথাও তাঁর কাছ থেকে বারবার দেশবাসী শুনেছে এবং নিজে কর্মধারা দিয়ে গ্রাম উন্নয়নের পথপ্রদর্শন করে ব্যক্তিচেতনায় মহৎ আদর্শ বোধকে বাস্তব প্রত্যক্ষ রূপ দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের পল্লী জীবন সম্পর্কে এই গাঢ় অনুরাগের কারণে, পাঠকেরা তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যে সেই অনুরাগের অনুলিপি যদি পাঠ করতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন, তবে তাঁদের খুব বেশী দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু একথাও একান্ত সত্য যে, রবীন্দ্রনাথের পল্লী সম্পর্কিত গঠনমূলক চিন্তাধাবাকে কেন্দ্রবিন্দু করে তাঁর সাহিত্য একটিও সৃষ্টি হয়নি। পূর্ব ও উত্তরবঙ্গে জমিদারী পর্যবেক্ষণে রত কবি চিত্ত গ্রামবাংলার জীবনপট ও দৃশ্যচিত্র দর্শনে উদ্বোধিত হয়েছিল ঠিকই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নামক মহা প্রতিভাধর ব্যক্তিত্বের বাস্তব জীবনবোধ তথা বাস্তব জীবনদৃষ্ট এবং সাহিত্যকার বা কবির ভাবদৃষ্টির মধ্যে পার্থক্য সুদূর বিস্তারী। পল্লী বাংলায় জমিদারী পর্যবেক্ষণের কিঞ্চিৎ পূর্বকাল থেকে কবির সুদীর্ঘ জীবনকালের

সাহিত্য-কর্ম বিশ্লেষণ করলে এই সত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, কবি যখন বাস্তব পৃথিবীচারী, মহৎ উদ্দেশ্য ও আদর্শবাদী ব্যক্তিসত্তায় দেশ গঠনের জন্য বাংলার পল্লীগ্রামের শিক্ষা, কৃষি, স্বাস্থ্য বা শিল্প-সাহিত্যের উন্নতির জন্য যথাসম্ভব চিন্তা ও কর্মরত, তখন তাঁর সাহিত্যিক ও কবি সত্তা বাংলা পল্লী জীবনের প্রতি ও পল্লীবাংলার নিসর্গ প্রকৃতিব প্রতি একটি ভাবমুগ্ধ দৃষ্টিতে হৃদয়ের সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম রোমান্টিক ও গভীর দার্শনিক অনুভবকে তুলে ধরেছেন। প্রকৃতপক্ষে মানসী-সোনারতরী-চিত্রা-চৈতালী কাব্য যুগের অসংখ্য কবিতায় এবং সেই সময়ে সৃষ্ট তাঁর জীবনের প্রথম ছোট গল্পগুলির অনেক কটির মধ্যে উত্তর ও পূর্ববঙ্গের পল্লীবাস কালের অভিজ্ঞতা কবিচিত্তে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। পল্লীবাংলার উদার বিস্তৃত প্রকৃতি চিত্র তাব নদী নালা প্রান্তর শস্যক্ষেত বেষ্টিত রূপ সেই পল্লীপটে সুখ-দুঃখ মিশ্রিত সাধারণ গ্রামবাসী নারীপুরুষের জীবন লীলার খণ্ড খণ্ড ছবি, গ্রাম বাংলাকে ভালবেসে, তার প্রকৃতি ও নিসর্গের মাঝখানটির প্রাণস্পর্শ পেয়ে উদ্বোধিত হৃদয়ের কাব্য প্রতিলিপি ফুটে উঠেছে বৈষ্ণব কবিতা, যেতে নাহি দিব, আকাশের চাঁদ, বসুন্ধরা, স্বর্গ হইতে বিদায়, প্রেমের অভিষেক, দুর্লভ জন্ম, পুণ্যের হিসাব, দুই বিঘা জমি, দিদি, জ্যোৎস্না রাত্রে প্রভৃতি কবিতায় পোষ্টমাস্টার, খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন, ছুটি, শুভা, শাস্তি, সমাপ্তি, অনধিকার প্রবেশ, মেঘ ও রৌদ্র, আপদ, দিদি, অতিথি প্রভৃতি গল্পগুলির মধ্যে কবির বঙ্গপল্লীর সাধারণ জীবন সংসার ও চরিত্র এবং প্রকৃতি সম্পর্কে এক সুগভীর অনুভবের পরিচয় সার্থক হয়ে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্পে বাংলার পল্লী গ্রামের সামান্য জীবন ছবির টুকরো টুকরো অংশ ফুটে উঠলেও ঠিক পল্লী জীবনের নিজস্ব সুখ-দুঃখ আনন্দ বেদনা বা সমস্যা জটিলতার বৃহৎ সামাজিক চিত্রায়ণ সেগুলিকে বলা যায় না। তবুও পল্লী সমাজের তথা বাংলার একান্ত অন্তর্জীবনের নাড়ি-স্পন্দন পাঠক সেখানে অনুভব করেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের জগত সম্পূর্ণভাবেই ভিন্ন। সেখানে একমাত্র তাঁর প্রথম ও অসমাপ্ত উপন্যাস করুণার পটভূমি হিসেবে পল্লীগ্রাম প্রধান ভূমিকা পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার প্রতিনিধি এ-রচনা নয়। তাই উপন্যাস বিচারে 'করুণা' অগ্রাধিকার পায় না। রবীন্দ্রনাথের তাঁর সাহিতিক সুহৃদ শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে 'শক্তিকানন' উপন্যাস সম্বন্ধে মুগ্ধ অভিমত জানিয়ে একদা লিখেছিলেন যে শ্রীশচন্দ্রে পল্লীজীবন ছায়া-আশ্রিত উপন্যাস তাঁর বিশেষ ভাল লাগে। সেই সঙ্গে শ্রীশচন্দ্র যেন উপন্যাস কোনোরকম ঐতিহাসিক কাহিনী প্রেক্ষাপটের আশ্রয় না গ্রহন করেন বা, উপদেশমূলক কাহিনী না লেখেন একথা জানিয়ে 'বাংলার অন্তর্দেশবাসী নিতান্ত বাঙালীদের সুখ দুঃখের কথা'ই যেন তার উপন্যাসে কাহিনীরূপ পায় আন্তরিকভাবে এই ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। তাথাচ,

'করুণা' বাদ দিলে কবির প্রথম পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস 'বউঠাকুরানীর হাট' থেকে শুরু করে শেষ উপন্যাস চার অধ্যায় পর্যন্ত সর্বত্রই হয় ইতিহাস অথবা মানবমনের সুজটিল রহস্যানুসন্ধান কিম্বা গভীর দর্শন ও রাষ্ট্রতত্ত্বকেই উপন্যাস কাহিনীর মূল বস্তু হিসেবে গ্রহণ করতে আমরা দেখেছি। এই সব উপন্যাসে সমাজ-পটভূমি থাকলেও তা বঙ্কিমচন্দ্রের বা শরৎরন্দ্রের অধিকাংশ উপন্যাসের মত গ্রামীণ এবং সামন্ততন্ত্রীয় নয়। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে সমাজ পটভূমিকা রূপে এলেও তা প্রায় সর্বক্ষেত্রেই নাগরিক এবং আধুনিক। সমালোচকের অভিমত ঃ "চোখের বালি এবং নৌকাডুবির পরিবেশে কিঞ্চিৎ প্রাচীনতার চিহ্ন বর্ত্তমান থাকলেও নিছক সমাজপটভূমির কালগত আধুনিকতা বিচারে এই দুটি উপন্যাসেও রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্র অপেক্ষা অনেক আধুনিক।" 'যোগাযোগ' উপন্যাস সম্বন্ধে এই সমালোচকই লিখেছেন যে, '...পটভূমিকা কিছু প্রাচীন হলেও এর মধ্যেকার সমাজ সমস্যার নবীনতা এবং লেখকের সমাজমনষ্কতার আধুনিকতা লক্ষ্যণীয়।" এবং গোরা ও ঘরে-বাইরে উপন্যাস দুটির '...সমাজ পটভূমিও অনুরূপ ভাবে আধুনিক। .... গোরার পরবর্তী উপন্যাস চতুরঙ্গের সমাজপটভূমি গোরা অপেক্ষা প্রাচীনতর হলেও এর মধ্যেকার আধুনিক যুগের চিহ্ন সম্পর্কে পাঠকের মনে দ্বিধার কোন অবকাশ নেই।" আর, "শেষ পর্বের উপন্যাসগুলি সমাজপটভূমির আধুনিকতার দিক দিয়ে বেশ উগ্র বলা চলে।"

(রবীন্দ্র উপন্যাস সমীক্ষা, শ্রীসত্যব্রত দে, পৃষ্ঠা. ৪৪)

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলিতে পল্লীসমাজের ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে পল্লীসমাজ কাহিনীর মূল বিষয়বস্তু যদিও হয়ে ওঠেনি, তবুও ঘটনা কাহিনীর প্রেক্ষাপট হিসেবে কখনও কখনও বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে। চরিত্রগুলির ভাব উদ্বোধনে সক্রিয় হয়েছে বা কাহিনীতে ভিন্ন আলোকপাত ঘটিয়েছে, অথবা কখনও শুধুমাত্র পরিবেশ পটভূমি হয়েই থেকেছে। সে ক্ষেত্রে পল্লী শুধুমাত্র বর্ণনামূলক।

রবীন্দ্রনাথেব প্রথম অপরিনত বয়স ও মননের সৃষ্টি অসমাপ্ত 'করুণা' উপন্যাস। এই রচনার কাহিনী-পটভূমি বাংলাদেশের এক অখ্যাত পল্লীগ্রাম সেই গ্রামের ধনবান জমিদার বৃদ্ধ অনুপ কামারের কন্যা করুণা ও তার আশ্রিত অনাথ ব্রাহ্মণ পুত্র নরেন্দ্রের বিবাহ এবং নরেন্দ্রর উন্মার্গগামীতা এবং করুণার লাঞ্ছনা, শেষ পর্যন্ত করুণার মৃত্যু ইঙ্গিত এই উপন্যাসের মূল কাহিনী। পার্শ্বকাহিনী মহেন্দ্র-রজনী ও মোহিনীর। কুরূপা রজনীকে বিবাহ করে মহেন্দ্র সুখী নয়, সে বিধবা মোহিনীর প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে ও কুসংসর্গে যোগ দেয়। কিন্তু পরবর্তীকালে

তার মোহ ভঙ্গ হয় এবং সুস্থ জীবনে ফেরে। এ উপন্যাসে রঘুনাথ সর্বভৌম বা পণ্ডিত মহাশয় নামে একটি চরিত্র আছে। তিনি করুণার হিতৈষী। করুণাকে শেষ সময়ে তিনি বাড়ি ফিরিয়ে আনেন এবং তার সুশ্রুষার ব্যবস্থা করেন। উপন্যাসে করুণার রোগশয্যা যে মৃত্যুশয্যায় পরিণত হয়েছে সেই আভাস রেখে রবীন্দ্রনাথ রচনাটি অসমাপ্ত রেখে দিয়েছেন।

সামন্ততান্ত্রিক পরিবেশে উনবিংশ শতকের জীবনপটে গ্রামীণ আবহাওয়ায় এই কাহিনী গড়ে উঠেছে। গ্রামের সঙ্গতিবান ব্যক্তির পালিত বালক নরেন্দ্রর বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কলকাতায় শিক্ষা লাভে গিয়ে অসৎ সঙ্গে মিশে অধঃপতনের দিকে গেল। নরেন্দ্র চরিত্রের লাম্পট্য ও সেই সঙ্গে বিবাহিতা স্ত্রী করুণার প্রতি চরম দুর্ব্যবহার ও অমানবিকতা দেখিয়ে রবীন্দ্রনাথ এই রচনাটিকে ব্যক্তি জীবনের কাহিনী রূপেই গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন সম্ভবত। নরেন্দ্রর বিপরীতে মহেন্দ্রর অসৎসঙ্গে পতন কিন্তু সেখান থেকে ফিরে আমার চাবিত্রিক দৃঢ়তাও করুণা উপন্যাসের একটি প্রধান দিক। এছাড়া পণ্ডিতমশায়ের নিজস্ব জীবন চর্যা এবং করুণার প্রতি তাঁর স্নেহ, স্বরূপবাবু, গদাধর প্রমুখ নরেন্দ্রর কুকর্মির নাগরিক সঙ্গীর নানা ঘটনা ও এ লেখায় দেখানো হয়েছে। এখানে চরিত্রগুলির পরিস্ফুটন ঘটানোই লেখকের প্রধান আগ্রহ হয়ে উঠেছে।

ভাষা এবং প্রকাশরীতিতে এ উপন্যাসে বঙ্কিমী প্রভাব যথেষ্ট রয়েছে। উনবিংশ শতকের বাংলা দেশের পল্লী-সমাজের কিছু চিত্র এখানে কাহিনীর অনিবার্য গতিতে সৃষ্টি হয়েছে। করুণার পিতা বর্দ্ধিষ্ণু জমিদার অনুপকুমার পুরোনো সামন্ততান্ত্রিক প্রথার ধনী ব্যক্তির মতই "অতিথিশালা নির্মাণ, দেবালয় প্রতিষ্ঠা, পুষ্করিণী খনন প্রভৃতি নানা সৎকর্মে ধন ব্যয় করতেন।" পাণ্ডিতমশাই চরিত্রটি ঠিক বাংলার পল্লীগ্রামের অতীত যুগের বহুদৃষ্ট পণ্ডিতমশায়দের মত নয়। তিনি তাঁর পাঠশালার ছাত্রদের কাছে মোটেই ভীতিপ্রদ ছিলেন না, বরং তাদের অত্যাচারের পাত্র ছিলেন। সরল, নিরীহ প্রায় নির্বোধ এই পণ্ডিতের দ্বিতীয় দার পরিগ্রহের বর্ণনা দিতে লেখক গ্রামীণ স্ত্রী আচারের উল্লেখ করেছেন। বিবাহ উপলক্ষে পল্লীগ্রামের পাড়া-প্রতিবেশীর অংশগ্রহণের বাস্তব দিকটিও এখানে দেখানো হয়েছে মহেন্দ্র লাম্পট্য বশতঃ রাত্রিবেলায় বিধবা মোহিনীর গৃহে উপস্থিত হলে এবং ধরা পড়ায় গদাধরের প্রহার লাভ, মহেন্দ্রর দুর্নাম। মোহিনীর পরিবার-পরিজন কর্তৃক লাঞ্ছনা পল্লীসমাজের স্বভাব বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট করেছে।

কিন্তু পল্লীসমাজের আর বিশেষ কোনও ভূমিকা এ লেখায় গৃহীত হয়নি। শুধু নরেন্দ্র বা মহেন্দ্রর চরিত্র স্খলনে গ্রামের লোকেদের নিন্দার কথা লেখক উল্লেখ করেছেন। অথচ, করুণা একাকিনী গৃহত্যাগ করে চলে যাওয়ার ব্যাপারে গ্রাম-সমাজ কোনোরকম দৃকপাত করে না যথাযথ পল্লীসমাজের স্বভাবরূপ এতে

ফোটেনি। এছাড়া, নরেন্দ্রর ব্যবহারে পল্লীসমাজের তাকে একঘরে করার উল্লেখ রবীন্দ্রনাথ যেমন করেছেন, তেমনি নরেন্দ্র তাতে বিন্দুমাত্র গ্রাহ্যও করেনি, এমন কথাও আছে। রবীন্দ্রনাথ পল্লীগ্রামের পটভূমিতে ঊনবিংশ শতকের বঙ্কিমানুসায়ী গদ্য ও বর্ণনা ভঙ্গীতে প্রাচীন পন্থার উপন্যাস হিসেবেই 'করুণা'র অসমাপ্ত লেখাটি লিখেছেন। পল্লীসমাজ জীবন-চেতনার প্রতিপালক হিসেবে তিনি এখানে কাহিনী রচনা করেননি। কয়েকটি চরিত্রের জীবন ঘটনা বিবৃত করেছেন মাত্র।

করুণা রচনা কাল ১২৮৪-৮৫ বঙ্গাব্দ। ভারতী পত্রিকায় এটি ধারাবাহিকভাবে একবৎসর কাল ধরে প্রকাশিত হয়। ইতিপূর্বে কবির কয়েকটি সাহিত্য সমালোচনা মূলক লেখায় সমাজ ও দেশ চেতনা প্রকাশিত হয়েছে। যেমন ভুবনমোহিনী প্রতিভা, (১৮৭৫) অবসর সরোজিনী (১৮৭৬) ইত্যাদি। সুতরাং তরুণ কবিচিত্তে দেশও সমাজ সম্বন্ধে নিজস্ব ভাব স্ফুরিত হয়েছিল একথা বোঝা যায়। 'করুণা' কাঁচা, অপরিণত মনের ও পুরোনোপন্থার অসমাপ্ত উপন্যাস রচনা হলেও এখানে নগর কলিকাতার অন্ধকার দিকের একাংশ উদঘাটন করেছেন রবীন্দ্রনাথ। কলকাতায় এসে ইংরেজী শিক্ষার নামে পাড়াগাঁর ছেলের অসৎসঙ্গে মিলে উচ্ছন্নে যাওয়া, প্রগতিশীলতার নামে বিধবা ভদ্রকন্যাকে কুপথে আনবার কদর্য চেষ্টা, বিবাহিতা স্ত্রীর প্রতি অত্যাচার ইত্যাদির বিরুদ্ধচারী হয়েছেন লেখক এ রচনায়। তবে পল্লীসমাজমূলক বা সাধারণভাবে সমাজ সমস্যামূলক লেখা এটি নয়।

সমকালীন সময় পটের পরিবর্তে বিগত যুগের ইতিহাস ছায়ায় মানবজীবন কাহিনী অঙ্কনের চেষ্টা দেখা গেছে রবীন্দ্রনাথের 'বউঠাকুরাণীর হাট' উপন্যাসে। এই উপন্যাসের রচনাকাল ১২৮৮ বঙ্গাব্দের কার্তিক থেকে ১২৮৯ বঙ্গাব্দের পৌষ পর্যন্ত। ভারতী পত্রিকায় ধারাবাহিক রচিত উপন্যাসটির গ্রন্থাকারের প্রকাশ হয় ১২৮৯ এর পৌষ মাসে, ইং ১৮৮৩ খ্রী: ১১ই জানুয়ারী। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ ইংলণ্ড থেকে দেশে প্রত্যাবর্তন করেছেন (১৮৮০ খৃ: ফেব্রুয়ারী) এবং ভারতী, শ্রাবণ ১২৮৮ বঙ্গাব্দ সংখ্যায় 'দয়ালু মাংসাশী' প্রবন্ধে হাস্য পরিহাসছলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতি নিন্দা বিদ্রুপ বর্ষণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের সমাজ সচেতনতায় পল্লীবাংলার সমাজ-গঠনের সচেতনতায় পল্লীবাংলার সমাজগঠনের পরিকল্পনার আলো প্রথম স্পষ্টভাবে পড়েছে ভারতী ১২৯১ আশ্বিন সংখ্যার হাতে কলমে পৃ: ২৩৩-৩৪, প্রবন্ধে। পল্লীপ্রাণের স্ফুরনেই দেশের জন্মান্তর রূপান্তর ঘটবে এমন ভাবনার সেখানে উদ্ভাস ঘটেছে। রবীন্দ্র জীবনীকার এই প্রবন্ধ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন— পরযুগে লিখিত স্বদেশী সমাজের ইহাই পূর্বাভাস এবং গঠনমূলক কার্যের ইহাই প্রথম খসড়া।' এর পর ক্রমশই দেশ ও সমাজ সম্বন্ধে ভাবিত কবিমন ধীরে ধীরে পল্লী পুর্নগঠন চিন্তায় আন্তরিকভাবে মগ্ন হয়ে পড়ে এবং কিছু পরবর্ত্তীকালে গ্রামজীবনের অন্দরমহলে প্রবেশ করে তার

দুঃখ-দৈন্য ও আরও সহস্রবিধ সমস্যার সঙ্গে পরিচিত হয়ে তার পরিকারকল্পে অসংখ্য পত্রে, প্রবন্ধে, বক্তৃতায় নিজস্ব অভিমত সুস্পষ্টভাবে বার বার ব্যক্ত করেছেন। এবং পরিশেষে নিজ জমিদারীর অর্ন্তগত উত্তর ও পূর্ববঙ্গের গ্রামাঞ্চলে পল্লী উন্নয়ন কাজে স্বয়ং অগ্রসর হয়ে বিপুল কর্মযজ্ঞের সূচনা করেন। সর্বত্র সফল না হলেও তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহ ও যুক্তি এবং কর্মনিষ্ঠার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এতে পাওয়া যাচ্ছে।

আমাদের ভাবতে অবাক লাগে যে, এই পর্বের কিঞ্চিৎকাল আগেই কবি লিখেছেন 'বউঠাকুরাণীর হাটে'র মত সম্পূর্ণ ভিন্ন চেতনার এক উপন্যাস। যশোর রাজ, বার-ভুঁইয়ার অন্যতম প্রতাপাদিত্যের ঐতিহাসিক চরিত্রকে অবলম্বন করে তিনি একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেছেন। সে উপন্যাসে তিনি সরে গেছেন উনবিংশ শতকের শেষ পর্বের বাংলার অশান্ত যুগ কল্লোল থেকে বেশ কিছু পেছনে। ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসেবে এটি যথাযত হয়নি, আমরা এই আলোচনায় যে দিকটির প্রতি আলোকপাত করব না, 'বউঠাকুরানীর হাটে' রবীন্দ্রনাথের পল্লী-সমাজ চেতনা কিছু ব্যক্ত হয়েছে কিনা এই নিবন্ধের সেটিই আলোচ্য বিষয়।

প্রাবন্ধিক বা সক্রিয় পল্লীউন্নয়নকামী কর্মী রবীন্দ্রনাথের পরিচয় এ উপন্যাসে একান্তই অনুপস্থিত। আধুনিক সমাজ-চেতনাবদ্ধ রবীন্দ্রমানস এখানে ক্রিয়াশীল নয় কিন্তু উপন্যাসের জীবন পটভূমির প্রয়োজনে বাংলায় পল্লীসমাজের পুরোনো দিনের সামান্য কিছু ছায়াপাত এখানে খুঁজে পেতে পারি। বাংলার প্রাচীন সামন্ততান্ত্রিক গ্রাম সমাজে স্ত্রী স্বাধীনতার নিতান্ত অভাব, পুত্র-বধুর প্রতি শ্বশুরালয়ের নানাবিধ বিরূপতা, বিশেষতঃ সে পয়া না অপয়া এইরকম বিচার রমণী মহলে খুবই সাধারণ ব্যাপার ছিল। বধুর প্রতি তার স্বামীর অনুরাগ ও শাশুড়ির কাছে বিশেষ প্রীতিকর ব্যাপার ছিল না। এছাড়া নানা ঝাড়-ফুঁক, মন্ত্রতন্ত্রের ওপর বিশ্বাস ও প্রযোগ, অন্দরমহলে গৃহিনীর অনুবর্তিতা আশ্রিতা মহিলাদের প্রতি পদে গৃহিনীর মনতুষ্টিতে তার কথায় সায় দেওয়া, দাস-দাসীদের ঘরের খবর নিয়ে বাইরে বলা, বাসর ঘরে নতুন জামাতার সঙ্গে মেয়েদের রসালাপ, জামাতাকে অপদস্থ করা, শ্বশুরালয়ে অসম্মান ঘটলে সেই ক্রোষ পত্নীর ওপর বর্ত্তানো বা তাকে ত্যাগ করা, এই অতি প্রচলিত পল্লী-সমাজের এই ব্যাপারগুলি 'বউঠাকুরাণীর হাটে' বেশ ভালবাবেই লক্ষ্য করা গেছে। আরও দেখা গেছে পুরোনো বিশ্বস্ত গৃহ-ভৃত্যের আচরণ, মনিবপত্নীকে মাতৃ সম্বোধন তাঁকে শাঁখা পরানো, পুরোনো বাংলার সমাজ-জীবনে শারদীয় আগমণী গানের প্রভাব ঠাকুরদা ও নাতি-নাতনীর স্নেহ সম্পর্ক ইত্যাদি মধুর গৃহ-ছবির পরিচয়।

'বউঠাকুরাণীর হাটে' রাজা প্রতাপাদিত্যের মর্যাদাবোধের উগ্রতা পুরানো বাংলা পল্লীর দম্ভী জমিদার-সুলভ। তিনি পুরানো যুগের গ্রাম্য অহঙ্কারী গৃহকর্তার মত পুত্রবধুকে তার পিতার অপরাধে গৃহে অসম্মানিতা করে রেখেছেন। তাঁর কথায় পল্লীর গ্রাম্যতা অস্পষ্ট "... শ্রীপুরের জমিদারের মেয়ে কি এখানেই আছে?... সে তাহার পিত্রালয়ে থাকিলেই তো ভাল হয়।... শ্রীপুরের ঘরে বিবাহ দিয়াছি; সেই অবধি বালকটা একেবারে অধঃপাতে গিয়াছে। ঈশ্বর করুণ আমার কনিষ্ঠ পুত্রটি যেন উপযুক্ত হয়।" অথবা, উদয়াদিত্যের অন্যায়ে ক্রোধ বর্ত্তায় পুত্রবধু সুরমার ওপর— "... মন্ত্রীকে কহিলেন, বউমাকে আর রাজপুরীতে থাকিতে দেওয়া হইবে না, কোন সূত্রে তাহাকে তাহার বাপের বাড়ি পাঠাইতে হইবে।

প্রতাপাদিত্যের মহিষীও একান্তই পল্লী-সমাজাশ্রিতা বয়স্কা গৃহিনীর মতই পুত্রবধু সরমার প্রতি ঈষৎ ঈর্ষাতুর কেননা, পুত্র উদয়াদিত্য স্ত্রীর বশ। গ্রাম্য স্ত্রীসুলভ বাক্য তার মুখে দিয়েছেন ঔপন্যাসিক বধু-সুরমার বিরুদ্ধে স্বামী উদয়াদিত্যের কাছে অভিযোগ : 'মহারাজ.... এ সমস্ত অনর্থের মূলে ওই বড় বউ। বাছা তো আমার আগে এমন ছিল না। যেদিন হইতে শ্রীপুরের ঘরে তাহার বিয়ে হইল, সেই দিন হইতে উদয় কেমন যে হইল..." অথবা, "আহা বাছা আমার রোগা কালো হইয়া গিয়াছে। বিয়ের আগে বাছার রং কেমন ছিল। ... তোর এমন দশা কে করিল? বাবা বড়ো বউ তোকে যা বলে তা শুনিস না। তার কথা শুনিয়াই তোর এমন দশা হইয়াছে।... ওর ছোট বংশে জন্ম, ওকি তোর যোগ্য?... এমন রাক্ষসীর সঙ্গেও মহারাজ তোর বিবাহ দিয়াছিলেন।" এই প্রসঙ্গে রাণীর অশ্রুপাতও তার চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গত। পল্লী-রমণীর সাধারণ ঈর্ষাতুর মনের লক্ষণ রাণীর মধ্যে আরও লক্ষ্য করা গিয়েছে কন্যা বিভার সাজসজ্জা প্রস্তুতিতে তার হস্তক্ষেপ। বিভার মনে সাজসজ্জা সম্পর্কে একটি সূক্ষ্ম সৌন্দর্য বোধ ছিল। কিন্তু রানী, পুরোনো বা সাবেকি কেতায় বিভার ক্ষীণ বাহু দুটিতে বৃহদাকার সোনার চুড়ি ও হীরার বালা পরিয়ে নাকে প্রকাণ্ড নথ পরিয়ে সন্তুষ্ট হয়েছেন। আবার, জমকালো কেশ সজ্জা খুলে বিভা সুরমার কাছে হালকা কেশ বন্ধন করলে মহিষীর মনে হয়েছে সুরমা বিভার স্বামী সমাগম মুখকে ঈর্ষা করে তাকে শ্রীহীন দেখাবার কুটিল অভিসন্ধিতে কোনবন্ধন পরিবর্তন করেছে। প্রতাপাদিত্যের স্ত্রী গ্রাম্য নারী সুলভ এই হীনতা বা ক্ষুদ্রতায় বিভাকে নিজ মনমত সাজসজ্জা করিয়েছেন। রাণী যথার্থ ঐতিহাসিক মর্যাদাময়ী রমণী চরিত্রের বদলে ভাল, মন্দ, ঈর্ষা কুটিলতা, স্নেহ ভবালবাসা নীচতা ক্ষুদ্রতা আবার কোমলতা মেশানো পুরোনো কালের পুরোনো পন্থী খাঁটি বাংলার পল্লীসমাজ কেন্দ্রিক মানসিকতার এক প্রতিনিধি চরিত্র। যিনি পুত্রবধুর প্রতি—পুত্রের প্রেম সহ্য করতে পারেন না, মন্ত্র-তন্ত্র ঝাড়-ফুঁকে তাঁরও পল্লীরমণীদের মত স্বাভাবিক

বিশ্বাস। তাই পুত্রকে বশীকরণের জন্য যা পুত্রবধুর প্রতি পুত্রের মন বিরূপ করে তুলবার জন্য দাসীর পরামর্শে মঙ্গলার মাধ্যমে ওষুধ করার ব্যবস্থা করেছিলেন।

পুনশ্চ উল্লেখ করা যায়, সুরমার মৃত্যুদৃশ্যে পাঠক এই প্রতাপাদিত্য মহিষীকেই সাধারণ নারীর মতই প্রকৃত স্নেহ করুণ বেদনার্তিতে ভেঙে পড়তে দেখেন '... রাজমহিষী ছুটিয়া আসিলেন, সকলে ছুটিয়া আসিল। সুরমার মুখ দেখিয়া মহিষী কাঁদিয়া উঠিয়া কহিলেন, "সুরমা, মা আমার তুই এইখানে থাক, তোকে কোথাও যাইতে হইবে না। তুই আমাদের ঘরের লক্ষ্মী...মা তুই কি রাগ করিয়া গেলি রে?" এইভাবে ঐতিহাসিক উপন্যাসে ঐতিহাসিক চরিত্রের দূরত্ব ও গাম্ভীর্য বজায় না রেখে ঔপন্যাসিক সাধারণ পল্লী রমণী চরিত্র হিসেবেই প্রতাপাদিত্য মহিষীকে সৃষ্টি করেছেন।

গ্রাম্য চরিত্রের মধ্যে এই উপন্যাসে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য মঙ্গলা তথা রুক্মিনী চরিত্র। ব্যর্থ প্রেমের প্রতিহিংসাময়ী রমণী হিসেবে তার বিচার একরকম হবে। আমরা উল্লেখ করছি তার ঈর্ষা প্রবণতার সঙ্গে প্রবল গ্রাম্য কুটিলতা, কলহ পরায়ণতা এবং মন্ত্র-তন্ত্র, তাবিজ-কবচ, ঝাড়-ফুঁক ক্রিয়াকর্মের দিকটি সে গ্রাম্য নারীর মতই পরের গোপন কথা অপরের মাধ্যমে টেনে বার করে। রাজবাড়ির দাসী মাতঙ্গিনীকে সে স্বামী বশীকরণের জন্য এক টুকরো শুকনো শেকড় দেয় ভাতের সঙ্গে তার স্বামীকে খাওয়ানোর জন্য! মাতঙ্গিনীর কাছ থেকে সুকৌশলে রাজবাড়ির গুপ্তকথা জেনে নেয়। বলি রাজবাটীর খবর কী?... তা তোমাদের বউ ঠাক্‌রুন কী করিলেন? নীচতা ও ঈর্ষাপূর্ণ গ্রাম্যতায় মঙ্গলা সুরমার সর্বনাশের জন্য মাতঙ্গিনীর মাধ্যমে রাণীকে বলতে বলেছে যে মঙ্গলা এমন ওষুধ দিতে পারে যাহাতে যুবরাজের মন তাঁহার উপর হইতে একেবারে চলিয়া যায়।" বলা বাহুল্য রানী মঙ্গলার এই কু-পরামর্শ গ্রহণ করেছিলেন। রাজমহিষী যখন শুনিলেন মঙ্গলা নামক একজন বিধবা তন্ত্র-মন্ত্র ঔষধ নানা প্রকার জানে তখন তিনি ... মাতঙ্গিনীকে মঙ্গলার নিকট হইতে গোপনে ঔষধ আনাইতে পাঠাইলেন। এবং সেই জন্য মঙ্গলা নানাবিধ শিকড় লইয়া সমস্ত রাত ধরিয়া কাটিয়া ভিজাইয়া বাঁটিয়া মিশাইয়া মন্ত্র পড়িয়া বিষ প্রস্তুত করিতে লাগিল।"

গ্রাম্য চরিত্রের লক্ষণ অতি স্পষ্টভাবে ফুটেছে প্রতাপাদিত্যের অন্দরমহলের মহিষীর দাসী এবং আশ্রিতা রমণীদের সংক্ষিপ্ত চরিত্র রূপায়নের মধ্যে। প্রতাপাদিত্যের মহিষী তার পুত্রবধু সুরমার প্রতি বিরক্তি ও ক্রোধ প্রকাশ করে পুত্রের কল্পিত দুঃখে চোখের জল ফেলাতে দু-একজন বৃদ্ধা দাসীও তাঁর কথায় সায় দিয়ে হাত নেড়ে বলে উঠেছে ঃ 'শ্রীপুরের মেয়েরা জাদু জানে। নিশ্চয় বাছাকে ওষুধ কবিয়াছে। ... বাবা ও তোমাকে ওষুধ করিয়াছে। এই যে মেয়েটি দেখিতেছ, উনি বড় সামান্য মেয়ে নন। শ্রীপুরের ঘরের মেয়ে। ওরা ডাইনী।

আহা বাছার শরীরে আর কিছু রাখিল না। এই বলিয়া সে সুরমার দিকে তীরের মতো এক কটাক্ষ বর্ষণ করিল ও আঁচল দিয়া দুই হস্তে দুই শুষ্ক চক্ষু রগড়াইয়া লাল করিয়া তুলিল। তাহা দেখিয়া আবার মহিষীর দুঃখ একেবারে উথলিয়া উঠিল। অন্তঃপুরে বৃদ্ধাদের মধ্যে ক্রন্দনের সংক্রামকতা ব্যপ্ত হইয়া পড়িল। কাঁদিবার অভিপ্রায়ে সকলে রাণীর ঘরে আসিয়া সমবেত হইল।'

রাজবাড়ীর অন্যতম দাসী মাতঙ্গিনী ও গ্রাম্য নারীর স্বভাবেই রাজবাড়ির গোপন কথা বাইরে প্রকাশ করার জন্য ব্যস্ত। এই ধরনের চরিত্রগুলিকে রবীন্দ্রনাথ বাস্তব প্রত্যক্ষ সততায় নির্মাণ করেছেন। সে মঙ্গলাকে প্রাণ খুলে সুরমা সম্বন্ধে নিন্দা করেছে।

"আসল কথা কি জান? আমাদের যে ঠাকরুনটি আছেন তিনি দুটি চক্ষে কাহারো ভালো দেখিতে পারেন না। তিনি কি মন্তর জানেন, সোয়ামীকে একেবারে ভেড়ার মতন করিয়া রাখিয়াছেন।" অল্প জানা ঘটনা বা ব্যাপার নিজের পছন্দমত রং জড়িয়ে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে আলাদা সত্যে পরিণত করা এক ধরনের গ্রাম্যতার লক্ষণ। এই লক্ষণটি মাতঙ্গিনী দাসীর কথায় ও আচরণে পরিস্ফুট। সে প্রতাপাদিত্যের জামাতা রামচন্দ্রের শ্বশুরালয় ত্যাগের ঘটনাটি মঙ্গলার কাছে এইভাবে উপস্থিত করেছে : "তিনি (সুরমা) আমাদের দিদিঠাকুরুণের নামে জামাইয়ের কাছে কী সব লাগাইয়া ছিলেন, তাই জামাই রাতারাতিই দিদি ঠাকুরুনকে ফেলিয়া চলিয়া গেছেন। দিদি ঠাকরুন তো কাঁদিয়া কাটিয়া হল্লাও করিতেছেন। মহারাজ খাপা হইয়া উঠিয়াছেন, তিনি বউঠাকরুনকে শ্রীপুরে বাপের বাড়িতে পাঠাইতে চান।' অবার সুরমার প্রতি উদয়াদিত্যের ভালবাসা তার কাছে বাড়াবাড়ি বোধ হয়। যুববরাজ তাঁর স্ত্রীকে "এক দণ্ড না দেখিলে থাকিতে পারেন না। যুবরাজকে 'তু' বলিয়া ডাকিলেই আসেন।

রমাইভাঁড় চরিত্রের মধ্যে অশ্লীল গ্রাম্য পুরুষ রূপটি রবীন্দ্রনাথ যেন বিতৃষ্ণা সহকারে চিত্রিত করেছেন। আবহমান কাল থেকে রাজসভায় রাজার বয়স্য বিদুষক ব্রাহ্মণ রশিক চরিত্রের সাক্ষাৎ আমরা পেয়েছি। তাদের রসিকতা ঈষৎ স্থূল হলেও তাদেব মার্জিত রূপচ্ছবিই মোটামুটি সংস্কৃত নাটক ইত্যাদিতে দেখা গেছে। অষ্টাদশ শতকে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভায় ব্রাহ্মণ বিদুষক হিসেবে গোপাল ভাঁড়ের সম্বন্ধে প্রচুর রস রসিকতার কিম্বদন্তী গল্প এখনও সুপরিচিত। 'বউঠাকুরাণীর হাটে'র প্রতাপাদিত্য জামাতা চন্দ্রদ্বীপের রাজা রামচন্দ্র রায়ের এই জাতীয় বয়স্য রমাই পণ্ডিত কিন্তু গোপাল ভাঁড়েরও তুল্য নয়। গোপাল ভাঁড় স্থূল রস-রসিকতা করলেও তার মধ্যে বুদ্ধি বা হৃদয়বত্তার—চিহ্ন ছিল। কিন্তু রমাই ভাঁড় একান্ত স্থূল-কুৎসিত অমার্জিত ও অসংযত হতে পারে যাহাতে যুবরাজের মন তাঁহার উপর হইতে একেবারে চলিয়া যায়।" বলাবাহুল্য রাণী মঙ্গলার এই কু-

পরামর্শ গ্রহণ করেছিলেন। রাজমহিষী যখন শুনিলেন মঙ্গলা নামক একজন বিধবা তন্ত্র-মন্ত্র ঔষধ নানা প্রকার জানে তখন তিনি,... মাতঙ্গিনীকে মঙ্গলার নিকট হইতে গোপনে ঔষধ আনাইতে পাঠাইলেন। এবং সেই জন্য মঙ্গলা নানাবিধ শিকড় লইয়া সমস্ত রাত ধরিয়া কাটিয়া ভিজাইয়া বাঁটিয়া মিশাইয়া মন্ত্র পড়িয়া নির্বোদ রসিকতা প্রকাশ করে চূড়ান্ত গ্রাম্যতার মূর্ত্তিমান রূপ ধরেছে। রাজসভায় প্রকাশ্য দরবারে সে কুরুচিপূর্ণ ভাষায় নিজের স্ত্রী সম্পর্কে কদর্য রসিকতা করেও হাস্যরস সৃষ্টি করতে চায় রামাই জোড়হস্তে ব্যাকুলভাবে কহিল, মহারাজ তাহাকে অর্ধাঙ্গ বলিবেন না। তিন জন্ম তপস্যা করিলে আমি বরঞ্চ একদিন তাহার অর্ধাঙ্গ হইতে পারিব, এমন ভরসা আছে। আমার মত পাঁচটা অর্ধাঙ্গ জুড়িলেও তাহার আয়তন কুলায় না।... প্রত্যুষে গৃহিণী এমনি ঝাঁটাইয়া দেন যে, একেবারে মারাজের দুয়ারে আসিয়া পড়ি। রামচন্দ্র যখন রমাইকে বলেন, গতবার তিনি শ্বশুরালয়ে বড়ই লাঞ্ছিত হন, তখন রমাই অনায়াসে বলে দেয় আজ্ঞা হাঁ, মহারাজের লাঙ্গুল বানাইয়া দিয়াছিল।... "আপনার এক শ্যালক আমাকে কহিলেন। বাসর ঘরে তোমাদের রাজার লেজ প্রকাশ পাইয়াছে তিনি রামচন্দ্র না রামদাস? আমি তৎক্ষণাৎ কহিলাম... পূর্বে তো ছিল না। আপনাদের ঘরে বিবাহ করিতে আসিয়াছেন, তাই যস্মিন দেশে যদাচার অবলম্বন করিয়াছেন। রামাই নির্বোধ রাজা রামচন্দ্র রায়কে আশ্বাস দিয়ে বলেছে ঃ '...... রমাই কে যদি অন্তঃপুরে লইয়া যাইতে পারেন, তবে স্বয়ং শাশুড়ী ঠাকুরানীকে পর্যন্ত মনের মধ্যে ঘোল পান করাইয়া আসিতে পারি।" রামচন্দ্র রায় যখন প্রতাপাদিত্যের চেয়ে সে নিজে কিসে ছোট বলে ক্ষুব্ধ হয়েছে, তখন এই রমাই তার গ্রাম্য রসিকতায় মন্তব্য করেছে "......বয়সে আর সম্পর্কে, নহিলে আর কি সে? ......" প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে ঘোর সম্পর্কীয় তার স্থূল নির্বোধ রসিকতা— "........জানেন তো মহারাজ, আদিত্যকে যে ব্যক্তি বগলে ধরিয়া রাখিতে পারে, সে ব্যক্তি রামচন্দ্রের দাস ঃ প্রতাপাদিত্যের গৃহের অন্তঃপুরে রমাইকে প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকের ছদ্মবেশে নিয়ে গেছে রামচন্দ্র রায়। অন্তপুরিকাদের জামাতার সঙ্গে ঠাট্টা রসিকতার চিত্রটিতেও ঔপন্যাসিক পল্লীসমাজের স্বাভাবিক রীতি পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। "জামাই অন্তঃপুরে আসিয়াছেন। ছলবিশিষ্ট সৌন্দর্যের ঝাঁকের ন্যায় রমণীগণ চারিদিক হইতে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছে। চারিদিকে হাসির কোলাহল উঠিল। চারিদিক হইতে কোকিল কন্ঠের তীব্র উপহাস, মৃণালবাহুর কঠোর তাড়ন, চম্পক অঙ্গুলির চন্দ্র নখরের তীক্ষ্ণ পীড়ন চলিতে লাগিল। এই অংশের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের 'ইন্দিরা' উপন্যাসের শেষ অংশে ইন্দিরার পিতৃগৃহে তার স্বামীর সঙ্গে মিলন উৎসবের বাসরে গ্রামের রমণীগণ এবং ইন্দিরার ভগ্নী কামিনীর জামাতার সঙ্গে রসরসিকতার দৃশ্যের চমৎকার সাদৃশ্য রয়েছে।

অন্তঃপুরিকাদের এই আসরে রমাই এর স্ত্রীবেশে উপস্থিতি এবং তার স্থূল অমার্জিত রসিকতা গ্রাম্য রমণীদেরও কর্ণ পীড়ক হয়েছে, ঔপন্যাসিক লিখেছেন, "..........তাহার মুখ দিয়া এমনি সকল রুচির বিকার বাহির হইতে লাগিলে যে, পুররমণীদের মুখ এক প্রকার বন্ধ হইয়া আসিল। তাহার মুখের কাছে থাকোদিদিও চুপ করিয়া গেলেন। বিমলাদিদি ঘর হইতে উঠিয়া চলিয়া গেলেন। কেবল ভূতোর মা তাহাকে খুব এক কথা শুনাইয়াছিল।........ তখন সেই প্রৌঢ়া তাহাকে বলিয়াছিল, 'মাগো, মা, তোমার মুখ নয় তো, এক গাছা ঝাঁটা।' ভূতোর মা তৎক্ষণাৎ কহিল, আর মাগি, তোর দুখটা আঁস্তাকুড়, এত ঝাঁটাইলাম তবুও সাফ হইল না।" বলিয়া গম্‌গম্ করিয়া চলিয়া গেল।"— পরে আরও রসিকতার স্থূল আনন্দে ছদ্মবেশী রমাই প্রতাপাদিত্যের মহিষীর কক্ষে উপস্থিত হয়ে তাঁকে নিরীক্ষণ করিয়ায় কহিল 'এই যে নিকষা জননী।" রামমোহন তাকে কঠিন শাস্তি দিতে উদ্যত হলে রমাই তখন প্রাণ ভয়ে "দোহাই বাবা ব্রহ্মহত্যা করিস না বলে আর্তি জানিয়েছে এবং অম্লান বদনে মহারাজ আমাকে আদেশ করিয়াছেন "বলে নিজের সাফাই গেয়েছে। প্রতাপাদিত্য তার এই অমার্জিত গ্রাম্যতার মুখোমুখি বেশিক্ষণ থাকতে পারেন নি, 'দূর করো, দূর করো, উহাকে এখনই দূর করিয়া দাও বলে তাড়িয়ে দিয়েছেন। রামচন্দ্র রায় দ্বিতীয়বার বিবাহে উদ্যোগী হলে রমাই যথারীতি তার স্থূল গ্রাম্য রসিকতায় বিবাহর নিমন্ত্রণ পত্র প্রতাপাদিত্যকে পাঠানোর এয়োস্ত্রী হিসেবে শাশুড়ীকে আনবার এবং মিষ্টান্নের থালা স্ত্রী বিভাকে পাঠানোর প্রস্তাব দিয়েছে— "প্রতাপাদিত্যের মেয়েকে যখন একথাল মিষ্টান্ন পাঠাইবেন তখন তাহার সঙ্গে দুটো কাঁচা রম্ভা পাঠাইয়া দিবেন। হৃদয়হীন কুৎসিত রসিকতাই এই চরিত্রটির প্রধান সম্বল! তাই উপন্যাসের শেষ দৃশ্যে ভিখারিনী বেশে বিভাকে দেখেও তার কদর্য রসিকতার অবসান হয় নাই। সে রাজার দিকে তাকিয়ে "কঠোর কণ্ঠে কহিল, কেন এখন কি আর দাদাকে মনে ধরে না নাকি?" ঐতিহাসিক উপন্যাসের মহত্ত ও গাম্ভীর্য এই গ্রাম্য চরিত্রটির অমার্জিত ও অশ্লীল রসিকতাকে বহুলাংশে ক্ষুণ্ণ করেছে এ বিষয়ে দ্বিধা থাকে না।

পুরুষানুক্রমে রাজা রামচন্দ্র রায়ের ভৃত্য রামমোহন মাল। চার পুরুষের আনুগত্য তার মধ্যেও সঞ্চারিত হয়ে পুরোনো বাংলাদেশের পল্লীসমাজ কেন্দ্রিক সামন্ততান্ত্রিক পরিবার কাঠামোয় গৃহভৃত্য পুরুষানুক্রমে চাকরী করে ও মনিবের সুখ-দুঃখের সঙ্গী হয়ে গৃহের একজন হয়ে যায়। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় গল্পের দরিদ্র মুসলমান গৃহ সেবক রূপোকার প্রসঙ্গে এই ক্ষেত্রে মনে পড়ে। মনিবের প্রতি বিশ্বস্ততাই এই মানুষগুলির চরিত্রের বড় বৈশিষ্ট্য ছিল। জমিদারের লাঠিয়াল বরকন্দাজ প্রমুখ এই ধরণের চরিত্র। শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজ উপন্যাসে বিংশ শতাব্দীর পটভূমিকাতেও সামন্ততান্ত্রিক বাংলার পল্লী সমাজে রমার অনুগত

থাকবার লেঠেল, কিম্বা দেনা পাওনা উপন্যাসে ষোড়শীর অনুগত ভূমিজ প্রজা সাগর সর্দাররা এই চরিত্র। এই উপন্যাসে রামমোহন মালও রাজা রামচন্দ্রের এই রকম বিশ্বস্ত পুরাতন ভৃত্য। রামচন্দ্রকে সে শিশুকাল থেকে পালন করেছে। তাই তার মঙ্গল অমঙ্গল শুভাশুভের নৈতিক গায় রামমোহন নিজের মনেই বহন করে আনুগত্যের সঙ্গে। সরল গ্রামীণ স্বভাবের এই বিরাটকায় শক্তিশালী বৃদ্ধ তার প্রভু রামচন্দ্র বা বধূ বিভার কোনো ক্ষতি সহ্য করতে পারেনি। বিভাকে সে যথার্থ ভক্তিপূর্ণ ভালবাসায় 'মা' বলে ডাকে এবং পুত্রের মত ব্যবহার করে উপান্যাস এক অনাবিল বাৎসল্য রস মিশ্রিত পবিত্র অনুভূতির সৃষ্টি করেছে। রামমোহন সন্তানের আবদারে বিভার হাতে চারগাছা শাঁখা পরায়, বিভা তার কাছে বসে চন্দ্রদ্বীপের গল্প শোনে মুগ্ধ হয়ে। প্রতাপাদিত্যের মহিষী তাকে সমাদরে ভোজন করায়। ঔপন্যাসিক রামমোহনের কণ্ঠে অতীত কালের গ্রাম সমাজে অতি প্রিয় দেবী দুর্গার আবাহনী সঙ্গীত বা আগমনী গান একটি দিয়েছেন। এই আগমনী গানটি উপন্যাসে প্রাচীন বাংলার জীবনপটকে যেন সত্য ব্যঞ্জনা এনে দিয়েছে। সরল সত্যনিষ্ঠ গ্রামীণ মানুষ হিসেবেই রাম রামাই পণ্ডিতের কদর্য ভাঁড়ামোকে কঠিন শাসনে বেঁধেছে। আবার মনিব রামচন্দ্রকে বাঁচানোর জন্য চরম দুঃসাহসের কাজও করেছে। পুনরায় বিভাকে চন্দ্রদ্বীপ নিয়ে যেতে স্বয়ং এসে সাধ্য-সাধনা করেছে। রামমোহনের পক্ষে বিভার মনোভাব বোধগম্য হয়নি। তাই নিরাশ হৃদয়েই সে ফিরে গেছে। রামচন্দ্র রায়ের নব বিবাহের দিন বিভারে আগমনে সে তাই বেদনায় কেঁদে ফেলেছে। রানীর অমর্যাদা, পুরোনো বাংলার ধ্যান ধারণার বাহক, পুরোনো আদর্শবাদের পরিপোষক রামমোহনের কাছে সহ্য হয়নি। সে তার নিষ্ঠা বৌ ঠাকরুণ বিভার মর্যাদা রক্ষায় নিয়োজিত করেছে, রাজার চাকরী ত্যাগ করে বিভার অনুগামী হয়েছে। রামমোহন গ্রামের সাধারণ ক্ষুদ্রচেতা পুরুষের প্রতিনিধি নয়। সামন্ততান্ত্রিক বাংলার অতীত পল্লীজীবন কেন্দ্রিক সমাজের পরিবার কাঠামোর এক গুরুত্বপূর্ণ দিক পুরুষানুক্রমে মনিবের বিশ্বস্ত ভৃত্যের ভূমিকা পালনকারী। মনিবের যথার্থ মান মর্যাদা রক্ষাকারী সরল আদিম মুক্ত মনের গ্রামীণ পুরুষের প্রতিমূর্ত্তি। রবীন্দ্রনাথ 'বউঠাকুরানীর হাটে' ঐতিহাসিক বসন্ত রায়ের চরিত্রে বাঙালীর অতীতের যৌথ পরিবার জীবনের স্নেহ সুন্দর বৃদ্ধ পিতামহের স্বভাব চিত্রায়ন ঘটিয়েছেন। প্রতাপাদিত্যকে তার এই খুল্লতাত পরম স্নেহে লালন করলেও তাঁর মোগল আনুগত্যের দোষে প্রতাপ তাঁকে ঘোর অপছন্দ করেন। কিন্তু বসন্ত রায় প্রাণাধিক ভালবাসেন পৌত্র উদয়াদিত্য এবং পৌত্রী বিভাকে। বিশেষত বিভা এবং উদয়াদিত্যের পত্নী সুরমার সঙ্গে তাঁর হাস্য পরিহাস বাঙালীর পুরোনো পল্লী-সমাজ-কেন্দ্রিক যৌথ পারিবারিক সংসার জীবন-গঠনের সমৃদ্ধ দিকটি আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। প্রতাপ ভালবাসেন না, তথাপি নির্বিরোধী

নাতি-নাতনী অন্তপ্রাণ সরল মানুষটি ছুটে ছুটে তাদের কাছে আসেন, অপমান গায়ে না মেখে প্রাণের স্ফূর্তিতে পিতামহসুলভ রস-রসিকতায় ও গানে বাজনায় গৃহ আমোদিত করে রাখেন। বসন্ত রায় ঘরে প্রবেশ করিয়াই হাসিতে হাসিতে গান ধরিলেন ঃ

"আজ তোমারে দেখতে এলেম অনেকদিনের পরে"

"বসন্ত রায়।।............আমি গোটা পনেরো গান ও একমাথা পাকাচুল আনিয়াছি, সেগুলি সমস্ত নিকাশ না করিয়া যাইতে পারিতেছি না।'

রবীন্দ্রনাথের অপরিণত রচনার দলেই অধিকাংশ সমালোচক এই উপন্যাসটিকে রেখে দিয়েছেন, যথার্থ ঐতিহাসিক উপন্যাস এটি হয় নি। কিন্তু ঔপন্যাসিকের জীবন দৃষ্টিতে যে বাস্তবতার দিকটি আছে এখানে সেটি কিছু কিছু ক্ষেত্রে রক্ষিত হয়েছে। পুরনো বাংলাদেশের সামন্ততান্ত্রিক সমাজ কাঠামোয় পল্লী-কেন্দ্রিক বাঙালীর পরিবার জীবনের ছায়া এই উপন্যাসে যেমন আছে, তেমনই আছে বাংলার পুরোনো দিনের পল্লীসমাজের নানা খুঁটিনাটি সহ পল্লী মানসিকতার অধিকারী একাধিক নরনারী চরিত্র।

রাজর্ষি

ত্রিপুরা রাজ্যের রাজ পরিবারের সত্য ইতিহাসমূলক উপন্যাস। রাজর্ষির রচনাকাল ঃ ১২৯২ সালের আষাঢ় মাস থেকে ফাল্গুন পর্যন্ত ছাব্বিশটি পরিচ্ছেদে 'বালক' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়; বাকী অংশসহ গ্রন্থাকারে রূপ পায় ১২৯৩ সালে। এই উপন্যাসটি রচনার আঠার বছর 'ভারতী' পত্রিকায় আশ্বিন সংখ্যায় (১২৯১ সাল) 'হাতে কলমে' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বদেশ চেতনার স্পষ্টবাণী ঘোষণা করেছেন। তাঁর মতে দেশের উন্নতি সাধন করার প্রথম সোপান হল দেশের আপামর জনসাধারণের অন্তরে শক্তি সঞ্চার করা। অসহায় নিরন্ন দুর্বল, অবহেলিত লক্ষ লক্ষ পল্লীবাসীর সঙ্গে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করে দেশকে উদ্ধার করার দায়িত্ব 'হাতে কলমে' নিতে হবে। একথাই কবির মূল বক্তব্য এখানে। সমালোচকদের মতে এখন থেকেই কবি গ্রামসেবার আদর্শকে গুরুত্ব দিলেন।

এই সময় কালেই ঠিক প্রায় দশমাস পরে যখন 'বালক' পত্রিকায় খণ্ডে খণ্ডে 'বাজর্ষি' উপন্যাস প্রকাশিত হ'তে শুরু করল তখন দেখা গেল, সে রচনার মুখ্য বিষয় ক্ষুদ্র পল্লীজীবনের সুখ-দুঃখ, ভালমন্দ মেশানো আনন্দ বেদনার ধারাবাহী কোনো জীবন কাহিনী না। কবি তাঁর সুগভীর ও অন্তর্ভেদী মননে সনাতন ধর্মের সংকীর্ণ আচার আয়োজন ও চিবকালীন উদার বিশ্ব মানব-ধর্মের বিরোধ ও

পরিশেষে উদার বিশ্বমানবতার ধর্মবোধকে জয়ী দেখিয়ে এ উপন্যাস সমাপ্ত করেছেন।

তাই পল্লী সমাজের গঠনগত কিম্বা ভাবগত বৈশিষ্ট্য অনুসন্ধান এই উপন্যাসে করা সঙ্গত বোধ হয় না। তথাপি এই প্রসঙ্গে দু' একটি কথা বলার উল্লেখ রাখে। 'রাজর্ষি' উপন্যাস রবীন্দ্রনাথের নিজের কথায় প্রেমের অহিংস পূজার সঙ্গে হিংস্র শক্তি পূজার বিরোধ মূলক কাহিনী। এই কাহিনীর তত্ত্ব বিশ্লেষণে না গিয়ে এখানে ঔপন্যাসিকের পল্লী-সমাজ চেতনার কতটুকু পরিস্ফুটন ঘটেছে দেখতে গেলে, প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় মহারাজা গোবিন্দমাণিক্যের সঙ্গে রাজগৃহের বাইরের নিঃসম্পর্কিত দুটি শিশু হাসি ও তার গভীর ও আন্তরিক সম্পর্কটির কথা। রাজা গোবিন্দমাণিক্য একদিন ঘটনাচক্রে বালিকা হাসি এবং শিশু তাতার সঙ্গে স্নেহের সুকোমল গ্রন্থিতে আবদ্ধ হন। হাসির উপন্যাসের প্রথমেই করুন মৃত্যু দৃশ্য থাকলেও তাতা রাজার অপত্যস্নেহে রাজবাড়িতে লালিত হতে থাকে। পরবর্ত্তীতে পুরোহিত, রঘুবীরের কুচক্রে রাজা রাজচ্যুত হলে তাতা বা ধ্রুবর দুর্গতি হয়. কিন্তু পরিশেষে বিল্বন ঠাকুরের সহায়তায় সে পুনরায় রাজার স্নেহাশ্রয় লাভ করে।

এই হাসি ও তাতা নামের দুইটি অনাত্মীয় শিশুর সঙ্গে রাজা তার রাজগাম্ভীর্য ত্যাগ করে যেভাবে হৃদয় বন্ধনে যুক্ত হয়ে এক অনাবিল স্নেহ-সমতার বাতাবরন উপন্যাসে সৃষ্টি করেছেন, সেটি বাঙালীর পুরোনো পল্লীজীবনের পারিবারিক কাঠামোটিকে যেমন স্মরণ করায় তেমনই পল্লী সমাজের সমষ্টিগত বৃহৎ আত্মীয়তা সম্পর্কের ভাবটিকেও ইঙ্গিত করে। বিংশ শতকের প্রথম দিক পর্যন্তও বাঙালী যৌথ পরিবার জীবনে কাকা, জেঠা, ভাই-বোন মাসী-পিসি সমন্বিত বৃহৎ আত্মীয়তার সঙ্গে যুক্ত থাকতো, পল্লীতেও, রক্তের সম্পর্ক ছাড়াও খুড়া-জ্যাঠ্যা ইত্যাদি সম্পর্কিত ডাক বিশেষ প্রচলিত ছিল। এই সমাজ ভাবনার সূত্র ধরেই বালিকা হাসি ও তাতা রাজার সঙ্গে সম্পর্ক পাতিয়েছে, কোনো দ্বিধা করেনি। কিন্তু গোবিন্দ মাণিক্যের নির্বাসনের পরে নক্ষত্র রায় তাতা বা ধ্রুবর প্রতি ঈর্ষা ও ক্রোধে ধ্রুবর ধূর্ত্ত খুড়া কেদারেশ্বরের এই সম্বন্ধ পাতানোর প্রচেষ্টাকে ধূলিসাৎ করে দিয়েছে ঃ "......... তোমার আস্পর্ধা তো কম নয় দেখিতেছি। তোমার ভ্রাতুষ্পুত্র আমাকে কাকা বলে? তুমি তাহাকে এই শিক্ষা দিয়াছ।"

'বিল্বন' চরিত্রটির পক্ষে রবীন্দ্রনাথের পল্লীসমাজের প্রতি সেবাধর্মের আদর্শবাদটি বেশ স্পষ্ট। সে পরোপকারী, স্বার্থলেশহীন সেবার আদর্শ মূর্ত্তি। রাজা গোবিন্দমাণিক্যের সে যেন পরিপূরক চরিত্র। রাজাকে বিল্বনই স্বার্থহীন প্রজারঞ্জক আদর্শ রাজধর্মের পথে উন্নীত করেছে। উপন্যাসের একচত্ত্বারিংশ পরিচ্ছেদে 'নোয়াখালির নিজামতপুরে বিল্বন ঠাকুর কিছু দিন হইতে বাস করিতেছেন' বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে বন্যা ও ঝড়ে প্রবল 'মড়কের প্রাদুর্ভাব' হয়েছিল। এখানে

বিল্বনের হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সেবা কার্যের যে বর্ণনা রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন, এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় যে চেষ্টা বিল্বন চরিত্রে দেখানো হয়েছে তা রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন সময়ের লেখায় ও বক্তৃতায় প্রকাশিত পল্লীসংস্কার ও পল্লীগঠনের নিঃস্বার্থ সেবাদর্শের সঙ্গে একান্ত গভীর মিলযুক্ত। যেমন ইতিপূর্বে উল্লেখিত রবীন্দ্রনাথের 'স্বদেশী সমাজ' শীর্ষক প্রবন্ধ, ৯ই ভাদ্র, ১৩১২ তে লেখা অবস্থা ও ব্যবস্থা প্রবন্ধ ১৩২১ ফাল্গুনে কর্মযজ্ঞ, ১৩২২ বৈশাখে 'পল্লীর উন্নতি' নামক দুটি পল্লী উন্নয়নের যে কর্মসূচী তিনি তুলে ধরেছেন, সেখানে একটি আদর্শ গ্রাম গঠনের ক্ষেত্রে ডাক্তার ও শিক্ষকের যে উপযোগিতার কথা কবি নির্দেশ করেছেন, 'রাজর্ষি' উপন্যাসে বিল্বন চরিত্রের কার্যকারীতা সেই নির্দেশকে যেন বেশ কিছু দিন পূর্বেই মূর্ত্ত করে তুলেছিল।

'বউ ঠাকুরানীর হাট' উপন্যাসে রাজার কর্তব্য সম্পর্কে কিছু তত্ত্বের ইঙ্গিত রবীন্দ্রনাথ দিতে চেষ্টা করেছিলেন. রাজর্ষি উপন্যাসের মধ্যেও সেই তত্ত্বের প্রকাশ আছে। প্রথম জীবনের— 'মুখুজ্জে বনাম বাঁড়ুজ্জে' প্রবন্ধে কবি গ্রামের জমিদারের দায়িত্ব কর্ত্তব্য সম্পর্কে স্পষ্ট ইঙ্গিত করেছিলেন। '.........এদেশে পূর্বকালে জমিদার সম্প্রদায়ের যে গৌরব ছিল তাহা খেতাব অবলম্বনে ছিল না— তাহা দান, অর্চনা, কীর্তিস্থাপন, আর্তগণের আর্তিচ্ছেদ, দেশের শিল্প সাহিত্যের পালন পোষণের উপর নির্ভর করিত। সেই মহৎ গৌরব এখনকার জমিদাররা প্রতিদিন হারাইতেছেন।" জমিদার সম্প্রদায়কে এই দায়িত্ববোধের কথা স্মরণ করানোর কথাটি তিনি যা প্রবন্ধে লিখলেন, তা 'রাজর্ষি' উপন্যাসে যেন রাজার কর্ত্তব্য কর্মের আদর্শের ইঙ্গিত মাধ্যমেই রূপায়িত করলেন। আবার কাছাকাছি সময়ে 'পাবনা সম্মিলনী'র সভাপতির ভাষণে তিনি রায়তদের স্বার্থ রক্ষার ব্যাপারে তিনি সভাপতির ভাষণে দেশের "রায়তদিগের পরের হাত ও নিজের হইতে রক্ষা করিবার উপযুক্ত শিক্ষিত সুস্থ শক্তিশালী" করে তুলবার জন্য দেশের জমিদারদের আহবান জানিয়েছিলেন। সাহিত্যিক সত্তা তত্ত্ব ও তথ্যের সঞ্চয়কে চেতনার গোপন কেন্দ্রে জাগ্রত রেখে সমস্ত সাহিত্যকর্মে তার সৌরভ ছড়িয়ে দেন। তত্ত্ব প্রধান হয়ে উঠলে সাহিত্য রস ক্ষুণ্ণ হয়। রাজর্ষি উপন্যাসে প্রধান তত্ত্ব হিংসামূলক ধর্মের বিরুদ্ধে অহিংসার জয়। পল্লীর সমাজচিত্রের পটভূমিতে এই উপন্যাস রচিত হয়নি। অথবা, পল্লী উন্নয়ন চিন্তা এ উপন্যাসের বিষয়বস্তু বা কাহিনীর মূল নির্মাণ করেনি। কিন্তু চিন্তাশীল সাহিত্যকারের অতীতাশ্রয়ী এবং ভিন্ন রাজ্যের (ত্রিপুরা) পটভূমি ও কাহিনী অবলম্বিত রচনা রাজর্ষিতেও দু একটি ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের পল্লী-সমাজ-চিন্তার ক্ষীণ আলোকপাত ঘটেছে— একথা বলা যেতে পারে।

চোখের বালি

রবীন্দ্রনাথের ঔপন্যাসিক প্রতিভার প্রথম সার্থক রূপায়ন 'চোখের বালি' উপন্যাস এর রচনাকাল বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠায় ১৩০৮ সালের বৈশাখ মাস থেকে ১৩০৯ সালের কার্ত্তিক পর্যন্ত উনিশ মাস সময়কাল। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত ইং ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই এপ্রিল।

'চোখের বালি'র মধ্য দিয়ে শুধু রবীন্দ্রনাথের বিস্ময়কর প্রতিভা উপন্যাস রূপ পায়নি, বাংলা উপন্যাস সাহিত্যেরও একটি নতুন দিক পরিবর্তন ঘটিয়েছে এই রচনাটি। সম্পূর্ণ মনস্তাত্ত্বিক ধরণে, নরনারীর প্রেম চেতনার মুক্ত অবাধ প্রকাশ এখানে ঘটেছে। বিবাহিত পুরুষ, বিধবা ভদ্র বধূর অবৈধ প্রেম চেতনা এখানে লেখকের গভীর আন্তরিক সহানুভূতির সিঞ্চন লাভ করেছে। বিষবৃক্ষ বা কমলাকান্তের উইলের ত্রিভূজ অবৈধ প্রেম-দ্বন্দ্ব এ উপন্যাসে নয়, মানব মনের গভীর জটিল অনুভব প্রক্রিয়ার অসামান্য সাহিত্য রূপায়ণ হয়ে 'চোখের বালি' বাংলার উপন্যাস শিল্পের একটি নবতম শাখার দ্বার প্রসারিত করল।

'চোখের বালি' রচনা কালে রবীন্দ্রনাথ তৎকালীন বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উত্তাল সমস্যাবলী সম্পর্কে একান্ত সচেতন ও চিন্তাশীল ছিলেন। পত্রাদিতে তিনি তাঁর নিজস্ব অভিমত ও নানা ব্যাপারে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানাতে যেমন দ্বিধা করেন নি, অনুরূপভাবে বিবিধ প্রবন্ধ-নিবন্ধ আলোচনা ইত্যাদি লেখায় ও বক্তৃতায় দেশ সম্বন্ধীয় নিজস্ব মতামত স্পষ্ট ও জোরালো ভাষায় তুলে ধরেছেন। যেমন, ১৩০০ সালে রাজনৈতিক প্রবন্ধ 'ইংরেজ ও ভারতবাসী' (এই প্রবন্ধটি কবি চৈতন্য লাইব্রেরিতে পাঠ করেন। সভাপতি ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। সূত্র ঃ শ্রীমন্তকুমার জানা, রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচিন্তা-পৃঃ ১৩৩)

'ইংরেজের আতঙ্ক'(১৩০০), 'মুচিরামের অধিকার' (সাধনা) এতে হিন্দু মুসলিম ঐক্য ভাবনা ব্যঞ্জিত হয়েছে ইংরেজের ভেদনীতির পরিপ্রেক্ষিতে, 'অপমানের প্রতিকার' (১৩০১, সাধনা ভাদ্র), 'রাজাপ্রজা' (১৩০১ রাজদ্রোহ আইনের প্রতিবাদ বিখ্যাত কণ্ঠরোধ প্রবন্ধ (সাধনা, ১৯০৫ সাল); ১৩০৫ সালের ভারতী পত্রিকায় শ্রাবণ সংখ্যায় প্রসঙ্গ কথায় কবি হিন্দু জাতির বর্তমান রাষ্ট্রীয় অনৈক্য 'অন্ধ লোকাচার' প্রাদেশিকতা ধর্মীয় অনুষ্ঠান প্রমুখ বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে লেখেন। এছাড়া ১৩০৮ সালে 'নেশন কি' প্রবন্ধ, ১৩০৯ সালে চীনে ম্যানের চিঠি কিম্বা ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রবন্ধ লেখা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের সমাজ সচেতন এই মনের ছায়া 'চোখের বালি'তে বিশেষ পড়ে নি। 'চোখের বালি' প্রায় সম্পূর্ণভাবে মানব মনের বিচিত্র জটিল ও রহস্যময় শাখা প্রশাখার অনবদ্য উদ্ভাসনে সমৃদ্ধ। সমালোচকের মতে 'চোখের বালি' মানব মন বিশ্লেষণাত্মক

উপন্যাস এবং এর কাহিনীপট নগর জীবন। কলকাতাই এই উপন্যাসের পাত্রপাত্রীগুলির জীবন-নাটকের মূল অভিনয় স্থান। তৎসত্ত্বেও পারিবারিক জীবন-ভূমি গঠনে পুরোনো সামন্ততান্ত্রিক প্রথা-রীতির বিশেষ, প্রভাব এখানেও লক্ষণীয়। যেমন মহেন্দ্রর কলকাতার গৃহেও সাবেকি মতে মা কর্ত্রী। তার ছোট জা বা মহেন্দ্রর বিধবা কাকীমার মিলিত এই পরিবারে সাধারণ রমণীসুলভ ঈর্ষায় মহেন্দ্রর মা রাজলক্ষ্মী বিধবা দেবপত্নীর ওপর বিরূপ হতে থাকেন। তাঁর সূক্ষ্ম ঈর্ষাবোধ মহেন্দ্রর জন্য। তিনি ভাবেন তাঁর সন্তানকে ছোট জা বেশী অধিকার করতে চায়। এই বিরোধে শেষপর্যন্ত তার কাশীবাসী হওয়া। নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও পল্লী জীবনের সঙ্গে রাজলক্ষ্মীর সংশ্রব বিচ্ছিন্ন হয়নি। ছেলের প্রতি কিঞ্চিৎ অভিমানে সে গেছে দেশ গ্রামে বেড়াতে। এই দেশ গ্রাম থেকেই সে বিনোদিনীকে নিয়ে এসেছে নিজের সংসারে। পরবর্তীকালে বিনোদিনীই রাজলক্ষ্মীর সংসারে প্রবল ঝড় তুফানের সৃষ্টি করেছে।

বিনোদিনী গ্রামবাসিনী হলেও গ্রাম কন্যার স্বভাব যুক্তা নয়। সে স্বভাবে খাটি শিক্ষিতা, আধুনিক নগর জীবন চিহ্নিত মানসিকতার নারী। বিনোদিনীর জীবন বাসনাও সম্পূর্ণ আধুনিক যুগ সম্ভব আলোকপ্রাপ্তা নগরনন্দিনী মহেন্দ্র সঙ্গে তার উদ্দাম প্রেম বা বিহারীর প্রতি গভীর গোপন অনুরাগ দুটিই নাগরিক মানসিকতার প্রকাশক। কিন্তু পল্লীসমাজ একটি ক্ষেত্রে উপন্যাসে কিছুটা ভূমিকা নিয়েছে।

বিনোদিনীর প্রতি মহেন্দ্রর দুর্বার বাসনানুরাগ একরাত্রে মায়ের চোখের সামনে প্রকটিত হয়ে পড়লে বিনোদিনী একসময় নিজের ফেলে আসা পল্লীকালে ফিরে যায়। সেখানে তাকে যথাযথ পল্লী সমাজের নানাবিধ সমালোচনা ও কটূক্তির মুখে পড়তে হয়েছে। বিনোদিনী ও মহেন্দ্রর নামে কিছু কথা ইতিপূর্বে গ্রামে অস্পষ্ট ভাবে এসেছিল। কাজেই গ্রাম সমাজের কাছে সে তখন আর মিলতে পারে না। বরঞ্চ এই অধ্যায় প্রকৃত পল্লী সমাজের একটি খাঁটি চিত্র স্বল্প পরিসরে এঁকে তুলতে পেরেছেন। "বিনোদিনী প্রতিবেশিনীদের বাড়ীতে গেল। তাহারা....... পরস্পরে কী যেন ইশারায় কহিয়া বিনোদিনীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া মুক চাওয়া চাওয়ি করিল।........." বিনোদিনীর সঙ্গে তার গ্রাম জীবনের দূরত্ব নির্দেশ করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন— "বিনোদিনী তাহার পল্লী হইতে সর্বতোভাবে বহু দূরে গিয়া পড়িয়াছে, তাহা পদে পদে অনুভব করিতে লাগিল। স্বগৃহে তাহার নির্বাসন।" বিনোদিনী এখন সম্পূর্ণ নগরের মানুষ। ডাক পিওনের কাছে তার চিঠি পাবার আকুলতা প্রকাশে, নিজের হাতে বিহারীকে চিঠি লিখে ডাকে দেওয়ার ঘটনায় পুনশ্চ পল্লী সমাজ আলোড়িত হয়েছে, বিনোদিনী নিন্দিত হয়েছে। বিহারীর বদলে বিনোদিনীর পল্লী ভবনে আগমন ঘটেছে মহেন্দ্রর। ফলে এ ব্যাপারে পল্লীসমাজ বিনোদিনীকে আর ক্ষমা করে না। "পল্লীবৃদ্ধেরা চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া

কহিল, এ কখনোই সহ্য করা যাইতে পারে না। কলিকাতায় কি ঘটিয়াছিল তাহা কানে না তুলিলেও চলিত, কিন্তু এমন সাহস যে মহেন্দ্রকে চিঠির উপর চিঠি লিখিয়া পাড়ায় আনিয়া এমন প্রকাশ্য নির্লজ্জতা। এরূপ ভ্রষ্টাকে গ্রামে রাখিলে তো চলিবে না।" তার দিদিশাশুড়ী ভৎর্সনা করেছে—"বাছা এখানে তোমার থাকা হইবে না তাহা বলিতেছি। ....ছি ছি, আমাদের মাথা হেঁট করিলে, তুমি এখনই যাও। বিনোদিনীকে গ্রাম ত্যাগ করতে হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ গ্রাম ও শহরের পার্থক্যটুকু সামান্য কথায় বোঝাতে সমর্থ হয়েছেন। শহরে নানা ভ্রষ্টতা চলে ও চাপা পড়ে যায়, কিন্তু গ্রামে তা চলে না। কেননা, গ্রামে সমাজ নামক একটা অত্যন্ত সজীব ও ক্রিয়াশীল ব্যপার আছে। সেই সমাজবিধি অতি কঠিন। বিনোদিনীকে তাই গ্রাম ছেড়ে শহরে যেতে হয়। গ্রাম সমাজের নীতি নৈতিকতার নিয়মবদ্ধ বিনোদিনীর দিদিশাশুড়ী মহেন্দ্রকেও তীব্র ভৎর্সনা করতে দ্বিধা করেনি—"...........এ তোমার কী রকম ব্যবহার। ঘরে তোমার স্ত্রী আছে, মা আছে, আর তুমি এমন বেহায়া হইয়া উন্মত্ত হইয়া ফিরিছো! ভদ্র সমাজে তুমি মুখ দেখাইবে কি বলিয়া।" শহরের ভদ্র সমাজ বা প্রতিবেশীরা মহেন্দ্র বা বিনোদিনীকে এই ভর্ৎসনা করে না।

'চোখের বালি'র মত মানব মন প্রধান উপন্যাসে পল্লীসমাজের আর কোনো বিশেষ ভূমিকা নেই। তবে রবীন্দ্রনাথের বাস্তব নিষ্ঠা জীবনদৃষ্টি সম্মত সমাজ সেবার আদর্শ চেতনার পরিচয় বিহারী চরিত্রের মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট হয়েছে, কিন্তু বিহারী পল্লী সংস্কারব্রতী নয়। সে নাগরিক জীবনের পর্যুদস্ত সৈনিক দরিদ্র কেরানীদের 'চিকিৎসা ও শুশ্রূষার' জন্য বালিতে একটি বাগান কিনে সেখানে কুটির নির্মাণ করে তাদের "বনের ছায়াটুকু ও গঙ্গার খোলা হাওয়া দান করিবার সংকল্প করিল।"

বিধবা বিনোদিনীকে বিহারী তার নাগরিক জীবন চেতনায় বিবাহ করতে চেয়েছিল। কিন্তু বিনোদিনীর জীবন সংস্কারে পল্লী সমাজের প্রাচীন পন্থা ও গভীর ও ব্যাপক মূল হয়তো বিস্তৃত ছিল। তাই বিহারীর প্রস্তাবে সে রাজী হয়নি। "ছি ছি, একথা মনে করিতে লজ্জা হয়। আমি বিধবা, আমি নিন্দিতা, সমস্ত সমাজের কাছে আমি তোমাকে লাঞ্ছিত করিব, এ কখনো হইতেই পারে না। ছি ছি এ কথা তুমি মুখে আনিয়ো না।" সাবেকি সমাজচেতনাই প্রকাশ পেয়েছে।

নৌকাডুবি

রবীন্দ্রনাথের 'নৌকাডুবি' উপন্যাস ১৩১০ বৈশাখ থেকে ১৩১২ আষাঢ় পর্যন্ত মাসিক কিস্তীতে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। ইংরাজী ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ২রা

সেপ্টেম্বর গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

'নৌকাডুবি' ব্যক্তি সমস্যামূলক উপন্যাস। বর্তমান যুগপটে অভূতপূর্ব ঘটনা বিপর্যয়ে পরস্ত্রীকে নিজ স্ত্রী রূপে নেওযা এবং শেষ পর্যন্ত ভ্রান্তির অবসান। কিন্তু রমেশ নামক এই হতভাগ্য ব্যক্তিটি তার অনুরাগী রমণী শিক্ষিতা তরুণী হেমনলিনীর কাছে বিশ্বাস ভঙ্গের দায় থেকে বাঁচলেও তাদের মিলন উপন্যাসে দেখানো হয়নি। 'নৌকাডুবিতে পল্লীসমাজেব কোনো সমস্যা, আচার-সংস্কার-প্রথা নিয়েমের প্রগাঢ় প্রভাব দেখা যায় নি। ঘটনা কাহিনী শুরু হয়েছে কলকাতায়। শিক্ষিতা নবীনা তরুণী হেমনলিনীর সঙ্গে কলকাতায় বিদ্যার্জনে আগত রমেশের প্রণয় ও বিবাহ সংঘটনের সমস্ত ঠিক এমন বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু পুরোনো গ্রাম সমাজের মানসিকতায় রমেশের পিতা রমেশকে দেশে নিয়ে গিয়ে নিজের অভিরুচি অনুযায়ী বিবাহ দেন। বিবাহের পর ফিরবার পথে 'নৌকাডুবি' হয়ে রমেশের পিতা এবং শাশুড়ী মারা যান। রমেশ নিজের স্ত্রী ভ্রমে নলিন ডাক্তারের নববধূ কমলাকে উদ্ধার করে আনে। কিন্তু ভুল ভাঙলে তার মন পুনরায় হেমনলিনীর জন্য ব্যাকুল হয়। ঘটনাচক্রে রমেশ কমলাকে স্ত্রী পরিচয়েই গাজীপুরে নিয়ে বসবাস করে। ইতিমধ্যে রমেশের অজান্তে তার হেমনলিনীকে লেখা পত্র পাঠে কমলা প্রকৃত সত্য অবগত হয় এবং গৃহত্যাগ করে। শেষ পর্যন্ত নলিনের সঙ্গে তার মিলন হয়। হেমনলিনীও প্রকৃত সত্য জানতে পারে। কিন্তু তাদের পরিণতি ঔপন্যাসিক দেখান নি। আলোচ্য উপন্যাসের মধ্যে পল্লীর সমাজ মানস উকি মেরেছে রমেশের বিবাহ ঠিক করে তার পিতার একেবারে রমেশ ধরে নিয়ে এসে বিবাহ করানোর ঘটনায়। দ্বিতীয়ত নববধূ কমলাকে নৌকাডুবির জন্য গ্রাম 'সমাজ দায়ি মনে করে' 'অপয়া' বলে চিহ্নিত করেছে, নববধূকে বরণ করার কোনো চেষ্টাও রমেশের পিতৃগৃহে হয়নি।

'নৌকাডুবি' উপন্যাস রচনার সময় বিখ্যাত বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ গভীরভাবে যুক্ত হয়ে পড়েন। তাঁর বিভিন্ন রচনায় প্রবন্ধে তো বটেই সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী সহ তিনি বঙ্গভঙ্গ রোধের আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন। রাখী বন্ধন উৎসব রবীন্দ্রনাথেরই চিন্তার ফল।

'নৌকাডুবি' উপন্যাসে বহির্জগতের এই রুদ্রছায়া কোথাও পড়েনি। এই নরনারীর ব্যক্তিগত ঘটনা সংঘাতময় রোমাঞ্চকর জীবন কাহিনী, তবুও কিন্তু চরিত্র চিত্রণে বা ঘটনা পরিস্থিতিতে পল্লীর ভাবছায়া পড়েছে, যেমন কমলাকে পল্লীসমাজের প্রতিবেশিনীদের 'অপয়া' আখ্যা দেওয়া জন্মাবধি পিতার মৃত্যুর জন্য অলক্ষুণে আখ্যা পাওয়া ইত্যাদি। কমলা চরিত্রের মধ্যে পল্লী জীবনাশ্রিতা নারী মূর্ত্তির রূপ পরিস্ফুটিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের নারী চরিত্রের ধারাতেই কমলা চরিত্রটি গড়ে উঠেছে। জন্মাবধি সে নিজেকে অপয়া জানে। বিবাহের পর

'নৌকাডুবি' হলে তার ধারণা আরও দৃঢ় হয়। বিশেষত রমেশের ব্যবহারের সে অর্থ না বুঝে পেলেও গাজীপুরে যাত্রার নদী পথটিতে তার গৃহ রচনার প্রচেষ্টা অনার্য উমেশকে কাছে রেখে লালন করা। উমেশের মুখের মা ডাক তার সেই পল্লী জীবনাশ্রিতা নারী মনকে সন্তুষ্ট করে। কমলার কাছে জীবনের ভ্রান্তি ধরা পড়ে যাওয়ার পর বেঁচে থাকা দায় হয়েছে। শেষ পর্যন্ত বহু জটিল ঘটনা জালের গ্রন্থি ছিন্ন করে কমলা তাব বঞ্চিত স্বর্গ, প্রকৃত স্বামী নলিনীকে খুঁজে পেয়েছে ও তার স্বীকৃতি ও প্রণয় লাভ করেছে। গাজীপুর যাত্রার সময়কালীন কমলাদের সঙ্গে যে চক্রবর্ত্তী খুড়ার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তিনি বাংলার পুরোনো পল্লীকেন্দ্রিক সমাজ পদ্ধতির ধারক। তিনি এই গ্রাম্য আন্তরিকতায় কমলার খুড়োতে পরিণত হয়েছেন। নিজগৃহে আশ্রয় দান করে তার সংসারটির একটি সুস্থ সুন্দর চিত্ররূপ দিতে চেয়েছেন। চক্রবর্তী খুড়োর স্নেহময়ী ভগ্নীস্বরূপা, নলিনীর মা ক্ষেকংকরী বাংলার পুরোনো পল্লী সমাজ জীবনের মধ্যস্থলে স্থিতা এক অপরূপ মাতৃমূর্ত্তি। আলোচ্য উপন্যাসে গ্রাম্য খলতাও নীচাশয়তার প্রতীক চরিত্র অক্ষয়, অন্যদিকে গৃহ-বিচ্যুতা কমলাকে গঙ্গাতীরে থেকে উদ্ধার কর্ত্রী প্রৌঢ়া নবীন কালীর স্বভাবে গ্রাম্য স্ত্রীলোকের মানসিকতা লক্ষণীয়। সে অসহায় কমলাকে উদ্ধার করেছে কিন্তু স্বার্থবুদ্ধির দ্বারা চালিত হয়ে। বিনা বেতনে পাচিকা ব্রাহ্মণী লাভ করার জন্যই কমলাকে আশ্রয় সে দিয়েছে। এই রমণীর আচার ব্যবহারের স্থূলত্ব কমলার মত সরলও নিরুপায় নারীর পক্ষে অসহ্য হয়েছিল। ঔপন্যাসিক বর্ণনা দিয়েছেন ঃ "নবীন কালীর আশ্রয়ে কমলার প্রাণটা যেন অল্পজল এঁদো পুকুরের মাছের মতো ব্যাকুল হইয়া উঠিতে লাগিল।" ভারতীয় নারীর সতীত্বেব আদর্শ অনুযায়ী কমলা তার নিরুদ্দেশ স্বামী নলিনাক্ষকেই একান্তভাবে চেয়ে যে ব্যাকুলতায় কাশী থাকতে চেয়েছিল নবীন কালীর তা বোঝার সাধ্য ছিল না। তবে তাদের সঙ্গে যাওয়ার পথে মোগলসরায় স্টেশান আকস্মিকভাবে উমেশের সঙ্গে কমলার দেখা হয়ে যাওয়ায় তার জীবনগতি এক সুষ্ঠ সুন্দর পরিণতির পথে মোড় নিয়েছে। ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী তাঁর কন্যা শৈল, কমলার পথে পাওয়া পুত্রসম উমেশ এদের সরল সুন্দর উদার চিত্ততার পাশে নবীন কালীর চিত্ত কালিমা গাঢ়তর হয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

নৌকাডুবির মধ্যে পুরোনো পল্লীসমাজ জীবন চিন্তার ছাপ কমলার জীবন পরিবর্তনের প্রবাহ বিশেষ নেই। কেননা, পরকে আপন করার প্রীতিমন্ত্র যা ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী বা শৈল বা উমেশ অথবা কমলার নিজের ছিল তার ঠিক গ্রাম সমাজের পাক্ষে অভাবিত। বিশেষত নিরুদেশ কমলাকে পুনশ্চ গ্রহণ করার মধ্যে আধুনিক মনের পরিচয়টিই বেশী স্পষ্ট। যাইহোক, মানুষের জীবন কাহিনীর জটিল ও বিচিত্র পক্ষী রানা করতে রবীন্দ্রনাথ এ উপন্যাসে পল্লী-চেতনার যতটুকু প্রকাশ

ঘটিয়েছেন তা স্বাভাবিক ভাবেই উপন্যাসে এসেছে। অতিরিক্ত কোনো বিশেষ মূল্য তার নেই।

গোরা

'গোরা' উপন্যাসের রচনাকাল ১৩১৪ সালের ভাদ্র মাস থেকে শুরু হয়ে ১৩১৬ সালের ফাল্গুন মাস পর্যন্ত সময়কাল। প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য কীর্ত্তির অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফসল 'গোরা'কে বাংলা সাহিত্যের প্রথম পূর্ণাঙ্গ মননশীল উপন্যাস আখ্যা দেওয়া হয়েছে। মননশীলতার সঙ্গে সঙ্গে তত্ত্বসমস্যার ব্যাপকতায় 'গোরা' এক অনন্য উপন্যাস। এখানে ধর্ম-রাজনীতির তীব্র বিতর্ক, সূক্ষ্ম মনন এবং নরনারীর প্রেম-চেতনার আবেগ এক চমৎকার সমন্বিত রূপ পেয়েছে। আধুনিক যুগের বিশ্ব-জনীন ভাবচেতনার উদার পরিশুল এখানে দৃষ্ট হয়েছে। গ্রাম্যতা বা সংকীর্ণতার ক্ষুদ্র চেতনা এর ঔদার্যের মধ্যে অংশ নিতে পারেনি। কিন্তু পল্লীগ্রাম বিষয়ক চিন্তা যা রবীন্দ্রনাথের প্রথম তারুণ্যের সময়কাল থেকেই বিভিন্ন পত্রে, প্রবন্ধে রচনায় আমরা উৎসারিত হতে দেখেছি, সেই চেতনার স্পষ্ট রূপমূর্ত্তি অত্যন্ত সফলভাবে 'গোরা' উপন্যাসের চরিত্র ও কাহিনীর বিকাশের প্রয়োজনে গৃহীত হতে দেখেছি।

১৩১৪ থেকে ১৩১৬ বাংলা সালের সময়কালে রবীন্দ্রনাথ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে নিজেকে ঠিক সরিয়ে রাখতে পারেননি। দ্বিতীয় বার বিলেত থেকে আড়াই মাস কালের ভ্রমণ শেষে দেশে ফিরে (১৮৮০ ফেব্রুয়ারী) আসবার পর থেকে রাষ্ট্রিক, সামাজিক, নতুন-পুরাতন ও প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের আদর্শগত বিচার বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে কবির স্বদেশ চিন্তার যথার্থ রূপায়বব গড়ে উঠতে থাকে। সমকালীন ব্রিটিশ রাজত্বের নানা অবমাননা, দেশবাসীর প্রতি লাঞ্ছনা, দেশের ক্রমাগত অবক্ষয় কবিকে ক্রমশ বাস্তব জীবনমুখী করে তুলছিল। দেশের যথার্থ মঙ্গলের জন্য চাই সামগ্রিক সাধারণ জনসমাজের সচেতনতা আত্মবোধের জাগরণ। সে জন্য ভারতবর্ষের যা হৃদপিণ্ডতুল্য সেই পল্লীসমাজের ব্যাপক পুর্ণগঠন একান্ত অবশ্যক। এই ভাবনাটি দৃঢ়ভাবে কবি একটির পর একটি পত্রে, প্রবন্ধে, রচনায় ও বক্তৃতায় দেশবাসীকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে 'হাতে কলমে' (ভারতী, ১২৯১, আশ্বিন) প্রবন্ধটির উল্লেখ অধিকাংশ সমালোচক করেছেন এবং সেখান থেকে কবির বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন, কেননা, এই প্রবন্ধ থেকেই কবির গ্রামসেবার আদর্শের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব বোধটি প্রথম স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে ঃ "আমরা যখন স্বদেশীয় বিপন্নদের সাহায্য করিতে অগ্রসর হইব তখন আমাদের আর এক মহৎ উপকার হইবে। তখন আমাদের দেশের লোক স্বদেশ কাহাকে বলে বুঝিতে পারিবে। ... সেই জন্যই বলিতেছি যদি স্বদেশপ্রেম শিক্ষা

দিতে হয় তবে সে পিতামহদের উল্লেখ করিয়া সিন্ধু হইতে ব্রহ্মপুত্র বিকম্পিত করিয়া বেড়াইতে হইবে না। হাতে কলমে এক একজন করিয়া স্বদেশীদের সাহায্য করিতে হইবে।" (হাতে কলমে, ভারতী ১২৯১ আশ্বিন পৃ: ২৩৩-৩৪)

কবির স্বদেশ চেতনার এই বিশেষ দৃষ্টিকোণ ক্রমশ নিজের জীবনেও হাতে কলমে সম্পাদনের মাধ্যমে সার্থক হয়ে উঠেছিল। পূর্ববর্তী আলোচনায় সেই দিকটি বারবার তুলে ধরা হয়েছে। ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে দেশব্যাপী যে বিরাট আন্দোলন গড়ে ওঠে কবি তাতে সক্রিয় ভাবেব যুক্ত হন। এই সময়েও তিনি দেশ গড়ার কথায় সর্বপ্রথম পল্লী সংস্কারের দিকেই নিজের মুখ্য প্রবণতার কথা প্রকাশ করেছেন। স্বাবলম্বন বৃত্তি, জনসংহতি ও ঐক্যবদ্ধ কর্মপ্রচেষ্টার দ্বারা দেশকে সবদিক থেকে আত্মনির্ভরশীল করে তুলতে হবে এই গণজাগরণের জন্য বাউল, ভাটিয়ালি, সারি প্রভৃতি দেশের একান্ত লোক জীবনের সুরেই স্বদেশী গান বেঁধেছিলেন। মূলত দেশের শিক্ষা-সংস্কার ও পল্লী সঞ্জীবনের কথাই তিনি বার বার বলেছেন, এই ছিল দেশ গঠনে তাঁর মুখ্য পথ নির্দেশিকা।

এই গঠনমূলক চেতনা তাঁর হৃদয়কে অধিকার করে থাকলেও, তাঁর সাহিত্য কর্মে পল্লীসমাজের বা পল্লী মানুষের জীবন-ভাবনা এক প্রথম জীবনের সার্থক ছোট গল্পগুলির কিছু অংশ ছাড়া এবং মানসী, সোনারতরী, চিত্রা, চৈতালী কাব্য যুগের কিছু করিতা ব্যতীত উপন্যাস বা নাটকে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেনি। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি অসমাপ্ত প্রথম উপন্যাস 'করুণা' থেকে 'বউঠাকুরাণীর হাট', রাজর্ষি, চোখের বালি, নৌকাডুবি প্রায় প্রতিটি উপন্যাসেই কাহিনী ও চরিত্রের প্রয়োজনে পল্লী বাংলার সমাজ সামান্যতম হলেও কিছু ভূমিকা গ্রহণ করেছে। কিন্তু 'গোরা' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ চেতনার এই নিগূঢ় অন্তর্দৃষ্টি তাঁর বিশ্বমানবতা বোধের অতলান্ত মহাসমুদ্রের মধ্যেও এক বিশিষ্ট মর্যাদায় দাঁড়িয়ে রয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ অন্যান্য পল্লীসমাজ বা পল্লীজীবন কেন্দ্রিক উপন্যাস রচনাকারী লেখক ঔপন্যাসিকদের মত পল্লীসমাজকে উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দু করে তোলেননি বটে, কিন্তু পল্লীবিষয়ক ভাবনার সারভূতরূপ মূর্তি বদ্ধ হয়ে পাঠককে গভীরভাবে ভাবিত করে তুলেছে 'গোরা' উপন্যাসে ১৩১৬ সালে 'গোরা' উপন্যাস সমাপ্ত হয়েছে। কবি ১৩১১ সালে 'বিজয়া সম্মিলন' প্রবন্ধে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সমস্ত বাঙালীর প্রাণশক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করার কথা ঘোষণা করেছেন। 'ব্যাধি ও প্রতিকার' (প্রবাসী ১৩১৪ শ্রাবণ) প্রবন্ধে দেশীয় সম্পর্ক হিন্দু মুসলমানের জাতি বিদ্বেষের বিরুদ্ধে লিখেছেন 'আমরা জানি, বাংলাদেশের অনেক স্থানে এক করাশে হিন্দু-মুসলমান বসে না। ঘরে মুসলমান আসিলে জাজিমের এক অংশ

তুলিয়া দেওয়া হয়। হুঁকার জল ফেলিয়া দেওয়া হয়...." তিনি এই প্রবন্ধেই পল্লীর প্রকৃত অবস্থার সঙ্গে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের প্রত্যক্ষ বাস্তব পরিচয় না থাকার ফলে তথা পল্লীর মানুষের সঙ্গে নগরবাসীর হৃদয় বন্ধন গড়ে না ওঠার ফলে রাজনৈতিক আন্দোলনে নেতাদের আহ্বানে পল্লীর মানুষ সাড়া দেয়নি। একথা লিখতে দ্বিধা করেননি। সাধারণ পল্লীর মানুষই দেশের মূল শক্তি। এই পল্লীর জাগরণ ঘটাতে হবে। গ্রামে গ্রামে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটাতে হবে গ্রামবাসীদের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা প্রীতির সম্পর্ক নিয়ে।

রাজনীতি থেকে নানা কারণে সরে এলেও দেশের পল্লীর বিবিধ সমস্যা, দুঃখ, দৈন্য কবিকে নিরন্তর পীড়া দিয়েছে। গ্রামের চাষীদের সর্ববিধ শোষণ, তাদের মর্মান্তিক জীবনবেদনা কবি অনুভব ও লিপিবদ্ধ করেছেন বার বার। কবি আহ্বান জানিয়েছিলেন একদল নিঃস্বার্থ শিক্ষিত যুবককে যারা গ্রামে গ্রামে জ্বেলে দেবে আলোর প্রদীপ; আশা দিয়ে ভরসা দিয়ে, শিক্ষা, জ্ঞান, স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক দুরবস্থা থেকে তাদের উঠিয়ে আনবার সাধনা করবেন। 'বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলী'তে পঠিত কর্মযজ্ঞ (১৩২১) পল্লীর উন্নতি প্রবাদ (১৩২২) এবং কবি আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন। অতুল সেন নামে এক শিক্ষিত যুবক তাঁর সঙ্গী দল সহ।

'গোরা' উপন্যাসে (১৩১৪-১৬ বাংলা সাল) রবীন্দ্রনাথের এই পল্লীসমাজ চিন্তা অনবদ্যভাবে রূপমূর্ত্তি নিয়েছে গোরার পল্লী দর্শনের বিস্তৃত বিরণের মাধ্যমে। মূলত 'গোরা' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ গোরা চরিত্রের মানসিকতার বিবর্ত্তন দেখিয়েছেন। সে জাত-পতি বন ভেদ রক্ষাকারী প্রবল নিষ্ঠাবান হিন্দু সন্তান হিসেবে নিজেকে তৈরি করেছে। মা আনন্দময়ীর দাসী 'লছমনিয়া'র হাতে জল খেতে তার আপত্তি। সেই গোরা উদার বিশ্বমানবতার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়েছে উপন্যাসের শেষে। "আমি আজ ভারতবর্ষীয় আমার মধ্যে হিন্দু-মুসলমান খৃষ্টান কোনো সমাজের কোনো বিরোধ নেই। আজ এই ভারতবর্ষের সকল জাতই আমার জাত. সকলের অন্নই আমার অন্ন।"

এই সুমহৎ জীবনবোধ গোরা উপন্যাসের মূল সুর হলেও রবীন্দ্রনাথ নাগরিক জীবন পট ছাড়াও বৃহৎ জনজীবনের বাস্তব চিত্র এই উপন্যাস রচনা করে এর মূল্য বর্ধিত করেছেন। গোরার জীবনসাধনায় অতি প্রাসঙ্গিকভাবে এসেছে গ্রামবাংলার সাধারণ বাঙালী সমাজের দুঃখ দারিদ্র, অশিক্ষা, কুসংস্কারের জ্বলন্ত বাস্তব চিত্র।

গোরার কারাবাসের মূলে আছে তার তীব্র স্বদেশানুরাগ। সূর্যগ্রহণ উপলক্ষে ত্রিবেনীতে গঙ্গা-স্নানযাত্রা ও তার শাস্ত্র বিহিত ধর্মানুষ্ঠানের প্রতি একান্ত নিষ্ঠা গোরার চরিত্রে প্রকাশিত হলেও এই স্টীমার যাত্রায় মূঢ়-অশিক্ষিত তীর্থযাত্রীদের

প্রতি স্টীমারের মাঝি-মাল্লা থেকে শুরু করে উচ্চশ্রেণীর স্বদেশী ও সাহেব আরোহীর মর্মান্তিক অবজ্ঞা, দেশের জনসাধারণের দুর্দশায় তাদের হৃদয়হীন আত্মপ্রসাদ বোধ গোরার চেতনায় যে প্রবল প্রতিবাদ সৃষ্টি করেছিল, রবীন্দ্রনাথের দেশ চিন্তার তা প্রতিফলক। গোরার ভর্ৎসনায় সাহেব লজ্জিত হলেও দেশী সাহেবের চৈতন্য উৎপাদন হয়নি। এইটিই গোরার মনে তীব্র জ্বালা সৃষ্টি করেছে। গোরার বস্তিকামী নিম্নশ্রেণীর লোকেদের সঙ্গে হৃদ্রতা স্থাপনের চেষ্টা, ছুতোরের ছেলে প্রাণশক্তিতে পূর্ণ, গোরার প্রিয় পাত্র নন্দের শোচনীয় অকাল মৃত্যু হল অশিক্ষা ও কুসংস্কারের ফলে। জনৈক চেনপরা বাবুর এক মুসলমান খানসামাকে জুড়িগাড়ি থেকে চাবুক মারা ও ধাক্কা দেওয়ার ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছে গোরা। এছাড়া আছে চরঘোষপুরের ঘটনা। সেখানে প্রজাদের ওপর নীলকর সাহেব ও পুলিসের অত্যাচার এবং দেশের বিচারকদের অবিচারের নির্মম কুটিলতা। 'গোরা' উপন্যাসে তার জেষ্ঠাভ্রাতা মহিম চরিত্রের মধ্যে পুরোনো পল্লীজীবন কেন্দ্রিক বাঙালী সমাজ মানসের প্রতিরূপ পাওয়া গেছে। গার্হস্থ্য জীবন সুখী ও সংসারী সন্তুষ্ট আত্মকেন্দ্রিক বাঙালী জীবনচেতনার প্রতিফলন তার কথায় ও আচরণে প্রস্ফুট। গোরার সঙ্গে বিনয়ের বন্ধুত্বের সুযোগে সে বিনয়কে নিজ কন্যার উপযুক্ত জামাতা হিসাবে নির্বাচন করে নিয়েছে।

সুচরিতার মাসী এবং তার দেবর এ দুটি এই উপন্যাসের খাঁটি পল্লীচরিত্র। গোরাতে মুখ্যত একটি প্রগতিশীল ব্রহ্ম পরিবার ও একটি সমৃদ্ধ হিন্দু পরিবারের নাগরিক জীবন পটাশ্রিত চিত্র নির্মাণ হয়েছে এবং এই উপন্যাস মহৎ ও গভীর জীবনবোধ, প্রেম ও দেশ চেতনা তথা বিশ্ব-মানবতা বোধর অতি উচ্চ ভাব প্রবাহ সঞ্চারিত হয়েছে। তথাপি, গোরা যেমন বঙ্গপল্লীর ক্ষুদ্র বিন্দুতে সিন্ধু দর্শন করেছে, তেমনি সুচরিতার মাসী হরমোহিনী এবং তার দেবর কৈলাসের ভূমিকা নির্মাণ করেও গ্রামবাংলার সাধারণ নরনারীর একটি সাধারণ পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন।

হরিমোহিনী ও তার কন্যা মনোরমার দুর্ভাগ্যের উপকাহিনী তৎকালীন পল্লীর সামাজিক রীতিনীতি ও নারীদের দুর্দশার চিত্র হিসেবে গ্রহণ করা যায়। গোরার কারামুক্তির পর কলকাতার উপকণ্ঠে পল্লী ভ্রমণের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সমকালীন গ্রাম বাংলার মর্মান্তিক অবক্ষয়কে চিত্রিত করেছেন। কলকাতা কেন্দ্রিক বাংলার নবজাগরণের পাশে দেশের মূল ভু-খন্ডের দরিদ্র অশিক্ষিত কুসংস্কার পীড়িত বৃহত্তর জনতার 'যথার্থ পরিচয়টি অত্যন্ত জীবন্ত করে তুলেছেন রবীন্দ্রনাথ। এই গ্রাম পরিভ্রমণে গোরার চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়েছে হিন্দু সমাজের সমস্ত জাতিভেদ ও খুঁটিনাটি নিয়ম পালনের অন্তর্নিহিত দুর্বলতাগুলি। পল্লীবাসীদের সম্পূর্ণ অভাবাত্মক জীবনদৃষ্টি, সার্থক কর্মপ্রেরণা ও সংঘশক্তির সুস্থ প্রয়োগের

একান্ত অভাব গোরা তথা পাঠকের সামনে যথার্থ বাংলাদেশের খাঁটি অন্তরঙ্গ রূপটিকে প্রতিফলিত করে দিয়েছে।

পাশাপাশি ফরু সর্দ্দারের ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো এবং প্রবল প্রতিরোধ করার চিত্রবর্ণনায় রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন মুসলমান সমাজের সমপ্রাণতা এবং সমস্যা সমাধানের জন্য ঐক্যবোধ। হিন্দু-সমাজের নিষ্ক্রিয়তা ও বিচ্ছিন্নতার সম্পূর্ণ বিপরীত চর-ঘোষপুরের মুসলমান প্রজারা এবং তাদের প্রধান ফরুসর্দার। তাদের কার্যধারার মাধ্যমে কবি যেন দেশবাসীকে তার যথার্থ ও প্রকৃত উন্নয়নমুখী পথধারার সন্ধান দিয়েছেন। "অন্য সমস্ত প্রজা বশ মানিয়াছে, কেবল এই চর-ঘোষপুরের প্রজাদিগকে সাহেবরা শাসন করিয়া বাধ্য করিতে পারে নাই। এখানকার প্রজারা সমস্তই মুসলমান এবং ইহাদের প্রধান ফরুসর্দ্দার কাহাকেও ভয় করে না। নীলকুঠির উৎপাত উপলক্ষে দুইবার পুলিশকে ঠেঙাইয়া সে জেল খাটিয়া আসিয়াছে, তাহার এমন অবস্থা হইয়াছে যে, তাহার ঘরে ভাত নাই বলিলেই হয়, কিন্তু সে কিছুতেই দমিতে জানে না। ....নীলকুঠির ম্যানেজার সাহেব স্বয়ং আসিয়া লাঠিয়ালসহ প্রজার ধান লুঠ করে। সেই উৎপাতের সময় ফরুসর্দ্দার সাহেবের ডান হাতে এমন এক লাঠি বসাইয়াছিল যে ডাক্তারখানায় লইয়া গিয়া তাহার সেই হাত কাটিয়া ফেলিতে হইয়াছিল। এত বড়ো দুঃসাহসিক ব্যাপার এ অঞ্চলে আর কখনো হয় নাই।"— উল্লেখ করতে ইচ্ছে করে, ফরুসর্দ্দারের সঙ্গে দীনবন্ধু মিত্রের বিখ্যাত 'নীলদর্পণ' নাটকের তোরাপ নামক চরিত্রটির প্রকৃতিগত সাদৃশ্য অনেকখানি। দুজনেই গ্রামবাংলার উৎপীড়িত চাষী। প্রকৃতপক্ষে 'গোরা' উপন্যাসের ছাব্বিশ অধ্যায়ের সিংহভাগ জুড়ে রবীন্দ্রনাথ এঁকে রেখেছেন সমস্যা ও কুসংস্কার পীড়িত শোষিত, বঞ্চিত বঙ্গপল্লীর প্রতিচ্ছবি।

রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য উপন্যাসের মধ্যে পল্লীবাংলার সমাজ অধিক প্রকট 'ঘরে-বাইরে' রচনায়। পটভূমি ও পারিপার্শ্বিক চিত্র হিসেবেই সেখানে গ্রামবাংলার অবস্থান। 'যোগাযোগ' উপন্যাসে গ্রামবাংলার ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততান্ত্রিক অবস্থার চিহ্ন রয়েছে বিপ্রদাসের জীবন-অবস্থানে। কিন্তু এ দুটি উপন্যাসের মূল বিষয় মানব-হৃদয়ের জটিল সমস্যা ও তার বক্রগতি চিত্রণ। সুতরাং সেখানে পল্লী-সমাজচিত্র বা পল্লী-ভাবনার অন্বেষণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়
শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে পল্লীসমাজ

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বেনামীতে লেখা 'মন্দির' নামক গল্পটি 'কুন্তলীন' পুরস্কার পেয়ে (১৩০৯ সাল) প্রসংশিত হ'লেও শরৎচন্দ্রকে বাংলা সাহিত্য সম্পূর্ণ করে পেয়েছে তাঁর 'বড়দিদি' রচনার মারফৎ। এটি 'ভারতী' পত্রিকায় ১৩১৪ সালের বৈশাখ থেকে আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত হয় এবং গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয় ১৩২০ সাল ইং ১৯১৩ খ্রীঃ ৩০শে সেপ্টেম্বর। 'বড়দিদি' রচনার মাধ্যমেই শরৎচন্দ্রের স্থান বাংলা কথাসহিত্যে দৃঢ়মূলভাবে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে যায়। অসামান্য জনপ্রিয়তা তিনি অচিরাৎ লাভ করেন। সাধারণ বাঙালী পাঠক থেকে শুরু করে সমকালালীন মহৎ মনীষাযুক্ত ব্যক্তিরাও তাঁর লেখাকে সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি দান করেন।

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের সংখ্যা উপন্যাস-প্রায় বড় গল্প সহ পঁয়ত্রিশটির (শ্রীকান্তের চারটি পর্ব যুক্ত করলে) মত। এই রচনাগুলির সঙ্গে তাঁর অসামান্য গল্প 'মহেশ' ইত্যাদিও তাঁকে বাংলা কথা সাহিত্যে অদ্যাবধি সম্ভ্রম ও ভালবাসার আসনে বসিয়ে রেখেছে। শরৎচন্দ্রের অধিকাংশ বড় গল্প এবং উপন্যাসগুলির জীবন পট হিসেবে গৃহীত হ'য়েছে বঙ্গ পল্লীর সমাজ। তার উপন্যাসের জীবন বৃত্তের মূল কেন্দ্রবিন্দু হ'ল পল্লীজীবন। কখনো তা সরাসরি কাহিনীর মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে, কখনো গৌণত পরোক্ষভাবে তার ভিত রচনা করেছে। তাঁর উপন্যাসের এই পল্লীসমাজের বিচিত্র চিত্রণ-ই এই আলোচনার মূল উপপাদ্য। সেই সঙ্গে শরৎচেতনায় পল্লীর জীবন ও সমাজ যে কিভাবে কতদূর প্রসারিত ছিল, তার বিশ্লেষণেরও যথাসাধ্য প্রচেষ্টাই করা হচ্ছে এখানে।

শরৎচন্দ্রের মানসে তাঁর পূর্ব ও সমকালীন সাহিত্য প্রভাবের একটি রেখাঙ্কন

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর অসামান্য শিল্প প্রতিভায় বাংলা সাহিত্যে খাঁটি উপন্যাসের যে ধাবাটি সৃজন করেছিলেন, সেখানে প্রাচীন পন্থা তথা চেতনার রক্ষনশীলতার বিশেষ স্থান ছিল। উনবিংশ শতকের শেষার্ধ থেকে বিংশ শতকের বাংলা কথা সাহিত্যে এই ভাবাদর্শই অনুকৃত হচ্ছিল প্রধান ভাবে। শরৎচন্দ্র নিজের সম্পর্কে বলেছেন, তিনি ছিলেন বঙ্কিমের 'অন্ধ' অনুসারী। "এই বার খবর পেলাম

বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর। উপন্যাস সাহিত্যে এর পরেও যে কিছু আছে, তখন ভাবতেও পারতাম না।...অন্ধ অনুকরণের চেষ্টা না করেছি যে নয়। লেখার দিক দিয়ে সেগুলো একেবারে ব্যর্থ হ'য়ে গেছে, কিন্তু চেষ্টার দিক দিয়ে তার সঞ্চয় মনের মধ্যে আজও অনুভব করি।" (জয়ন্তী উৎসর্গ, পৌষ ১৩৩৮—শরৎ সাহিত্য ও সমসাময়িক কাল—গোপীনাথ রায়চৌধুরী, শরৎসাহিত্যের ভূমিকা গ্রন্থের ৫৪ পৃ. দ্রষ্টব্য)।

শরৎচন্দ্রের কৈশোর বা যৌবনের প্রথমকালের সাহিত্যে বাস্তবিক বঙ্কিমের গভীর প্রভাব আছে। শুধু তাই নয়, বঙ্কিমচন্দ্রের পারিবারিক-সামাজিক অখণ্ড আদর্শবাদের ধারণা তাঁর চেতনায় সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর তলে শেকড় বিস্তারিত করেছিল। এই বিস্তর তাঁর সমস্ত জীবনের সাহিত্য সাধনাতেই লক্ষ্যে অলক্ষ্যে ঘটেছিল।

কিন্তু ভারতবর্ষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক দিক থেকে যে বিপুল পরিবর্তন বিংশ শতকের গোড়া থেকে বাঙালীর জীবনবোধে যা দিয়েছিল, সাহিত্যেও তার ছায়াপাত ঘটেছিল। রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রাচীন ভাবধারা ত্যাগ করে তাঁর সুগভীর মনীষা ও নবদৃষ্টির আলোকপাতে বাংলা উপন্যাসে পৃথক রসলঙ্কার করলেন। অলীক রোমান্স ও নীতিবাদী রক্ষণশীলতা বর্জন করেন, নরনারীর চেতন-লোকের বিচিত্র ক্রিয়াকলাপ ও রহস্যময় গতি-প্রকৃতিকে উপন্যাসে প্রকাশ্য ও প্রধান করে তুলে ব্যক্তি জয়ধ্বনি ওড়ালেন সমাজ-চেতনার ওপর। তাঁর 'নষ্টনীড়' (১৩০৮) ও 'চোখের বালি' (১৩০৮-৯) তে ব্যক্তির 'কামনা বাসনার মধ্যে সামজ নিরপেক্ষ ভাবের পরিচয়' পাওয়া গেল। শরৎচন্দ্র বিশেষভাবে 'চোখের বালি'র মত উপন্যাস ভাবনা দ্বারাও অনুপ্রাণিত হন। তাঁর নিজের কথায় ঃ "ভাষা ও প্রকাশভঙ্গির একটা নূতন আলো এসে যেন চোখে পড়ল।... কোন কিছু যে এমন করে বলা যায় অপরের কল্পনার ছবিতে নিজের মনটাকে যে পাঠক এমন চোখ দিয়ে দেখতে পায়, এর পূর্বে কখন স্বপ্নেও ভাবিনি। এতদিনে শুধু কেবল সাহিত্যের নয়, নিজেরও যেন একটা পরিচয় পেলাম।" (ঐ , জয়ন্তী উৎসর্গ, সূত্র ঃ দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলার কথা সাহিত্য, গোপীনাথ রায়চৌধুরী, পৃ. ১৩৬)

এছাড়াও রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাসেও ইতিমধ্যে ধ্বনিত হয়েছিল জাতি-ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায়ে গত ভেদহীনতার বাণী অখণ্ড জাতীয়তাবোধযুক্ত দেশপ্রেম ও মনুষ্যত্ব বোধের গভীর উচ্চারণ। এছাড়া ছিল শরৎচন্দ্র সমকালীন ভারতী পত্রিকা গোষ্ঠীর প্রভাব, ঊনবিংশ শতকের শেষ পর্ব থেকেই 'ভারতী' পত্রিকার (১২৯৪ থেকে ১৩৩৩ বাংলা সাল) উদ্ভব। শরৎচন্দ্রের বাংলা সাহিত্যে প্রকাশ্যে যোগদানের সময় 'ভারতী' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্র স্নেহচ্ছায়া

পুষ্টও মোটামুটি রবীন্দ্রকুমারী এক লেখকগোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। কিন্তু সৌরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মনিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী প্রমুখ ভারতী গোষ্ঠীর তরুণ লেখক বৃন্দ রুষ বা অন্যান্য পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য (জাপানী) ভাষা থেকে আধুনিক প্রগতিশীল চিন্তাধারার গ্রন্থানুবাদ মারফৎ কিম্বা 'পতিতা' ইত্যাদি সমাজ নিন্দিত চরিত্র-অবলম্বনে অথবা নরনারী প্রেম সম্পর্কের নব মূল্যায়ণের দ্বারা তৎকালে বাংলা সাহিত্যে অভিনবত্ব সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছিলেন। এই 'ভারতী' গোষ্ঠীর সঙ্গেও শরৎচন্দ্রের সাহিত্যিক জীবনের প্রথম পর্বে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের সাক্ষ্য এই পত্রিকার তাঁর 'বড়দিদি' লেখাটির প্রকাশ।

কিন্তু শরৎচন্দ্র সম্পূর্ণভাবে বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ বা পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য চেতনা পুষ্ট নব্যভাবধারার রোমাঞ্চ রস সিক্ত 'ভারতী' সাহিত্য গোষ্ঠীর কোনো একটি পথকে নিজের সাহিত্য চেতনার মূল ভিত্তি করেননি। বরং বলা যায়, বঙ্কিম সৃষ্ট সামাজিক-পারিবারিক আদর্শায়িত উনিশ শতকীয় দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে নব ভাবনার উত্তরণ প্রয়াসকে মিশিয়ে এক নতুন ও স্বতন্ত্র সাহিত্য লোক নির্মাণ করলেন তিনি। একথা অনস্বীকার্য, শরৎচন্দ্র বাংলা উপন্যাসের যে নবদিগন্ত খুলে দিলেন, সেখানে মূল ভূমিকা নিয়েছে বাংলার পল্লীসমাজ। বঙ্গ পল্লীর ম্লান-বিধুর মুখশ্রী, তার দুঃখ পীড়িত সাধারণ নরনারীর জীবনচিত্র, তার সামাজিক দায়, আচার বিচার, সংস্কার-কুসংস্কার রীতিপ্রথা যুক্ত বিন্যাস,—তার ভালমন্দ সমস্তই এই দরদী লেখকের কলমে আশ্চর্য জীবন্ত হ'য়ে উঠেছে। আর, আরও সচেতনভাবে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, শরৎচন্দ্রের মানস লোক দৃঢ়ভাবে বাংলা তথা ভারতীয় পল্লীজীবন ভিত্তিক প্রাচীন, সামাজিক ও পারিবারিক মূল্যবোধের দিকেই অধিকতর সহানুভূতিশীল।

অবশ্যই শরৎচন্দ্র রক্ষণশীল লেখগোষ্ঠীর প্রাচীন জীবনদাদর্শ বা নীতিবোধকে নির্বিচারে গ্রহণ করেননি। পূবর্তন সমাজ বিন্যাস ও জীনধারার প্রতি তাঁর গভীর আকর্ষণ ছিল। তিনি যেন আমাদের পূর্বতন সামন্ততান্ত্রিক কাঠামো ভিত্তিক জীবন চেতনা, সমাজ-পদ্ধতি বা মানবিক চরিত্র এই সব কিছুর একটা নিজস্ব বিশ্লেষণ দিতে চেয়েছেন। বাংলার পল্লীসমাজ ও তার নরনারী, এককথায় বাংলার পল্লী সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও এক্ষত্রে এক মূল্যবান ভূমিকা নিয়েছে, যা তার একাধিক উপন্যাস বা আলোচনা চিঠিপত্রে স্পষ্টভাবেই উদ্ধৃত হয়েছে' শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে পল্লীচেতনার বিশ্লেষণের প্রাক্‌কালে লেখকের মানসিক প্রবণতা সম্পর্কে প্রখ্যাত সমালোচকের মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে। "....পুরাতন সামন্ত সমাজে একান্নবর্তী আমাদের নিম্নবধ্যবিত্ত পরিবারে যাহা আছে, সবই কেবল ভুল আর অন্যায় নয়— সেই জীবনের স্বপক্ষেও দুই একটি কথা বলিবার আছে।...শরৎচন্দ্র প্রথম উপস্থিত হইলেন এই কথাটি বলিয়া—না',

এ পা ধরা বাঙালী সমাজে মানুষ আছে; সুখ আছে, দুঃখ আছে, ক্ষতি আছে, বেদনা আছে, কিন্তু মানুষও তবু এইখানে ঠাঁই পায়, ফুটিয়া উঠিতে পারে। হালদার গোষ্ঠীর সামন্ত জীবনের কাঠামো ভাঙ্গিয়া না বাহির হইলে বনোয়ারীলাল ফুটিতেই পারে না। কিন্তু 'নিষ্কৃতির' মুখুজ্জে পরিবারে মানুষগুলি সকলকে জড়াইয়া থাকিয়াও মানুষ হইয়া ওঠে— ইহাকি কম সত্য?" (শরৎ সাহিত্যের সাক্ষ্য ঃ গোপাল হালদার, গ্রন্থ— বাংলা সাহিত্য ও মানবস্বীকৃতি)।

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলিতে পল্লীসমাজ যে রূপবন্ধতা লাভ করেছে, তার মূলে শরৎচন্দ্রের প্রত্যক্ষ পল্লীজীবন অভিজ্ঞতা অনেকখানি কাজ করেছে। উপন্যাস শিল্পটাই যে মুখ্যত জীবন অভিজ্ঞতার ফসল একথা প্রখ্যাত সাহিত্য আলোচক হাডসন, ঔপন্যাসিকের বিষয়বস্তু সম্পর্কিত কর্তব্য নির্ধারণ প্রসঙ্গে বলেছেন—

"Whatever aspect of life the novelist may choose to write about, he should write of them with grasp and throughness which can be succeed only by familarity with his material. What he is not familiar with he should love alone." (W.H. Hudson : An Introduction to the study of literature. 2nd Edition , Page 173). অর্থাৎ ঔপন্যাসিক যে বিষয়বস্তু নিয়ে লিখবেন তার সঙ্গে তাঁর নিজের ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকা চাই। যে বিষয়বস্তুর সঙ্গে তাঁর নিজের পরিচয় নেই সেটি তার বাদ দেয়াই উচিত।

ঔপন্যাসিকের এই দায়িত্ব শরৎচন্দ্র নিঃসন্দেহে পালন করেছেন। তাঁর বেনামীতে লেখা 'মন্দির' গল্পটি বা প্রথম প্রকাশিত উপন্যাসের পর বড়গল্প 'বড়দিদি' থেকে শুরু করে প্রায় প্রতিটি উপন্যাস বা গল্পে (শেষ প্রশ্ন, চরিত্রহীন, পরিনীতা ব্যতীত) বাংলাদেশের পল্লীসমাজ তার বহু বিচিত্র রূপরেখা দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে। এবং এই পল্লীসমাজ তাঁর নিজের চোখে দেখা, নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লব্ধ।

পল্লীমৃত্তিকার সঙ্গে অমোঘ সূত্রে জড়িত শরৎচন্দ্রের জন্মস্থান বাংলাদেশের হুগলি জেলার দেবানন্দপুর গ্রাম। তাঁর জীবনের প্রথম বছরের মধ্যে তিন-চার বছর ছিলেন বিহারের ভাগলপুর ও ডিহরিতে। দেবানন্দপুরেই তাঁর বাল্যকৈশোরের অধিকাংশ সময় কেটেছিল। আবার তাঁর....আঠারো থেকে চব্বিশ বছর বয়স পর্যন্ত (১৮৯৪-১৯০২) শরৎচন্দ্র ভাগলপুরেই প্রধানত থাকতেন। "অবশ্য সেখানেও তিনি গ্রাম বাংলার সমাজজীবনের ছায়াশ্রয় পেয়েছিলেন। কেননা, "...ভাগলপুরে তখন বহু বাঙালীর বাস, উনিশ শতকীয় বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের এক সংক্ষিপ্ত রূপ ঐ ভাগলপুরের বাঙালী সমাজ। কলহ, দলাদলি, রক্ষণশীলতা, প্রথানুগত আবার তারই মধ্যে প্রগতিশীলতার স্ফুরণ—সব মিলিয়ে ভাগলপুরের প্রবাসী বাঙালী সমাজের ওই একান্ত সজীব পরিবেশ থেকেই

সেদিনের তরুণ শরৎচন্দ্র মুখ্যত বাংলার সমাজ জীবনের জটিল সমস্যা, সুধ্ব রূপের প্রত্যক্ষ বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন।" (শরৎ সাহিত্য ও সমসাময়িককাল,—গোপকানাথ রায়চৌধুরী। শরৎ সাহিত্যের ভূমিকা শীর্ষক গ্রন্থের ৫২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

চোখে দেখা গ্রাম বাংলার সামাজিক সমস্ত দিক শরৎচেতনাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। বাংলাপল্লীর কৃষি, সংস্কৃতি, লোকশ্রুতি—পুরাণ, উপকথা, কল্পকথা বা কিম্বদন্তী—এ সবই তাঁর উপন্যাসকে সমৃদ্ধতর করেছে। আবার পল্লীসমাজের গ্লানির দিকটিও তিনি গভীর বেদনায় লিপিবদ্ধ করেছেন।

শরৎচন্দ্রের জন্মস্থান দেবানন্দপুর সহ হুগলী জেলার এক বিস্তৃত গ্রামাঞ্চল.... রাধাপুর, দিখাড়া, সরস্বতী নদী দুধারের গ্রামগুলি, আর দূরের পাণ্ডুয়া স্টেশন, হাড়ীপোতা গ্রাম, জন্মসূত্রে দেখা এই অঞ্চলকেই শরৎচন্দ্র তাঁর কয়েকটি উপন্যাসে তুলে ধরেছেন।" (শরৎচন্দ্র ও পল্লীজীবন, প্রণয়কুমার কুন্ডু "শরৎ সাহিত্যে ভূমিকা" গ্রন্থের ১৩৮ পৃ. দ্রষ্টব্য)। দেবানন্দপুর প্রাচীন ঐতিহ্যশালী গ্রাম। এটি ইতিহাস প্রসিদ্ধ সপ্তগ্রামের অন্তর্গত একটি গ্রাম। সপ্তগ্রামের বিখ্যাত সাতটি গ্রাম হ'ল বংশবাটী, বাসুদেপপুর, খামার পাড়া, কৃষ্ণপুর, শিবপুর, ত্রিশ বিঘা এবং দেবানন্দপুর। রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র দেবানন্দপুর গ্রাম লিখেছেন ঃ

"দেবের আনন্দধাম দেবান্দ্রপুর গ্রাম তাহে অধিকারী রাম রামচন্দ্র মুন্সী ভারতে নরেন্দ্র রায়, দেশ যার যশ গায়, হ'য়ে মোর কৃপায় দায় পড়াইল পারসী।" সূত্র ঃ ড. সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের, 'শরৎচন্দ্র ও লোকসংস্কৃতি' শীর্ষক প্রবন্ধ যা শিশির মজুমদার সম্পাদিত 'উত্তরকাল ও শরৎচন্দ্র' নামক সংকলনে আছে, সেটি থেকে তথ্য গৃহীত।

প্রাচীন কিংবদন্তী অনুসারে সপ্তঋষি এখানে তপস্যাও সিদ্ধিলাভ করল সপ্তগ্রাম নাম করল। পিতা ও মাতার গ্রাম ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার সূত্রে শরৎচন্দ্রে বর্ত্তে ছিল। তাঁর পিতৃভূমি মামুদপুর গ্রাম ছিল ভাটপাড়ার অন্তর্গত বৈদিক ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ঐতিহ্যযুক্ত। দেবানন্দপুর সুপ্রাচীন বন্দর ও ত্রিবেনী সঙ্গমতীর্থের অর্ন্তগত সপ্তগ্রামের অন্তর্ভুক্ত। "নিকটবর্ত্তী হালি শহরের শক্তি তান্ত্রিক ভাবধারা এবং খড়দহের বৈষ্ণবভাবধারায় এক মিশ্রিত চেতনা শরৎচন্দ্রের পিতা মতিলালের রক্তে সঞ্চারিত হ'য়েছিল এবং অপর দিকে শাক্ত আবহাওয়া পরিবর্দ্ধিত মাতা ভুবনমোহিনী। এ দুয়ের সংমিশ্রনে শরৎচন্দ্র এক উচ্চতর সংস্কৃতির অধিকারী হয়েছিলেন রক্তের সূত্র।" (ড. সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'শরৎচন্দ্র ও লোকসংস্কৃতি', 'উত্তরকাল ও শরৎচন্দ্র"—সম্পাদক শিশির মজুমদার। পৃষ্ঠা—১৯৫)। এই কারণেই গ্রামীণ ও লোকায়ত সংস্কৃতির প্রাণরস শরৎচন্দ্রের শিরায় শিরায় প্রবাহিত

হ'য়ে তাঁর উপন্যাসেও সঞ্চারিত হ'য়েছিল।

পল্লীগ্রাম ও তার জীবন সম্পর্কে স্বয়ং শরৎচন্দ্র তাঁর ব্যাকুলতা, আগ্রহ ও ভালবাসার কথা বহুবার বলেছেন। তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেছেন বিশদভাবে। সেকথা ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্তি ঃ "গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া সকল সম্প্রাদায়ের নরনারীর সংস্পর্শে আসিবার ও তাহাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করিবার সুযোগ তাঁহার হইয়াছিল।" (শরৎপরিচয়—ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ৪৬)

আত্মকথনের মত আলাপচারিতায় কখনো স্বয়ং শরৎচন্দ্রের মন্তব্য চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে ঃ "এমন দিন গেছে, যখন দু'তিন দিন অনাহারে অনিদ্রায় থেকেছি। কাঁধে গামছা ফেলে এ গ্রাম সে গ্রাম ঘুরে বেড়িয়েছি।.....গ্রামের সকলের সঙ্গে মিশেছি, তাদের সুখ-দুঃখে সহানুভুতি জানিয়ে তাদের মুখ থেকে তাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের কাহিনী জেনে নিয়েছি। তারপর খুব ভাল করে দেখে নিয়েছি পল্লীগ্রাম ও পল্লীসমাজ...।" (প্রবাসী—কার্তিক, ১৩৪৫ দ্রষ্টব্য)।

শরৎচন্দ্রের পল্লীজীবনাশ্রিত উপন্যাস ও বড় গল্পগুলিকে সাধারণভাবে নিম্নোক্ত দুটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা যায়।

(ক) সম্পূর্ণভাবে পল্লীজীবন ও সমাজভিত্তিক উপন্যাস। এখানে ঔপন্যাসিক কখনো সাধারণ বর্ণনার মাধ্যমে, কখনো ঘটনা ও কাহিনীতে প্রবিষ্ট হ'য়ে গ্রামবাংলার সমাজজীবনের প্রত্যক্ষ বাস্তব রূপ প্রদর্শন করেছেন, বা সমাজের মূল অভিব্যক্তিগুলি সঠিকভাবে চিহ্নিত করেছেন।

এই উপন্যাসগুলি হ'ল ঃ পল্লীসমাজ, বামুনেব মেয়ে, অবক্ষনীয়া, চন্দ্রনাথ, দেনাপাওনা, বিরাজ বৌ, কাশীনাথ, মেজদিদি, দত্তা, অনুপমার প্রেম, পণ্ডিত মশাই, রামের সুমতি, বিন্দুর ছেলে, সুভদা এবং আরও একাধিক বড় গল্প।

(খ) নগর ও পল্লী উভয় জীবনপট অবলম্বনে রচিত উপন্যাস। পল্লীসমাজের ভূমিকা অনেক ক্ষেত্র প্রধান হ'য়ে উঠেছে। ঘটনা ও চরিত্রের ওপর বিশেষ প্রভাব ফেলেছে।

এই শ্রেণীর উপন্যাস বা বড়গল্প জাতীয় রচনার উদাহরণ ঃ গৃহদাহ, বিপ্রদাস, দেবদাস, পথনির্দেশ, অনুরাধা, নববিধান, শ্রীকান্ত (চারটি পর্ব সহ) প্রভৃতি ।

এই দুই শ্রেণীবিভক্ত শরৎ রচনাবলীতে প্রতিফলিত পল্লীসমাজের বৈশিষ্ট্যগুলি আবার নিম্নোক্ত পর্যায়ে বিন্যস্ত করা যায় ঃ

এক. বঙ্গপল্লীর ভূমি-চিত্র ও লোকায়ত সংস্কৃতির পরিচয়।

দুই. গ্রামীণ বিবিধ প্রথা, আচার-আচরণ, সংস্কার বিশ্বাস, লোকশ্রুতি, কিংবদন্তীর উল্লেখ।

তিন. শরৎ উপন্যাসে বাংলার পল্লীসমাজের যৌথ পরিবারিক জীবনচিত্র।

চার. শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে পল্লীসমাজের অসংখ্য কুসংস্কার, কুপ্রথা, ধর্ম ও জাতিভেদ এবং সেই সঙ্গে ধর্মরক্ষক ও সমাজপতিপত্তিদের ভূমিকা।

পাঁচ. শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে বাংলার পল্লীসমাজের নীচতা ও হীনতার সত্য চিত্ররূপ।

ছয়. শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে পল্লীসমাজের উন্নতির 'সাধান সূত্রে শিক্ষা সম্পর্কিত চেতনা।

সাত. শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে পল্লীসমাজের ভূম্যধিকারী বা উচ্চবিত্ত ক্ষমতাসীন শ্রেণী ও কৃষক শ্রমজীবী মানুষ। সামন্ত সম্পর্ক।

আট. শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে পল্লীসমাজের অন্তর্গত দেশ ও কালাতীত মানবমানবী।

(এক) শরৎ উপন্যাসে বঙ্গ পল্লীর ভূমিচিত্র ও লোকায়ত সংস্কৃতির পরিচয়

গ্রামবাংলার মাটি ও মানুষকে আমৃত্যু ভালবেসেছিলেন শরৎচন্দ্র জীবনের প্রথম আঠার বছর বয়স কালের মধ্যে তিন-চার বছর বাদে সবটা কেটেছিল তাঁর জন্মস্থান হুগলী জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে। প্রবাস থেকে মধ্যবয়সে দেশে ফিরেও গ্রামের প্রতিই তিনি অনুরক্ত ছিলেন। তাই কলকাতার 'অভিজাত অঞ্চলে বালিগঞ্জ বাড়ি থাকা সত্ত্বেও এবং শহরে সম্মান প্রতিপত্তির প্রাচুর্য সত্ত্বেও পানিত্রাসে রূপনারয়ণ তীরস্থ শান্ত পল্লী নিবাসে সাধারণ মানুষদের সঙ্গে সরল জীবনযাপন করিতে ভাল বাসিতেন।'' (শ্রী শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়ে, শরৎচেতনা পৃ. ২৮১, প্রথম প্রকাশ ঃ আশ্বিন ১৩৭৫)। যে শান্ত স্নিগ্ধ পল্লী অঞ্চলে তাঁর কৈশোর কালের অধিকাংশ সময় কেটেছে, সেই সপ্তগ্রামের অন্তর্ভুক্ত ঐতিহ্যময় দেবানন্দপুর গ্রাম এবং কেষ্টপুর, রাধাপুর, দিখাড়া, কিম্বা সরস্বতী নদীর দুধারের গ্রামগুলি সহ হুগলী জেলার এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল এবং পরবর্তী কালের বাসস্থান হাওড়া জেলার পানিত্রাস, মলতাবেড় প্রভৃতি পল্লীঅঞ্চলের চিত্র তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে বারবার দেখা গেছে পল্লীবাংলার জল-স্থল, আকাশ-বাতাস, বৃক্ষলতা-পশুপাখী আর মানুষজনের প্রতি নিবিড় ভালবাসা আর ঐকান্তিক আগ্রহের চিহ্ন স্বরূপ এই চিত্রগুলি।

'দত্তা' উপন্যাসের সূত্রপাত ঘটেছে লেখকের সুপরিচিত হুগলী জেলার তিনটি গ্রাম দিখাড়া রাধাপুর ও কেষ্টপুর থেকে হুগলী ব্রাঞ্চ ইস্কুলের ছাত্র অভিন্ন হৃদয় তিন বালক বন্ধুর প্রতিদিন স্কুলের পার্শ্ববর্তী এক ন্যাড়া বটতলায় একত্র হওয়ার

চিত্র বর্ণনা দিয়ে—"জগদীশ আসিত সরস্বতীর পুল পার হইয়া দিঘড়া গ্রাম হইতে, এবং বনমালী ও রামবিহারী আসিত দুইখানি পাশাপাশি গ্রাম কৃষ্ণপুর ও রাধাপুর হইতে।" 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের তৃতীয় পর্বের প্রথম পরিচ্ছেদে শ্রীকান্তর আত্মচিন্তার আলোয় স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে বাংলার একটি পরিচিত পল্লীচিত্র ঃ

"রেল স্টেশনের উদ্দেশ্যে আমরা যখন যাত্রা করিলাম তখন সূর্যদেব বহুক্ষণ অস্ত গিয়াছেন। আঁকাবাঁকা গ্রাম্য দুই ধারে যদৃচ্ছা-বর্ধিত বঁইচি, শিয়াকুল এবং বেতবন, সঙ্কীর্ণ পথটিকে সঙ্কীর্ণতর করিয়াছে এবং মাথার উপর আম-কাঁঠালের ঘনশারি শাখা মিলাইয়া স্থানে স্থানে সন্ধ্যার আঁধার যেন দুর্ভেদ্য করিয়া তুলিয়াছে।..."

'দত্তা' উপন্যাসে পল্লীগ্রামের সূর্যাস্ত আবার অসামান্য চিত্রপট অঙ্কিত হ'য়েছে জিয়ার স্মৃতিমগ্ন মন থেকে উঠে আসা তার প্রয়াত পিতারই বেদনাহত স্মৃতিচারনার বর্ণনাটুকু দ্বারা বিজয়ার "মনে পড়িল...তিনি...বলিয়াছিলেন.... তুই তো জানিস নে মা, কিন্তু আমার যে চোখ দুটি এই বুকের ভেতর থেকে উঁকি মেরে চেয়ে আছে, তারা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, আমাদের ফুলবাগানের ধারে ছোট নদীটি এতক্ষণ সোনার জলে টলটল করে উঠেছে। আর তার পরপারে যতদূব দৃষ্টি যায়, মাঠের পর মাঠের শেষে এখনও সূর্য ঠাকুর যাই করেও গ্রামের মায়া কাটিয়ে যেতে পারেননি।"

গ্রামের দৃশ্য চিত্র কবিরা যতই মায়াঞ্জল চোখে নিয়ে রচনা করুনা না, সেই সৌন্দর্য সাধারণ মানুষ দেখতে পায়না। কারণ পল্লীগ্রাম এখন বাস্তবিক পক্ষে শ্রীহীন ও শ্রীভ্রষ্ট। সেই শ্রীহীন ভূমি চিত্রও শরৎচন্দ্র সত্য দৃষ্টিতে এঁকেছেন। শ্রীকান্ত, চতুর্থ পর্বে, গহরের গৃহে রাত্রে অবস্থানের পর পরদিন সকালে গহরের সঙ্গে গ্রাম্য পথের দৃশ্য-সৌন্দর্য উপভোগ করতে গিয়ে পাড়াগাঁ-র যে সত্য রূপ দেখে হতাশ হয়েছিলেন সেই বর্ণনা এইরকম ঃ

"...প্রাচীরের গায়ে আধমরা একটা জামগাছের অর্দ্ধেকটায় মাধবী ও অর্দ্ধেকটায় মালতী লতা....অত্যন্ত নির্জীব চেহারা—তথাপি একটায় গোটা কয়েক ফুল ফুটিয়াছে,.....কিন্তু গাছে এত কাট্‌পিপড়া যে ছোঁবার যো নাই।...

পথের দুধারে আমবাগান। কাছে আসিতেই অগনিত ছোট ছোট পোকা চড়চড় পটপট শব্দের আম্রমুকুল ছাড়িয়া চোখে নাকে মুখে জামার ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল, শুকনা পাতায় আমের মধ ঝরিয়া চটচটে আঠার মত হইয়াছে, সেগুলা জুতার তলায় জড়াইয়া ধরে, অপ্রশস্ত পথের অধিকাংশ বেদখল করিয়া বিরাজিত ঘেঁটুগাছের কুঞ্জ....।

...আমাদেরই গ্রামের নদী ইহাদেরও গ্রামপ্রান্তে প্রবাহিত। বর্ষায় পরিস্ফীত জলধারা বসন্ত সমাগমে একাংশ শীর্ণ, সেদিনের স্রোতশ্চালিত অপরিমেয় পানা ও

শৈবাল আজ শুষ্ক তটভূমিতে পড়িয়া শিশির ও রৌদ্রে পচিয়া সমস্ত স্থানটাবে দুর্গন্ধে নরককুণ্ড করিয়া তুলিয়াছে।....."

তবুও এই গ্রামকেই শরৎচন্দ্র ভালবেসেছেন। দেশ ও মাটিকে ভালবেসে তার লোকায়ত সংস্কৃতির প্রতিও তাঁর ছিল গভীর অনুরাগী মন। 'শ্রীকান্ত'র তৃতীয় পর্বের প্রথম পরিচ্ছেদে লেখক গ্রামবাংলার জীবনপ্রবাহ ও হাজার হাজার বছরের পিতৃপিতামহদের ঐতিহ্যানুসারিত জীবনযাত্রার এক ছবি এঁকেছেন ঃ "....মনে হইল এই পথের উপর দিয়াই পিতামহ একদিন পিতামহীকে বিবাহ করিয়া আনিয়াছিলেন,....আবার একদিন যখন তাঁহারা স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন, তখন এই পথ ধরিয়াই প্রতিবেশীরা তাঁহাদের মৃতদেহ নীদতে বহিয়া লইয়া গিয়াছিল। এই পথের উপর দিয়াই মা আমার একদিন বধুবেশে গৃহ প্রবেশ করিয়াছিলেন, এবং আবার একদিন....ধূলাকালির এই অপ্রশস্ত পথের উপর দিয়াই আমরা তাঁহাকে মা-গঙ্গায় বিসর্জ্জন দিয়া ফিরিয়া ছিলাম।"—সমালোচক বলেছেন, এটিই লৌকিক ঐতিহ্যের (Folk Tradıton) অনুসৃতি। লেখক লৌকিক সংস্কৃত ও জীবনচর্চার সুমহান ঐতিহ্যকে উপলব্ধি যেমন করেছেন, তেমনি, বর্তমানের সেই লোকায়ত জীবনধারা ও সংস্কৃতির অধঃপতনের কথাও চিন্তা করেছেন ঃ তখনও এই পথ এমন নির্জন ও দুর্গম হইয়া যায় নাই, তখনও বোধকরি ইহার বাতাসে বাতাসে এত ম্যালেরিয়া, জলাশয়ে জলাশয়ে এত পঙ্ক, এত বিষ জমা হইয়া ওঠে নাই। তখনও দেশে অন্ন ছিল, বস্ত্র ছিল, ধর্ম ছিল— তখনও বোধ হয় দেশের নিরানন্দ এমন ভয়ঙ্কর শূণ্যতায় আকাশ ছাপাইয়া ভগবানের দ্বার পর্যন্ত ঠেলিয়া ওঠে নাই।"

এই শ্রদ্ধা ও ভালবাসার আবেগে শ্রীকান্ত জন্মভূমির ধূলো নিয়ে মাথায় মেখেছে। '...দুই চক্ষু জলে ভাসিয়া গেল, গাড়ির চাকা হইতে কতকটা ধূলা লইয়া তাড়াতাড়ি মাথায় মুখে মাখিয়া ফেলিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলাম, হে আমার পিতৃ-পিতামহের মুকে সুখে-দুঃখে বিপদে সম্পদে হাসি-কান্নায় ভরা ধূলা বালির পথ তোমাকে বারবার নমস্কার করি।....মা জন্মভূমি, তোমার বহু কোটি অকৃতি সন্তানের মত আমিও কখনো তোমাকে ভালবাসি নাই—আর কোন দিন তোমার সেবায় তোমার কাজে, তোমারই মধ্যে ফিরিয়া আসিব কি না জানিলা, কিন্তু আজ এই নির্বাসনের পথে আঁধারের মধ্যে তোমার যে দুঃখের মূর্তি আমার চোখের জলের ভিতর দিয়া অস্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিল, সে এ জীবনে কখনো ভুলিব না।

দুই. শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে উল্লিখিত গ্রামীণ বিবিধ প্রথা (আচার আচরণ, সংস্কার, বিশ্বাস লোকশ্রুতি, কিংবদন্তী ইত্যাদি)

"আসলে কোন লেখকই তাঁর দেশ ও দেশজ সংস্কারের উর্ধচারী হ'তে পারেন না। যে পরিবেশের মধ্যে লেখক তাঁর জীবনরসকে পরিপুষ্ট করে তোলেন, সেই দেশ ও সমাজের মানুষ তার আচার আচরণ, ভাললাগা মন্দ লাগা সংস্কার কুসংস্কার, বিশ্বাস অবিশ্বাস কোন কিছুকে অতিক্রম করতে ত' পারেন না বরং এসবের মধ্য থেকেই তাঁর সাহিত্য ও শিল্পকর্মের প্রাণরস পরিস্ফুট করে তোলেন আবার যোগান নেন।" (ড. সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র ও লোকসংস্কৃতি— প্রবন্ধ উত্তরকাল ও শরৎচন্দ্র শীর্ষক সংসকলণ গ্রন্থ দ্রষ্টব্য পৃ. ১৯৬, সম্পাদক শিশির মজুমদার)

শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজভিত্তিক উপন্যাসে লেখকের এই বিশিষ্ট মানসপ্রবণতা স্বতোঃসারিত হ'য়েছে বহুমহলে সমস্ত দেশের পল্লীমসাজেরই কিছু নিজস্ব ধ্যান ধারণা, আচার-সংস্কার বিশ্বাস, লোকশ্রুতি থাকে। শরৎচন্দ্রের কালে তা গ্রামময় বাংলায় প্রভূত পরিমাণেই ছিল। এখনও সেসবের ক্ষীণ অনুসৃতি হ'য়ে থাকে। শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে পাড়াগ্রামের বালিকা বা যুবতীদের মধ্যে প্রচলিত 'সই পাতানোর' মত অতি পরিচিত একটি রীতি বেশ গুরুত্ব পেয়েছে। 'শ্রীকান্তে'র দ্বিতীয় পর্বের শুরুতেই দেখা যায় তার প্রয়াত মায়ের ছেলেবেলার 'গঙ্গাজল' পাতনো সখী শ্রীকান্তকে পত্রদ্বারা আনিয়েছে তার মা শ্রীকান্তকে সখী গঙ্গাজলের কন্যার জন্য পাত্র হিসেবে সুনির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন। সেই সময় গ্রাম বাংলায় মেয়েরা পরস্পরের সঙ্গে মায়াত্বে আবদ্ধ হ'য়ে প্রকৃত নামের বদলে একটি নতুন ধরনের নামে পরস্পরকে সম্বোধন করিতেন। শ্রীকান্তর মা ও তাঁর সখী 'গঙ্গাজল' এই রকম নামকরণ নিয়েছিলেন। পরস্পরকে এই নামই তাঁরা ডাকতেন। প্রসঙ্গত উল্লেখকরা যায়, রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' উপন্যাসে আশা ও বিনোদিনী এই নামাকরণ যুক্ত সখীত্ব গ্রহণ করেছিল। শ্রীকান্তকে প্রয়াত মায়ের সখী "গঙ্গাজলে"'র কাছে দেওয়া কথা রক্ষার জন্য গ্রামে যেতে হ'য়েছিল, কেননা, তৎকালে এই 'সত্যরক্ষা' ও সখীত্ব স্থাপনের একটি বিশেষ শর্ত ছিল।

বাল্যরা শিশুকাল থেকেই সন্তানদের পিতামাতার কখনো বিবাহের কখনো 'বাগদান' করে ফেলতেন। 'শ্রীকান্ত'র মা যেমন সখী 'গঙ্গাজলকে' তার পুত্র শ্রীকান্তকে সখীর কন্যার স্বামী হিসেবে স্বীকৃতি পত্র লিখেছিলেন, সেই রকমই প্রায় 'দত্তা' উপন্যাসে অভিন্ন হৃদয় বন্ধু জগদীশকে বনমালী তার কন্যা জন্মালে অবশ্যই জগদীশের পুত্রের সঙ্গে বিবাহ দেবেন এমন কথা জগদীশের পত্রের

উত্তরে স্বীকার করে লিখেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি জগদীশের ছেলেকে বিবাহের যৌতুক স্বরূপ তার বন্ধক রাখা বাড়িটি দান করেছেন—এমন কথাও তাঁর পত্রে লেখা ছিল।

পল্লীসমাজে ধর্ম মানুষের জীবনের মূল কেন্দ্রে অবস্থিত থাকে। ধর্মভীরুতা বা ধর্মবিশ্বাস ও নানা লৌকিক দেবদেবীর প্রতি আস্থা সেই সম্পর্কিত নানা প্রকার জনশ্রুতি কিম্বদন্তী গ্রামসমাজে দৃঢ়মূল হ'য়ে থাকে। 'দেনাপাওনা' উপন্যাসে গোটা চণ্ডীপুর গ্রামই যেন গড়ে উঠেছে দেবী চণ্ডীর মন্দিরকে কেন্দ্র করে। দেবীর পূজারিণী বা সেবিকা হিসেবে 'ভৈরবী' আসলে গ্রামবাসীর কাছে মাতৃকা দেবীর শক্তি স্বরূপা। এই বিশ্বাসে 'ভৈরবী' প্রথা সেই গ্রামে বর্তমান। উপন্যাস কাহিনীতে তৎকাল 'ভৈরবী' তথা উপন্যাসের নায়িকার নাম 'ষোড়শী' হয়েছে দেবী কালিকার দশমহাবিদ্যার একটি রূপের (তৃতীয়া রূপ) নাম অবলম্বনে। দেবীর 'ভৈরবী'দের প্রতি গ্রামবাসীর অন্ধভক্তি ও বিশ্বাস এই উপন্যাসে আছে, স্বয়ং 'হৈমবতী' 'ষোড়শী'র প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন। ষোড়শীর নামে অকথা কুকথা বলতে উদ্যতত্ত হ'য়েও প্রবীনা এক নারী দেবীর মূর্তির ওপর দৃষ্টিপাত করে চুপ হয়ে যায় এবং দেবীর ক্ষমা প্রার্থনা করে। "....সহসা প্রতিমার প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই...নিজের দুই কান তিনি তৎক্ষনাৎ দুই হাতে স্পর্শ করিয়া কহিতে লাগিলেন, মায়ের ভেরবী, নিন্দে করলে মহাপাপ হবে..." ইত্যাদি।

'চণ্ডীগড়ে'র এই দেবী চণ্ডী সম্বন্ধে কিম্বদন্তীটি উপন্যাসের শুরুতে দেওয়া হয়েছে। "কিম্বদন্তী আছে রাজা বীরবাহাদুর কোন এক পূর্বপুরুষ কি একটা যুদ্ধজয় করিয়া বারুই নদীর উপকূলে এই মন্দির স্থাপন কারন, এবং পরবর্তীকালে কেবল ইহাকেই আশ্রয় করিয়া এই চণ্ডীগড় গ্রামখানি ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছিল।"

পল্লীসমাজের নানারকম ভৌতিক বিশ্বাস-সংস্কার শরৎচন্দ্র তাঁর উপন্যাসগুলিতে বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে খুব স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে তুলে ধরে গ্রাম সমাজের চেতনার মূল জায়গাটিতে পৌঁছতে পেরেছেন ঃ 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের চতুর্থ পর্বে নিমের ছেলেবেলার বহুপরিচিত গ্রামের পথে দীর্ঘ দিন বাদে পা রেখে শ্রীকান্ত যখন "নষ্টালজিয়ায় বিধুর হয়েছিল, সেই সময়ে সে পুরোনো স্মৃতি স্মরণে পায়ে পায়ে পৌঁছে গিয়েছিল যশোদর বৈষ্ণবীর পরিতক্ত্য কুটীরে। স্মৃতি অবগাহনের দূরাগত পথ ধরে তার স্মরণে উঠে এসেছে গলায় দড়ি তেঁতুল গাছটির জলশ্রুতি। ছেলেবেলায় তার শোনা ছিল কেউ এই বিশেষ তেঁতুলগাছটিতে গলায় দড়ি দিয়েছিল। তাই এই নামকরণ।

পুরোনো বাংলার গ্রাম সমাজে প্রতিটি পদেপদে নানা প্রথা, আচার-আচরণের নির্দিষ্ট নিয়ম যে কিভাবে পালন করা হ'ত। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে তার বিশদ পরিচয় ফুটে উঠেছে। যেমন ছেলের শুভকামনায় মন্দিরে মানসিক করা

(দেনাপাওনা), দাসীকে সঙ্গে নিয়ে অল্পবয়সী ভদ্র স্ত্রীলোকের রাস্তায় পথ চলা (পল্লীসমাজে রমার আচরণ), জন্মবারে ছেলেমেয়েকে মরার গাল না দেওয়া (নিস্কৃতি), জুতো পায়ে রান্নাঘরে না ওঠা (নিস্কৃতি), গা ছুঁয়ে দিব্যি করা (একাধিক উপন্যাসে), পূর্ব পুরুষদের জন্য বিশেষ তিথিতে আকাশ প্রদীপ জ্বালানো (নববিধনে), ফকির সন্ধ্যামা স্থানত্যাগ করার সময় বাসস্থানের সম্মুখে ধুনি বা অগ্নিচিহ্ন নিভিয়ে যাওয়া (দেনাপাওনা) বাড়ী থেকে বাইরে যাওয়ার সময় সধবা স্ত্রীলোকের পায়ে আলতা পরা (বিন্দুর ছেলে), দেবীর ভৈরবীকে স্বামী স্পর্শ করা যাবে না (দেনাপাওনা), দুপুরবেলা তৃষ্ণার্তকে শুধু জল না দিয়ে অন্তত বাতাসা দেয়া (একাদশী বৈরাগী), পুরুষের সামনে মেয়েদের না খাওয়া (শ্রীকান্ত), পুরুষের আগে মেয়েদের না খাওয়া (শ্রীকান্ত) ইত্যাদি অজস্র আচার-সংস্কার। এবং এইসব আচার সংস্কার বেশীরভাগের, নারীরাই রক্ষক। শ্রীকান্ত উপন্যাসে রাজলক্ষ্মী মুসলমান কুলিতে খাবার ছুঁয়ে ফেলেছে সেজন্য সেই খাবার সে নিজে খায়নি কিন্তু শ্রীকান্ত খেয়েছে, এ প্রসঙ্গে তার অকুণ্ঠ স্বীকারোক্তি ঃ "পুরুষ মানুষের জন্য আবার এত বাঁধাবাঁধ আইন-কানুন কিশের জন্যে? তারা যা ইচ্ছে খাক, যা ইচ্ছে করুক, যেমন করে হ'ক সুখে থাক, আমরা আচার পালন করে গেলেই হ'লো।"

(তিন) শরৎ উপন্যাসে বাংলার পল্লীসমাজের যৌথ পারিবারিক জীবনচিত্র

পুরোনো ভাবধারার পল্লীসমাজের যে আদর্শ ও মূল্যবোধ শরৎচন্দ্রকে সব থেকে বেশী অনুপ্রাণিত করেছিল বা শরৎচন্দ্রের সম্ভ্রম ও ভালবাসা আদায় করেছিল, তা হ'ল বঙ্গপল্লী সমাজের যৌথ পরিবার জীবনের আদর্শ। পল্লীসমাজের মূল ভিত্তি যৌথ পরিবার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কুফলে ভেঙ্গে যায়। সেই ভাঙ্গনের ব্যাপারটি উনবিংশ শতক থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্যায় নাগাদ ধীরে ধীরে স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। তথাপি বিংশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত গ্রামবাংলায় সমাজে এই ভিত্তিটুকু প্রাণপনে ধরে রাখবার প্রচেষ্টা ছিল। শরৎচন্দ্র, সেই যৌথ পরিবার জীবনের মহত্ত ও গৌরব এবং তার ভাঙনের করুন চিত্র তাঁর উপন্যাসে তুলে ধরেছেন গভীর আন্তরিকতায়। যদিও, বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে এই চিত্রায়ণ নতুন নয়, উনবিংশ শতকেই তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিখ্যাত 'স্বর্ণলতা' উপন্যাসে বাঙালীর যৌথ পরিবার জীবনের বিনষ্টির রূপটি দেখানো হ'য়েছে তার মহিমাময় দিকটির পূর্ণ রূপ। বিন্দুর ছেলে, রামের সুমতি, নিস্কৃতি, বিপ্রদাস, মেজদিদি, বিরাজ বৌ, বৈকুণ্ঠের উইল, পল্লীসমাজ, দেবদাস, অরক্ষনীয়া প্রভৃতি উপন্যাসে ও বড়গল্পে পল্লীজীবনের পাঠাশ্রয়ে বাঙালীর যৌথ

পরিবার জীবনের সুখ-গৌরব-শান্তি এবং তার কলুষিত অবসানও চিত্রিত হয়েছে।

যৌথ পরিবার জীবনের ভিত্তি যে নারী বা পুরুষের নিঃস্বার্থ সেবা, মমতা, স্নেহ ও আত্ম-পরহীন ভালবাসার চেতনা সেগুলি পরিস্ফুট হয়েছে বিন্দুর ছেলে, রামের সুমতি, মেজদিদি, নিস্কৃতি, বৈকুণ্ঠের উইল, নববিধান এবং বিপ্রদাসে।

এই রচনাগুলির সবগুলিতেই হয় বৈমাত্রেয় ভ্রাতার প্রতি ভ্রাতার গভীর স্নেহ-মমতা ও স্বার্থত্যাগি (বিপ্রদাস, বৈকুণ্ঠের উইল) অথবা সম্পর্কিত ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধুর সংসারে একান্ত আপনভাবে গ্রহণ করা ও তার প্রতি বিশ্বাস রাখা (নিস্কৃতি), কিম্বা ভাসুর পুত্রের প্রতি নিঃসন্তান রমণীর মাতৃ-স্নেহ উদার করে দেওয়া (বিন্দুর), বৈমাত্রেয় দেবরের প্রতি ভ্রাতৃবধুর জননীবৎ ছলে আচরণ (রামের সুমতি), যপত্নী পুত্রকে গর্ভস্থ সন্তান অপেক্ষাও বেশী ভালবাসা ও নির্ভর করা (বিপ্রদাস, বৈকুণ্ঠের উইল, নববিধান,) নিঃসম্পর্কিত কিশোরকে ভ্রাতৃ বৎ কাছে টেনে নেওয়া (মেজদিদি), বিমাতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা (বিপ্রদাস, বৈকুণ্ঠের উইল), কাহিনী ও ঘটনাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে।

'বিন্দুর ছেলে'-তে নিঃসন্তান বিন্দু তার ভাসুরপুত্র অমূল্যকে ঘিরে নিজের সমস্ত মাতৃ-হৃদয়ের সম্পদ উজার করে দিয়েছে। আবদ্ধ এই উপন্যাসের সাংসারিক মূলভিত্তিও নিঃস্বার্থ আত্মপরহীন ভালবাসা। জ্ঞাতি সম্পর্কিত ভ্রাতা মাধবকে মানুষ করেছিলেন ।

'নিস্কৃতি'র কাহিনীও বাঙালীর পুরোনো যৌথজীবনের মূল্যবোধে গড়ে ওঠা হাসি-কান্নার অমূল্য চিত্রায়ন। জ্ঞাতি ভ্রাতা রমেশ ও তার পত্নী শৈল গৃহকর্তা গিরিশ ও তার স্ত্রী সিদ্ধেশ্বরীর সংসারে একান্ত স্বজন ও অভিন্ন পারিবারিক সত্তাই শুধু নয়, শৈলজা কণিষ্ঠা বধু হ'য়েও গৃহ-চালিকা শক্তি। মেজবৌ নয়নতারার কূট-কৌশলে এই সংসারে বিভেদ সৃষ্টি হ'লেও উদার প্রাণ গিরিশের স্নেহ-মমতা শৈলর নামে দেশের জমি-বাড়ী দানপত্র ফরিয়ে এক অনাবিল আত্মপরহীন ভালবাসার মন্ত্রকেই এই কাহিনীর মূল সুর করে তুলেছে।

গ্রামের মধ্যবিত্ত মানুষ শ্যামলালের পত্নী নারায়ণী বৈমাত্রেয় দেবরকে মাতৃস্নেহে লালন করে। বহির্শক্তির কুটিলতায় দুই ভায়ের বিষয় ভাগাভাগি হ'য়ে গেলেও কিম্বা বিরক্ত ক্রুদ্ধ স্বামীর ভয়ানক 'দিব্যি' দেওয়া থাকলেও শেষ পর্যন্ত নারায়ণী তার জননী সত্তা দিয়ে দুরন্ত দেবর কিশোর রামকে কোলে টেনে নিয়েছে। এবং সেজন্য নিজের গর্ভধারিণী মায়ের সঙ্গে বিচ্ছেদকেও ক্ষতি বলে মনে করেনি।

একান্নবর্তী পল্লী সংসারের বিরাট জীবনপট দেখানো হ'য়েছে 'বিপ্রদাসে'। এখানেও বিপ্রদাসের জননী দয়াময়ী বিমাতা, কিন্তু দয়াময়ীর গর্ভস্থ সন্তান দ্বিজদাস যে কথা বলে "....মিছে কথা সৎমা বটে, দাদার নয়, আমর।"—একথা পাঠকও

অত্যুক্তি মনে করেন না। যৌথ পরিবার জীবনের আদর্শ ভাবনা বন্দনার মত উচ্চশিক্ষিতা ও পাশ্চাত্ত্য আবহাওয়ায় লালিত মেয়েও এখানে নতমস্তকে গ্রহণ করেছে ঃ "....কিন্তু আমার শাশুড়ী, আমার জা, আমার ভাসুর, আমাদের ঠাকুর, অতিথি-শালা, আমাদের আত্মীয় স্বজন সমাজ, এর থেকে আলাদা করে আমার স্বামীকে আমি একদিনও পেতে চাইনে, তিনি সকলের সঙ্গে এক হ'য়েই যেন আমার থাকেন।"—এই পারিবারিক যৌথ দায়িত্ব বোধ তার মনে যে নিঃস্বার্থ স্নেহ-মমতার জন্ম দিয়েছে, মৃতা দিদি সতীর পুত্র সন্তান বাসুকে বুকে টেনে নেওয়ার মধ্যে তার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে। সে বিপ্রদাসকে বলেছে "....বাসুকে আমি নিলুম।....তাকে শেখাবো আমায় মা বলে ডাকতে।"

'বিরাজ বৌ' উপন্যাসে এই যৌথ পরিবার জীবনের দায়িত্ব ও ভালবাসায় নীলাম্বর ও বিরাজ নীলাম্বরের পিতৃমাতৃহীন ভগ্নী পুঁটিকে কন্যাস্নেহে লালন পালন করেছে এবং পুঁটির বিবাহ-পণ জোগাতে নীলাম্বর সর্বস্ব খুইয়েছে। এই উপন্যাসেই দেখা গেছে গ্রামের অশিক্ষিতা নারী নীলাম্বরের ছোট ভ্রাতৃবধুকে, যে দুই ভাইয়ের পৃথকান্ন সংসারের মধ্যব্যাপী কঠিন বেড়াটির পার্থক্য বারবার ভেঙ্গে ফেলে বড় জা বিরাজের কাছে আসে, তাদের দুঃখের দিনে সাহায্য করা এবং বিরাজের গৃহত্যাগের নিদারুণ ঘটনার পরে বেদনাকাতর নীলাম্বরের সন্তপ্ত জীবনে সান্ত্বনা হ'য়ে আবির্ভূত হয়েছে। এই নারীটির প্রেরণাতেই নীলাম্বরের ছোট ভাই অনুতপ্ত ও দুঃখিত হ'য়ে উঠোনের মাঝখানের বেড়াটি খুলে দিতে বলেছে।

যৌথ পরিবারের বন্ধন পল্লীসমাজেও যে ধীরে ধীরে ক্ষয়ে যাচ্ছিল তারও স্পষ্ট চিত্র বৈকুণ্ঠের উইল, দেবদাস, অরক্ষনীয়া, বিরাজ বৌ, প্রভৃতি উপন্যাসে পাওয়া যাচ্ছে। বৈকুণ্ঠের উইলে গোকুলের শ্বশুর ও স্ত্রীর কুটিলতায় গোকুলের একান্নবর্তী সংসার বিভক্ত হ'য়ে যায়। বিমাতা ভবানী ও বৈমাত্রেয় ভাই বিনোদ ভিন্ন হ'য়ে গেলে তার যন্ত্রনা ও বেদনা শরৎচন্দ্র অসামান্য ভাবে দেখিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত গ্রামের কুচক্রী মানুষদের প্ররোচনায় আর বিভ্রান্ত না হ'য়ে দাদা গোকুলের স্নেহময় অন্তরটি চিনে নিয়ে তার পায়ে বিনোদ নিজেকে সমর্পন করেছে।

'দেবদাস' উপন্যাসে গৃহকর্তা জমিদার নারায়ণ মুখোপাধ্যায় গত হ'লে তার দুই পুত্র দ্বিজদাস ও দেবদাসের মধ্যে বিষয় সম্পত্তি বিভক্ত হয়, দেবদাসেরই ইচ্ছায়। কিন্তু এখানে বড়ভাই ছোটভাইকে বঞ্চনা করে, বড়ভ্রাতৃ বধু দেবর দেবদাসের নিন্দে করে। সংসার উদাসীন দেবদাসও কিছু বুঝতে পারে। সে পার্বতীকে বলেছে ঃ "....বাবা নাই, আজ আমার কি দুঃখের দিন,....বড়বৌকে জানিস ত, দাদার স্বভাবও কিছু তোর কাছে লুকানো নেই, বল দেখি মাকে নিয়ে এ সময়ে কি করি।" 'অনুপমার প্রেম' গল্পে শরৎচন্দ্র পুরোনো যৌথ সাংসারিক

জীবনের শান্তিময় সহাবস্থানের ভগ্ন ও বিনষ্ট রূপ দেখিয়েছেন। অনুপমার দাদার হীন-স্বার্থবুদ্ধি যুক্ত স্নেহ হীনতা এ গল্পে অনুপমাকে সম্পত্তির অধিকারের কারণে মিথা কলঙ্কিনী বানাতে দ্বিধা করেনি।

সত্য সন্ধানী শরৎচন্দ্র 'অরক্ষনীয়া'তে তুলে ধরেছেন আত্মীয় পরিজনদের হিংসা-দ্বেষজাত বিরোধ। এবং শক্তিমানের হা'তে অসহায়ের পীড়নের করুন চিত্র। সমালোচক মন্তব্য করেছেন— "অরক্ষনীয়ায় জ্ঞানদা ও তাহার মা দুর্গামনির অসহায়তা এবং দুর্গামনির দেবরের সংসারে তাহার ও জ্ঞানদার লাঞ্ছনা মর্মস্পর্শী ভাষায় রূপায়িত হইয়াছে।" (শ্রী শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় 'শরৎচেতনা'— পৃষ্ঠা ঃ ১৩৯)

এই প্রসঙ্গে বিপরীতভাবে পল্লীসমাজ উপন্যাসের নায়িকা চরিত্র বিধবা রমার কথা স্মরণ করা যেতে পারে। তার পিতা রমা ও রমার ছোট ভাই যতীনকে বিষয়সম্পত্তি ভাগ করে দিলেও ছোট ভাই-এর সম্পত্তি বুক দিয়ে রক্ষা করে বিধবা দিদি রমা। সে নিজে বিষয়ের অর্ধাংশের মালিক হ'লেও নিঃস্বার্থ ঐকান্তিক স্নেহ ও দায়িত্ববোধে তাব বিশ্বাস গড়া। সেই বোধেই রমেশকে স্পষ্ট ভাষায় বলেছে যে বিষয়ের অর্ধেকের সে মালিক শুধু নামেই। "রমা বলিল, শুধু নামে। বাবা নিশ্চয় জানতেন সমস্ত বিষয় যতীনই পাবে; তাই অর্দ্ধেক আমার নামে দিয়ে গেছেন।"

রমার এই পরিবার রক্ষা করার চেতনার সঙ্গে বা ছোট ভাইয়ের বিষয় আগলানের মধ্যে স্নেহ ও আন্তরিকতা আছে, সেইরকম আন্তরিক স্নেহ স্বামীগৃহে অসম্মনিতা হ'য়েও 'নববিধান' গল্পের ঊষা চরিত্রে প্রকাশিত হ'য়েছে সপত্নী পুত্র সোমেনকে পরম মাতৃমমতায় আপন করে নেওয়ার মধ্যে। ঊষা, স্বামীকে একলা চায় নি, তার সপত্মী পুত্র তো বটেই, সেই সঙ্গে ননদ বিভা সহ স্বামীর আত্মীয় পরিজনকে নিয়ে এক নিবিড় পারিবারিক বন্ধনে আবদ্ধ থাকতে চেয়েছে। তার এই চেতনার ভিত্তি রচনা করেছে তার নন্দীপুর নামের পল্লীগ্রামস্থ পিতৃগৃহের একান্নবর্তী সংসার। ঊষা স্বামীগৃহ পরিত্যক্তা হ'য়ে গ্রাম ভায়েদের সংসারেই ছিল এবং নন্দ বিভার কাছে অকপটে জানিয়েছে সোমেনকে ছেড়ে থাকতে তার কষ্ট হবে, কেননা, "... সেখানে বৌয়েদের সব ছেলেপুলেই আমার হাতে মানুষ", এজন্য "কেউ একজন কাছে না থাকলেও আমি বাঁচিনে ঠাকুর ঝি।"

'শ্রীকান্ত' উপন্যাসেও বাঈজী হওয়া সত্ত্বেও রাজলক্ষ্মীর পল্লী জীবন সত্তাই তার সপত্নী পুত্র 'বঙ্কু'কে কাছে টেনে আনবার মানসিকতা সৃষ্টি করেছে। তাকে কাছে রেখে মানুষ করে সংসারী করিয়েছে। এক বৃহৎ যৌথ জীবনের গূঢ় চেতনা এই উপন্যাসেও শরৎচন্দ্র দেখানোর চেষ্টা করেছেন রাজলক্ষ্মীর মধ্য দিয়ে এবং সেই সঙ্গে তৃতীয় পর্বে 'গঙ্গামাটি' গ্রামে বসবাসের সূত্রে কুলারী পরিবারের ছোট

ভাই ও তার পত্নী সুনন্দার আদর্শের খাতিরে সংসার ভেঙে চলে যাওয়া ও সেই কারণে কুশারী গিন্নীর প্রকাশ্য এবং কুশারী গৃহকর্ত্তা বড় ভাই-এর অলক্ষ্য বেদনা শ্রীকান্ত লক্ষ্য করেছিল। সুনন্দার আদর্শের তেজ যতই ঝাঁঝালো হ'ক, প্রথমে প্রভাবিত হ'লেও চতুর্থ খণ্ডে এ বিষয়ে রাজলক্ষ্মীর বিরূপতা স্পষ্ট করে প্রকাশের মাধ্যমে শরৎচন্দ্র নিজস্ব পারিবারিক গৃহ-জীবনের আদর্শটুকু পাঠককে জানিয়েছেন। রাজলক্ষ্মীর মন্তব্য ঃ 'ঐ যে তাঁতিদের সঙ্গে একটা সুব্যবস্থা হ'লো ঃ সেকি... তেজ দেখিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়াতেই হয়েছে ভাবে? কখ্‌খনো না। সে করেচে ওর বড়জা কেঁদেকেটে স্বামীর পায়ে ধরে। সুনন্দা সমস্ত সংসারের কাছে ওর গুরুজন ভাসুরকে চোর বলে ছোট করে দিলে—এইটেই কি শাস্ত্রশিক্ষার বড় কথা? ওর পুঁথির বিদ্যে যতদিন না মানুষের সুখ-দুঃখ, ভালোমন্দ, পাপপূণ্য লোভ মোহের সঙ্গে সামঞ্জস্য করে নিতে পারবে ততদিন ওর বইয়ে পড়া কর্তব্যজ্ঞানের ফল মানুষকে অযথা বিঁধবে, অত্যাচার করবে, সংসারে কাউকে কল্যাণ দেবে না...।"

'পণ্ডিমমশাই'-এর কাহিনীতেও ভ্রাতা-ভগ্নীর স্নেহময় পরিবার জীবনের চিত্র এবং বাইরের প্রাণী (কুসুমের দাদার শাশুড়ী)-র জটিলতায় তার বিনষ্টির রূপও দেখানো হয়েছে। এররকমই পল্লীসমাজের আদর্শ গৃহজীবন ছবি 'মামলার ফল' গল্পে পাঠককে অভিভূত করে। সেখানে মাতৃহীন দুরন্ত দেবর পুত্রের জন্য পৃথকান্ন হ'য়ে খাওয়ার পরেও জেঠিমার স্নেহমমতার কমতি হয় না, বরং দেবর পুত্রকে নিয়েই সে নিজের ক্ষুদ্র-সংসার ছেড়ে আত্মপর জ্ঞানহীন বৃহৎ প্রেমের নিরাভরণ সংসার পেতে বসেছে।

এভাবেই শরৎচন্দ্র তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসে বাংলাদেশের পল্লীসমাজের গৃহ জীবনের আদর্শ তথা স্নেহ-ভালবাসাময় আত্মপরজ্ঞানহীন নিঃস্বার্থ সেবাময় একান্নবর্তী সংসারের অসংখ্য আবেগময় চিত্র রচনা করে তাঁর মূল লালস প্রবণতাকে পরিস্ফুট করেছেন। তাঁর জবীন চেতনার স্বরূপটি সম্বন্ধে প্রখ্যাত অলোচক এভাবে আলোকপাত করেছেন ঃ '....উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী জীবনের অন্তর্নিহিত যে রূপ, যাহা বাংলার প্রাচীনতর শাক্ত ও বৈষ্ণব সাধনার যুগ্মধারায় সিঞ্চিত ও রঘুনন্দনের শাসনে দৃঢ় গঠিত, শরৎচন্দ্র তাহাকেই সাহিত্যে একটি রসরূপ দান করিয়াছেন।.... শরৎচন্দ্র প্রাণে মনে নেই গত যুগেরই বংশধর, যাঁহার রচিত সাহিত্যে আমরা একটা বিলীয়মান যুগের বাঙালী সভ্যতা, বাঙালী সমাজ এবং সেই সমাজের শক্তি ও অশক্তির যে মর্মান্তিক লিপিচিত্র পাইয়াছি, তাহাই বাংলাসাহিত্যে অমর হইয়া থাকিবে।' (সাহিত্যবিতান, মোহিতলাল মজুমদার)

(চার) শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে পল্লীমসমাজের অসংখ্য কুসংস্কার, কুপ্রথা, ধর্ম ও জাতিভেদ এবং সেই সঙ্গে ধর্মরক্ষক ও সমাজ-পতিদের ভূমিকা

পল্লীবাংলাকে শরৎচন্দ্র প্রাণমন আত্মা দিয়ে একান্ত নিবিড় বাঙালী সমাজ জীবনের বহু বিচিত্ররূপ বহু ভালবাসায় তিনি বারংবার এঁকেছেন। কিন্তু তাঁর এই ভালবাসায় যেহেতু খাদ ছিল না, সেহেতু সমাজের কল্যাণসাধন তাঁর চেতনায় অলক্ষ্যে ছিল এবং যেহেতু আমাদের গ্রামসমাজের চিরায়ত রূপাদর্শ তিনি কোনমতেই বর্জনের পক্ষপাতী ছিলেন না,— সেইহেতু বাংলাপল্লী সমাজের ভাল-মন্দ, সু ও কু সমস্তই তিনি অবিচলভাবে তাঁর রচনায় উপস্থিত করেছেন। নিজের পল্লীসমাজকে ভালবেসেই তিনি এর গ্লানি ও হীনতার দিকটিকে অধিক প্রকট করেছেন। সমাজের অধঃপতন সম্বন্ধে তাঁর তীব্র অসন্তোষ ও রুষ্ট সমালোচনা যে তাঁর একাধিক উপন্যাসে অভিব্যক্ত হ'য়েছে— এর মূলে আছে শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজের প্রতি আন্তরিক ভালবাসা।

শরৎচন্দ্র স্বয়ং বাংলার সমাজ সম্বন্ধে অনিলা দেবী ছদ্মনামে 'সমাজ-ধর্মের মূল্য' নামক যে আলোচনাটি লেখেন, সেটির কিয়দংশ এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা গেল।—'যে সমাজ মড়া মরিলে কাঁধ দিতে আসে, আবার শ্রাদ্ধের সময় দলাদলি পাকায়, বিবাহে যে ঘটকালি করিয়া দেয়, অথচ, বউভাতে হয়ত বাঁকিয়া বসে, কাজে কর্মে হাতে পায়ে ধরিয়া যাহারা ক্রোধশান্তি করিতে হয়। উৎসবে, ব্যসনে যে সাহায্যও করে, বিবাদও করে, যে সমস্ত দোষ ত্রুটি সত্ত্বেও পূজনীয়—আমি তাহাকেই সমাজ বলিতেছি,....

.....সমাজ যদি তাহার শাস্ত্র বা অন্যায় দেশাচারে কাহাকেও ক্লেশ দিতেই বাধ্য হয়, তাহার সংশোধন না করা পর্যন্ত এই অন্যায়ের পদতলে নিজের ন্যায্য দাবী বা স্বার্থ বলি দেওয়ায় যে কোন পৌরুষ নাই, তাহাতে যে কোন মঙ্গল হয় না, এমন কথাও ত জোর করিয়া বলা চলে না।' ('সমাজধর্মের মূল্য', ভারতবর্ষ বৈশাখ ও জৈষ্ঠ ১৩২৩, শ্রীমতি অনিলা দেবী)

শরৎচন্দ্র এভাবে বাংলার যে সমাজের কথা বলেছেন, সেটি নিঃসন্দেহে বাংলার পল্লীসমাজ। এই বঙ্গপল্লীর সমাজকে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে দেখে তার ভালমন্দ যাবতীয় বৈশিষ্ট্য তিনি তুলে ধরেছেন নিজের লেখাতে। শরৎচন্দ্রকে সমাজ মনস্কতার দিক থেকে ''উনিশ শতকের বঙ্কিম সমসাময়িক ও বঙ্কিম অনুসারী লেখকগোষ্ঠীর ধারণানুসারী''। (গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, 'দুই বিশ্বযুদ্ধের

মধ্যকালীন বাঙলা কথা সাহিত্য' পৃ. ১৩১, প্রথম সংস্করণ ১৩৮০) তথা পুরোনো পন্থী সমাজ-মনস্ক লেখক আখ্যা কেউ কেউ দিলেও, শরৎচন্দ্র এক প্রবল সমাজ-বিদ্রোহীর মতই কিন্তু বারংবার বিবিধ ছলে বঙ্গপল্লীর তথা বাঙালীর পুরোনো সমাজ ব্যবস্থার দুর্নীতিগুলির খুঁটিনাটি পাঠকের চোখের সামনে তুলে ধরে সমাজের অধঃপতনের বা অবক্ষয়ের প্রতি তীব্র ক্ষোভ, ঘৃণা ও প্রতিবাদ প্রকাশ করেছেন।

'আচারে শুষ্কতা এবং কুসংস্কারের বোঝা বঙ্গপল্লীর সমাজ জীবনকে এই শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ পর্যন্ত পঙ্গু করে যে রেখেছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। শরৎচন্দ্রের লেখনি ধারণকাল অর্থাৎ চতুর্থ দশক পর্যন্তও বাংলার পল্লীসমাজের বহু কুসংস্কার তাকে বদ্ধ জলাশয়ের মতই পঙ্কিল করে তুলেছিল। শরৎচন্দ্র উত্তরজীবনেও হাওড়ার সামতাবেড় পানিত্রাসে দীর্ঘ সময় গ্রামের প্রত্যক্ষ যোগাযোগে কাটিয়েছেন। কাজেই তার লেখা সত্য ও তথ্যমূলক অবশ্যই।

তখনও কুসংস্কারে আবদ্ধ গ্রামবাসী মেয়েদের ইংরাজী শিক্ষা তথা সায়েবিয়ানার ঘোর বিরোধী ছিল। ধর্মের গোঁড়ামি হিন্দু সমাজকে তখনও প্রতিপদে পশ্চাদমুখী করে তুলত। ব্রাহ্ম কন্যা অচলা বধু বেশে ব্রাহ্মণ পরিবারে এসে প্রবেশ করলে, তাকে গ্রামবাসীরা সাদর অভ্যর্থনা জানায়নি, বরং তার জামা জুতো পরা দেখে, তার বয়স অনুমান করে পরস্পরের মধ্যে 'মুখ চাওয়া-চাওয়ি', 'গা টেপাটেপি' ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গে 'বেশ, মেলেচ্ছ' প্রভৃতি মন্তব্যও করতে ছাড়েনি। মহিমের দূরসম্পর্কের এক ঠানদি কোনক্রমে অচলাকে হাত ধরে ঘরে এনে বসিয়ে রেখে বিদায় নেয়। কেননা, দেখা গেছে অচলা ব্রাহ্মকন্যা অতএব ম্লেচ্ছ বা অশুচি। এদের সংস্পর্শে থাকলে পল্লীসমাজ নামধারী প্রবল দেবতাটি রীতিমত ক্রুদ্ধ হবেন। শরৎচন্দ্র লিখেছেন, "বস্তুতঃ ঠানদিদির অপরাধ ছিল না। ....পাড়াগাঁয়ে বাসকরিয়া এ সকল জিনিষকে ভয় করে না, এতবড় বুকের পাটা পল্লী ইতিহাসে সুদুর্লভ। ব্রাহ্মকন্যাকে বিবাহ করা ব্রাহ্মণ সন্তনের পক্ষে একটি বিরাট অপকর্ম এবং তার প্রতিফল এ মহিমকে পেতে হ'ল তাঁর গৃহদাহের মাধ্যমে—এই হীন সংস্কার রোধের কথা অনায়াসে গ্রামস্থ ভদ্রজনের মুখপাত্র স্বরূপ বাঁড়ুজ্যেমশাই বলতে পেরেছেন ঃ "ব্রহ্মার ক্রোধ ত শুধু শুধু হয় না বাবা। আমাদের একবার জিজ্ঞাসা পর্যন্ত করলে না, এতবড় বামুনের ছেলে হয়ে কি অকর্মটাই না করলে.... কৈ আর কারুর প্রতি ব্রহ্মার অকৃপা হ'ল না কেন! বাবা, বেহ্মও যা খ্রীষ্টানও তাই। সাহেব হলেই বলে খ্রীষ্টান আর বাঙালী হলেই বলে বেহ্ম।....যাই কর না বাবা, আগে একটা প্রায়শ্চিত্ত করে ওটাকে ত্যাগ করে—" ইত্যাদি। গ্রাম সমাজের ব্রাহ্মবিদ্বেষ 'দত্তা' উপন্যাসেও বর্ণিত হ'য়েছে। বিজয়ার পিতা বনমালী রায় ও তার বাল্যবন্ধু রামবিহারী উভয়ে ব্রাহ্মবিবাহ

করায় গ্রাম সমাজে প্রবল বিরোধিতা হয়। "....গ্রাম জুড়িয়া এমনি একটা কদর্য হৈ হৈ শুরু হইয়া গেল যে,.." বনমালী "গ্রাম ছাড়িয়া কলিকাতায় আসিয়া বাস করিল," কিন্তু রামবিহারীর "..... কোনমতে তাহার দেশের বাটিতেই 'একঘরে' হইয়া বসিয়া রহিল।" দীর্ঘদিন বাদে পিতার মৃত্যুর পর জমিদার কন্যা বিজয়া যখন নিজে আধুনিকা শিক্ষিতা নারীর মতই সর্বসমক্ষে খোলা গাড়িতে করে গ্রামে স্টেশন থেকে পৌঁছল তখনও তার প্রজারা "সে প্রকাশ্যে জুতামোজা পরে—খাদ্যাখাদ্য বিচার করে না—ইত্যাদি কুৎসা" "সঙ্গোপনে" করেছে।

বাংলার পল্লীসমাজে শাস্ত্রাচার বিকৃত হয়ে যে বিভিন্ন কুসংস্কার সৃষ্টি করেছে 'বামুনের মেয়ে' উপন্যাসের শুরুতেই সেরকম একটি কুসংস্কারের বিবরণ রয়েছে, যার দ্বারা গল্পকহিনী জটিলতার দিকে এগিয়েছে। একটি ঘুমন্ত ছাগলের দড়ি ডিঙিয়েছিল রাসমনি তথা 'রাসু বামনির নাতনী। এবং সেদিন ছিল মঙ্গলবার এবং বারবেলা। এই দিনক্ষণে ছাগলদড়ি ডিঙানো রাসমনির কাছে গর্হিত অপরাধ বলে বোধ হয়েছে। সে নাতনীকে তীব্র ভর্ৎসনা বাক্যে বিদ্ধ করেছে। "পোড়ামুখী বামুনের ঘরের ন'দশ বছরের বুড়োধাড়ী মেয়ে এটা শেখোনি যে ছাগলদড়ি ডিঙোতে মাড়াতে নেই, কিছুতে নেই।" শুধু তাই নয়, এর ফলে তার নাতনীর যে বিশেষ অমঙ্গল হ'তে পারে, এই বদ্ধমূল কুসংস্কারে সে ছাগলের অদৃশ্য মালিককেও যথেচ্ছ ভর্ৎসনা করেছে।'....এই মঙ্গলবারের বারবেলায় মেয়েটা যে দড়িটা ডিঙিয়ে ফেললে—কেন? কিসের জন্যে পথের ওপর ছাগল বাঁধা? বলি তাদের ঘরে কি ছেলেমেয়ে নেই? তাদের কি একটা ভালমন্দ হতে জানেনা?" গ্রাম্য কুসংস্কারের প্রাবল্যে 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে (চতুর্থ খণ্ড) রাজলক্ষ্মী এক গণৎকারকে কমললতাদের বৈষ্ণব আখড়া থেকে কলকাতায় পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার আয়োজন করেছিল শ্রীকান্তর মঙ্গলের জন্য তাকে দিয়ে গ্রহ শান্তির ক্রিয়া কর্মের জন্য। "....গণক....বলিল, মশায় আপনার তো দেখি মস্ত ফাঁড়া—ফাঁড়া? কবে? খুবশীঘ্র। মরণ বাঁচনের কথা।—চাহিয়া দেখিলাম রাজলক্ষ্মীর মুখে আর রক্ত নাই—ভয়ে সাদা হইয়া গিয়াছে।.....চতুর গণক তৎক্ষণাৎ বুঝিল হিসাবে তাহার ভুল হয় নাই, বলিল...কিন্তু রুষ্ট গ্রহকেও শান্ত করা যায়, তার ক্রিয়া আছে..." এই রকম ভাবে তুকতাক, মন্ত্র-তন্ত্রে বিশ্বাসের কুসংস্কারের প্রসঙ্গও শরৎচন্দ্র দিয়েছেন। 'পল্লীসমাজের প্রথমেই রমার মামীর কটূক্তিতে জানা যায় যে, রমেশের সঙ্গে রমার বিয়ে না দেওয়ার রমেশের পিতামাতা কোনা তুক তাকের আশ্রয় নেওয়াতেই স্বল্পদিনের মধ্যেই রমার বৈধব্য ঘটেছে। বেণী ঘোষালও সায় দিয়েছে এ কথায় এবং ভৈরব আচার্য্যের নাম করেছে, তুকতাক করার ব্যক্তি হিসেবে তাকে রমেশের পিতামাতা হয়ত ব্যবহার করেছিল।

বাংলার গ্রাম সমাজে যত সংস্কার, জীবনাচরণ বা প্রথা বিদ্যমান, সমস্ত কিছুর সঙ্গেই একটা ধর্মভীতি জড়িয়ে আছে। কিন্তু ধর্মবোধ সংকীর্ণ হওয়ায় সেখানে

আবিলতা সৃষ্টি হ'য়েছে। আচার, সংস্কার অভ্যাস প্রথা মানুষের জীবনে গভীর প্রভাব ফেলে একথা ঠিক, শরৎচন্দ্র তাকে গুরুত্ব দিয়েছেন, কিন্তু যথার্থ ধর্মে কোনও আবিলতা থাকতে পারে না। তাহলে মানুষের সুস্থ জীবনবিকাশে তা বিঘ্ন ঘটায়। বাংলাদেশের পল্লীগ্রামে এইভাবেই অজস্র কুপ্রথা ধর্মের নামে স্বার্থবুদ্ধি সম্পন্ন ধর্মরক্ষকরা সৃষ্টি করে ছিল। সেগুলি দীর্ঘকাল বাঙালীর জীবনকে পঙ্গু করে রাখে। শিক্ষাবিকাশের ফলে শহরাঞ্চলের বাঙালী সমাজজীবনে সেগুলি সামান্য কমে গেলেও গ্রাম কেন্দ্রিক বাংলাদেশের বৃহত্তর জনসমাজে বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশক পর্যন্তও (শরৎ সাহিত্য-সৃষ্টি কালীন সময়) যে যথেষ্ট প্রবল ছিল, সেকথা যথার্থ। এই কারণে শরৎ-সাহিত্যের অধিকাংশ কাহিনীতে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে তৎকালীন গ্রাম সমাজে প্রচলিত বিবিধ কুপ্রথাগুলি। শরৎচন্দ্র সেগুলিকে দেখিয়েছেন মনুষ্যত্ব বিকাশের অন্তরায় হিসেবে, মনুষ্যত্বের অবমাননা কারীরূপে।

'বামুনের মেয়ে উপন্যাসে' বাংলাদেশে প্রায় ঊনবিংশ শতকের শেষ পর্যন্ত সুপ্রচলিত কৌলিন্য প্রথার ন্যক্কারজনক পরিণাম মর্মস্পর্শীভাবে লেখক দেখিয়েছেন। বিখ্যাত কুলীন বংশের কন্যা সন্ধ্যার বিবাহে আবার প্রমাণিত হ'ল তার পিতা নাপিতের ঔরসজাত সন্তান। এই ভয়ংকর সত্য উদ্‌ঘাটনে সন্ধ্যার বিবাহ বন্ধ হ'য়ে গেল, তারা সমাজ থেকে বিচ্যুত হ'ল। শেষ পর্যন্ত তার মা প্রায়শ্চিত্ত করে হয়ত জাতে উঠবে এমন সম্ভাবনার ইঙ্গিত শরৎচন্দ্র দিয়েছেন, কিন্তু সন্ধ্যার পিতা প্রিয়নাথের কোনো সামাজিক ক্ষমা নেই। তাকে দেশ ত্যাগ করতে হ'য়েছে। সন্ধ্যা তার অনুগামী হ'ল।

এ বিষয়ে সমালোচকেরা বিভিন্ন মত পোষন করেছেন। অধিকাংশেরই মত এই যে, শরৎচন্দ্র যে সময়কালের পটভূমিতে এই কাহিনী রচনা করেছেন সে সময় সমাজে কৌলিন্য প্রথার অবমান ঘটেছিল।

ক. "এই কৌলীন্য-সমস্যা আজ বাংলা দেশে প্রায় নিঃশেষিত বলিয়া ইহার ভয়ঙ্কর রূপই আমাদের প্রত্যয়যোগ্য হওয়া কঠিন........এই সমস্যার কেন্দ্রিক গল্প উপন্যাসের আকর্ষণ স্বভাবতঃই কমিয়া যাইতেছে।" (শ্রী শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধায় শরৎচেতনা। পৃ. ৫৪৯)

খ. 'বামুনের মেয়ে' গল্পে মুকুন্দ মুখুজ্যে ও হিরু নাপিতের কাহিনী শরৎচন্দ্রের সমকালীন সমাজের ঘটনা বলে মনে হয় না।....হয়ত জনশ্রুতির মধ্য দিয়ে সামাজিক অবক্ষয়ের ঐ ধরনের ঘৃণাই অথচ করুণ কাহিনী শরৎচন্দ্রের শ্রুতিগোচর হ'য়েছিল।.. ..সামাজিক কথাকারের প্রতি কশাঘাত করাবার জন্য শরৎচন্দ্র মনুষ্য হৃদয়ের সেই হাহাকারকে তুলে ধরেছেন, যদিও সমকালীন সমাজে এই ধরনের কদাচার প্রবহমান ছিল না।" (তাবাপদ লাহিড়ী, শরৎসাহিত্যে সাময়িকতা ও দেশকাল নিরপেক্ষতা । উত্তরকাল ও শরৎচন্দ্র শিশির মজুমদার সম্পাদিত গ্রন্থের ১৩২-১৩৩ পৃ.)

গ. সর্বোপরি ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমত ঃ

'কৌলীন্য-প্রথার কুফল ও কৌলীন্য-গর্বের অসংগত ও অন্তঃসারশূণ্যতা ইহার (বামুনের মেয়ে) আলোচ্য বিষয়। এই ব্যধির জীবানু আমাদের সমাজদেহে আর সেরূপ সজীব ও ক্রিয়াশীল নাই, ইহা এখন একটা অতীতের স্মৃতি মাত্র।''

সমাজে কৌলীন্য প্রথার ফলে কুলীন কন্যাদের কুলীন বংশে কন্যা বিবাহ দান রীতি অবশ্য করণীয় ছিল। কিন্তু কুলীন পাত্রেব অভাব বশতঃ শিশুকন্যাসহ বয়োবৃদ্ধা নারীরও এক সঙ্গে এক পাত্রের হাতে সমর্পণ করা সে সময়ের সত্য চিত্র ছিল। মৃত্যুপথযাত্রী কুলীন পাত্রের হাতেও কন্যা সম্প্রদানের অসংখ্য উদাহরণ আছে। আর সর্বপ্রধান ব্যাপার ছিল কুলীন পাত্রের অসংখ্য বিবাহ, এমন কি, বিপুল সংখ্যক পত্নীগ্রহণের ফলে তাঁরা সব পত্নীর গৃহে (সেই সব পত্নীরা পিত্রালয়েই থাকতেন) থেকেও পারতেন না। কিন্তু কুলীন জামাতা হিসেবে অর্থ আদায়ের তাগিদে কখনো কখনো অতি ঘৃণিত কাজ তাঁরা করতেন। উৎকোচের লোভ দেখিয়ে সমাজের নীচুশ্রেণীর কোনো পুরুষকে নিজের নামে শ্বশুরালয়ে প্রেরণ করতেন। এর ফলে অবৈধ পুরুষ সংসর্গে কুলীন পত্নীদের সন্তানাদিও জন্মাতো। ঊনবিংশ শতকের রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন-কুল সর্বস্ব' নাটকে এই কুৎসিত প্রথার বিস্তৃত বর্ণনা আছে। 'বামুনের মেয়ে' উপন্যাসে শরৎচন্দ্র কৌলীন্য প্রথার এই অসামরিক রূপটি দেখাতে চেয়েছেন। সন্ধ্যার পিতামহী ছিলেন ঐ করম দুর্ভাগিনী এক কুলীন কন্যা ও কুলীন পত্নী, মুকুন্দ মুখুজ্যে নামক তার অপরিচিত (কেননা, বিবাহ রাত ভিন্ন তাদের দেখা সাক্ষাৎ। ঘটেনি) স্বামী হিরু নাপিতকে স্বামীর পাওনা আদায়ে পাঠানোর ফলে সন্ধ্যার পিতা প্রিয়নাথের জন্ম। এ ব্যাপারটি বহুল প্রচলিত ছিল। কিন্তু যেহেতু হিরু নাপিত ধরা পড়ে এবং সর্বসমক্ষে সত্য উদ্‌ঘাটিত হয় তাই সন্ধ্যার পিতামহীকেই দেশ ছেড়ে কাশীবাস করতে হয়। দীর্ঘদিন বাদে চাপা পড়া এই সত্য নতুন করে আবিষ্কার করে গ্রামের সমাজপতি অথচ অসচ্চরিত্র, কুচক্রী গোলক চাটুজ্যে। সন্ধ্যার বিবাহ বন্ধ হয়। তার মা জগদ্ধাত্রীর হয়ত প্রায়শ্চিত্ত করে সমাজে ওঠার একটা বিধান আছে এমন ইঙ্গিত শরৎচন্দ্র দিয়েছেন। কিন্তু প্রিয়নাথের ক্ষমা নেই। সমাজের চাপে তাকে দেশত্যাগী হ'তে হ'য়েছে। কন্যা সন্ধ্যা পিতারই অনুগামী হয়।

'কৌলীন্য' প্রথার এই ন্যক্কারজনক দিকটি হয়ত সমাজ থেকে উঠে গিয়েছিল, অর্থাৎ এক পাত্রের সংখ্যাধিক বিবাহ প্রথা ।

কিন্তু কৌলীন্য প্রথার আরও অনেক সামাজিক দিক তখনও রক্ষিত হ'ত, সেগুলি 'বামুনের মেয়ে' উপন্যাসে আছে।

যেমন , কুলীন বংশ ছাড়া অন্যত্র কুলীন কন্যার বিবাহে সমাজের অস্বীকৃতি। সন্ধ্যা যেহেতু উচ্চকুলীন বংশের কন্যা সেহেতু সমাজে তাদের থেকে বংশমর্যাদায়

খাটো শিক্ষিত ব্রাহ্মণ সন্তান এবং সন্ধ্যার অনুরাগী অরুণের সঙ্গে সন্ধ্যার বিবাহ-চিন্তাই সন্ধ্যার মা করতে পারেন না। এমনকি সন্ধ্যাও এই সামাজিক চেতনায় আষ্টেপৃষ্ঠে আবদ্ধ। সে অরুনকে এই কৌলীন্য অভিমানে বলতে পেরেছে ঃ "....তুমিও আমর স্বজাতি—কিন্তু তবুও বাঘ আর বেড়ালও এক নয় অরুন দা।"...

সামাজিক উচ্চাসনের মোহ মানুষের হৃদয়ের আবেদনকেও কিভাবে ছিন্নকরে, তার প্রমাণ সন্ধ্যা। কৌলীন্য গর্বে গর্বিত সে প্রণয়ী অরুনকে জানাতে দ্বিধা করে যে, "....বাবা রাজি হ'তে পারেন, মাও ভুলতে পারেন, কিন্তু আমি ভুলতে পারিনে, আমি কত বড় বামুনের মেয়।" অরুনের বিবাহ প্রস্তাব সে এইভাবেই তুচ্ছ করেছে।

'পল্লীসমাজে' বিবাহ-আসরে উপস্থিত কন্যার বিবাহ নষ্ট হ'লে তাকে লগ্নভ্রষ্টা বলা হয়। এবং সে মেয়ের বিবাহ পুণর্বার হয় না। সেক্ষেত্রে মেয়েকে সেই লগ্নে যে কোনও অপর পাত্রের হাতে দিতে হয়, নতুবা পিতা মাতা বা আত্মীয়জন জাতিচ্যুত হন। 'অনুপমার প্রেম' গল্পে এই রকম ভাবেই বর পলাতক হওয়ায় অনুপমাকে বৃদ্ধপাত্রের হাতে দিয়ে পিতা জাতিরক্ষা করেছিলেন। বামুনের মেয়ে উপন্যাসে সন্ধ্যা যে ক্ষেত্রে ছুটে গেছে অরুনের কাছে ঃ ".....না, না অরুনদা....আমাকে আর কেউ নেবে না—কেউ বিয়ে করবে না। কেবল তুমি ভালবাসো— কেবল তুমিই আমার চিরদিন মান রাখো।"

পল্লীসমাজে কন্যাপাত্রস্থ করার রীতি অতি কঠিন। উপযুক্ত কুল-জাত-মান বজায় রাখার আবশ্যকতায় বাল্য বিবাহের প্রথাটি অতি প্রচলিত ছিল। এই বাল্য বিবাহে বালিকা এমন কি শিশু কন্যার বিবাহ হ'তে পারত বৃদ্ধের সঙ্গে। কন্যাদের বয়স বৃদ্ধি হ'লে পিতামাতার জাতিচ্যুত হ'বার ভয় থাকত। সেই জন্য পাত্র নির্বাচনে বয়স, রূপ, অর্থ কিম্বা চরিত্র কোনও কিছুই বিচার করা হ'ত না, এছাড়া ছিল পণপ্রথা। উপযুক্ত পণ না সংগ্রহ করতে পারলে কন্যাদের বিবাহ ত'ত না। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের রাজলক্ষ্মী ও তার দিদি সুরলক্ষ্মী' এই প্রথার করুন পরিণতি লাভ করেছে, তাদেরকে এক সঙ্গে একরাত্রে বিবাহ দেওয়া হ'য়েছিল 'স্বভাব কুলীন', 'বয়স যাটের কাছে'। "হাবাগোবা ভালমানুষ" এক 'বামুন ঠাকুরে'র সঙ্গে। পাত্র একান্ন টাকা পণ দুইটি কন্যাকে বিবাহের জন্য নিতে রাজী হয়নি পাত্র। কারণ এ টাকায় নাকি "একজোড়া ভাল রাম ছাগল পাওয়া যায় না।" তাই সে 'দুটো ষাঁড় কেনার খরচ' স্বরূপ একশ টাকা চেয়ে শেষে সত্তর টাকায় রাজী হয়। 'শ্রীকান্ত'র চতুর্থ পর্বে রাজলক্ষ্মী আবার জানিয়েছে, সত্তর নয় পঁচাত্তর কাটায় বিবাহ রফা হয় এবং পঁচিশ টাকা বাঁকি থাকায় "কুশণ্ডিকে" না করেই (অর্থাৎ বিবাহ সম্পূর্ণ না করে) বর পলাতক হয়। বহু অনুসন্ধানে শেষে জানা

গেল বর কলকাতার এক হোটেলে "রাঁধতে বাঁধতে জ্বরে পরেছে। বিয়ে আর পুরো হ'ল না।" তাই তার দিদি সুরলক্ষ্মী 'আধকপালা', 'পোড়াকপালা' ইত্যাদি গ্রাম্য আখ্যা পেয়ে লজ্জায় বেদনায় ঘর থেকে বেরোতো না। শেষে "একেবারে শ্মশানে" তাকে নিয়ে যাওয়া হয়। আর রাজলক্ষ্মীর শেষ পরিণতি কাশীতে পিয়ারী বাঈজী হওয়া। রাজলক্ষ্মী বলেছে ঃ "আমাদের দু'বোনের মত শাস্তিভোগ এদেশে কত শত মেয়ের কপালেই ঘটে। আর কোথাও বোধ হয় কুকুর-বেড়ালেরও এমন দুর্গতি করতে মানুষের বুকে বাজে।"

শরৎচন্দ্রের বুকে এই নিষ্ঠুর সমাজপ্রথা খুব গভীর হ'য়ে বেজেছিল। তাই তাঁর আরও অনেক রচনাতেই মেয়েদের বিবাহ সমস্যা ও সেই কারণে সামাজিক লাঞ্ছনা, পণপ্রথার চরম হৃদয়হীনতা অকম্পিত লেখনি চিত্রে ফুটিয়ে তুলেছেন। 'বিরাজ বৌ'-তে নীলাম্বর ও বিরাজের জীবনে দুঃখ ঘনিয়ে এসেছে তাদের দারিদ্র্যের জন্যই প্রধানত। এবং তাদের সেই দারিদ্র্যের কারণ নীলাম্বরের ভগ্নী পুঁটি বা হরিমতীকে সুপাত্রে দান করার দরুণ অপর্যাপ্ত পণ যোগানের দায়ে সম্পত্তি বন্ধক দেওয়া ও বিক্রয় করা। পুঁটিকে সন্তানধিক স্নেহে মানুষ করলেও, অর্থাভাবে স্বামীর লাঞ্ছনাও অপমান এবং সাংসারিক দুঃখ সহ্য না করতে পেরে বিরাজ বৌ এর মুখ থেকে নিদারুণ আক্ষেপার্তি শোনা গেছে ঃ "পুঁটিকে মানুষ করেছি,...কিন্তু সে হতে আমার এতটা দুঃখ ঘটবে জানলে ছোট বেলায় তাকে নদীতে ভাসিয় দিতুম। ...হা ভগবান! বড়লোক তারা, কোন কষ্ট, কোন অভাব নেই, তবুও জোঁকের মত আমার রক্ত শুষে নিতে তাদের এতটুকুও দয়া মায়া হচ্ছে না?"

মেয়ে 'অরক্ষনীয়া' অর্থাৎ বিবাহের নির্দিষ্ট বয়সসীমা অতিক্রম হয়ে গেলে সমাজ যে কি নিদারুণভাবে সেই কন্যা বা তার পিতামাতাকে পীড়ন করে, 'অরক্ষনীয়া' রচানায় সেই সমাজ-প্রথার নিষ্ঠুরতা দেখানো হ'য়েছে। বয়স্থা অনূঢ়া কন্যা জ্ঞানদার বিবাহ চিন্তায় তার মা দুর্গাসাগর রোগশয্যা আরও দুর্বিষহ হ'য়েছে। কেননা প্রতিবেশিনীগণ জানিয়েছে এই মেয়ে তার মৃত্যুর পর পারলৌকিক ক্রিয়ার অধিকার পাবে না। কাজেই গর্ভস্থ সন্তান মায়ের কাছে 'পরমশত্রু' বোধ হয়েছে, কেননা পারলৌকিক ক্রিয়া না হ'লে মায়ের আত্মার গতি হবেনা। এই অন্ধ কুসংস্কারে দুর্গামনি নিজেকে পরম পাপিষ্ঠা মনে করে নিজের দুর্ভাগ্যের জন্য নিজকে দায়ি করেছেন ঃ আর জন্মে কত স্ত্রীহত্যা, ব্রহ্ম হত্যা করেছিলুম।" সামাজিক এই অন্ধ অনুশাসন মাতৃস্নেহর প্রতি রুদ্ধ করে দিয়েছে। জ্ঞানদাকে পাত্রপক্ষ জবাব দিয়ে যাওয়ায় তার আত্মীয়-কুটুম্ব যেমন তাকে লাঞ্ছনা করেছে, তেমনি সেই লাঞ্ছিতা কন্যাকে মা দুর্গামনি পর্যন্ত কুটবাক্যে বিদ্ধ করেছে, কঠিন নিগ্রহ করেছে । প্রখ্যাত সমালোচক, মেয়ের হাতের জল শুদ্ধ

হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় বৃদ্ধ গোপাল ভট্টাচার্য্যের হাতেই প্রাণাধিকা কন্যাকে তুলে দেওয়ার জন্য মা দুর্গামনির আগ্রহ আতিশয্যকে এইভাবে ব্যাখ্যা কারেছেন : "সমাজের ক্রুরতম নির্যাতন সেইখানে, সেখানে তাহার বিষাক্ত প্রভাবে মাতৃস্নেহ পর্যন্ত নিষ্ঠুর জিঘাংসাতে রূপান্তরিত হয়। (বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃ. ২৪২, পঞ্চম পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সং ১৩৭২)

'শুভদা' উপন্যাসেও বিবাহ-বিষয়ে পল্লীসমাজের এই বিধানে চেয়ে ছলনার বিবাহ-সমস্যা বা শুভদার কাছে পুত্রের রোগ সমস্যার চেয়ে প্রধান হ'য়ে উঠেছে, ছেলে "মাধবের নিকট পার আছে, কিন্তু বাঙালীর ঘরে ছলনার নিকট পার নাই" ছেলের মৃত্যুশোকে পল্লীসমাজ সান্ত্বনা দেবে, সাহায্য করবে, কিন্তু সময়মত কন্যাপাত্রস্থ না হ'লে সেই গ্রাম সমাজই শুভদার পরিবারের কলঙ্ক রটাবে, সমাজচ্যুত করবে।

'পথনির্দেশে'র হেম অনূঢ়া থাকতে চাইলে মা সুলোচনা যথার্থ বলেছে, তাতে তাদের জাত যাবে এবং গ্রাম ছাড়তে হবে। কেননা, "জাত গেলে কেউ উঠোন ঝাঁট দিতেও ডাকবে না।"

সামাজিক চাপে বালিকার বৃদ্ধ স্বামী বরণ করার অনিবার্য পরিণতি বৈধব্য। বিধবাবিবাহ উনবিংশ শতকে আইনে পরিণত হয় ঠিকই, কিন্তু দীর্ঘকাল পরেও পল্লীসমাজে তা গৃহীত হয়নি। শরৎচন্দ্রের কালেও বিধবাবিবাহ আমাদের পল্লীগ্রামে অকল্পনীয় এবং ক্ষমাহীন সামাজিক অপরাধ ছিল। জাতিচ্যুতি বা একঘরে হওয়া অর্থাৎ সম্পূর্ণ ভাবে সমাজে নিন্দিত হ'য়ে থাকাই এর শাস্তি ছিল। এই বালবিধবাদের জন্য সামাজিক কড়াকড়ি, আচার নিয়মের প্রাবল্য, সমস্তরকম সুখ ও আনন্দ থেকে বঞ্চিত রাখা শরৎচন্দ্রের দরদী প্রাণকে কাঁদিয়েছিল। তিনি এই নিষ্ঠুর সমাজ-বিধানে নিষ্পেষিত নারী জীবনচিত্র এঁকে প্রকারান্তরে পল্লীসমাজের প্রথাকে তীব্র সমালোচনা করেছেন। কোনও কোনও বিধবার হয়ত বা জৈবিক প্রবৃত্তিবশত অথবা, দুষ্কৃতিকারীর প্ররোচনায় পদস্খলন হ'য়ে থাকতে পারে। সমাজে তার জন্য কঠিন দণ্ড ছিল। শরৎচন্দ্র এই হতভাগিনীদেরও সহানুভূতির চোখে দেখেছেন। আবার, সনাতন হিন্দু ধর্মের বিধান, রক্ষাকারিনী শুদ্ধাচারী বিধবা মূর্ত্তিকেও তিনি সশ্রদ্ধায় কোনো কোনো রচনায় তুলে ধরছেন। পল্লীসমাজে বিধবা সম্পর্কিত বিধিবিধান লেখক কিভাবে চিত্রিত করেছেন, আমরা সেটা উদ্‌ঘাটনে প্রবৃত্ত হবো।

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে ও একাধিক বড় গল্পে দেখা গেছে বিধবাবিবাহ বা বিধবার প্রেম সম্পর্কের প্রতি পল্লীসমাজ সর্বদা ক্ষমাহীন। এই সামাজিক নিষেধজ্ঞায় রমার প্রাণমন শৃঙ্খলাবদ্ধ ছিল বলেই রমেশের প্রতি তার অনুরাগকে কখনো প্রকাশ্যে আনতে পারেনি। বরং রমেশের বিরুদ্ধে তাকে মিথ্যে সাক্ষী দিতে হ'য়েছে সামাজিক কলঙ্ক রটনার দায় থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য। রমার

বুক ফেটে গেলেও একটিবারের জন্য মুখ ফোটেনি। কেননা তার গোপন প্রেম প্রকাশ হ'লে সমাজ-নীতি বিবর্জিত আচরণের অন্যায় দণ্ড সে শুধু একা ভোগ করবে না, তার সহোদর যতীন্দ্রকেও চিরজীবন সামাজিক লাঞ্ছনা ও অপমান ভোগ করতে হবে। তাই নিজের পারিবারিক ও বংশের সামাজিক সম্মান রাখবার জন্য নিজের ব্যক্তি চেতনাকে জলাঞ্জলী দিয়ে সে গ্রাম ত্যাগ করে জেঠাইমা বিশ্বেশ্বরীর সঙ্গে কাশীবাসী হ'য়েছে। শরৎচন্দ্র দেখিয়েছেন পল্লীসমাজ কিভাবে নারীর স্বপ্নসাধের পবিত্র সৌধটিকে তার নিষ্ঠুর প্রথার পেষণে গুড়িয়ে দিয়েছে। বিশ্বেশ্বরী রমেশকে প্রকারান্তরে এই কথাই বোঝাতে চেয়েছেন দেশত্যাগের মুহূর্তে। "বিশ্বেশ্বরী...বলিলেন, সংসারে তার স্থান নেই বাবা, ...যদি বাঁচে সারাজীবন ধরে এই অত্যন্ত কঠিন প্রশ্নের মীমাংসা করতে অনুরোধ করবে, কেন ভগবান তাকে এত রূপ, এত গুণ, এত বড় একটা প্রাণ দিয় সংসারে পাঠিয়েছিলেন এবং কেনই বা বিনাদোষে এই দুঃখের বোঝা মাথায় দিয়ে আবার সংসারের বাইরে ফেলে দিলেন!"

"পল্লীসমাজ একান্তই হ'য়ে উঠেছে মানব-জীবনের পরিচালক। তার অমোঘ শক্তিকে লঙ্ঘন করা শরৎচন্দ্রের নায়ক-নায়িকাদের হ'য়ে ওঠেনি। 'অনুপমার প্রেমে'র অনুপমা ও 'শুভদা'র ললনা বিধবা হ'য়েও পরবর্তী জীবনে প্রেমের স্পর্শ পেয়েছে। কিন্তু অনুপমা তার দাদা চন্দ্রবাবু দ্বারা নিষ্ঠুর অপমান পেয়ে আত্মহত্যার জন্য জলে ঝাঁপ দেওয়ায়, শেখান থেকে ললিতমোহন তাকে উদ্ধার করে আশ্রয় দিয়েছে। কিন্তু সামাজিক বিবাহের কথা এ প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র লেখেননি।

'শুভদা' উপন্যাসের বিধবা ললনাও সংসারের আর্থিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য কলকাতায় রূপ বিক্রয়ের বাসনায় জীবনের সব মূল্যবোধ হারিয়ে ফেলে যদিও জমিদার সুরেন্দ্রনাথের প্রেমে সে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে তবুও নিজ মজ্জাগত সংস্কার বশত ললনা নিজেই বিবাহে সম্মত হয়নি। সমাজ বিধির দৃঢ় শেকড় তার চেতনায় এভাবেই গভীরভাবে প্রোথিত হ'য়ে গেছে।

'পথ নির্দেশে'র হেমন্ত সামাজিক এই নির্দেশ বিধির মূল জীবনবোধের গভীরে দৃঢ়ভাবে প্রেথিত কবেছে। তাই গুণীর মহৎ প্রেমকে অমর্যাদা করে বলতে পেরেছে : "....তুমি আমাকে নষ্ট করতে চাও। বিধবার আবার বিয়ে কি গুনী দা? আমি এত শিশু নই যে, ধর্মের ভান করলেই অধর্মের পথে পা বাড়িয়ে দেব।"

বিধবার বিবাহ প্রেম সম্বন্ধে সমাজ-নীতির রূঢ় নিষ্ঠুরতা বিভিন্ন লেখায় দেখালেও শরৎচন্দ্রের চেতনাতেও এ বিষয়ে দ্বিধা মিশ্রন ছিল, এ কথা সমালোচকেরা বলেছেন। "হেমনলিনীর সংশয়ের প্রধান কারণ তার শ্রষ্টার

দ্বিধাগ্রস্ততা....” (ড. নিতাই বসু, শরৎচন্দ্র জীবন ও সাহিত্য। ২য় মুদ্রণ ৬.০২.৭৭ পৃ. ১৭৩) সমালোচক এই প্রসঙ্গে লিখেছেন যে শরৎচন্দ্র তাঁর স্নেহভাগনীয়া লীলারানী দেবীকে প্রশ্ন করেছিলেন যে, যে ষোল সতের বছর বয়সে বিধবা হইয়াছে, তাঁর সুদীর্ঘ জীবন আর কাহাকেও ভাল বাসিবার বা বিবাহ করিবার অধিকার নাই?” “এবং এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন নিজেই, ‘বিবাহই নারীর সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রেয়’, অথচ তিনি নিজে কোথাও বিধবার বিবাহ দেননি। সংসারে অনেক আশ্চর্য দ্রব্য আছে, এবং চেষ্টা করিয়াও তাহার হেতু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।’ (উদ্ধৃতি ঃ ঐ, পৃ. ১৭৩)

মানসিক এই দ্বিধা নিয়েই তিনি হয়ত গৃহদাহ উপন্যাসে ‘মৃণালে’র পল্লীসমাজ নির্ধারিত বৈধব্য পালনের মুহূতটি মহিমান্বিত রূপে এঁকেছেন। ‘ইহার বিধবার বেশ। চুলগুলি ঘাড় পর্যন্ত ছোট করিয়া ছাঁটা; ইহার মুখের উপর সর্বখালের সকল বিধবার বৈরাগ্য যেন নিবিড়ভাবে বিরাজ করিতে ছিল। ম্লান দীপালোকে প্রথমে ইহাকে মৃণাল বলিয়া অচলা চিনিতে পারে নাই।”

শরৎচন্দ্র বিধবা বিবাহ বিষয়ে এক এক সময়ে দ্বিধা প্রকাশ করেছেন। যেমন— ‘এ সম্পর্কে ‘বঙ্গবাণী’র প্রধান সচিব কুমুদচন্দ্র রায়চৌধুরীকে একদা শরৎচন্দ্র বলেছিলেন..... ‘বিধবাবিবাহ যে সমাজের পক্ষে সর্বক্ষেত্রে মঙ্গলকর একথা আমি মানতে পারিনে।” (ঐ, পৃ. ১৭৫) কিন্তু সর্বদা মেনে না নিলেও তিনি পল্লীসমাজের এই কঠোর নিষ্পেষণে আবদ্ধ নারীদের সম্পর্কে যে গভীর সহানুভূতি দেখিয়ে ছিলেন, সেকথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। শরৎচন্দ্রের জীবনের আচরণেও সেকথা প্রমাণিত হয়েছে। নিজের রচনায় বিধবাবিবাহ না দিলেও কিম্বা সুস্পষ্ট ভাবে বিধবা বিবাহের সপক্ষে কথা না বললেও তিনি ‘একবার দুর্গা নাম্নী জনৈকা বিধবার বিবাহের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।....প্রতুলবাবুকে ঐ ঘটনার জন্য আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবেশীরা ত্যাগ করলেও শরৎচন্দ্র দুর্গাকে কন্যার মতো করে নিজের সামতাবেড়ের বাড়িতে কিছু দিন রেখেও ছিলেন।...” (ঐ, পৃষ্ঠা, ১৭৬)

(পাঁচ) শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে
বাংলার পল্লীসমাজের নীচতা ও হীনতার সত্য চিত্ররূপ

গ্রাম জীবনের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসাই শরৎচন্দ্রকে বাংলার পল্লীসমাজের কঠোর সমালোচক করে তুলেছে। উপদেশের ছলে কথা না বললেও সমাজের ত্রুটি বিচ্যুতির মূলে পৌঁছে তাকে তিনি এক নির্ভেজাল সত্যতায় গোটা পৃথিবীর

কাছে তুলে দেখাতে চেয়েছেন। হয়ত বলতে চেয়েছেন, এই যে আমাদের পল্লীসমাজ-এর যে অপরিমেয় হীনতা ও নীচতা তাকে সবাই জানুক। এবং জেনে তার প্রতিকার সাধনে এগিয়ে আসুক। সমাজের তাই পল্লীবাংলার সমাজ যাবতীয় খুঁটিনাটি সহ তাঁর লেখায় প্রত্যক্ষ সত্য চিত্রের মত উদ্ভাসিত হয়েছে। বিবাহ, পণপ্রথা, বিধবা-সমস্যা ছাড়াও জাতিভেদের সংকীর্ণতা, বর্ণহিন্দুদের মধ্যেও বিভেদ, পারস্পরিক দলাদলি, পরের ছিদ্র অন্বেষণ, কুৎসা রটনা, ঘোঁট পাকানো, অপরের অনিষ্ট সাধনের কুটিল প্রবৃত্তি, পরকে ঠকিয়ে আমোদ, তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয় নিয়ে ঝগড়া-দ্বন্দ্বের মাধ্যমে নিজেদের আত্মসম্মান জ্ঞানহীনতায় চূড়ান্ত পরিচয় দেওয়া, জমিজমা সংক্রান্ত বিবাদে লাঠালাঠি, মারামারি এমন কি কথায় কথায় মামলা মোকদ্দমা, ছুঁতোয় নাতায় অপরের জ্ঞাতি নাশের চেষ্টা— সেই সঙ্গে গ্রামের ভূমধ্যাকারী বা বিত্তশালীদের একচ্ছত্র ক্ষমতা ও তার অপব্যবহার, নিম্ন বর্গীয় ওপর উচ্চ বর্গের অত্যাচার, ধনী কৃষকদের ভণ্ডামী ও শঠতা— সমস্তই শরৎচন্দ্র পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন বিভিন্ন উপন্যাসে।

গ্রাম্য দলাদলির কদর্য রূপ নিয়ে 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসের সূত্রপাত। তারিনী ঘোষালের মৃত্যুর পর তার একমাত্র সন্তান রমেশ দীর্ঘদিন পরে গৃহ প্রত্যাগত হয়ে শ্রাদ্ধের আয়োজন করলে, তারই জেঠতুত ভাই বেণী ঘোষাল শরিকী শত্রুতা বশত গোপনে ঘোঁট পাকাচ্ছে রমেশের ক্রিয়াকর্ম পণ্ড করে দেওয়া যায় কিভাবে সে পরামর্শ করতে গেছে মুখুয্যে বাড়ীর রমার সঙ্গে। যে রমার পিতার সঙ্গে রমেশের পিতার চিরস্থায়ী বিবাদ ছিল। রমা সতেজে বলেছে ঃ "........আমি যাব তারিনী ঘোষালের বাড়ি? যদি রমেশ বাড়ি আসে নিমন্ত্রণ করতে তবে রমা কি করবে, এর উত্তরে রমা পল্লীসমাজের উপযুক্ত প্রতিনিধি হয়ে বলেছে "......আমি কিছুই বলব না— বাইরে দরওয়ান তার উত্তর দেবে।" তাদের কথাবার্তার মধ্যেই রমার মাসীর আগমন এবং মাসীর কটূক্তিতে পল্লীসমাজের বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের মধ্যেও যে উচু নীচু ভেদ তথা কৌলীন্যের অহঙ্কার আছে সেটিও স্পষ্ট ভাবে লেখক প্রকাশ করেছেন। রমা যেহেতু বড় কুলীন, মুখুয্যে বংশের কন্যা, সেহেতু একদা অকুলীন রমেশের পিতামাতা রমার সঙ্গে রমেশের বিবাহ প্রস্তাব তুলে তাদের রীতিমত অসম্মানিত করেছিলেন— এমন পূর্ব প্রসঙ্গ মামী তোলাতে, বেণী ঘোষাল নিজে রমেশের বংশের মানুষ হ'য়েও তা নতমস্তকে স্বীকার করেছে। 'তুমি কত বড় কুলীনের মেয়ে তোমাকে কি আমরা ঘরে আনতে পারি বোন! ছোট খুড়োর একথা মুখে আনাই বেয়াদপি।

এই উপন্যাস যেন সার্থক নামা হয়েই গ্রাম্য বাংলার তৎকালীন সমাজজীবনের প্রায় সমস্ত দিকগুলিকেই পাঠকের সামনে প্রকাশ করে দিচ্ছে। জাত্যাভিমান বা কৌলীন্য গর্ব যেমন এখানে সমাজে প্রচলিত তেমনি জ্ঞাতিকে ঠকানো বা বোকা

বানানোর হীন কৌশলও এখানে প্রকটিত হয়েছে বেণী ঘোষাল ও রমা উভয়ের দ্বারা পুকুরের সবগুলি মাছ আত্মস্যাৎ করা ও রমেশকে ভাগ না দেওয়ার মধ্যে। রমেশের পিতৃশ্রাদ্ধের পূর্বদিন গোবিন্দ গাঙ্গুলী ও ধর্মদাস মুখোপাধ্যায় এই দুই প্রবীণ ব্রাহ্মণের চাটুকারীতা ও তার প্রতিযোগিতা পারস্পরিক কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি ও হাতাহাতি রমেশের মত পাঠককেও স্তম্ভিত করে। পিতার শ্রাদ্ধের দিন গ্রাম সমাজের আর এক নীচতা প্রকাশ পেয়েছে। নিমন্ত্রিতা ক্ষেন্তী বামনীর কন্যার কলঙ্ক নিয়ে প্রত্যক্ষভাবে তার সঙ্গে পরান হালদার ও গোবিন্দ গাঙ্গুলীর কুৎসিত কলহ— গ্রাম সমাজের পঙ্কিল রাজনীতিকে প্রকটিত করেছে। পরান হালদার অন্নগ্রহণ না করে স্থান ত্যাগ করে, গোবিন্দ গাঙ্গুলি ছুঁতো করে পংক্তি ভোজনে বসে নি।

রমেশের কাছে পরম উপকৃত হয়েও ভৈরব আচার্য শেষ পর্যন্ত তার বিরোধী পক্ষের সঙ্গেই হাত মিলিয়েছে এবং দৌহিত্রের অন্নপ্রাশণে রমেশের নিমন্ত্রণ না করে তাকে চরম অপমান করেছে। কিন্তু ভৈবরও নিরুপায়, কেননা, তার কন্যা বয়ঃপ্রাপ্তা, অচিরাৎ পাত্রস্থ করতে না পারলে তাকে একঘরে হতে হবে, তাই জাতি কুল রক্ষার দায়ে নিতান্ত বিশ্বাস ঘাতকের কাজ করতে হয়েছে গ্রামের সমাজপতি বেণী ঘোষালের দিকে যোগদান করে এও পল্লী সমাজচারী হওয়ার এক নিতান্ত নিরুপায়তার প্রকাশ।

এই রকম নিরুপায়তার জন্যই রমা রমেশের মঙ্গলাকাঙ্খিনী ও গোপন অনুরাগিনী হয়েও কোর্টে দাঁড়িয়ে তার বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে এসেছে।

এক আশ্চর্য জীবন্ত পল্লী সমাজের ভ্রষ্টতার চিত্র পল্লীসমাজে চিত্রিত হয়েছে। এখানে আছে বেণী ঘোষাল, গোবিন্দ গাঙ্গুলী, পরান হালদার— প্রমুখ পরছিদ্রান্বেষী, স্বার্থপর হীনচেতা সমাজ ধর্ম রক্ষক ও বিত্তবানদের দল। যারা বেণী ঘোষালের মত লম্পট হয়েও সমাজ রক্ষক, যাদের গোবিন্দ গাঙ্গুলীর মত বাড়ীর 'বিধবা ছোট ভাইজে'র গোপন কলঙ্ক থাকা সত্ত্বেও অপরের মেয়ের কলঙ্ক বিচার করে শাস্তি বিধানে বিন্দুমাত্র সংযোগ থাকে না, যেখানে পরান হালদারের মত পুরুষ তার বেয়ানের তাঁতি অপবাদ থাকা সত্ত্বেও ক্ষ্যান্ত বামনী ও তার মেয়েকে উদ্দেশ্য করে জনসমক্ষে "বেশ্যে মাগীদের বাড়ী থেকে তাড়িয়ে না দিলে এখানে আমি জলগ্রহণ করব না" এমন ভীতি প্রদর্শন করে রমেশের ক্রিয়া-কর্ম, ব্রাহ্মণ ভোজনের ব্যাপার নষ্ট করে দিতে চায়। অথচ যে কালীচরণকে সে উঠে চলে আসতে আহবান করেছে সেই কালীচরণ তখন ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল। কেননা, বছর চারেক পূর্বে কলকাতাবাসী তাহার এক গণ্যমান্য খরিদ্দার বন্ধু তাহার বিধবা ছোট ভগ্নিটিকে লইয়া প্রস্থান করিয়াছিল— পাছে এই দুর্ঘটনার ইতিহাস এত লোকের সমক্ষে আবার উঠিয়া পড়ে সেই ভয়ে কালী মুখ

তুলিতে পারিল না।" দীনু ভট্টাচার্য ক্ষ্যান্ত বামনীর বলা গ্রামের কেচ্ছা কেলেঙ্কারীর কথা উল্লেখ করে যথার্থই বলেছে যে, "........ওকে ঘাঁটালে কেলেঙ্কারীর সীমা পরিসীমা থাকবে না,.......কারণ সে, "মুড়ি বেচে খায়, সব ঘরে যাতায়াত করে, সকলের সব কথা টের পায়।" আর "অনাচার" সব ঘরেই আছে, এমন কি বেণী ঘোষাল সম্পর্কেও সে অনুরূপ ইঙ্গিত দিতে উদ্যত হয়েছিল।

এই ভ্রষ্ট, অধঃপতিত, হীনচিত্ত পল্লীসমাজ দেখে দেখে রমেশ যেমন ক্লান্ত তেমনি হতাশ হয়েছিল। সে চোখের সামনে এই মাতৃভূমিকে দেখেছে যেখানে দোকানের টাকা শোধ করতে গেলে দোকানদার মধুপাল বিস্মিত হয়, কেননা, গ্রাম সমাজে কেউ কোনদিন যে উপযাচক হয়ে "ঘর বহিয়া ঋণ শোধ করিতে আসে, তাহা মধুপাল এতটা বয়সে কখনো চোখে ত দেখেই নাই, কানেও শোনে নাই।" বাঁড়ুজ্জে মশায়ের মত কলকাতা-বিমুখ ব্যক্তিকে দেখাও রমেশের এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা। বাঁড়ুজ্জে মশাই জেলেনীর আচরণে ক্রোধ প্রকাশ করেছেন, কেননা, সে সর্ব সমক্ষে বাঁড়ুজ্জে মশায়ের হাত ধরে ফেলেছে তার মাছের ঝুড়িতে হাত দেওয়ার জন্য। জেলেনী পয়সা পায়, সে পয়সা শোধ করার বদলে নতুন ধার করেন বাঁড়ুজ্জে মশাই, এতে কিন্তু তাঁর সম্মানে বাধে না। মধুপালের দোকান থেকে অনেকটা পরিমাণ তেল নিয়ে নাকে কানে মাথায় মেখে নিয়ে তাঁর কোনো সংকোচ নেই। মধু পুরনো মুদী সওদার দাম চাইলে তিনি বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হন, উপরন্তু আরও এক পয়সার লবন নিজে হাতে খামচা দিয়ে তুলে নিয়েছেন ধারে। বিকেলে পয়সা শোধ করবেন। এ এক আশ্চর্য হীনতার জগতে রমেশ এসে পড়েছে।

রমেশ গ্রামবাসীর ভাল করতে গিয়ে দেখে তার কাজের পেছনে লোকে তার কোনো স্বার্থ বা অভিসন্ধি খুঁজতে চায়। রাস্তাঘাট মেরামত করার জন্য যে চাঁদা তুলতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে। উপরন্তু, নিজে কানে শুনেছে গ্রামের মানয একে অপরকে বলছে, চাঁদা কোন মতে না দিতে। কেননা, রমেশই জুতো পায়ে মস্‌মসিয়ে, চলে তাই রাস্তা সারানোর গরজ রমেশেরই, ভাঙা রাস্তায় গ্রামবাসীদের ষ্টেশনে যাওয়া আটকায় না। আবার অপর জন উত্তরে আরও হীনচিত্ততার আর শঠ বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে বলেছে রমেশকে খোসামোদ করে দুটো বাবু বাবু করতে পারলেই ব্যাস।" অর্থাৎ রমেশকে খোসামোদ করলেই কাজ আদায় করা যায়।

রমেশ তিক্ত চিত্তে বাংলার পল্লীসমাজের এই দিকটি সম্পর্কে তাই সঠিক মূল্যায়ন করেছে জেঠাইমা বিশ্বেশ্বরীর কাছে ঃ 'এদের দান করলে এরা বোকা মনে করে, ভাল করলে গরজ ঠাওরায়, ক্ষমা করাও মহাপাপ, ভাবে ভয়ে পেছিয়ে গেল।" এই গ্রাম, সমাজ স্বচক্ষে দেখে রমেশের দেশ সম্পর্কে পুরোনো ধারণা

ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে। সে শহরে বসে ভেবেছিল..........আমাদের বাঙালী জাতির আর যদি কিছু থাকে ত নিভৃত গ্রামগুলিতে সেই শান্তি স্বচ্ছন্নতা আজও আছে যাহা বহু জনাকীর্ণ শহরে নাই। সেখানে স্বল্পে সন্তুষ্ট সরল গ্রামবাসীরা সহানুভূতিতে গলিয়া যায়, একজনের দুঃখে আর একজন বুক দিয়া আসিয়া পড়ে, একজনের সুখে আর একজন অনাহুত উৎসব করিয়া যায়। শুধু সেইখানে সেই সব হৃদয়ের মধ্যেই এখনো বাঙালীর সত্যকার ঐশ্বর্য অক্ষয় হইয়া আছে।" রমেশের এই কল্পনা অতীতের মোহময় রূপস্মৃতি জড়ানো রোমান্টিক সমাজ ভাবনা। এ যেন রবীন্দ্রনাথের কবিতা বর্ণিত গ্রাম বাংলার স্বর্ণময়ী রূপ কল্পনার রোমান্টিক স্বপ্নানুভূতি—

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি,
চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস আমার প্রাণে
বাজায় বাঁশী।

কিন্তু মোহমুগ্ধ করা ঐ বাঁশী রমেশের হৃদয়তন্ত্রীতে সুর ঝরাতে পারেনি। গ্রাম সমাজের হীন বাস্তব রূপ তাকে কল্পনার স্বর্গ থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে কঠিন মাটিতে—

"হায়রে। একি ভয়ানক ভ্রান্তি। তাহার শহরের মধ্যেও যে এমন বিরোধ, এইপরশ্রী কাতরতা চোখে পড়ে নাই।.....হা ভগবান। কোথায় সেই চরিত্র? কোথায় সেই জীবন্ত ধর্ম আমাদের এই সমস্ত প্রাচীন নিভৃত গ্রামগুলিতে? ধর্মে প্রাণটাকেই যদি আকর্ষণ করিয়া লইয়াছ, তাহার মৃতদেহটাকে ফেলিয়া রাখিয়াছ কেন? এই বিবর্ণ শবদেহটাকেই হতভাগ্য গ্রাম্য সমাজ যে যথার্থ ধর্ম বলিয়া প্রাণপণে জড়াইয়া ধরিয়া তাহারই বিষাক্ত পূতিগন্ধময় পিচ্ছিলতায় অহর্নিশি অধঃপাতেই নামিয়া চলিতেছে।"

শরৎচন্দ্র গ্রাম সমাজের রোমান্টিক মিথ্যা স্বপ্ন ছবি আঁকেন নি। তার খাঁটি সত্য রূপটি ফোটাতে তার অধঃপতনের দিকটিকে তুলে ধরেছেন তাঁর হৃদয় বত্তার কোমলতাটুকু মিশিয়ে। তিনি তাঁর প্রিয় মৃত্তিকার অধঃপতনের তথা শোচনীয় ভ্রষ্টদশার কারণ অনুসন্ধানও করেছেন। এই হৃতশ্রীর কারণ হিসেবে কিন্তু জাতপাতের, উচুনীচুর সামাজিক বিভেদকে শরৎচন্দ্র প্রধান বলে গ্রহণ করেননি। পল্লী সমাজ উপন্যাসে বিশ্বেশ্বরী চরিত্রের মুখ থেকে শরৎচন্দ্র সমাজের জড়ত্বের তথা আচার বিচারের শুষ্কতা ও কুসংস্কার এবং সেই কারণে যথার্থ ধর্মাচরণের অবলোপকে বাংলার পল্লী সমাজের অধঃপতনের কারণ হিসেবে প্রকাশ করেছেন। 'বিশ্বশ্বরী কহিলেন.......যাকে যথার্থ ধর্ম বলে, পল্লীগ্রাম থেকে সে একেবারে লোপ পেয়েছে। আছে শুধু কতকগুলো আচার বিচারের কুসংস্কার আর তার থেকে নিরর্থক দলাদলি। সমালোচক অভিমত দিয়েছেন ঃ"শরৎচন্দ্র মোটামুটি বলিতে

চেষ্টা করিয়াছেন যে, বাংলার সমাজ, বিশেষ করিয়া পল্লীসমাজ দীর্ঘ দিনের গতিহীনতার অভিশাপে জড়তাগ্রস্ত, জগৎ ও জীবনের পরিবর্তনশীল রূপের সঙ্গে তাহার পরিচিতি নাই বলিলেই চলে। জড়তাগ্রস্ত বলিয়া নূতন আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া লইবার সাহসও এই সমাজের নাই। ইহার উপর কায়েমী স্বার্থের জন্য একদল জমিদার, ধনী অথবা ব্রাহ্মণ ও তাহাদের হাতের লোকেরা সমাজের যেটুকু অগ্রগতির বা জীবননায়নের সম্ভাবনা ছিল তাহার পথও রোধ করিয়া বসিয়া আছে।" (শরৎ চেতনা, শ্রী শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় পৃঃ ১৩৪-১৩৫, প্রথম প্রকাশ আশ্বিন, ১৩৪৭)

বাংলার পল্লীসমাজের এই পঙ্কিল রূপ 'বামুনের মেয়ে' উপন্যাসেও লেখক নির্দ্বিধায় দেখিয়েছেন। রাস্তার মধ্যে ছাগল বাঁধা থাকায় সেই দড়ি ডিঙানোর জন্য নাতনীকে গালমন্দ দেওয়া বা দুলে মেয়ের গায়ের ছোঁয়া লেগেছে, কল্পনা করে তাকে অবেলায় স্নান করানো এবং দুলে জাতিকে ব্রাহ্মণ পাড়ায় আশ্রয় দেয়ার জন্য সন্ধ্যার পিতাকে কটূক্তি এবং এই অনাচারের জন্য সমাজপতির কাছে নালিশ করার হুমকি দিয়েছে গ্রামের প্রবীণা বিধবা ব্রাহ্মণী 'রাসমণি' যাকে সকলে 'রাসু' বামণি বলেই জানে। এই উপন্যাসে কৌলীন্য প্রথার কুফল হেতু নাপিতের ঔরসে কুলীন পত্নীর সন্তান লাভের কলঙ্কজনক ঘটনা আছে। সেই ঘটনার জন্য পরবর্তীকালে সেই সন্তান প্রিয়নাথ মুখুজ্জের কন্যা সন্ধ্যার বিবাহ আসরে বিবাহ ভেঙে দেওয়া কুচক্রী নীচমনা গ্রাম্য সমাজের লোকজন তথা সমাজপতি লম্পট গোলক চাটুয্যে আছে। এই গোলক চাটুয্যের মাধ্যমে পল্লী গ্রামের উচ্চবর্ণ ব্রাহ্মণ কুলীন সমাজের প্রথা নিয়মের অজস্র জটিল বন্ধন রক্ষা হয়। ধর্ম বা জাতি রক্ষার ছুতোয় গরীব ব্রাহ্মণের অল্পবয়সী কন্যাকে সে বিবাহ করে, অথচ ইতিপূর্বে স্ত্রী বিয়োগের পরে সম্পর্কিতা বিধবা শ্যালিকা জ্ঞানদার সঙ্গে অবৈধ যোগসাধনে সে গর্ভবতী হয়েছে। আবার সন্ধ্যার যৌবনও সৌন্দর্যে লুব্ধ হয়ে সে তাকে বিবাহে আগ্রহী হয়ে ওঠে। জ্ঞানদাকে মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে তার সর্বনাশ করে তার গর্ভপাত করানোর মত পাপ কাজের আয়োজনে দ্বিধা করে না। এজন্য প্রিয়নাথের হাত জড়িয়ে অনুনয় করতে দ্বিধা করেনি। আবার প্রিয়নাথ অসম্মতি জ্ঞাপন করাতে মুহূর্তে নমনীয়তা বর্জন করে হিংস্র কুটিল রূপ ধারণ করে প্রিয়নাথের চরিত্রেই জ্ঞানদার সন্তান সম্ভাবনা বিষয়ক কলঙ্কের দায় নির্লজ্জের মত দিতে দ্বিধা করে না। এ বিষয়ে তার উপযুক্ত সহকারিনী ঐ রাসু বামনী। শুধু তাই নয়, গোলক চাটুজ্জের মত ভণ্ড ও নীচ প্রকৃতির লোকটি এ বিষয়ে তার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য 'মৃত্যুঞ্জয়' ঘটককে নিয়োগ করেছে প্রিয়নাথের গ্রামে গিয়ে তার মাতৃ কলঙ্কের রহস্য উদ্ধার করে নিয়ে আসতে। এই কাজের জন্য মৃত্যুঞ্জয়কে যে তার প্রাপ্য ঋণের সুদ এবং আসল পর্যন্ত মাপ করার লোভ দেখিয়েছে। সেই কলঙ্ক

ঘটনা উদ্ধার করে এনে অতঃপর সন্ধ্যার বিবাহ বাসরে সর্বসমক্ষে জানিয়ে তার বিবাহ বন্ধ করা এবং ঐ পরিবারকে জাতিচ্যুত করার মধ্যে গ্রাম সমাজের নীচতা কুটিলতা এবং হীন ষড়যন্ত্রের পঙ্কিল চিত্রটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

(ছয়) শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে পল্লীসমাজের উন্নতির সমাধান সূত্রে শিক্ষা-সম্পর্কিত চেতনা

বাংলার পল্লীসমজের প্রতি শরৎচন্দ্রের গভীর ভালবাসা ও একটি ঐকান্তিব আবেগ ছিল। তাই এই সমাজের যথার্থ রূপ চিত্রণ করতে তিনি এর ভাল ও মন্দ উভয় দিক দেখিয়েছেন। মন্দ দিকটির স্পষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ রূপায়ণ করলেও তাকে পল্লীসমাজ নীতি বিরোধী, বলা যায় না। তিনি যে সমাজকে ভালবাসেন, তার দুর্দশা ও ভ্রষ্টাচারে বেদনাহত চিত্তে সেই সমাজ-লিপি চিত্রিত করেছেন। কিন্তু সেই বেদনা ও অপমান থেকে পল্লী সমাজকে মুক্ত করার জন্য তিনি সমাধান সূত্রও অন্বেষণ করেছেন নিজের মত ভাবনা দিয়ে।

'পল্লীসমাজ' উপন্যাসে রমেশ চরিত্রের মত এক আদর্শবাদী যুবক যখন গ্রামে ফিরে সমাজের উন্নতি কল্পে কাজ শুরু করে দিয়েছে, সেই সময় গ্রাম সমাজের বহুদিনগত কুসংস্কারাচ্ছন্ন এবং সুবিধাভোগী স্বার্থপর মানুষরা অজ্ঞনতা বশত রমেশের সঙ্গে সহযোগিতার বদলে বিরোধিতাই করেছিল। রমেশের মন আশাহত ও শেষে পলায়নমুখী হয়েছিল। কিন্তু সেই সময় রমেশকে আশাভঙ্গের বেদনার সান্ত্বনা দিয়েছেন তার জেঠাইমা বিশ্বেশ্বরী। রমেশকে কর্ম্মমুখী হবার পুনঃপ্রেরণা দিয়ে তাকে সঞ্জীবিত যেমন করেছেন, তেমনি গ্রামের মানসিক অধঃপতন থেকে উদ্ধারের প্রতিকার উপায় তিনি উচ্চারণ করেছেন। শরৎচন্দ্র গ্রাম-সমাজের পঙ্ককুণ্ড দেখিয়ে কর্ত্তব্য সমাধা করেননি, সেই পঙ্ককুণ্ড পরিশ্রুত করার নৈতিক দায়ও তাঁর ছিল। বিশ্বেশ্বরীর মুখ থেকে শরৎচন্দ্রের নিজের বক্তব্য বা বিশ্বাসই ধ্বনিত হয়েছে। রমেশকে জ্যাঠাইমা এক নতুন নির্মাণের স্বপ্ন দেখিয়ে সঠিক পথ নির্দেশ করে দিয়েছেন। 'বিশ্বেশ্বরী বলিলেন, আছে বইকি বাবা, প্রতিকার আছে শুধু জ্ঞানে। যে পথে তুই পা দিয়েছিস শুধু সেই পথে। তাই তোকে কেবলি বলি তুই তোর এই জন্মভূমিকে কিছুতে ছেড়ে যাসনে। শরৎচন্দ্র তাঁর 'পল্লীসমাজ' ও 'পণ্ডিতমশাই' উপন্যাসে সমাজ পরিবর্ত্তনের জন্য দুটি পথকে যথার্থ বলে উপস্থিত করেছেন। এক. শিক্ষিত গ্রামবাসী যেন পল্লীবাস ছেড়ে নগরাভিমুখী না হয়। দুই. গ্রামে শিক্ষার আলো জ্বালাতে হবে। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, শিক্ষিত আধুনিক প্রগতিশীল মনের যুবক রমেশকে এ কথা দুটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলেছেন

গ্রামবাসিনী একজন প্রৌঢ়া রমণী।

বিশ্বেশ্বরী দেখেছেন, রমেশ দেশে প্রত্যাবর্তন করে সমাজ-পুর্নগঠনের চেষ্টা করছে নানাবিধ পল্লী মঙ্গল মূলক কার্যাদি করে। তিনিও তাই লেখকের চেতনার আলোটি নিজ কণ্ঠস্বরে মিশিয়ে রমেশকে বারবার অনুরোধ ও উপদেশ করেছেন। "রমেশ, চুলোয় যাক্‌গে তোদের জাত বিচারের ভালমন্দ ঝগড়াঝাঁটি, বাবা, শুধু গ্রামে গ্রামে লোক অন্ধকারে কানা হয়ে গেল, একবার কেবল তাদের চোখ মেলে দেখবার উপায়টা করে দে বাবা! তখন আপনি দেখতে পাবে তারা কোন্‌টা আলো, কোন্‌টা ধলো।"

বিশ্বেশ্বরী রমেশের মত নতুন শিক্ষিত প্রজন্মকে দুহাতে আঁকড়ে ধরে গ্রামে রেখে দিতে চাইছেন। "যদি ফিরে এসেছিস বাবা, তবে চলে আর যাসনে; তোরা মুখ ফিরিয়ে থাকিস বলেই তোদের পল্লী জননীর এই সর্বনাশ।"

রমেশ বিশ্বেশ্বরীর ব্যাকুলতার মর্মার্থ বুঝতে পেরেছে। সত্যই ত! সে চলিয়া গেলে ত ইহার প্রতিকারের লেশ মাত্র উপায় থাকিত না।' শরৎচন্দ্র এই চরিত্রটির মাধ্যমেই পল্লীর জড়ত্ব স্বভাব মোচনের উপায় সূত্রটি খুঁজে পেয়েছেন, এবং সেটি হ'ল পল্লীগ্রামে শিক্ষা বিস্তার।

শরৎচন্দ্র নিজে যে শিক্ষার কতখানি অনুরাগী ছিলেন তার পরিচয় পাওয়া যায় শরৎচন্দ্রের বাস্তব জীবনীকারের লেখায়। "সামতাবেড়ের পাশে পানিত্রাসে ছেলেদের একটি উচ্চ বিদ্যালয় থাকলেও তখন এখানে মেয়েদের শিক্ষার জন্য কোন বিদ্যালয় ছিল না। তাই শরৎচন্দ্র সামতাবেড়ে এসে ও অঞ্চলে একটি বিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টা করতে লাগলেন। কিছুদিনের মধ্যে তাঁর চেষ্টায় একটি বালিকা বিদ্যালয়ও স্থাপিত হল। সে বিদ্যালয়টি আজও রয়েছে এবং সেটি এখন একটি বড় বিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে।" [শ্রী গোপালচন্দ্র রায়—শরৎচন্দ্র পৃষ্ঠাঃ ২২৮ (১৯৬৫)]

পল্লীসমাজ উপন্যাসে লেখকের মতই রমেশ নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে এবং শিক্ষা বিস্তারে আগ্রহী হয়েছে। সমালোচক পল্লীসমাজ উপন্যাসের এই দিকটিকে উল্লেখ করে মতামত দিয়েছেন ঃ "পল্লী সমাজের একটি অভাবত্মক দিকের প্রতি শরৎচন্দ্র দৃষ্টিপাত করিয়াছেন. তাহা হইল, পল্লীগ্রামে শিক্ষার অভাব। এই শিক্ষার অভাব না ঘুচিলে পল্লীসমাজের সত্যকার উন্নতি হইতেই পারে না। তাঁহার পল্লীসমাজ উপন্যাসে পল্লীগ্রামের জাতিভেদ, দলাদলি, স্বার্থপরতা, পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি তীব্ররূপ পাইলেও এবং ইহাদের কুফল সম্বন্ধে পাঠকমনে বিরুদ্ধমত সৃষ্টির চেষ্টা হইলেও পল্লীসমাজে শিক্ষাপ্রসারের যে আন্তরিকতা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে তাহার মূল্য কম নয়।" (শরৎ চেতনা, শ্রী শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা- ১০৯, প্রথম প্রকাশ ১৩৭৪) রমেশের জাগ্রত চেতনাকে প্রবলভাবে

উদ্দীপিত করেছিলেন বিশ্বেশ্বরী। পল্লীসমাজের অনগ্রসরতার মূল কারণ যে অজ্ঞানতা— জ্ঞানের অভাব, জাত-পাত ব্যাপারটি তুচ্ছ, এই ভাবটি সম্পর্কে কাজী আবদুল ওদুদের স্বীকৃতি এই রকম ঃ "পল্লীসমাজ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য মোটের ওপর এই জাতিভেদ, ছোঁয়াছুঁয়ি এসবের ফলে হিন্দু সমাজে দুর্দশা দেখা দিয়েছে কিনা ; এসব প্রশ্ন অগ্রগণ্য নয়, অগ্রগণ্য প্রশ্ন হচ্ছে পল্লীর সাধারণ লোকদের মধ্যে শিক্ষার আলোজ্বালা, তাদের মধ্যে সহযোগিতা বাড়ানো, তাদের অভীত করা।" [শরৎচন্দ্র ও তাঁর পর— কাজী আবদুল ওদুদ। প্রথম সং, পৃঃ ৪১]

যে শিক্ষা জাতীয় উন্নতির মূল সেই শিক্ষার পুঁথিগত ও ব্যবহারিক দুটি দিকের উপযোগিতার কথাই শরৎচন্দ্র উপন্যাসে বলা হয়েছে। বহু পাঠশালা, স্কুল, কলেজের উল্লেখই শরৎচন্দ্র শুধুমাত্র তার লেখাগুলিতে করেন নি, স্কুল কলেজের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বা ডিগ্রী ছাড়াও শিক্ষার বক্তব্য তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন। দেবদাস, বিন্দুর ছেলে, নিষ্কৃতি, রামের সুমতি, শ্রীকান্ত, পথের দাবী, বিপ্রদাস, দত্তা, পল্লীসমাজ, পণ্ডিত মশাই, চরিত্রহীন প্রভৃতি রচনায় লেখাপড়ার প্রতি পিতামাতা বা গ্রামবাসীর বিশেষ ভাবনা, গুরুমশাই এর কাছে ছেলেদের পাঠানো বা পুরানো দিনের পাঠশালার চিত্র যেমন বর্ণনা করা হয়েছে, তেমনি অনিচ্ছুক দুরন্ত ছাত্রের বিদ্যালয় থেকে বিতারণ (দেবদাস) কিম্বা ছাত্রের নিজের পাঠে অনীহা (চরিত্রহীনের সতীশ, আবার এই উপন্যাসের দিবাকরের বিপুল আগ্রহ প্রথম দিকে কলেজে যাওয়ার জন্যও দেখানো হয়েছে। এই সব রচনার মধ্যে 'পল্লীসমাজ' ও 'পণ্ডিত মশাই' পল্লীর শিক্ষা বিষয়ে শরৎচন্দ্রের গঠনমূলক চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়।

'পল্লীসমাজে' স্কুল কলেজ প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গঠনমূলক পুঁথিগত শিক্ষার প্রতি শরৎচন্দ্র বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। রমেশ নিজে রুড়কিতে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া শিক্ষিত যুবক, সে চেতনার অন্ধকার দূর করার জন্য তার নিজের গ্রামে না হোক, পার্শ্ববর্ত্তী মুসলমান গ্রামে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছে। (অবশ্য সেক্ষেত্রে স্থানীয় মুসলমান প্রজাদের আগ্রহ একান্ত ছিল)। নিজের গ্রামের বিদ্যালয়ের উন্নতি নিয়ে চিন্তা করেছে, গ্রামের স্কুলে নিজে পড়িয়েছে। গ্রামের অর্থশালী শিক্ষিত জমিদার যদি এইভাবে গ্রামে থেকে শিক্ষার সঙ্গে আগ্রহে যুক্ত হয়, তবে সাধারণ মানুষ বুকে একটা আশ্বাস পায়। অনুপ্রেরণা পায়, তারা ক্রমশ শিক্ষানুরাগী হয়ে ওঠে। এরকম ভাব প্রকাশের জন্যই রুড়কি প্রত্যাগত রমেশকে শরৎচন্দ্র গ্রামেই চিরস্থায়ীভাবে রেখেছেন।

'পণ্ডিতমশাই' উপন্যাসে বৃন্দাবন রমেশের মত উচ্চবংশজাত ও সমাজে প্রভাবশালী ধনী ব্যক্তি নয়। নিম্নবর্গে জন্ম নিয়েও শিক্ষানুরাগী এবং শিক্ষাব্রতী বৃন্দাবন নিজের গ্রামে শিক্ষার প্রসার ঘটাতে চেয়েছে তার সাধ্যমত। উপন্যাসে

শরৎচন্দ্র এইভাবে দেখিয়েছেন শিক্ষা চেতনার ফলে গ্রামের একান্ত সাধারণ চরিত্রটিও কতখানি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। একটি উচ্চ আদর্শবাদে স্থিত হয়ে নির্বিরোধী, শান্ত, ধর্মভীরু, ভাল মানুষ বৃন্দাবন সমাজের নিম্নশ্রেণীর মানুষদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তাদের প্রীতি ও বিশ্বাস অর্জ্জন করে তাদের লেখাপড়া শেখাবার সাধনায় আশাবাদী হয়েছে। অশিক্ষিত মানুষ শিক্ষার মর্ম বুঝলে তবেই তাদের সন্তান সন্ততিবর্গকে শিক্ষিত করার চেষ্টায় ব্যাকুল হবে। যেনতেন প্রকারে তারা নিজেদের উত্তর পুরুষকে শিক্ষার আলোয় টেনে আনবার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করবে। আর ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে যেন থাকে শ্রদ্ধার সম্পর্ক। যিনি শ্রদ্ধেয় তিনিই শিক্ষক হলে শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়।

এই উপন্যাসে আছে কেশব চরিত্র। শিক্ষিত শিক্ষানুরাগী এই যুবক বৃন্দাবনকে বলেছে এদেশের ইতর জনসাধারণকে শিক্ষিত করাটাই দেশের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ, শিক্ষা না দিয়ে তাদের আর কিছু করানো পণ্ডশ্রম হবে। কেশবের আন্তরিকতা থাকলেও তার চেতনায় কিছু ফাঁকি ছিল, বৃন্দাবনের সূক্ষ্মতর সংবেদনশীল চিত্ত সে ফাঁকি ধরে ফেলেছে। গ্রামের নিম্নবর্গীয় জনসাধারণকে কেশব বারবার ইতর, ছোটলোক ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত করায় তার খারাপ লেগেছে। "এইভাবে ছোটলোক কথাটি বারবার ব্যবহারে চাষী বৈষ্ণব বৃন্দাবনের স্বভাবতই খারাপ লাগিল। তাহার মুখ রাঙা হইয়া উঠিল।" কিন্তু সে সংযম হারায় নি।......"শান্ত ভাবে বলিল, ছোটলোকদের ভাগ্য ভাল যে, ভদ্রলোকের পাঠশালে ছেলে পাঠায়নি। কিন্তু তোমারও ভাই, আমাদের মত ছোটলোকদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে মান ইজ্জত নষ্ট করা উচিত হয়নি।" একথা শুনে কেশবের চৈতন্য হয়েছে। তখন বৃন্দাবন তাকে বুঝিয়েছে, প্রথমে ভদ্রলোক ও ছোটলোক প্রভেদটা ঘোচাতে হবে, অর্থাৎ ছোটলোকের কাছে ভদ্রলোকের দূরত্ব নিয়ে আসা চলবে না, তাদের কাজে কথায় 'আচরণে সত্য' আত্মীয়তা অর্জ্জন করতে হবে। তখন ছোটলোকেরা বুঝতে পারবে— এই ভদ্রলোক সমাজ তাদের থেকে 'স্বতন্ত্র দল' নয়। এই বিশ্বাস অর্জ্জন করতে না পারলে "ছোটলোকেরা শিক্ষিত ভদ্রলোককে ভয় করবে, মান্য করবে, ভক্তিও করবে, কিন্তু বিশ্বাস করবে না, কথা শুনবে না। এ সংশয় তাদের মন থেকে কিছুতেই ঘুচবে না যে তোমাদের ভালো এবং তাদের ভাল এক নয়।"

শরৎচন্দ্রের অগোচরে এভাবে এই বক্তব্যে যেন শ্রেণীহীন সমাজ সাম্য চেতনার পরিস্ফুটন ঘটেছে। লেখক তাঁর পল্লীবিষয়ক শিক্ষা চেতনার মূর্ত্ত প্রতীক করে গড়ে তুলেছেন রমেশকে। রমেশ জমিদার প্রভু হওয়া সত্ত্বেও কর্মে ও কথায় 'সত্য আত্মীয়তা' অর্জ্জন করেছে তার দুঃখী প্রজাদের কাছ থেকে। তাই তার দেওয়া শিক্ষা তারা মাথায় তুলে নিয়েছে। আত্মস্থ করেছে। শিক্ষা রমেশের নীচু

জাতের দুঃখী প্রজাদের মধ্যে দুটি ভাবে ক্রিয়াশীল হয়েছে।

এক. তাদের নিজেদের প্রাপ্য বুঝে নিতে তারা শিখেছে বা তাদের আত্মমর্যাদাবোধ গড়ে উঠেছে এবং প্রতিবাদ করতে শিখেছে।

দুই. হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতিবোধ গড়ে উঠেছে তথা একটা অখণ্ড ঐক্যবোধ গ্রাম সমাজের অশিক্ষিত নিম্নবর্গীয় জনতা জাগ্রত হয়েছে।

এর ফলে, তারা মিথ্যা মামলায় রমেশের জেল হলে সমাজের নীচুতলার মানুষরা একজোট হয়ে সেই মামলায় রমেশের বিপক্ষচারী রমার দুর্গোৎসবের আমন্ত্রণ বর্জন করেছে।

ছোটলোকদের এহেন স্পর্ধায় সমাজের তথাকথিত শীর্ষ ব্যক্তিরা যেমন 'বেণী ঘোষাল', গোবিন্দ গাঙ্গুলী প্রমুখ ক্রোধে উত্তেজনায় অধীর হয়ে কটূক্তি করেছে, কিন্তু তাদের রুষ্ট ভ্রূকটিকে উপেক্ষা করতে শিখেছে রমেশের ভাবপুষ্ট পল্লী সমাজের নতুন প্রাণধর্ম। এদেরই প্রতিনিধি হয়ে কুঁয়াপুর গ্রামের সনাতন হাজরা নতুন চেতনার কথা বলতে পেরেছে। "........সেদিন পিরপুরে নতুন ইস্কুল ঘরে ছোটবাবু বলেছিলেন, গলায় গাছকতক সূতো ঝোলানো থাকলেই বামুন হয় না। আমি তো আর আজকের নয় ঠাকুর, সব জানি! যা করে তুমি বেড়াও সেকি বামুনের কাজ? তোমাকেই জিজ্ঞাসা করছি দিদি ঠাকরুণ, তুমিই বল দেখি?.......তাছাড়া খাজনা দিয়ে বাস করব— ভয় কারুকে করব না। আর বামুনের মত থাকতে বামুন, না থাকে আমরাও যা তারাও তাই।"

পল্লীগ্রামের শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপারে শরৎচন্দ্রের চিন্তা 'শ্রীকান্ত'র তৃতীয় পর্বে গঙ্গামাটির যদুনাথ কুশারীর মাধ্যমেও ব্যক্ত হয়েছে। যদিও শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে জমিদার উপন্যাসে জমিদার কর্তৃক বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠা বা ছাত্রদের ভরণ-পোষণের চিত্র দেখানো হয়েছে, 'বিপ্রদাস' তবুও যদুনাথ কুশারী দেশের জমিদারদের শিক্ষা ব্যবস্থায় অনীহার জন্য তীব্র নিন্দা করেছেন। এই চরিত্রটির মধ্য দিয়ে লেখক প্রাচীন ভারতীয় অধ্যাপক, আদর্শের কথাটি তুলে ধরেছেন। সুনন্দার স্বামী যদুনাথ কুশারী দরিদ্র অধ্যাপক অর্থাভাবে তিনটি ছাত্রের ভরণ-পোষণও তিনি করে উঠতে পারেন না, তবুও শিক্ষাদানের মহৎ ব্রাহ্মণ্য আদর্শ তিনি ছাড়তে পারেন না। রাজলক্ষ্মীকে বলেছেন ঃ অধ্যয়ন অধ্যাপনা ব্রহ্মণেরই কাজ! আচার্যদেবের কাছে যা পেয়েছি, সে ত কেবল ন্যস্ত ধর্ম আর একদিন যেত ফিরিয়ে দিতেই হবে মা। রজলক্ষ্মীর সাহায্যে আনন্দ ত গঙ্গামাটিতে 'শিশুশিক্ষালয়' খেলার ব্যবস্থা করেছে। শরৎচন্দ্রের অর্দ্ধসমাপ্ত উপন্যাস 'জাগরণে'র নায়ক দেশব্রতী অমরনাথের মূল বৃত্তি অধ্যাপনাকেই দেখানো হয়েছে মহত্ত দিয়ে। শিক্ষা বিষয়ে শরৎচন্দ্রের চেতনা পল্লীসমাজের এই মৌল অপূর্ণতার দিকটিকে এভাবে সর্বসমক্ষে উদ্‌ঘাটিত করে দিয়েছে।

(সাত) শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে পল্লীসমাজের ভূম্যাধিকারী বা উচ্চবিত্ত ক্ষমতাসীন শ্রেণী ও কৃষক, শ্রমজীবী মানুষ; সামন্ত সম্পর্ক

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকেই শরৎচন্দ্র সাহিত্য সৃষ্টি শুরু করেন। যদিও তাঁর লেখা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়কালে। এই যুগমুহূর্তে পৃথিবীতে রাশিয়ার বিপ্লব ও সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা ঘটেছে। কিন্তু এদেশে মার্কসীয় সমাজচেতনার বিপ্লববাদ তখনও ছড়ায়নি। সমাজ সম্পর্কে গভীরভাবে সচেতন শরৎচন্দ্রের বিভিন্ন উপন্যাসে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের কিছু কিছু বক্তব্যের রূপায়ন পাঠককে আকৃষ্ট করে।

মার্কসীয় সমাজবাদে সমাজে অর্থনৈতিক অসাম্যকে তীব্রভাবে বিরোধিতা করে ধনী-নির্ধন, এই ভেদ লুপ্ত করে শ্রেণীহীন সমাজের ভিত্তি প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। সামন্ততন্ত্রের জমিদার ও কৃষক ধনতন্ত্রের পুঁজিবাদী শ্রমিক দুই পক্ষের লড়াইতে জমিদার বা পুঁজিবাদীর পতন ও কৃষক শ্রমিকের জয় ঘোষণায় সমাজতন্ত্রবাদের প্রতিষ্ঠা। শরৎচন্দ্র এই নির্দিষ্ট তত্ত্বকে তাঁর উপন্যাসে অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত করেননি, কেননা, তাঁর চেতনা ঐ তত্ত্বাশ্রী ছিল না এবং তাঁর মানস গঠনে উনবিংশ শতাব্দীর ভাব প্রভাব তথা সামন্ততন্ত্রের প্রতি কিম্বা ভারতবর্ষের পুরোনো জীবনধারা ও আদর্শের প্রভাব গভীর ছিল। এই কারণে পল্লী সমাজের দুঃখী জনসাধারণ, তথা কৃষক বা অন্যান্য শ্রমজীবী মানুষদের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতিশীল হয়েও শরৎচন্দ্র পল্লীসমাজ উপন্যাসের বিরূপ সমালোচনার উত্তর প্রসঙ্গে তাঁর নিজস্ব বক্তব্যটি এইভাবে বলতে পেরেছেন—" ...Social Reform বা Construction বা আমার কাজ নয়, আমার ব্যবসা লেখা।" যথার্থই শরৎচন্দ্র লেখকের দায়িত্ব পালন করেছেন; তাঁর লেখায় পল্লীসমাজের দুঃখী নিপীড়িত মানুষের বেদনা, চাষী-কৃষক শ্রমজীবীদের ওপর ধনী, জমিদার ও বিত্তবান সুবিধাভোগী শ্রেণীর নিষ্ঠুর পেষণ ও শোষণ চিত্র সত্যরূপ ধরে ফুটে উঠেছে। গ্রামবাংলার শোচনীয় অর্থনৈতিক অবক্ষয়ের বাস্তব সম্মত চিত্রায়ন লেখক করেছেন, কিন্তু সেখানে শ্রেণীগতভাবে মানুষকে ঠিক দেখেন নি। শরৎচন্দ্র বিত্রিত বাংলার গ্রামসমাজে দুঃসহ অত্যাচার পীড়িত নিম্নবর্গীয় মানুষ ও অত্যাচারী নিষ্ঠুর বিত্তবান জমিদার আছে, আবার শুভবুদ্ধি সম্পন্ন প্রজাদরদী ভূম্যাধিকারী নারী বা পুরুষ চরিত্রেরও অভাব নেই।

শরৎচন্দ্রের সমাজতন্ত্রী মনোভাব তাঁর একান্ত নিজস্ব। দেশের দুঃখী মানুষের দলকে তিনি তার উপন্যাসে তাদের দুর্দশা সহ শুধুমাত্র দেখাননি, তাদের

সচেতনতা ও প্রতিবাদও তাঁর কলমে যথাযোগভাবে উপস্থিত করা আমরা দেখতে পাই। জীবনের শেষ দিকে শরৎচন্দ্র দেশের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী জানিয়েছেন ঃ "...তিনি বাংলাদেশে একটি স্যোসালিস্ট পার্টি গঠনের পরিকল্পনা ঠিক করে দেন ...। বাংলাদেশে প্রথম সোস্যালিস্ট নিউক্লিয়াস এইরূপে তিনিই সৃষ্টি করে দেন।"

(ডঃ নিতাই বসু, শরৎচন্দ্র, জীবন ও সাহিত্য, পৃ. একশ সাতাত্তর)

একথা স্মরণে রেখেও বলা যায় শরৎচন্দ্র গ্রামের সমাজ-রূপে অর্থনৈতিক অসাম্য ও অর্থ প্রতিপত্তির দ্বারা অর্থহীন প্রজার ওপর উৎপীড়নের মর্মন্তুদ চিত্র রচনা করলেও সেই সমস্যাকে তিনি 'প্রধানত দেখাইয়াছেন বহিরঙ্গরূপে, অন্তরঙ্গরূপে খুব কম ক্ষেত্রেই দেখাইতে পারিয়াছেন। সমস্যাকে তিনি তাঁহার শক্তিশালী লেখনীর সাহায্যে যেভাবে জটিল করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, প্রকৃতপক্ষে সমস্যার প্রত্যক্ষ রূপটুকুই তাহাতে বিশেষভাবে ধরা পড়িয়াছে।"

(শরৎচেতনা; শ্রী শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ পৃ. ১৫৫)

পল্লী সমাজের উচ্চবিত্ত, জমিদার বা সুবিধাভোগী ধনী শ্রেণীর ব্যক্তি চরিত্র ও গ্রামস্থ দরিদ্র সাধারণ জনসমাজ— শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের এই দুই পক্ষের রূপাবয়ব অবলম্বনে আমাদের বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করা যাবে।

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের জমিদার বা গ্রামীণ উচ্চবিত্তর (তারা সকলেই ভূম্যাধিকারী) সংখ্যা অনেক। পল্লীসমাজ, দেনাপাওনা, বিপ্রদাস, দত্তা, বিরাজবৌ, চন্দ্রনাথ, বড়দিদি, শুভদা, জাগরণ (অসমাপ্ত), শ্রীকান্ত, শেষপ্রশ্ন কিম্বা বিখ্যাত ছোট গল্প মহেশ ও অভাগীর স্বর্গে জমিদার ও সুবিধাভোগী উচ্চবিত্তদের বিচিত্র চরিত্র সমাবেশ ঘটেছে। শরৎচন্দ্র ছিলেন মানবতার পূজারী। তিনি ব্যক্তি মানুষকে তার ভেতর থেকে উদ্ধার করে মহৎ মহিমাটুকু চিত্রিত করেছেন। যে ভাল কাজ করে তাকে তিনি তার নিজস্ব ব্যক্তিত্বেই দেখেছেন, শ্রেণীর সঙ্গে মিলিয়ে দেননি। গ্রামসমাজের কঠিন উৎপীড়ক জমিদার হিসেবে দেনাপাওনা উপন্যাসের জীবানন্দ চরিত্র তার পাপমূর্তি নিয়ে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছে। গ্রাম পদার্পণ করেই গোমস্তা এককড়ি নন্দীকে হুকুম জানিয়েছে ঃ "...আমি দিন আষ্টিক আছি; তার মধ্যে হাজার দশেক টাকা চাই।" এককড়ি ইতিপূর্বেই জমিদারের মদ্যপান ও লাম্পট্যের সংবাদ 'কাছারির বড় পেয়াদা' বিশ্বম্ভরের কাছে শুনেছিল, নিজে স্বচক্ষে সে জীবানন্দের সুরাপানের দৃশ্য প্রত্যক্ষও করেছিল। এবং শুধু টাকা নয়, জীবানন্দ নারী-মাংসোও যোগান চেয়েছিল এককড়ির কাছে। '..দেখ এককড়ি আমি বিবাহ করিনি, ...আর ভীষ্মদেব সেজেও বসিনি—...বলি কথাটা বুঝলে ত এককড়ি? ওটা চাই।

এই জমিদারের পাইক বরকন্দাজের অত্যাচার শরৎচন্দ্র এভাবে বর্ণনা করেছেন—'জমিদার জীবানন্দ চৌধুরী মাত্র পাঁচদিন চণ্ডীগড়ে পদার্পণ করিয়াছেন,

এইটুকু সময়ের অনাচার ও অত্যাচারে সমস্ত গ্রামখানা যেন জ্বলিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। নজরের টাকাও আদায় হইতেছে, কিন্তু সে যে কি করিয়া হইতেছে তাহা জমিদারের সরকারে চাকরি না করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করাও পাগলামি। ... ইতিমধ্যে তারাদাস চক্রবর্তীর ওপর টাকার জন্য যথেষ্ট পীড়ন চলেছে. তাকে "ছয় ঘন্টাকাল তীক্ষ্ণ রোদে খাড়া দাঁড়াইয়া" থাকতে হয়েছে, কিন্তু "সর্বসমক্ষে কান ধরিয়া ওঠবোস, ঘোড়দৌড় এবং ব্যাঙের নাচ নাচাইবার প্রস্তাবে" সে বিচলিত হয়ে জমিদারের চাহিদামত অর্থ যোগান দিতে সম্মত হয়েছে। ইতিমধ্যে জমিদারের কাছে প্রতিদিন মহাপ্রসাদ যোগাইতে হইয়াছে; পুকুরের মাছ, বাগানের ফলমূল, চালের লাউকুমড়া জমিদারের লোক যথেচ্ছা টানিয়া ছিঁড়িয়া লইয়া গিয়োছে ..." শুধু তাই নয়, 'মাতাল ভূস্বামীর' খেয়ালে 'জমিদারের লোক ডোমপাড়া হইতে একটা খাসি আনিয়া মন্দিরে হাজির করে এবং তাহাকে মহাপ্রসাদ করিয়া দিতে বলে। পুরোহিত প্রথমটা আপত্তি করে, কিন্তু শেষে আদেশ শিরধার্য করিয়া উহাকেই উৎসর্গ করিয়া যথারীতি বলি দিয়া দেবীর মহাপ্রসাদ করিয়া দেয়।'

শরৎচন্দ্রের সমকালে এদেশের গ্রামে সামন্ততান্ত্রিক সমাজরূপ ক্ষয়িষ্ণু হলেও যেটুকু টিকে ছিল জীবানন্দ চরিত্রের মধ্য দিয়ে (প্রথমদিকে তার ক্লেদাক্ত পরিণাম চিহ্ন পরিস্ফুট করেছেন তিনি। সে সময়ের জমিদার কেউ কেউ গ্রামে থাকতেন না, কিন্তু মাঝে মাঝে জমিদারীতে উপস্থিত হ'য়ে জীবানন্দ চৌধুরীর মতই আচরণ করতেন। জীবানন্দ তৎকালীন ঐ সব সম্পট মদ্যপ অনাচারী ও বিবেকহীন জমিদারদের মতই 'ষোড়শী'কে রাত্রিবেলা তার গৃহে আটকে রেখেছে। তার কান্নায় ও শত অনুনয়েও কর্ণপাত করেনি. ' .. আজকের মত ও ঘরে বন্ধ থাকো, কাল তোমার সতীপনার পরীক্ষা হবে ... ।"

প্রজাপীড়ক আর একজন জীবানন্দ চৌধুরীর গোত্রজ পল্লীজমিদারের উল্লেখ 'দেনাপাওনা' উপন্যাসেই রয়েছে। চণ্ডীগড়ের চণ্ডী মন্দিরে উৎসবরে আগত এক দুঃখী অতিথি উমাচরণ সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র জানিয়েছেন ঃ "লোকটির নাম উমাচরণ, জাতিতে বৈষ্ণব, বাটি আগে ছিল মানভূম-জেলার বংশীবট গ্রামে। গ্রামে অন্ন নাই, জল না, চিকিৎসক না— এ যাহার ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি তিনি পশ্চিমের কোন এক সহরে ওকালতি করেন। রাজায় প্রজায় প্রীতি নাই, সম্বন্ধ নাই, আছে শুধু শোষণ করিবার বংশগত অধিকার। এই ফাল্গুনের শেষে বিসূচিকারোগে তাহার স্ত্রী মরিয়াছে।"

গ্রামবাংলার বহু অঞ্চলেই এই ধরনের মাটির সঙ্গে সংশ্রব ও প্রতি আকর্ষণ হীন জমিদার বা ভূস্বামী থাকতেন। তাঁরা পল্লীগ্রামকে তাঁদের অর্থসম্পদের এক

চিরস্থায়ী উৎসমাত্র মনে করতেন। তাঁদের প্রয়োজনীয় বিলাসব্যসন নিবৃত্তির অপরিমেয় অর্থ যোগান দিত তাঁদের জমিদারীর অন্তর্ভূক্ত গ্রাম সমাজের মানুষগুলি। কিন্তু প্রজাদের একান্ত প্রয়োজনটুকুও তাঁরা মেটাতে ঘোর অনাগ্রহী ছিলেন। শরৎচন্দ্রের অসমাপ্ত উপন্যাস জাগরণে পল্লীর এই জমিদারী আচরণকে স্পষ্টই তীব্র সমালোচনা মূলকভাবে তুলে ধরেছেন লেখক। জমিদার কন্যা 'আলেখ্য'র হুকুমে পুরোনো কর্মচারী নয়ন গাঙ্গুলী চাকুরীজীবী হয়ে আত্মহত্যা করলে সে অনুতপ্ত ও বেদনাবিদ্ধ হলেও উপন্যাসের নিমাই ভট্টাচার্য ও অমরনাথ কর্ত্তৃক সে নিদারুণভাবে ভৎর্সিত হয়েছে। নিমাই ভট্টাচার্য বলেছে ঃ ''অমরনাথ বলছিলেন তোমার কাপড়-জামা জুতো মোজার খরচ তিনি বলছিলেন আয়না-চিরুণী সাবান-গন্ধের অত্যন্ত ব্যয়, একজনের ভাত কাপড়ের প্রয়োজনের চেয়ে আর একজনের এইগুলোর প্রয়োজন যে কোন অবস্থাতেই বড় হতে পারে এ কুশিক্ষা যদি কোথাও পেয়ে থাকত সে তোমায় আজ ভুলতে হবে; যারা জন্মেছে তারা যত দুর্বল, যত অক্ষম, যত পীড়িতই হোক বাঁচবার অধিকারে তাদের কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারে না, এ সত্য তোমায় শিখতেই হবে।''

'শেষপ্রশ্নে'র আশুবাবু আগ্রা নিবাসী হলেও তিনিও জমিদার। কিন্তু দেশ গ্রামের জমিদার হয়ে না থেকে তিনি প্রবাসে থাকেন এবং তাঁর জাঁকজমকপূর্ণ জীবনযাত্রার ব্যয় নির্বাহের উৎস ঐ জমিদারীর আয়। শরৎচন্দ্র 'বিপ্রদাস' উপন্যাসের সুত্রপাতে বিপ্রদাসের শক্তিমান, অহঙ্কারী দোর্দন্ড প্রতাপশীল ভূস্বামী রূপ তুলে ধরেছেন। সে তেজারতী কারবারও করে। সেজন্য কলকাতায় মস্ত বাড়ী।

কিন্তু শরৎ কিন্তু শরৎচন্দ্র চরম অত্যাচারী মদ্যপ ও লম্পট জমিদার জীবানন্দ চৌধুরীর মত মানুষকেও শেষ পর্যন্ত 'ষোড়শী'র সংস্পর্শে এসে সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন চরিত্রে রূপান্তরিত করিয়েছেন। যে জীবানন্দ ষোড়শীর প্রতি ক্রুদ্ধ প্রতিহিংসার বাসনায় প্রজাদের জমিতে চিনির কল বসানোর জন্য মাদ্রাজী মালিককে সম্মতি দিয়েছিল। পরবর্তী কালে প্রজাদরদী জমিদার হয়ে তাদের সুবিধার্থে সাঁকো তৈরি করে দেওয়ার জন্য ব্যাকুলতা বোধ করেছে , নিজে দাঁড়িয়ে তদারক করে কাজটি সম্পন্ন করেছে। শুধু তাই নয়; দুখী প্রজাদের কাছ থেকে জোর করে কেড়ে নেওয়া জমি তাদের আবার ফিরিয়ে দেওয়া মনস্থ করেছে এমন কি তাদের নাম দিয়ে গ্রামের উচ্চবিত্ত সমাজপতি জনার্দন রায় ও নিজের বিরুদ্ধে আনীত মামলায় নিজেই প্রজাদের হয়ে সাক্ষী দেবে ঘোষণা করেছে। নির্মলকে জীবানন্দের উক্তি ঃ ''কৃষকেরা তাদের জমি ছাড়বে না। কারণ এ শুধু তাদের অন্নবস্ত্রের কথা নয়, তাদের সাতপুরুষের চাষ আবাদের মাঠ, এর সঙ্গে তাদের নাড়ির সম্পর্ক। এ তাদের দিতেই হবে।...... অন্য পক্ষ অত্যন্ত প্রবল, তার উপর জোরজুলুম চলবে না। চলতে পারে কেবল চাষাদের উপর, কিন্তু চিরদিন তাদের প্রতিই অত্যাচার

হয়ে আসছে, আর হতে আমি দেব না।"

এই কথাগুলি কোনো অত্যাচারী নিষ্ঠুর প্রজাপীড়ক শোষক জমিদারের যেন নয়, এক মানব দরদী সুস্থ জীবন সন্ধানী সাম্যবাদী মানুষের কথা হয়ে উঠেছে। শরৎচন্দ্র আসলে জীবানন্দ চৌধুরীর পরিবর্তিত দৃষ্টির মাধ্যমে পল্লীসমাজের চিরকালের অত্যাচারিত কৃষক, ভূমিজ প্রজার দুঃখকে দেখাতে চেয়েছেন। তাই জীবানন্দের যখন হৃদয়-মন ষোড়াশীর আকস্মিক চণ্ডীগড় ছেড়ে যাওয়ার ও তার হাতে মন্দিরের বিশাল সম্পত্তির অধিকাব সমর্পণ করার অভাবিত ঘটনায় একান্ত বিচলিত হয়ে পড়েছিল, সেই সময় একাকী সন্ধ্যায় গ্রামের পথে প্রান্তরে ঘুরে তার চোখের সামনে যেন পল্লীগ্রামের সাধারণ হতভাগ্য কৃষকদের দুরবস্থা সত্যরূপ হয়ে প্রকাশিত হল। "দরিদ্র পীড়নের এই উৎকট চিহ্ন এই পথে কতবারই ত তাহার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। কিন্তু আজ ইহাই চোখে পড়িয়া দুই চোখ অশ্রুপ্লাবিত হইয়া উঠিল। মনে মনে কহিল, তাহার কত ক্ষতিই না জানি হয়েছে! কত ছোট ছোট ছেলেমেয়ে হয়ত পেট ভরে দু'বেলা খেতেও পারে না। কেনই বা মানুষে এসব করে? .. হাতে টাকা থাকলে কালই মিস্ত্রি লাগিয়ে এটা বাঁধিয়ে দিতাম, প্রতি বৎসর এ নিয়ে আর তাদের দুঃখ পেতে হত না ..." জীবানন্দ চৌধুরীর পাষণ্ড রূপটিই বাংলা দেশের গ্রাম সমাজে সচরাচর দৃষ্ট জমিদার বা ভূস্বামীদের প্রকৃত সত্য মূর্ত্তি, তার পরিবর্তিত প্রজারঞ্জক চরিত্রের মত ভূস্বামীর সংখ্যা অপ্রতুল।

'বিপ্রদাস' উপন্যাসেও বিপ্রদাসের জবরদস্ত জমিদারী রূপের চেয়ে বা তেজারতি কারবারী রূপের পরিবর্তে তার মহত্ত্ব ও ঔদার্যই পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে পরিস্ফুটিত হয়েছে। 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসের অন্যতম জমিদার রমেশ উপস্থিত হয়েছে এক মানবতার উপাসক আদর্শবাদী শিক্ষিত যুবক রূপে। তার চোখ দিয়ে শরৎচন্দ্র দেখিয়েছেন পল্লীসমাজের নীচতা ও হীনতার সত্য চিত্র তার প্রজাবাৎস্য সাধারণ দুঃখী প্রজাদের জন্য তার অকৃত্রিম সহানুভূতি পল্লীসমাজের উন্নতির জন্য তার নানাবিধ প্রচেষ্টা-উদ্যম এদেশের সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার কিছু কিছু মহত্তের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এখানেও পল্লীগ্রামে অনেক ভূস্বামী মন্দির প্রতিষ্ঠা করতেন পুকুর দিঘি নির্মান, ঘাট বাঁধানো, রাস্তাঘাটের সুব্যবস্থা, অতিথিশালা, চিকিৎসালয় বা শিক্ষায়তন, টোল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার মত ভাল কাজ করতেন। রমেশ ঠিক সেই পথের অনুসারী নয়। সে পল্লীগ্রামের অনগ্রসরতার মূল কারণ অশিক্ষা-কুশিক্ষা অনুভব করে সেই অন্ধকার দূর করার জন্য শুধু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেনি, সমাজের সাধারণ মানুষের নিজস্ব অধিকার বোধকেও জাগ্রত করেছে। রমেশ নিজের হাতে প্রজাদের কল্যাণে গ্রামের জন্য জমিদারদের ক্ষুদ্র স্বার্থ রক্ষায় নির্মিত বাঁধ কেটে দিয়েছে। এ নিয়ে লাঠি হাতে ধরতেও তার দ্বিধা হয়নি।

রমেশের আদর্শবাদ তাকে জেলখানায় ঠেলে দিয়েছে, কিন্তু তার মর্যাদা ও সম্মান শতগুণ বর্দ্ধিত হয়েছে তার প্রজাদের কাছে। এই রকম আদর্শবাদী ভূস্বামী করে রমেশকে চিত্রিত করা বা বিপ্রদাসের পরবর্তী পরিচয় কিম্বা জীবানন্দের জীবন গতির বিরাট বাক পরিবর্ত্তন লেখকের মানসিক বৈশিষ্ট্যকেই প্রকাশ করেছে। তিনি ভাল জমিদারের আরও একটি প্রতিচ্ছবি একেছেন শুভদা উপন্যাসে। সামান্য বেতনের দুশ্চরিত্র কর্মচারী হারান জমিদারী তহবিলেব প্রায় তিন হাজার টাকা চুরি করায় জমিদার ভগবান নন্দীর কাছে হারানের স্ত্রী শুভদা নিজে গিয়ে কাকুতি মিনতি করায় তিনি হারানকে মাপ করে দেন। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের রাজলক্ষীকেও জমিদার রূপে তৃতীয় পর্বে দেখানো হয়েছে। রাজলক্ষীও প্রজাদের সুখ-সুবিধা, বিপদ আপদ সব কিছুই গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে দেখেছে।

এই মহৎ ও প্রজাবৎসল ভূস্বামীদের চিত্র আমাদের যতই ভাল লাগুক, স্বার্থপর, নীচ, অর্থলোভী, নিষ্ঠুর স্বাভাবের ভূম্যাধিকারী আর উচ্চবিত্ত সুবিধা ভোগীরা যারা বাংলার পল্লীসমাজকে কলুষিত করে রেখেছে, তাদের পূর্ণাঙ্গ রূপও শরৎচন্দ্র নির্মান করেছেন। পল্লীসমাজের বেণী ঘোষাল, বামুনের মেয়ের গোলক চাটুজ্যে, বিরাজ বৌ এর রাজেন্দ্রবাবু, 'কাশীনাথে'র কমলা, কিম্বা বিখ্যাত ছোট গল্প দুটি মহেশ ও অভাগীর স্বর্গের জমিদার বাবুরা এদেশের পল্লীসমাজের উৎপীড়ক ভূস্বামীদের খাঁটি নমুনা। "দেনা-পাওনা'র জনার্দন রায় ও দুর্বৃত্ত উচ্চবিত্ত। বড়দিদি উপন্যাসের সুরেন্দ্রনাথ ও জমিদার রূপে বহু-নিন্দিত চরিত্র।

'পল্লীসমাজে'র বেণী ঘোষাল নিষ্ঠুর স্বার্থপরতায় সামান্য অর্থের জন্য বাঁধের জল আটকে রাখে, গ্রামের সমাজপতি হিসেবে জ্ঞাতি ভ্রাতা রমেশের সামাজিক সম্মান বিনষ্ট করার বা তার ক্রিয়াকর্ম পণ্ড করার গোপন হীন চক্রান্ত চালায়। নিজে স্খলিত চরিত্র হয়েও মিথ্যা অপবাদে রমাকে একঘরে করে। বেণী ঘোষালের স্বভাবে সুস্থ মানবিক বোধের একান্ত অভাব মুদ্রিত করে তাকে পল্লীসমাজের যথার্থ সুবিধাভোগী উচ্চবিত্ত বা ভূম্যধিকারীর বাস্তব প্রত্যক্ষ মূর্তি হিসাবে তুলে ধরেছেন শরৎচন্দ্র। বেণী ঘোষালের থেকেও ঘৃণ্য চরিত্রের মানুষ গোলক চাটুজ্যে। সম্পূর্ণভাবে পল্লীসমাজের ভণ্ড, শঠ ও নীচ স্বার্থপর জাতীয় ভূম্যাধিকারীও সমাজপতি সেজে বসে থাকা ব্যক্তিটি ব্যক্তিগত জীবনে চরম লাম্পট্যে স্ত্রী বিয়োগের পরে শ্যালিকা জ্ঞানদার সঙ্গে ব্যাভিচার করে। জ্ঞানদার গর্ভপাত ঘটানোর জন্য প্রিয়নাথকে রাজী করাতে না পেরে শেষপর্যন্ত প্রিয়নাথকেই অপরাধী সাজায়। এই নির্লজ্জ ব্যক্তি সন্ধ্যাকে বিবাহ করতে না পেরে প্রিয়নাথের মায়ের গোপন কলঙ্ক কাহিনী উদ্ধার করে এনে সংধ্যার বিবাহ-উৎসবের মুহূর্তে তা প্রকাশ করেছে। ফলে সন্ধ্যার বিবাহ পণ্ড হয়। লগ্নভ্রষ্টা মেয়ে হয়ে সন্ধ্যার ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়, প্রিয়নাথ নাপিতের উরসজাত এই সত্য প্রকাশে

সন্ধ্যাদের পল্লীসমাজে জাতিচ্যুত করে। প্রিয়নাথ কন্যাসহ দেশত্যাগী হয়। এই গোলক চাটুজ্জে যে নিজে লম্পট হয়ে অপরের ছিদ্রান্বেষী যে সুদের কারবারী এবং গোরু চালানের ব্যবসা করেও ঈশ্বরের নামে ভণ্ডামী করে— সে আমাদের পল্লীসমাজের একটি খাঁটি প্রতিনিধি চরিত্র হিসেবে বিগত শরৎচন্দ্রের যুগকে প্রতিবিম্বিত করছে।

'বিরাজ বৌ' উপন্যাসে রাজেন্দ্র বাবুও লম্পট জমিদার। তার লালসার আগুনে বিরাজ তার প্রবল ক্রোধ প্রকাশিত করতে চেয়ে উপন্যাসের কাহিনীকে গতিময় করেছে। রাজেন্দ্র বাবুর শোষক জমিদার রূপ চিত্রণ শরৎচন্দ্র করেননি। 'কাশীনাথ' উপন্যাসে কাশীনাথের স্ত্রী জমিদার কন্যা। পিতার অবর্তমানে সে সম্পত্তির মালিকানা পায়। প্রজা শাসনের বুদ্ধি তার ছিল। নতুন ম্যানেজারের পরামর্শে ব্রাহ্মণের জমি সে দখল করতে চেয়েছে। এটা তার কাছে অন্যায় বোধ হয়নি। কাশীনাথের সাক্ষ্যে প্রজার সম্পত্তি রক্ষা পেলে কমলা স্বামীকে যে অপমান সূচক কথা বলে তার মধ্যে প্রভু বা মালিক চরিত্রের দম্ভই প্রকাশিত হয়েছে। এবং এই অহঙ্কার ও দম্ভ গ্রামেব জমিদারী রক্তের স্বাভাবিক লক্ষণ বলেই গণ্য হতে পারত, কিন্তু যেহেতু কমলা নারী, তাই তার পত্নীত্বের নিষ্ঠা ও প্রেম এবং মহত্ত্ব এতে ক্ষুন্ন হয়েছে—এভাবে লেখক দেখিয়েছেন।

শরৎচন্দ্র প্রত্যক্ষভাবে গ্রামজীবনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। পল্লীসমাজের সব ধরনের চরিত্রকে তিনি কাছেব থেকে দেখতে পেয়েছিলেন। এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় হয়ত ভালমন্দ দুই ধরনের উচ্চবিত্ত বা ভূস্বামী চরিত্রই তিনি দেখেছিলেন, তারই রূপায়ণ ঘটেছে তাঁর উপন্যাস সমূহে। অথবা, আর একটি সূত্র শরৎ-চেতনা থেকে খোঁজা যায় যে, পুরোনো সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যববস্থার ওপর শরৎচন্দ্রের কিছু আকর্ষণ ছিল। সমাজের ধনী ও নির্ধন দুই সুনির্দিষ্ট শ্রেণী বিভাজন এবং নিধনের প্রতি ধনীর অন্যায় শোষনের কথা তিনি সুনির্দিষ্ট ভাবে চিন্তা করতে পারেননি বা, সেই চেতনায় সম্পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন না। ফলে অত্যাচারী শোষক শ্রেণী হিসেবে তিনি জোতদার জমিদার মহাজনকে সুচিহ্নিত করে দিতে সব সময় পারেননি। তাদের ব্যক্তি চরিত্রের কার্যধারায় তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। তাই শরৎচন্দ্র বাংলার পল্লীসমাজের কৃষক কুলের প্রতি গভীর সহানুভূতিশীল হওয়া সত্ত্বেও কিম্বা 'মহেশে'র মত জমিদারের হাতে অন্যায় ভাবে অত্যাচারিত, অবশেষে ভিটেমাটি ছেড়ে গ্রামত্যাগী সর্বহারা কৃষক সমাজের প্রতিনিধির মত গোফুর চরিত্র কিম্বা জমিদার ও তার হৃদয়হীন কর্মচারীদের কাছে মায়ের শবদাহের জন্য কাঠ-ভিক্ষাকারী কিশোর কাঙালী-চরণের চূড়ান্ত অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়ে একদিনের অভিজ্ঞতায় বৃদ্ধ হয়ে যাওয়ার মর্মান্তিক আলেখ্য রচনা করেছেন, তিনিই আবার রমেশের মত হৃদয়বান যুবক ভূস্বামীর আদর্শ নিষ্ঠ চরিত্র নির্মাণ করেছেন।

সমালোচকেরা বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের কৃষক সম্বন্ধীয় চেতনার তুলনা করে থাকেন। দেশের সাধারণ মানুষ অসম ধনবন্টন ব্যবস্থার ফলেই অর্থনৈতিক স্বাধীনতা পায় না। কিম্বা জমিদারী প্রথার অবসান ঘটানোর ওপর কৃষকের মুক্তি নির্ভর করছে— এমন কথা শরৎচন্দ্র লেখেননি। শরৎচন্দ্রের লেখায় উৎপীড়িত কৃষককূল একটু সহানুভূতি পেলেই কৃতজ্ঞ হয়ে উঠেছে জমিদারের ওপর। রমেশের কাজে ব্যবহারে তার সাধারণ প্রজারা তাকে বক্ষের মণির মত মনে করেছে। অত্যাচারী জীবানন্দ চৌধুরী আকস্মিকভাবে প্রজাদবদী মানুষে পরিণত হলে তাকে সাধারণ প্রজারা বিশ্বাস করেছে। শরৎচন্দ্র যেখানে আবেগের দ্বারা বেশী চালিত হয়েছেন, বঙ্কিমচন্দ্র যুক্তির দ্বারা সেখানে সঠিক পথ খুঁজেছেন। 'বঙ্গদেশের কৃষক' শীর্ষক প্রবন্ধে বঙ্কিম লিখেছেন ঃ 'জমিদারের ঘরে ধান আছে তাহার একমাত্র কারণ এই যে, তাঁহারা ভূমির উৎপন্ন ভোগ করেন। প্রজাওয়াড়ি বন্দোবস্ত হইলে প্রজারা সেই উৎপন্ন ভোগ করিত, সুতরাং সেই ধনটা তাহাদের হাতে থাকিত। তাহাতে দেশের কোন ক্ষতি হইত না। কেবল দুই চারি ঘরে তাহা রাশীকৃত না হইয়া লক্ষ লক্ষ প্রজার ঘরে ছড়াইয়া পড়িত।" —এই বক্তব্য শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে প্রতিফলিত হ'য়ে শোষক ও শোষিতের যথার্থ সম্পর্ক চিহ্নিত করে দেয়নি।

তথাপি শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে পল্লীসামজের গণ জাগরণের উদ্ভাস ইঙ্গিত হয়েছে। সমস্যা সমাধানের সুনির্দিষ্ট তাত্ত্বিক পণ গ্রহণ না করেও যে মানুষের ন্যায্য অধিকার জাগ্রত করা যায়, সমাজের পরিবর্তন ঘটানো যায়, সেকথা শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে বিভিন্ন ঘটনায়, কথায় ও বর্ণনায় বোঝা গেছে। 'শ্রীকান্ত উপন্যাসের তৃতীয় পর্বে দুজন সাধারণ গ্রামবাসী শ্রীকান্তকে তার বন্ধু সতীশ ভরদ্বাজের কলেরায় মৃত্যুর পরে প্রসঙ্গক্রমে আক্ষেপ করে বলেছে ঃ "...দিঘি নেই, পুকুর নেই, কুঁয়ো নেই কোথাও এক ফোঁটা খাবার জল নেই, গ্রীষ্মকালে গরু বাছুরগুলো জলাভাবে ধরফড় করে মরে যায়; কোথাও একটু ভাল খাবার জল থাকলে কি সতীশ মারা যেতেন? ... ম্যালেরিয়া, কলেরা, হর রকমের ব্যাধিপীড়ায় লোক উজাড় হয়ে গেল, কি কাকস্য পরিবেদনা কর্ত্তারা আছেন শুধু রেলগাড়ী চালিয়ে কোথায় কার ঘরে কি শস্য জন্মেছে শুষে চালান করে নিয়ে যেতে।" বাংলার পল্লীগ্রামের এই বাস্তব সত্যরূপ, একে অনুধাবন করেছে সাধারণ গ্রামবাসী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। শ্রীকান্ত নিজের গ্রামে গিয়ে দেখেছে পুরোনো বাদশাহী সড়ক এখন ভগ্নপ্রায়, কিন্তু সারাবার কোনো ব্যবস্থা নেই, "গ্রামের লোক জানে অনুযোগ অভিযোগ বিফল— তাহাদের জন্য কোনদিনই রাজকোষে অর্থ নাই— তাহারা জানে পুরুষানুক্রমে পথের জন্য শুধু পথকর যোগাইতে হয়, কিন্তু সে পথ যে কোথায় এবং কাহার জন্য এ সকল চিন্তা করাও তাহদের কাছে বাহুল্য।"

কিন্তু এই শোচনীয় জীবনচিত্রকে পাল্টাবার দিন ত আগত প্রায়। শরৎচন্দ্রের লেখা গ্রামভিত্তিক উপন্যাস সেই কথা বলতে চেয়েছে সাধারণ মানুষরাই সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার শেষদিকে অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে সামগ্রিক ভাবে জীবনের ক্ষেত্রে যে ভাঙন দেখা দিয়েছিল এবং যাদের শোষণ করে এই জমিদার ভূস্বামী তথা অভিজাতদের দল নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখত, গ্রামবাংলার সেই নিম্নবর্গীয় জনসমাজ যে ক্রমেই জেগে উঠছে তা শরৎচন্দ্র দেখিয়েছেন। সমালোচকের ভাষায় ঃ বঞ্চিত, রিক্ত, শোষিত, অসহায় মানুষদের প্রতি গভীর সহানুভূতিবশে তাহাদের ন্যায্য পাওনা দিবার যে আকাঙ্খা শরৎচন্দ্র তাঁহার কথাসাহিত্যে, প্রবন্ধাবলীতে ও চিঠিপত্রে রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা এদেশের জাতীয় অর্থনৈতিক বুনিয়াদ পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহ।"

(শরৎচেতনা, শ্রী শ্যামসুন্দর বন্দ্যোঃ পৃ. ১৩৩)

'দত্তা' উপন্যাসে আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত ডাক্তার যুবক নরেন তার কল্পিত বন্ধুর পরিচয়ে বিজয়াকে গ্রামবাংলার কৃষি সমস্যার কথা জানিয়েছিল ঃ "আমাদের দেশে সত্যিকার চাষী নেই। চাষ করা পৈত্রিক পেশা, তাই সময়ে অসময়ে জমিতে দুবার লাঙল দিয়ে বীজ ছড়িয়ে আকাশের পানে হাঁ করে চেয়ে বসে থাকে। একে চাষ করা বলে না, লটারী খেলা বলে। কোন জমিতে, কখন সার দিতে হয়, কাকে সার বলে, কাকে সত্যিকারের চাষ করা বলে— এ সব জানে না।"

কিন্তু ক্রমশঃই এদের ঘুম ভাঙছে, সচেতনতা আসছে। এবং সর্বক্ষেত্রেই সচেতনতার জন্য চাই শিক্ষা। সেই শিক্ষার আলো জ্বেলে দেওয়ার দায়িত্বও নিয়েছে রমেশের মত আদর্শ নিষ্ঠ যুবক। যে জমিদার হয়েও জমিদারী আভিজাত্য ত্যাগ করে তার গ্রামের দেশের পল্লী মানুষদের দুঃখ বেদনার অংশীদার হয়েছে। 'পণ্ডিত মশায়ে'র বৃন্দাবন চাষী শ্রেণীর যুবক। শিক্ষার আলোয় তার চেতনার দ্বার খুলে গেছে। সেই আলোক বোধ দিয়ে সে শিক্ষিত উচ্চবর্ণের যুবককে গ্রামবাসীদের যথাযত শিক্ষার পরিবেশ কিভাবে গড়ে উঠবে তার পরামর্শ দেয়। কেশব সেকথা গ্রহণ করে। রমেশের শিক্ষা তার পরিচিত নিম্নবর্গীয় গ্রাম্য জনমণ্ডলীকে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে নবযুগ চেতনায় উদ্বোধিত করেছে। মিথ্যা ষড়যন্ত্রে রমেশকে তার গ্রামের হীনচেতা বেণী ঘোষালের দল জেলে পাঠিয়েছিল। রমেশের প্রানস্পর্শে উজ্জীবিত সেই চাষী কৈবর্ত শ্রেণী কিম্বা মুসলমান প্রজারা ঐ ষড়যন্ত্রকারীদের ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। যে কোনো মুহূর্তে তারা প্রতিশোধ নেবে সমাজের এই মৌরসীপাট্টা নেওয়া সুবিধাভোগী শ্রেণীদের ওপর। তাদের ক্রোধের প্রকাশ ঘটেছে রমার দুর্গাপূজার প্রসাদ গ্রহণে সমবেতভাবে বর্জনের মাধ্যমে। যেহেতু রমাকে তারা অন্যতম ষড়যন্ত্রকারী ভেবেছে। এদের প্রতিনিধি হয়ে সনাতন সদর্পে মুখ তুলে বেণী ঘোষাল প্রমুখের দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট বলেছে রমেশকে

যারা জেলে দিয়েছে তাদের বাড়ীতে কেউ প্রসাদ নিতে আসবে না। সে বলেছে পীরপুরের মুসলমান প্রজারা রমেশকে হিন্দুদের পয়গম্বর মনে করে, তারা নতুন যুগের স্বাধীকার অঙ্গীকার ক'রে দেয়াল লিখন পড়তে শিখেছে, তারা স্পষ্ট বলে দিয়েছে "জমিদার তো ছোটবাবু (রমেশ)। আর সব চোর ডাকাত। তাছাড়া খাজনা দিয়ে বাস করব ভয় কারুকে করব না। আর বামুনের মত থাকে ত বামুন, না থাকে আমরাও যা, তারাও তাই।"

বিদ্রোহ ধ্বনিতে সমাজ বদলের আসন্ন ইঙ্গিত এইভাবে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের সাধারণ চরিত্রগুলি দিয়েছে। বঙ্গ পল্লীর সাবেক জীবন জাতি যে জড়ত্বের কূপে আবদ্ধ হয়েছিল, সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা পল্লী জীবনে যে অসহনীয় শোষণ ও পীড়ন সৃষ্টি করেছিল, সেই পীড়ণকারীদের প্রতিমূর্তি যেমন শরৎচন্দ্র নির্মাণ করেছেন, তেমনি পল্লীসমাজের বৃন্দাবন, সনাতন, সাগর সর্দার ও অগণিত সাধারণ প্রজার আত্মবোধের নবজাগরণ ও প্রতিবাদের দীপ্তিতে সেই সমাজের পুরানো সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোর আসন্ন ধ্বংসের ও আগামী নতুন সমাজ গঠনের দিগন্তরেখাও সুস্পষ্টভাবে অঙ্কিত করে দিয়েছেন।

(আট) শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে পল্লীসমাজের রক্ষচারী দেশ ও কালাতীত মানব দানবী

শরৎচন্দ্র বাংলা পল্লীর একান্ত সন্নিকটে পৌঁছেছিলেন তাঁর বাল্য-কৈশোরের অধিকাংশ সময়ে ও পরবর্তীকালে জীবনের শেষ ভাগে। গ্রামবাংলার মৃত্তিকাচারী এই লেখক শুধু পল্লী মৃত্তিকায় বাস করেননি মাত্র। ঐ ভূমি-লগ্ন নরনারীর প্রাণের স্পর্শে নিজের চেতনাকে সর্বদা রস সমৃদ্ধ করে রেখেছিলেন। পল্লী বাংলাকে ভালবেসে, তার ভাল-মন্দ সুখ-দুঃখ সবকিছুর অংশীদার হয়ে এই সমাজকে তার সম্পূর্ণ অবয়ব সহ তুলে ধরেছেন অধিকাংশ উপন্যাসে। শরৎচন্দ্রের উপন্যাস তাই পল্লী বাংলার সমাজ প্রাণের অজস্র সমারোহ। একান্ত বাংলার গ্রামেরই মানুষজন তাদের সর্altবিধ চরিত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে এখানে উপস্থিত।

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের গ্রাম প্রান্তরের মত বিপুল সীমাতে আছে দুর্বৃত্ত, শঠ মহাজন ভূস্বামী, লম্পট সমাজপতি, হৃদয়হীন উচ্চবিত্ত। আছে কল্যাণী নারী, জায়া, কন্যা, জননী, স্বার্থ কুটিল সুবিধাবাদী হীনচেতা সাধারণ জনতা আছে, আবার আদর্শ নিষ্ঠ যুবক প্রাণও আছে। নিষ্ঠারতা রমণী আছে, আবার প্রেমের বেদনা, গ্লানি বহনকারী নারীর আর্ত রূপ আছে।— এই চরিত্র গুলির পাশে আছে। শোষিত, নিপীড়িত সাধারণ প্রজাবর্গের দল। জমিদার 'ভূস্বামী' মহাজন এবং ধর্ম রক্ষক ও যাদের পীড়ন করে। সমাজে যাদের আসন বহু নীচে তাদের লাঞ্ছনা ও

অপমান চিত্র ও শরৎচন্দ্র অগ্নিরেখায় রূপায়িত করেছেন। এক চেনা জগত ও জীবনের মুখোমুখি পাঠক দাঁড়ান শরৎচন্দ্রের উপন্যাস। কিন্তু চেনা পরিচিত বাস্তব প্রত্যক্ষ মানুষ গুলির মধ্যেই এক একটি চরিত্র শুধু মাত্র বঙ্গ পল্লীসমাজের বৃত্তচারী থাকেনি; দেশ ও কালের শক্ত রজ্জু ছিঁড়ে সেই সব পুরুষ ও নারী সর্বকালের সব দেশের প্রতিনিধি প্রাণ সত্ত্বায় পরিণত হয়েছে।

সমালোচকেরা শরৎচন্দ্রের এই বৈশিষ্ট্যকে বার বার হতচকিত বিস্ময়ে বিশ্লেষণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের সাহিত্য স্বভাব সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন যে, "তিনি (শরৎচন্দ্র) সম্পূর্ণভাবেই নিজের দেশের এবং কালের।" (চিত্র, ১৩৪৪, ভারতবর্ষ) প্রখ্যাত অধ্যাপক আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন শরৎচন্দ্র বাঙালীর বিশেষত ঃ পল্লীবাংলার বাঙালীর জীবনের বহিরঙ্গ কাঠামোটি সযত্নে এঁকেছেন, এদিক থেকে তাঁর সত্যনিষ্ঠা রবীন্দ্রনাথ থেকে অধিক (অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩৬৪ সালের দেশ পত্রিকার সাহিত্য সংখ্যার "বাংলা উপন্যাস সূত্র শরৎ চেতনা, পৃ. ১২৭ শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়) আবাব তিনিই এ প্রবন্ধেই লিখেছেন, ... শরৎচন্দ্রের কৃতিত্ব এইখানে যে, তিনি তাঁহার চরিত্রগুলিকে বাঙালী রাখিয়াই তাহাদের মধ্যে সার্বভৌমিকতার সুসঙ্গত প্রবর্তন করিয়াছেন।" (ঐ, পৃ. ১২৭) শরৎচন্দ্রের লেখনীতে উদ্ভাসিত পল্লীসমাজের এই সার্বভৌমিকতা' যুক্ত চরিত্র হিসেবে উল্লেখ করতে পারি নারী ও পুরুষ দুই প্রকার ব্যক্তি সত্ত্বার।

নারী ঃ শরৎচন্দ্রের একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন 'মহেন্দ্রবাবু ... আমার আন্তরিক বিশ্বাস কোন মানুষেরই একটা সুনির্দিষ্ট জাত নাই, জাত আছে কেবল মানুষের হৃদয়ের, মস্তিস্কের।... এইগুলিই (শিক্ষা. হৃদয়ের প্রশস্ততা, স্বদেশপ্রীতি স্বজাতির দুঃখে বেদনাবোধ, উদ্যম, আন্তরিকতা) বড় জাতীয়। ... নইলে ব্রাহ্মণই কি আর দুলে বাগ্দীই বা কি— এইগুলো না থাকিলে কেবলমাত্র জন্মপত্রিকার লেখাগুলিই কোন মানুষকে কোন দিন উচ্চপদ দিতে পরিবে না। ..." (৪ঠা আশ্বিন, ১৩২৬ শিবপুর থেকে মহেন্দ্রনাথ করণকে লেখা একটি চিঠি। সূত্র ঃ 'শরৎচেতনা',— শ্রী শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় পৃ. ১৩২)

আমাদের মনে হয় সমাজের অন্যায় বর্ণভেদের গ্লানিতে লেখা শরৎচন্দ্রের এই তীব্র প্রতিবাদ বাণী শুধু উঁচু নীচু ছোট বড় জাতিভেদের ক্ষেত্রে নয়, সামগ্রিকভাবে সমাজের নারী পুরুষ সম্পর্কেও তিনি এই অভিমত পোষণ করতেন। নারীজাতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও দরদ নিয়ে শরৎচন্দ্র তাদের মূল্যায়ন করেছেন; তারই ফলে তাঁর বর্ণিত পল্লীসমাজের গ্লানিময় পটে প্রস্ফুটিত হয়েছে বিশ্বেশরীর মত রমণী চরিত্র। কুঁয়াপুর গ্রামের নিতান্ত অসংস্কৃত, অমার্জিত, জাত-পাত, উঁচু নীচুর হীন মানসিকতা যুক্ত গোষ্ঠী বা জ্ঞাতি, শত্রুতা, দলাদলি, জোট পাকানো, পরছিদ্রান্বষী স্বার্থপর সমাজপতিদের অন্যায়ের কালিমার মধ্যে মানবিক

মহিমাবোধে উজ্জ্বল এক অসামান্য মাতৃমূর্তিকে স্থাপিত করেছেন। বিশ্বেশ্বরী গ্রামসমাজে লালিত-পালিত, গ্রামের অভিজাত উচ্চ বংশের বধূ এবং সমাজপতি পুত্রর মা। কিন্তু গর্ভস্থ সন্তান বেণী ঘোষালের অন্যায় কর্মের যতখানি বিরুদ্ধতা করা সম্ভব তিনি সেটুকু প্রকাশে নির্দ্ধিধায় করেন। রমেশের পিতৃশ্রাদ্ধ পণ্ড করে দেওয়ার কুৎসিত গ্রাম্য প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে দৃঢ় কণ্ঠে প্রতিবাদ জানিয়েছেন ঃ গাঙ্গুলী মশাইকে ... আর হালদার মশায়কে .. আমার কাজ কর্মের বাড়িতে হাঁকহাঁকি চেঁচামেচি গালিগালাজ করতে আমি নিষেধ করচি। যাঁর অসুবিধে হবে, তিনি আর কোথাও গিয়ে বসুন।" পল্লী বাসীদের অসহযোগিতা আর বিরোধীতায় শুদ্ধ চিত্ত রমেশকে তিনি বারবার আশা আর সান্ত্বনায় নতুন পথ হাঁটবার প্রেরণা যুগিয়েছেন। "রাগ করে যে জন্মভূমি ছেড়ে চলে যেত চাচ্ছিস রমেশ, বল দেখি তোর রাগের লোক এখানে আছে কে? ... আহা এরা যে কত দুঃখী, কত দুর্বল তা যদি জানিস রমেশ, এদের উপর রাগ করতে তোর আপনি লজ্জা হবে। ... এদের মাঝখানেই তুই থাক বাবা।" রমেশের চেতনাকে স্বচ্ছ করে তুলেছে এই রমণীর গ্রাম সমাজের জড়ত্ব ও হীনতার মূল কার সম্পর্কে প্রকৃত উৎস সন্ধান ঃ 'যাকে যথার্থ ধর্ম বলে, পল্লীগ্রাম থেকে সে একেবারে লেশ পেয়েছে। আছে শুধু কতকগুলো আচার বিচারের কুসংস্কার, আর তা লোকের নিরর্থক দলাদলি।" তিনি রমেশকে বলেছেন, একমাত্র শিক্ষার প্রসারেই পল্লীসমাজের জড়ত্ব মোচন হবে। শুধু জ্ঞানের আলো জ্বেলে দিতে হবে। এই তেজস্বিনী নারী মৃত্যুর পর হিন্দু সংস্কার অনুযায়ী মুখাগ্নি পাবেন তার সন্তান বেণী ঘোষালের হাতে, এই ভয়ে গ্রাম ত্যাগ করে চিরতরে কাশী চলে যাচ্ছেন, —এই কথা শুনে পাঠক বুঝতে পারেন, সন্তানের প্রতি কি তীব্র ঘৃনার বেদনা বুকে নিয়ে তিনি দেশত্যাগী হচ্ছেন। বাংলা দেশের পল্লীসমাজের এই রকম রমণী চরিত্র শুধু মাত্র কুঁয়াপুরের বেণী ঘোষালের মা, অভিজাত জমিদার বধূ বা রমেশের জেঠিমা হয়ে থাকেননি, শরৎচন্দ্র তাঁকে মানুষের সত্য 'ধর্মের ন্যায়' নিষ্ঠ নিরপেক্ষ এক চেতনার আলোকে চিরকালের মহৎ ও উদার মানবতাবাদের বিশ্বভূমে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

'দেনাপাওনা'র ষোড়শী এরকমই এক নারী, যে প্রবল ব্যক্তিত্বময়ী চণ্ডীদেবীর ভৈরবী হওয়া সত্ত্বেও লম্পট অত্যাচারী জমিদারের মধ্যে স্বামীকে খুঁজে পেয়ে সনাতন হিন্দু নারীর সংস্কার ও ধর্ম বোধে তার জন্য পুলিস সাহেবের কাছে মিথ্যে সাক্ষ্য দিয়েছে, পরিণামে বিপুল কলঙ্ক.. টিকা মাথায় নিয়ে। 'রামের সুমতি' গল্পের গ্রাম্য রমণী নারায়ণী তার নিঃস্বার্থ স্নেহ বাৎসল্য সুধায় বৈমাত্রেয় দেবরকে ভরে রেখেছে। নিজের সন্তানের মত সে দেবরকে মায়ের মতই কোলে টেনে নিয়েছে। তখনি সে হয়ে উঠেছে বিশ্ব জোড়া মাতৃস্নেহের এক চিরন্তন প্রতিনিধি, শুধুই পল্লী বাংলার সমাজ তাকে দাবী করতে পারে না। গ্রামের বধূ, স্বামী

পরিত্যক্তা অভয়া যে বলিষ্ঠ সাহসে অপর পুরুষকে সঙ্গী করে সুদূর বর্মায় স্বামীর খোঁজে যায়, সে তো শুধু মাত্র পল্লী বাংলার রমণী নয়। এই অভয়া যখন লম্পট অত্যাচারী স্বামীকে ত্যাগ করে তার অনুরাগী যুবক রোহিনীর কাছে ফিরে এসে নতুন করে জীবন আরম্ভ করে এবং নিজের নারীত্বের অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা মুক্তকণ্ঠে শ্রীকান্তর কাছে উচ্চারণ করে, তখন অভয়া বিশ্বসাহিত্যের সব দুঃসাহসী স্বাধীকার প্রতিষ্ঠাকারী নারীদের গোত্রীয়া হয়ে যায়। পিয়ারী বাঈজী হয়েও রাজলক্ষ্মী 'শ্রীকান্ত'র প্রতি বাল্যপ্রেমের নিষ্ঠায় যে চিরকাল তাব জন্যই জীবনের সমস্ত কিছু সমর্পন করে বসে থাকে, সেই নারী গ্রাম্য সংস্কার সত্তেও ঠিক পল্লী বাংলার আটপেটরে রমনী নয়। 'শুভদা' উপন্যাসের গ্রাম্য প্রতিতা নারী 'কাতু' এক পরমাশ্চর্য চরিত্র হয়ে উঠেছে শরৎচন্দ্রের লেখনীতে। মিথ্যাবাদী নেশাখোর হারান তার রুগ্ন ক্ষুধার্ত পুত্রে নাম করে তার রক্ষিতা কাত্যায়নী বা কাতুর কাছে সাহায্য চাইলে, সে দয়ার্দ্র হয়ে শুধু দশটি টাকাই দেয়নি, পরম শুভানুধ্যায়ীর মত হারানকে বলেছে ঃ "ঠাকুর করুণ, তোমার যেন চোখ ফোটে।... তোমার অহিত আমি চাইনে, ভালর জন্যই বলি এখানে আর এসো না, গুলির দোকানে আর ঢুকোনা— বাড়ি যাও, ঘরবাড়ি স্ত্রী-পুত্র দেখোগে, একটা চাকরি -বাকরি কর, ছেলেমেয়ের মুখে দুটো অন্ন দাও, তারপর প্রবৃত্তি হয় এখানে এসো।" পতিতা নারীটি এখানে মানুষ্য-ধর্মে উজ্জ্বল হয়ে চিরন্তর মানবীতে উন্নীত হয়েছে। বাংলার পল্লীসমাজে তার মর্যাদা নেই, কিন্তু পাঠকের মনের আকাশে এই ক্ষুদ্র তারকাটি স্বকীয়তায় উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে।

এভাবেই শরৎচন্দ্রের লেখনীতে ভৈরবী ষোড়শী শুধু ধর্মপীঠের পুজারিণী না হয়ে থেকে শোষিত নিপীড়িত ভূমিজ প্রজাদের মা হয়ে উঠে, তাদের দুঃখবেদনার প্রতিকারের জন্য বারবার জমিদার জীবানন্দ চেধুরীকে আবেদন জানিয়ে সামগ্রিকভাবে পৃথিবীর দুঃখী জীবনের সহানুভূতিশীলা সমাজ পরিবর্তনকারী চরিত্রে পরিণত হয়েছে। শরৎচন্দ্র 'মানুষ্যত্বের সন্ধানে পচাগলা সমাজের অন্ধকার কোটরগুলি হাতড়ে বেড়িয়েছেন। পচা পুকুরের পাঁকের মধ্যে থেকে স্বর্ণময় দেব প্রতিমা উদ্ধারের মত তিনি অবক্ষয় পিষ্ঠ মুহূর্মু ফিউডাল সমাজের পঙ্কিল শর্তগুলির তলদেশ থেকে সমুজ্জ্বল মনুষ্যত্বের স্বর্ণ প্রতিমা উদ্ধার করে সব জন সমক্ষে স্থাপন করে একালের মানুষদেরকে ডাক দিয়ে বলেছেন, "দেখো, মনুষ্যত্বব বিলুপ্ত হয়নি।" (শরৎ সাহিত্যে সাময়িকতা ও দেশকাল নিরপেক্ষতা ঃ তারাপদ লাহিড়ী। উত্তরকাল ও শরৎচন্দ্র সম্পাদক ঃ শিশির মজুমদার পৃ. ১৫০)

পল্লীসমাজের পুরুষ চরিত্রগুলির মধ্যে পল্লীর কুপমণ্ডুকতা ও নীচতার অন্ধকার ঠেলে প্রকাশিত হয়েছে পল্লী সমাজের রমেশের ব্যক্তি চেতনা। যে ভূস্বামী হয়েও

সমাজ নিপীড়িত। যে সহৃদয় আন্তরিকতার সমাজ সংস্কারে এগিয়ে যায় অথচ, গ্রামবাসীর সহ মর্মিতা পায় না। তার অভিমান, বেদনা কিন্তু দুঃখী গ্রামবাসীদের শুভ চিন্তার আলোয় দুর হয়। মানুষের ভাল করার অপরাধে তার জেল হয়। কিন্তু তার জ্বালানো শিক্ষার আলো পল্লী সমাজের পথে ঘাটে, ঘরে-বাইরে ছড়িয়ে পড়েছে। রমা যথার্থই বলেছে, "আর ভয় নেই রমেশদা, তোমার এ আলো আর নিভবে না... এখন প্রতিদিনই উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।"

'শ্রীকান্ত' মত্ত আপাত ভবঘুরে অথচ জীবনদ্রষ্টা পুরুষ চরিত্রের জীবনভিত্তি পল্লীসমাজ। 'শ্রীকান্ত' তার জীবন পরিক্রমায় কত অজস্র ব্যক্তিত্ব কত বিচিত্র নারী, পুরুষের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে। সে সকলের প্রাণের অভ্যান্তরস্থ অমৃত আহরণ করে দিনে দিনে অমৃতত্ত্ব লাভ করেছে। তার দেখার আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে বাঈজী পিয়ারীর বক্ষদীর্ণ করে চিরন্তন কন্যাণী নারী রাজলক্ষ্মী, সনাতন ভারতীয় পত্নী ধর্মের প্রতিমূর্তি অন্নদা দিদির অত্যাশ্চর্য সাধ্বী রূপ। অভয়ার বলিষ্ঠ চেতনা দুঃসাহসী জীবন বাসনা। গহরের মহৎ উদার নিঃস্বার্থ ফকির-বাউল কবি সত্ত্বা। 'কমললতা'র অনাস্বাদিত জীবন পরিচয় শ্রীকান্ত পেয়েছে, পেয়েছে সুনন্দার মত তীব্র ব্যক্তিত্ব সচেতন বিদুষী নারীর কিম্বা তার স্বামী যদুনাথের আদর্শব্রতী অধ্যাপক মূর্তি, শ্রীকান্ত পল্লী মানুষদের সরলতা স্নেহ মূর্তি দেখেছে অগ্রদানী ব্রাহ্মণ ও তার গৃহিণীর মধ্যে, তেমনি পল্লীসমাজের হীন স্বার্থ বুদ্ধি ঠাকুর্দা প্রমুখের প্রকৃত রূপ চিত্রও তার চোখে ধরা দিয়েছে সত্য মূর্তিতে। এই জীবন পরিক্রমার মধ্য দিয়ে 'শ্রীকান্ত' বাঙালী পাঠকের কাছে যতখানি প্রিয় আর আপন হয়েছে, তেমনি, তারা জেনে যায়, এমন চরিত্রকে শুধু গৃহ বন্ধনের সীমা আটকাতে পারে না। পল্লীবাংলার হৃতশ্রী দেখে এই মানুষটি তীব্র বেদনানুভব করে, গ্রামের মৃত্তিকা মাথায় তুলে নেয় পরম শ্রদ্ধায়, কিন্তু তার মন্ত্র চরৈবেতি। দীর্ঘ সময় আর বিপুল পৃথিবী পড়ে আছে, শ্রীকান্ত ঠিক এক সময় রাজলক্ষ্মীর স্নেহ বন্ধন ও ছিন্ন করে আবার হয়ত ভেসে পড়ার কোনো দূরতর দ্বীপের খোঁজে।

'বিপ্রদাস' চরিত্রের ব্যক্তিত্ব দৃঢ় ব্যঞ্জনা পাঠককে বিস্মিত করবে। গ্রামের জমিদার ও তেজারতির কারবারী শক্ত চিত্তের বিষয় মানুষটিকে উচ্চ শিক্ষিতা বন্দনা পূজারত দেখে এক অপূর্ব অনুভূতিতে পূর্ণ হয়। বিপ্রদাসের কলেজের বিদ্যা নেই, কিন্তু তার অসাধারণ জীবন জ্ঞান এবং চারিত্রিক কাঠিণ্য সাধারণের থেকে বহুদূরবর্তী। তাই সে পাথরের দেবতা। স্ত্রী বিয়োগ, পুত্র বিচ্ছেদ অর্থহীনতা কোনোটিই তার মনে দাগ কাটে না। পল্লী সমাজের বুকে থেকেও সে পল্লীর নিজ সন্তান হয়ে থাকে না।

শরৎচন্দ্র 'পণ্ডিতমশাই' উপন্যাসে আর একটি দৃঢ়চেতা চরিত্র নির্মাণ করেছেন 'বৃন্দাবনের রূপাঙ্কণের মাধ্যমে, যাকে গ্রামের চাষী বৈষ্ণব সমাজের একজন বলে

ধরা যায় না। বৃন্দাবন জাতিভেদহীন নতুন ভারতবর্ষের নতুন ব্যক্তিসত্তা। বৃন্দাবন পল্লীসমাজের দুরবস্থার মূল উৎখাত করতে চায় জাতিভেদের দূরত্ব অপনোদন করে। উচ্চ ও নিম্নবর্ণের যে স্পষ্ট বিভাজন যুগ ঘুগান্তর ধরে দুই পক্ষকে আশ্চর্য শীতলতায় বিপরীত মুখী করে রেখেছে। সেই সীমারেখা মোচনের কথা সুস্পষ্টভাবে বৃন্দাবন জানিয়েছে তার শিক্ষিত উচ্চবর্ণের যুবক বন্ধু কেশবকে। গ্রামের উচ্চবর্ণ সমাজ হিংস্র কুটিলতায় বৃন্দাবনের পুত্রকে চিকিৎসা করেনি। বৃন্দাবন, তার সমাজে, তার দেশকালের থেকে অনেক দূর এগিয়ে ছিল। এই জন্যই তাকে সর্বস্ব হারিয়ে পথে নামতে হয়েছে শেষ পর্যন্ত। যে সমাজে গুল্ম ছাড়া কিছু জন্মায় না, সেই সমাজের আঙ্গিনায় প্রস্ফুটিত হয়েছে বৃন্দাবনের মত বনস্পতি তুল্য চরিত্র। তাকে দেশ-কাল বুঝবে কি করে।

শরৎচন্দ্র গ্রামের অতি সাধারণ জনতার মধ্য থেকেও খুঁজে পেয়েছেন মানব সম্পদ। 'শ্রীকান্ত'র রতন, পল্লীসমাজের অভয়া, দত্তার কালিপদ মানবিক হৃদয় সম্পদে পূর্ণ হয়ে দেশকালের গণ্ডি ছাড়াতে পেরেছে। পল্লীসমাজের হিন্দু মুসলমান সাধারণ প্রজার দল, সনাতন তাদের মুখপাত্র হয়ে সমাজপতি বেণী ঘোষাল, গোবিন্দ গাঙ্গুলী প্রমুখের রক্ত চক্ষুর সামনে চোখ তুলে তাকিয়ে নিজেদের প্রাপ্য অধিকার টুকু ব্যক্ত করেছে। নিজেদের চেতনা মুক্তির কথা ঘোষণা করেছে। জমিদার কন্যা রমার দুর্গোৎসবের প্রসাদ প্রত্যাখ্যান করেছে, দুর্বৃত্ত বেণী ঘোষালের মাথা ফাটিয়ে পালিয়ে যায়নি। ধরা দিয়ে বোঝাতে চেয়েছে তাদের সম্মিলিত প্রতিবাদ সামাজিক অন্যায় কারীদের বিরুদ্ধে।

সমালোচক প্রশ্ন তুলেছেন 'যে মনুষ্যত্ব মৌলিক মানবধর্মের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত —সে ত পুনঃ পুনঃ পরিবর্তনশীল মানবসমাজের সম্পদ। কোন বিশেষ দেশ ও কালের সীমার মধ্যে কি তাঁকে বেঁধে রাখা যায়?'

আমরা উত্তর দিতে পারি তাঁর সৃষ্টি তাঁকে এই ক্ষুদ্র সীমায় বেঁধে রাখে না, মনুষ্যত্বের ভাবুক শরৎচন্দ্র তার পল্লী পটভূমি উপন্যাসগুলিতে এমন অজস্র চরিত্র রচনা করেছেন যারা দেশকাল অতিক্রম করে বিশ্বমানবতার দরবারে পৌঁছতে পেরেছে। সমাজের দ্রুত রূপান্তর ঘটছে। বাংলা পল্লীসমাজ ও আর শরৎচন্দ্রের যুগ ভাবনার বৃত্তে আবদ্ধ নেই। তথাপি, এই সামাজিক রূপান্তর সত্ত্বেও শরৎচন্দ্র সৃষ্ট এই পল্লী চরিত্রগুলি বিস্মরণের গর্ভে নিক্ষিপ্ত হবে না, তারা চিরন্তন মানব মহিমার বাণী উচ্চারণ করবে।

উপসংহার

শরৎপরবর্ত্তী বাংলা উপন্যাসে পল্লীসমাজ

।। ভূমিকা।।

এক নিবিড় পল্লীসমাজ বোধ শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের মূল ভিত্তি ছিল। বাংলা উপন্যাসের ধারায় রবীন্দ্র প্রতিভার যুগেও তাঁর সরল সহজ গ্রামজীবনের কথা চিত্র, বাঙালীর চিরন্তন আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পাঠকবর্গকে মুগ্ধ করেছিল। তাঁর উপন্যাসে চিত্রিত বাংলার পল্লীসমাজের যথাসম্ভব বাস্তব তথ্য-ভিত্তিক কাহিনী ঘটনা ও চরিত্র বাঙালী পাঠককে নগর কলকাতার তৎকালীন জীবনভাব কেন্দ্রিক কৃত্রিম রোমান্টিকতা মনো-বিকলনের রূপ ও নগ্ন বাস্তবতার চিত্রময় উপন্যাস সাহিত্য থেকে অনেক পরিমাণে ভিন্ন স্বাদ দান করেছিল। পূর্বকালীন বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস ধারার অর্ন্তভুক্ত না হয়েও এবং রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম-মনন চেতনার ভাগীদার না হয়েও শরৎচন্দ্র তাঁর সময়কালীন বাংলা সাহিত্যে বিশেষ আসন করেছিলেন নিজস্ব বিষয় গ্রহণের অভিনবত্বে। শরৎচন্দ্রের চেতনায় বাংলা পল্লীসমাজ সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার, সমস্যা পীড়া-আর্তিসহ উঠে এসেছিল, গভীর চিন্তার সূক্ষ্ম বোধে পরিভ্রমণ না করেও বাঙালীর প্রাণে তিনি পল্লীজীবনের প্রতি কৌতুহল ও আগ্রহ নতুন ভাবে সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন।

অথচ, শরৎচন্দ্রের এই সাহিত্য আদর্শের পরিবর্তে বাংলা সাহিত্যে তৎকালে (প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কালে) জগৎ ও জীবন সম্পর্কে গভীর ও জটিল জিজ্ঞাসাই প্রধান হয়ে উঠেছিল। নগর জীবনের অভিজ্ঞতা বা নাগরিক মার্জিত বুদ্ধি সচেতন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা জীবনের পরিচয় এ সময় এক শ্রেণীর নতুন বাঙালী লেখকদের রচনায় প্রাধান্য পেল। জীবন সম্পর্কে সংশয় ও অবিশ্বাস সেখানে মুখ্য স্থান পেল। সমাজের জটিলতা, জীবন সংগ্রামের তীক্ষ্ণ বাস্তব সত্য এরা রূপায়িত করার চেষ্টা করলেন। তিরিশ দশকের এই তরুণ বাঙালী লেখক সম্প্রদায় 'কল্লোল' পত্রিকা মারফৎ তাঁদের প্রতিভা বিকশিত করায় তাদের 'কল্লোল গোষ্ঠী'র লেখক আখ্যা দেওয়া হয়েছে। সনাতন ভারতীয় তথা বাঙালীর জীবনবোধকে মহাযুদ্ধ যেমন ছিঁড়ে-খুঁড়ে তছনছ করে দিয়েছিল, অনুরূপভাবে কল্লোল গোষ্ঠীর তরুণ বাঙালী লেখকবৃন্দ বাংলা কথা সাহিত্যে এনেছিলেন জটিল

জীবন রহস্যের সংকেত, ব্যর্থতাবোধ, অস্থিরতা ক্রমবর্ধমান নেতিবাদী চেতনা। 'কল্লোল গোষ্ঠী'র সাহিত্য চেতনায় বৈশিষ্ট নির্দেশ করেছেন সমালোচক এইভাবে। এঁদের লেখার "প্রচলিত সমাজের ধর্মনীতি ও প্রেম সম্পর্কে আদর্শবাদী চিন্তার অভাব। এক ধরনের সংশয়ী ও নাস্তিক্য বুদ্ধির উদ্ভব। সেই সঙ্গে প্রচলিত মূল্যবোধ ও কথা সাহিত্যের বিষয় ভাব ও আঙ্গিক ভাষার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।......"

"তথাকথিত বস্তুনিষ্ঠা বা Realism এর দিকে প্রবল ঝোঁক। 'ভারতবর্ষ', 'প্রবাসী', 'বসুমতী', 'বঙ্গবাণী' ইত্যাদি সমকালীন পত্রিকায় যে বাস্তব প্রবণতার পরিচয় ফুটে উঠেছিল 'কল্লোল গোষ্ঠী' তাকেই আরও তীব্র, তীক্ষ্ণ করে তুললেন। এই বাস্তব প্রবণতার একদিকে যৌন মনস্তত্ত্বের অসংকোচ রূপায়ন, অন্যদিকে নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষের অভাব অভিযোগজনিত দুঃখবোধের প্রকাশ।"

[ড. গোপিকানাথ রায় চৌধুরী, দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথা সাহিত্য, পৃ. ২২৮/ ১৩৮০ সংস্করণ]

সমালোচকের মতে, "এই পর্বের সাধারণভাবে যুদ্ধোত্তর আধুনিক কথাসাহিত্যের অন্যতম লক্ষণ নগর চেতনা।" কারণ হিসেবে বলেছেন "যুদ্ধোত্তর কাল পর্বের কল্লোল গোষ্ঠীর চেতনায় সমাজ-সত্তার অস্তিত্ব ক্ষীণ হয়ে গিয়ে ব্যক্তি জীবনের বিচিত্র রূপ, বহুবিধ সমস্যা, জটিল অর্ন্তদ্বন্দ্ব, সংশয় জিজ্ঞাসা, আবার অন্যদিকে, স্বপ্নকল্পনা যতই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে, কলকাতা শহরের পটভূমি তাঁদের সৃষ্টির পক্ষে ততই অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।"

(ড. গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাঙলা কথা সাহিত্য। পৃ. ২৩১, ২৩২, ১৩৮০ সংস্করণ)

বাংলা কথা সাহিত্যের এই পটভূমিকায় বাংলা গ্রামজীবনের স্নিগ্ধ শান্তির আবহমণ্ডল নতুন করে ফিরিয়ে আনা এক অবিশ্বাস্য ও অসম্ভব ব্যাপারই ছিল। কেন-না, পাশ্চাত্ত রূঢ়বাস্তববাদী জীবন চেতনা ও ভাবধারায় প্রভাব প্রথম মহা-যুদ্ধোত্তর কালে একান্ত অনিবার্য ছিল। তথাপি বাঙালীর সহজ জীবন পিপাসু গোপন সত্তাকে প্রাণভরে তৃষ্ণা মিটিয়ে দিয়ে অভিনব পল্লীজীবন চেতনা বাহক হয়ে শরৎ পরবর্ত্তীকালে বাংলা কথা সাহিত্যে নিশান উড়িয়ে দিলেন প্রধানভাবে তিনজন মহা কথাশিল্পী। এঁরা হলেন, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভুষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। কালানুক্রমিকভাবে সাজালে এরকম :

বিভূতিভুষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০)।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১)।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬)।

এই ত্রয়ী ঔপন্যাসিকের মধ্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থ পল্লীচেতনা ভিত্তিক

উপন্যাস রচনা করেননি। তিনি 'কল্লোলে' বা 'কালি-কলমে' না লিখলেও বুদ্ধদেব বসু তাঁকে ' belated Kallolean' ও তাঁর রচনাকে ' of kallol in spirit' বলে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন, অচিন্ত্যকুমার বলেছেন, তিনি 'কল্লোলেরই কুলবর্ধন'। (সূত্র : ডঃ গোপিকানাথ রায় চৌধুরী। দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাঙলা কথা সাহিত্য। পৃ. ৩৩১)। প্রকৃতপক্ষে গভীর ও জটিল বক্র জীবন চেতনার প্রথাবিরোধী বিদ্রোহ রূপায়ন তাঁর সাহিত্যের প্রধান দিক। তাই 'কল্লোল গোষ্ঠী'র লেখকরা তাঁকে আত্মজন ভেবেছেন। তথাপি নিজস্ব ভাবদৃষ্টি ও রচনাশৈলী নিয়ে তিনি যথার্থভাবে 'কল্লোল পন্থী' নন একথা অধিকাংশ সমালোচকের বিশ্বাস।

নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায় : "মানিক কল্লোলের ধারাবাহী নন, তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণের স্থানিক সাহিত্যও তাঁকে প্রেরণা দেয়নি। .... তিনি স্বয়ং সিদ্ধ।" (সূত্র : ঐ, পৃষ্ঠা : ৩৫০) মানুষের মনের বিচিত্র গহ্ণতাকে উপন্যাসের বিষয় করে তিনি (মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়) বাংলা উপন্যাসে নতুন দিগন্তের সন্ধান করেছেন ....." (সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, পৃ. ৩১০, ১৯৭১/১৩৭৮ সংস্করণ)। তথাপি বাংলার গ্রামজীবন তাঁর উপন্যাসে এসেছে। পল্লী পটে তিনি জীবনকাহিনী রচনা করেছেন এবং পল্লীবাংলার বিশেষ সমাজ প্রবনতা তাঁর উপন্যাসের বহু ক্ষেত্রে খুঁজে পাই। সেই কারণেই বাংলা কথা সাহিত্যে তথা উপন্যাসে শরৎচন্দ্রের পরবর্তীকালে পল্লী সমাজভাবনার আলোচনায় তাঁর প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হয়েছে। এ বিষয়ে আলোকপাত যথা সময়ে করা হবে।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

শরৎ পরবর্তী বাংলা উপন্যাসে পল্লীবাংলার জীবন ও সমাজ-ছবি গভীর আন্তরিকতায় উজ্জ্বল হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে বিভূতিভূষণ ও তারাশঙ্করের লেখনিতে। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের বাংলা সাহিত্যে যখন জগৎ ও জীবন সম্পর্কে চরম অনিশ্চয়তা ও তিক্ততা বোধ ও যৌনতার বহুল প্রয়োগ, মনোজগতের অন্ধকার কুটিল অলিগলির মধ্যে চেতনার বিসর্পিত পরিভ্রমণ, পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের রূঢ় বাস্তবতার অনুসরণে এক ক্লান্তিকর পৌনঃপুনিক রূপায়ন চলেছে, সেই যুগমুহূর্তে "বিভূতিভূষণ নিয়ে এলেন এক শান্তনির্লিপ্ত লিরিক সুরের নির্জন অবকাশ। বিক্ষুব্ধ জনজীবনের কর্ম-কোলাহল থেকে অনেক দূরে পল্লীর নির্জন পথে ধূ-ধূ করা উধাও মাঠে, গহন রাত্রির নিঃসঙ্গ আকাশের তলায় যেখানে সহজ শান্ত জীবনের আবেগ মথিত সুরগুলি স্তম্ভিত হয়ে আছে। বিভূতিভূষণ তাঁর প্রথম উপন্যাসের (পথের পাঁচালী) অতিপরিচিত পটভূমিতে সেইগুলিকে প্রকাশ করলেন অলংকারহীন অথচ আশ্চর্য ব্যঞ্জনাময় এক ভাষায়।" (বিভূতিভূষণ : মন ও শিল্প—গোপিকানাথ রায় চৌধুরী। পৃ. ১৪, দে'জ সংস্করণ, নভেম্বর

১৯৭৮)

বাংলার পল্লী ও মানুষ সহজ ও সরলভাবে তাঁর উপন্যাসে প্রত্যক্ষ হল। গ্রামবাংলার অতি পরিচিত নর-নারী, তাদের সংসার যাত্রা, দুঃখ দারিদ্র, ছোট ছোট আশা আকাঙ্খার ছবি, পল্লীসমাজের স্বভাব বৈশিষ্ট্য, বিভিন্ন সমস্যা সব কিছু এক অনায়াস সরলতায় ফুটে উঠেছে। বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত', 'ইছামতী' প্রমুখ উপন্যাসে গ্রামবাংলার নর-নারী ও সমাজকে কেন্দ্র করে কাহিনী গড়ে উঠেছে, গ্রামবাংলার স্নিগ্ধোজ্জ্বল শ্যাম প্রকৃতি পটভূমিতে লেখক এঁকে তুলেছেন মানুষের জীবন প্রবাহকে। কিন্তু বিভূতিভূষণের লেখনি বৈশিষ্ট্য এখানেই যে, জীবনের জটিলতা, সমস্যা পীড়নে আর্ত্ত পল্লীর সাধারণ মানুষ এ উপন্যাসে তাঁর প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর শোনায় না, গ্রামীণ মানুষের ক্রমপ্রগতির আলোকচিত্রও বিভূতিভূষণ আকেননি। প্রবল প্রতাপ সমাজসত্ত্বার অমোঘ নিয়ন্ত্রণ শক্তিও তিনি দেখাননি। শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজ মনস্কতা থেকে তাঁর চেতনা ভিন্নমুখী। তিনি এক আশ্চর্য অর্ন্তদৃষ্টিতে বাংলার পল্লীকে অবলোকন করেছেন। তাঁর দেখার আলোয় গ্রামবাংলার সাধারণ শান্তস্নিগ্ধ প্রকৃতি অসামান্য রসলাবণ্যে প্রাণময়ী হয়ে উঠেছে। প্রকৃতির তুচ্ছাতিতুচ্ছ সৃষ্টিকলা তাঁর কাছে অপরূপ ও অসামান্য তাৎপর্য ধরা দিয়েছে। তিনি ভুলে গেছেন জীবনের দারিদ্র্য, দুঃখ, বেদনা, সহস্রাধিক লাঞ্ছনা, হতাশার দীর্ঘশ্বাস। ভাবরসের অমেয় সুধায় ভরা মনে, মুক্ত পক্ষ-বিহঙ্গের ডানায় ভর দিয়ে তাঁর অনির্বার পথচলা ঘাট থেকে ঘাটে। সর্বোপরি এক সুগভীর আস্তিক্য বোধ তাঁকে নম্র-নত করেছে। বিশ্ববিধানের কেন্দ্রমূলে স্থিতি পরম শক্তির কল্যাণ স্পর্শ তিনি গহণ অন্তঃস্থলে অনুভব করেছেন। এর ফলে পল্লীর জীবন, পল্লীর প্রকৃতি, সব কিছু যেন নতুন ভাবে আলোকিত হয়ে যায় তাঁর রচনায়। পাঠকমনে শোক দুঃখ বেদনার অতীত এক পরম প্রসন্নতায় পৌঁছে যায়।

ব্যক্তি জীবনে গ্রাম বাংলার মাটিও মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে চিরদিনই প্রায় বিভূতিভূষণ যুক্ত ছিলেন, তাঁর শৈশব কৈশর কেটেছে "যশোহর জেলার বারাকপুর গ্রামে, হুগলীর কাছে শাগঞ্জ কেওটায় ও মামার বাড়ি মুবাতিপুরে।" (দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথা সাহিত্য, ডঃ গোপিকানাথ রায় চৌধুরী, পৃ. ৩৮৩ /১৩৮০ সংস্করণ)। বিভূতিভূষণের অধিকাংশ উপন্যাসের পটভূমি গ্রামবাংলা, তার চরিত্রগুলি পল্লীর সাধারণ মানুষ আর সমস্যাও প্রধানভাবে গ্রামের সাধারণ জীবনসমস্যা বৈচিত্র্যহীন পল্লী বাংলার দারিদ্র পীড়িত সংসার 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের পটভূমি। হরিহর, সর্বজয়া ও তাদের পুত্র কন্যা দুর্গা ও অপু ভেঙ্গে পড়া গৃহতলে সংসার খেলা খেলছে নিশ্চিন্দিপুর গ্রামে। বাংলাদেশের আরও অসংখ্য সাধারণ পল্লীগ্রামের মতই নিশ্চিন্দিপুর নগর জীবন থেকে দূরবর্তী এমন কি রেল লাইনও দেখতে যেতে হয় গ্রাম প্রান্তর মাঠ জলা পার হয়ে।

প্রকৃতি চেতনা মুখ্য হলেও 'পথের পাঁচালী'তে বাংলার পল্লী জীবনের সার্থক রূপ-ছবি ফুটে উঠতে দেখা গেছে।

লেখকের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে যেন খাঁটি পল্লীসমাজে এ উপন্যাসে এসে দাঁড়িয়েছে। মহাযুদ্ধের পরবর্ত্তীকালে বাংলার নগরজীবনের প্রবল পরিবর্তন হয়ে গেলেও পথের পাঁচালীর মুগ্ধ বিস্ময় রসসিক্ত অনবদ্য প্রকৃতি চেতনা ও কালের চিরন্তন গতি চেতনার ফাঁকে দেখা দিচ্ছে পল্লী বাংলার সরল বৈচিত্রহীন গার্হস্থ্য জীবন চিত্র। হরিহর সর্বজয়ার কষ্টের সংসার, যেখানে দরিদ্র হরিহর গুরুগিরি করে অর্থ-উপার্জ্জনের জন্য বাহিরে ঘুরে বেড়ায়। তার সংস্কৃতি বিদ্যা আধুনিক কুলে কর্মসংস্থান ঘটায় না। বাড়িতে সর্বজয়া সন্তানদের নিয়ে সামান্য উপকরণে বেঁচে থাকে। দীর্ঘদিন হরিহরের কাছে থেকে পত্র বা টাকা না পেয়ে তার অর্ধাশন অনাহারে চলে। তখন সন্তানদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য লুকিয়ে কাঁসার বাসন নাপিত বৌ-কে বিক্রি করতে হয় আধুলির বিনিময়ে। কিন্তু মধ্যবিত্ত ভদ্র-জনের আত্মাভিমানে সে নাপিত বৌ-কে কাউকে এ কথা জানাতে বার বার না করে। পল্লী গ্রামের অভাবী ভদ্র-সংসারের জ্বলন্ত সত্য চিত্র এভাবে বিভূতিভূষণ আঁকেন ঃ ঘরে একদানা চাল নেই, দুটোখানি বাসি চাল ভাজা মাত্র আছে। অপু কান্নাকাটি করে, তা হবেনা মা, আমার খিদে পায় না বুঝি—আমি দুটি ভাত খাব (বিভূতি রচনাবলী—মিত্র ঘোষ পাবলিশার্স, ১৩৮৬ সং, পৃ: ১৪৬)।

সন্তানদের মুখে অন্ন তুলে দেবার জন্য ভদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারের গ্রামবধু সর্বজয়াকে আত্মসম্মান ত্যাগ করে নিম্নশ্রেণীর নিবারণের মার কাছ থেকে পুরোনো চাদরের বিনিময়ে 'আধকাঠা খানেক চাল আজ দিয়ে যাবি?'— এই মিনতি জানাতে হয়। সর্বজয়া পল্লীবাংলার অভাবী ভদ্র পরিবারের খাঁটি বাস্তব জননী মূর্ত্তি। যে নিজে উপবাসে থেকে সন্তানকে বাঁচাতে চায়।

"কয়দিন সে ওলশাক, কচুশাক সিদ্ধ করিয়া খাইয়া দিন কাটাইতেছে— নিজে উপবাসের পর উপবাস দিয়া ছেলে মেয়েকে যাহা কিছু সামান্য খাদ্য ছিল খাওয়াইতেছে—শরীর ভাবনায়, অনাহারে দুর্বল। মাথার মধ্যে কেমন করে।" (ঐ পৃ. ১৪৯)।

পল্লীসমাজের জমিদার ও প্রজা সম্পর্কের সরাসরি চিত্র না থাকলেও দরিদ্র কৃষক ও মহাজন সম্পর্কের নিষ্ঠুরতার দিকটি 'পথের পাঁচালী'র সপ্তদশ পরিচ্ছেদে বিভূতিভূষণ দেখিয়েছেন। এই একটি পরিচ্ছেদে ত্রিশদশকের গ্রাম সমাজের অর্থনৈতিক চিত্রটি খুব সংক্ষিপ্ত অথচ সত্যমূলকভাবে অঙ্কিত হয়েছে। গ্রামে সরকারী ভাবে জরিপের কাজ শুরু হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিভূতিভূষণ এখানে স্বার্থপর মধ্যসত্ত্ব ভোগী গ্রামীণ মহাজন জাতীয় কিছু ভূ-সম্পত্তি মালিকের নির্মম রূপ দেখিয়েছেন। বিভূতিভূষণ যথার্থই লিখেছেন "গ্রামের সকল ভদ্রলোকই কিছু জমিজমার মালিক"। তাঁরা পিতৃ পুরুষের অর্জ্জিত এই সব সম্পত্তির নিরাপদ

কূলের জীবন তরণী লগি কষিয়া পুতিয়া জড় পদার্থের ন্যায় উদ্যমহীন, গতিহীন নিষ্ক্রিয় অবস্থায় দিনগুলি একরূপ বেশ-ই' কাটাচ্ছিল, কিন্তু এবার তাঁরা বিপন্ন। এ কথা ঠিক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, এবং দেশ ভাগের আগে পর্যন্ত গ্রামের অনেকেই প্রবাসী বা শহরবাসী হলেও দেশ হিসাবে গ্রামের সঙ্গে সংযোগ রাখতেন। তাই বিবাহ বা উৎসব পূজা ইত্যাদিতে সমবেত হওয়ার মতই এই জরিপের সময়ে নিশ্চিন্দিপুর গ্রামে তাদের অনেককেই আসতে হয়েছে। অন্নদা রায়ের গৃহেও তার প্রবাসী শরিক পুত্রের আগমণ ঘটায় তার অংশের ঘরগুলি ছেড়ে দিতে হয়েছে। অন্নদা রায়ের মত মানুষের পক্ষে এটি অসুবিধাজনক, কেন না প্রবাসী শরিকের জমিজমা বাগান ঘর-বাড়ি এ সব নিরঙ্কুশভাবে তার পক্ষে আর ভোগ করা সম্ভব হচ্ছে না।

এই পরিচ্ছেদেই মহাজন ভূম্যধিকারীর নিষ্ঠুর স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। খাতক অন্নদা রায়ের কাছে গ্রামের দরিদ্র কৃষকবধু তার স্বামীর মৃত্যুর মাত্র চারদিনের মাথাতেই ছেলের একমাত্র রুপোর নিমফল টুকু বিক্রি করে পাঁচটি টাকা যোগাড় করে এসে হাত পেতেছে আহার সংস্থানের জন্য; তাদের গোলার চাবিটি খুলে দেওয়ার আবেদন জানিয়েছে। কিন্তু সরলা কৃষক বধুর পক্ষে মহাজন রায় মহাশয়কে চিনতে দেরী ছিল। নিঃস্ব ও অসহায় নারীটি ও শিশুর জন্য তার কোন মাথা ব্যাথাই ছিল না. বরং মৃত তমরেজ-এর কাছ থেকে পাওনা কিভাবে আদায় হবে সেই ভাবনাই তার প্রধান হয়েছে। হৃদয়হীন অন্নদা রায় নির্বিকারভাবে দীনু ভট্টাচায্যিকে বলতে পেরেছে—'ওই ও পাড়ার তমরেজের বৌ— দিন চারেক হোল তম্‌রেজ না মারা গিয়েছে? সুদে আসলে চল্লিশ টাকা বাকী, তাই মরবার দিনই বিকেল থেকে গোলায় চাবি দিয়ে রেখেছি, এখন গোলা খুলিয়ে দ্যান— হেন করুন —তেন করুন' (ঐ পৃ. ৯৯)। কৃষক বধু তবুও আকুলভাবে বলে উঠেছে "কসে খান ও সফি ঠাকুর মোর খোকার একটা উপায় করে যান, ওরে মুই খাওয়াবো কি, এক পয়সার মুড়ি কিনে দেবার যে পয়সা নেই— মোর গোলা না খুলে দ্যান, মোর টাকা কডা মোরে ফেরৎ দ্যান'— (ঐ পৃ. ১০০) তমরেজের বউ-এর এই আকুল বেদনার্তি পল্লীবাংলার সব হারানো কর্ষণজীবী মানুষের বেদনার্তি। কিন্তু এই অর্তি যতই করুণ হোক মহাজন ভূস্বামীর তাতে কোন সহানুভূতি জাগে না। তাই রায় মশায় মুখ খিঁচিয়ে নির্দয়ভাবে বলতে পারেন— "যা যা সন্দেবেলা খালী ফ্যাচ ফ্যাচ্ করিস নে— এক মুঠো টাকা জলে যাচ্ছে তাবু সঙ্গে খোঁজ নেই। গোলা খুলে দাও। টাকা ফেরৎ দাও— গোলায় আছে কি তোর? জোর শলি চারেক ধান, তাতে টাকা শোধ যাবে? ও পাঁচ টাকাও উসুল হয়ে রৈল, আমার টাকা দেখবো না। ওঁর ছেলে কি খাবে বলে দ্যাও— ছেলে কি খাবে তা আমি কি জানি?" (ঐ পৃ. ১০০)

বিবেকহীন নিষ্ঠুর ও স্বার্থপর এই শোষক মধ্যসত্ত্বভোগী সম্প্রদায় পল্লীবাংলায় সৃষ্টি হয়েছিল কুখ্যাত ভূমিনীতি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে। তাদেরই এক প্রতিনিধি অন্নদা রায়। কিন্তু বিভূতিভূষণের লেখায় এই হৃদয়হীন সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কোন প্রতিকার ত নেই-ই, প্রতিবাদ পর্যন্ত নেই। কৃষকদের শ্রেণীচেতনা জাগরণের কোন লক্ষণ তাদের বিদ্রোহ দূরের কথা এই অমানবিক ব্যাপারটি নিয়ে বিভূতিভূষণ আর বেশী কথা লেখেননি। শুধু স্বামীর মৃত্যু বিবরণ দিতে গিয়ে এই হতভাগিনী কৃষক রমণীর রুদ্ধ বেদনা অশ্রু মথিত কণ্ঠস্বরে প্রকাশ করেছেন .... "ওমা নিতে তারা উঠতি না উঠতি মানুষ দেখি আর সাড়া শব্দ দেয় না, দুপুর হতি না হতি মোরে পথে বসিয়ে— মোর খোকারে পথে বসিয়ে— চোখের জলে তাহার গলা আটকাইয়া গেল।..." অন্নদার জ্ঞাতিভ্রাতার পুত্র নীরেন এ সময় এসে যাওয়ার এই করুণ প্রসঙ্গটি সম্পূর্ণ চাপা পড়ে গেছে।

অন্নদা রায়ের পারিবারিক অধ্যায়েও বাঙালীর গৃহজীবনের একটি বাস্তব দিক চিত্রিত হয়েছে বাড়ির বধুটির প্রতি তার স্বামী ও অভিভাবিকা পরিজনের অত্যাচারের মাধ্যমে। সেই সময়ের বৃহৎ গ্রামীণ সংসারে স্ত্রীকে নিগ্রহ করার অধিকার স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে এই সব নিকট আত্মীয়াদের অবশ্যই ছিল। অন্নদা রায়ের পুত্রবধুকে তার স্বামী গোকুল খড়ম পেটা করে। প্রতাপশীলা পিসী শাশুড়ী 'সখী ঠাকরুন' ও সামান্য অজুহাতে তাকে যথেচ্ছ গাল মন্দ করে, শূদ্রের স্পর্শ দোষ কাটনোর জন্য মাজা বাসন পুনরায় মাজিয়ে, হাঁড়ি ফেলে দিয়ে রান্নাঘর গোবর নিকিয়ে শুদ্ধ করিয়ে নেয়। ফলে তার স্নানাহার করতে করতে আর বেলা থাকে না। এই বধুটি উৎপীড়িতা অসংখ্য অসহায় পল্লীবধুদের একজন হয়ে ওঠে লেখকের সরসী বর্ণনায়। হুকুম মত সকল কাজ সারিতে বেলা একেবারে পড়িয়া গেল। নদীতে সে যখন পুনরায় স্নান করিতে গেল, তখন রৌদ্র, ক্ষুধাতৃষ্ণায় ও পরিশ্রমে তাহার মুখ শুকাইয়া ছোট হইয়া গিয়াছে। ... এই সময় প্রতিদিন তাহার শৈশবের কথা মনে পড়ে ..."পান কৌড়ি পান কৌড়ি ডাঙায় ওঠো সে ... গোকুলের বউ খানিকক্ষণ পান কৌড়িটার দিকে চাহিয়া রহিল। মায়ের মুখ মনে পড়ে। সংসারে আর কেহ নাই যে মুখের দিকে চায়। মায়ের কি মরিবার বয়স হইয়াছিল? ... বুকের মধ্যে উদ্বেল হইয়া উঠে, চোখের জলে ছায়াভার নদীর জল। মাঠ, ঘাট, ওপারের শিমুল গাছটা বাঁকের মোড়ে বড় নৌকাখানা—সব ঝাপসা হইয়া আসে।" (ঐ, পৃ. ১০৩-১০৪)

পথের পাঁচালীতে গ্রাম্য নারীদের একে অপরের সম্বন্ধে কানাকানি, আলোচনার প্রবণতা বিশেষ নেই, দু-একটি ক্ষেত্রে থাকলেও (যেমন অন্নদা রায়ের ছেলে গোকুলের বউকে মাথায় খড়ম মারার ঘটনা নিয়ে পুকুরঘাটে রায় গিন্নীর আলোচনা, নীরেনের কাছে টাকা নিয়ে ভাইকে পাঠানোর জন্য নানা কু-কথা,

ইত্যাদি) বিভূতিভূষণ যেন উদাসীন নিস্পৃহতায় আলগোছে এই সব সংসার বিষকে তাঁর ভাব পক্ষ থেকে ঝরিয়ে দিয়ে চোখ ফেলেছেন আনন্দ বোধের মধু সমুদ্রে। তাঁর কাছে পৃথিবীর সব কিছুই মধুময়। মধুরং মধুরং মধুরং। বা রবীন্দ্রনাথের কবিতার ভাষায় তিনি যেন বলতে চান "এ দ্যুলোক মধুময়, মধুমা, পৃথিবীর ধূলি, এই মহামন্ত্রখানি, ইহারে নিয়েছি আমি তুলি'— কিন্তু এই সৌন্দর্যলোক থেকে কতবারই না ক্লিষ্ট পৃথিবী তাঁকে টেনে আনছে তার দুঃখে আর আর্তিতে ভরা বাস্তব মৃত্তিকায়। পরমনিরাসক্তি সত্ত্বেও তো মৃত্তিকাময়ী পৃথিবীর বাস্তব পরিচয়কে তিনি উপেক্ষা করতে পারেন না। আর অপু সংসারের দারিদ্র্য, কষ্ট ও অপমানের বস্তু কাঠিন্যকে অগাধ বিস্ময় রসসিক্ত ভাব বৃষ্টি আর জীবনের অখণ্ড গতিময়তা বোধে সরিয়ে দিচ্ছে সর্বদা, কিন্তু উপন্যাসে অপুর চতুঃস্পার্শ ঘিরে রয়েছে যে পার্থিব অপরাপর নরনারী, শিশু-বৃদ্ধ তারা বাংলার পল্লীসমাজের বাস্তবতাকে তো অনিবার্যভাবে ছুঁয়ে আছে। সেই কারণে সর্বজয়া চরিত্রকে লেখক প্রথম জীবনে স্বার্থপর কলহপরায়না গ্রাম্য নারী স্বভাবেই দেখিয়েছেন। যে তার জ্ঞাতি সম্পর্কিতা বৃদ্ধা ইন্দির ঠাকরুনকে দুই চক্ষে দেখতে পারেনি এবং ছুঁতো পেয়েই গৃহ থেকে বিতাড়িত করেছে, আবার শত দুঃখেও সন্তানদের নিয়ে কত ছোট ছোট কলাকৌশলে গৃহ সংসারটি সচল রাখতে চেয়েছে। হরিহর স্বপ্ন বিলাসী, সংসারে বুদ্ধিহীন উদাসীন প্রকৃতির মানুষ হয়েও স্ত্রী-পুত্র পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য অর্থরোজগারের আশায় গ্রাম ছেড়ে বাইরে ঘুরে বেড়িয়েছে। পূজা সন্নিকটে গ্রামে ফিরে এসেছে সন্তানদের হাসিমুখ দেখবার আশায় আর পাঁচজন পিতার মতই তাদের পছন্দের জামা-কাপড়-বই আলতা নিয়ে। হরিহর গ্রাম্য চরিত্র ময় সে বর্হিজগতে যৌবনকালে ঘুরে বেড়ানোর ফলে গ্রাম্য কূপমণ্ডুকতা তার চরিত্রে নেই। তবুও কখনো কখনো গৃহ বন্ধনে তার মন আটকে যাচ্ছে। বিশেষত ঃ পুত্র অপুর জন্য এবং দুর্গার অকাল প্রয়ানে তার স্মৃতি বেদনা তাকে বাস্তব পিতায় পরিণত করেছে।

দুর্গার চরণ ছন্দে ও ঘর ছাড়া মুক্তি চেতনা বার বার ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক। তথাপি দুর্গার চুরি করে অপরের আম বাগান থেকে কাঁচা আম জোগাড় করা, নারকেল চুরি করা আমের কুসি কুড়িয়ে খাওয়া, অপটু হাতে বনভোজনের রান্না করা, ভাই এর ওপর গভীর ভালবাসা, আবার তার সঙ্গে কলহ- মারামারি করা, টুনির মার সোনার সিন্দুর কৌটো চুরি করা— নীরেনের সঙ্গে তার বিবাহ প্রস্তাবে দরিদ্র ঘরের এই পল্লী বালিকাটি তার সামান্য একটুখানি আকাঙ্খার ছবি ফুটিয়েছে, একটি শুভলক্ষণ দায়ক সুদর্শন পোকাকে সামনে দেখে। নিজের প্রিয়জনদের মঙ্গল কামনার সঙ্গে এই জীবনবাসনা জুড়ে দিয়েছেন "... নীরেন বাবুকে ভাল রেখো, আমার বিয়ে যেন ওখানেই হয় সুদর্শন, রানুর দিদির মত

বাজি বাজনা হয়।"

উপন্যাসে গ্রামের ছেলে অপুর বন্ধু পটু, জেলে পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে পটুর দিদি বিনি যুগীদের বামুন বলে তাদের ঘটি করে জল খেতে দেওয়া, মুখুজ্যের মেয়ে রানী, অপুর ওপর তার টান, হরিহরের শিষ্য বাড়িতে গুরু পুত্র বলে অপুর আদর, তাদের বৈকালীন হা ডু ডু খেলা—এসব বাস্তব পল্লী জীবন রসাসিক্ত ঘটনা ও চরিত্র পথের পাঁচালীর সম্পদ হয়ে উঠেছে। এছাড়া আছে পল্লী জীবনের অঙ্গ বিভিন্ন পূজা পার্বন, উৎসব আনন্দ বিনোদনের প্রধান মাধ্যম যাত্রাগান— সবকিছুর বিস্তারিত বিবরণ। মেয়েলি ব্রত, ব্রত কথা পাঠ, লৌকিক ছড়া- প্রবাদ বচনের উদ্ধৃতির অসংখ্য প্রয়োগ এবং সেই সঙ্গে কিম্বদন্তী লৌকিক সংস্কার, বিশ্বাস, প্রথা আচার—এই জীবন কাহিনীতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যুক্ত হয়ে বাংলার পল্লী প্রাণ সত্তাটিকে যেন পরিপূর্ণভাবে তুলে ধরেছে।

(১) ছড়া : ইন্দিরা ঠাকরুন শিশু দুর্গার সঙ্গে ছড়ার পদপূরণ খেলা খেলেছে— 'ও ললিতে চাঁপ কলিতে একটা কথা শুনসে রাধার ঘরে চোর ঢুকেছে

দুর্গা পদ পূরণ করে : "চুলো বাঁধা এক মিনসে।"

(২) সর্বজয়া ভাত কাপড়ের খোঁটা দিয়ে দুর্বাক্য বললে ইন্দিরা ঠাকরুণ সে সব সহ্য করে এই বাস্তব ছড়াটি স্মরণ করে : "লাথি ঝাঁটা পায়ের তল/ভাত পাথরটা বুকের বল।

(৩) সর্বজয়া স্মরণ করেছে দেড় বছরের শিশু অপুকে ঘুমপাড়াতে সুর টেনে ঘুম পাড়ানী গান করত-'আয়রে পাখী—ই-ই- লেজঝোলা, আমার খোকনকে নিয়ে—এ-এ- গাছে তোলা ...

ঝড় বৃষ্টিতে আম কুড়োতে গিয়ে ভিজতে ভিজতে দুর্গা আর অপু বহু পরিচিত সব শিশুদের জানা বৃষ্টি থামানোর বিশ্বাসী ছড়া সমস্বরে বলেছে : নেবু পাতায় করম চা / হে বৃষ্টি ধরে যা— অপুর মুখে প্রতিবেশীর মেয়ে লীলার বিয়ের জন্য বালুচরের শাড়ীর কথা শুনে ইন্দিরা ঠাকরুণের শেখানো মজার অর্থহীন ছড়া দুর্গা ভাইকে শুনিয়েছে। বালুচরের বালুরচরে একটা কথা কই-/ মেয়ের পেটে ময়ূর ছাঁনা দেখে এলাম সই।

গন্ধভাদালির পাতা খুঁজতে খুঁজতে দুর্গা পিসিমা ইন্দিরা ঠাকরুণের কাছে শেখা ছোটবেলার ছড়া আপন মনে মনের সুখে মাথা দুলিয়ে বলে : হলুদ বনে বনে / নাকছাবিটি হারিয়ে গেছে সুখ নেইকো মনে।

লৌকিক ব্রতের বিবরণ :

দুর্গার লৌকিক মেয়েলি ব্রত পুন্যিপুকুর করার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন

লেখক। এই ব্রতটি গ্রাম সমাজে অতি পরিচিত। কুমারী মেয়েরা করে থাকে সুখ সৌভাগ্যের জন্য।

সকালে স্নান সেরে দুর্গা পেঁপে তলায় ব্রত করতে বসেছে। সে দ্রুত বেগে আবৃত্তি করে : পুন্যিপুকুর পুষ্পমালা কে পুজেরে দুকুরবেলা?

আমি ঘাতী লীলাবতী ভায়ার বোন ভাগ্যবতী—

শুভ ও মঙ্গলের প্রতীক সুদর্শন পোকা এই লোকচলিত ধারণার বিশ্বাসে ঐ পোকাটিকে দেখে এক নিঃশ্বাসে দুর্গা বলতে থাকে :— সুদর্শন, সুভালাভালি রেখো... সুদর্শন, সুভালাভালি রেখো (বিভূতি রচনাবলী ১ম খণ্ড পৃ. ১১৩, চতুর্থ মুদ্রণ)

পুরাণ পাট : দ্বিপ্রাহরিক বিশ্রামের সময় রামায়ন, মহাভারত সুর করে পড়ে শোনানো বা নিজে পড়া আর পাঁচজন সাধারণ পল্লীবাসী বাঙালী গৃহিণীদের মধ্যে অতি প্রচলিত ছিল। সর্বজয়াও আঁচল পেতে শুয়ে ছেঁড়া-খোঁড়া কাশীদাসী মহাভারত সুর করে পড়ত। — 'রাজা বলে শুন শুন মুনির নন্দন। / কহিব অপূর্ব কথা না যায় বর্ণন। / সোম দত্ত নামে রাজা সিন্ধু দেশে ঘর। / দেবদ্বিজে হিংসা যদা অতি (ঐ, পৃ. ৩৭)

পূজা পার্বন : গ্রামের বারোয়ারী চড়ক পূজার আয়োজন নিশ্চিন্দিপুরের পল্লী জীবনে চড়ক বিরাট উৎসব বিশেষ। এই উৎসবে এক দিকে চড়ক পূজার সন্ন্যাসীদের গাজন, ভক্তদের শিব বা নীলের পুজো, অন্যদিকে এই পুজোকে কেন্দ্র করে কয়েক রাত ধরে যাত্রাগানের আয়োজন। নিশ্চিন্দিপুরের নিস্তরঙ্গ জীবনে এ একটা বিরাট আনন্দ আলোড়ন। প্রায় মাস খানেক ধরে গ্রামে চাঁদা ওঠানো হচ্ছে। এবারে নীলমনি হাজরার দল আনা হবে। পাল পাড়ার বাজারে মহেশ সেকরার বালক কেত্তনের দলের গানের সঙ্গে যেন পাল্লা দেওয়া যায়— এমন একটা প্রতিযোগিতার ভাব উদ্যোক্তাদের কথায় ফুটে উঠেছে। এই উৎসবের বিবরণ লেখক খুটিনাটি শুদ্ধ— 'চড়কের আর বেশী দেরী নাই গাজনের সন্ন্যাসী বাহির হইয়াছে' চড়কের পূর্বরাত্রে নীলপুজো হয়। এ পূজোর দিনে বিকেলে "একটা ছোট খেজুর গাছে সন্ন্যাসীরা কাঁটা ভাঙে" পুরোনো গাছের বদলে এবার অন্য গাছ থেকে কাঁটা ভাঙা হবে। কাঁটা ভাঙার নাচ হয়। চড়ক তলায় "খেজুরের ডাল দিয়া নীল পূজার ঘিরিয়াছে, ..."। সেখানে ভুবন মুখুজ্যের বাড়িতে মেয়ে 'টুলু বলল আজ রাত্রে সন্নিসিরা শ্মশান জাগাতে যাবে।' রানু বলল 'একজন ঘড়া হবে। তাকে বেধে নিয়ে যাবে শ্মশানের সেই ছাতিম তলায়। তাকে আবার বাঁচাবে, তারপর মড়ার মুণ্ডু নিয়ে আসবে। ছড়া বলতে বলতে আসবে। ওর সব মন্তর আছে। দুর্গা সেই ছড়া শুনিয়ে দ্যায় : "স্বগগো থেকে এলো রথ/ নামলো খেতুতলে / চব্বিশ কুটী, বানবর্ষা শিবের সঙ্গে চলে—/ সত্য যুগের মড়া আর

আড়ল যুগের মাটি, / শিব শিব বলরে ভাই ঢাকে দ্যাও কাঠি—" (ঐ , পৃ. ১৩১)

লৌকিক ভূত-প্রেত অপদেবতা বিশ্বাস বা সংস্কার এই পল্লী বালিকাদের রক্তে গাঁথা হয়ে গেছে। সেই সংস্কারে রাণু ডাকে—'চল ভাই আমরা বাড়ি যাই— আজ রাতটা ভাল নয়— আয়রে অপু, দুগগাদি আয়।' অপুর প্রশ্ন কেন ভাল নয়-এর রহস্যের সঠিক উত্তর রাণুর জানা না থাকলেও লৌকিক সংস্কারে বলে "সে সব কথা বলতে নেই, তুই আয় বাড়ি।' অপু বাড়ি না ফিরলেও রাত বাড়লে তার মনেও এক ভৌতিক ভীতি এসে দানা বাঁধে, কেমন একটা অনৈসর্গিক পরিবেশ ও অনুভূতি সৃষ্টি করেছেন লেখক। সন্ধ্যে থেকে "শ্মশানেরও মড়ার মুণ্ডের গল্প শুনিয়া তাহার যে সব ভয় ভয় করিতেছে। মোড়ের বাঁশবনের কাছে অসিয়া মনে হইল কিসের যেন কটু গন্ধ বাহির হইতেছে।"

এই অপ্রাকৃত বিশ্বাস ন্যাড়ার ঠাকুরমার মত প্রাচীনার মনে বদ্ধমূল। অপু জিজ্ঞাসা করে " কিসের গন্ধ বেরিয়েছে ঠাকুর মা? বুড়ি বলিল — আজ ওরা সব বেরিয়েছেন কিনা? ..তারই গন্ধ আর কি— অপু বলিল— কারা ঠাকুরমা? কারা আবার —শিবের দলবল। সন্দেবেলা ওদের নাম করতে নেই— রাম রাম—রাম রাম—

অপুর গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল। চারিধারে অন্ধকার সন্ধ্যা, আকাশে কালো মেঘ, বাঁশবন, শ্মশানের গন্ধ। শিবের অনুচর ভূত-প্রেত—ছোটছেলের মন বিস্ময়ে, ভয়ে রহস্যে, অজানার অনুভূতিতে ভরিয়া উঠিল। সে আতঙ্কের সুরে বলিল— আমি কি করে বাড়ী যাবো ঠাক্‌মা।...

বুড়ী বকিয়া উঠিল। —তা এত রাত করাই বা কেন বাপু আজকে দিনে? ... এসো আমার সঙ্গে। নীল পূজার থালা খানা দিয়ে আসি তার পর এগিয়ে দেবো'খন। ধন্যি যা হোক"—

যাত্রা

গ্রাম বাংলার সমাজ সংস্কৃতির অচ্ছেদ্য অঙ্গ যাত্রা। চড়ক পূজাকে কেন্দ্র করে অপুদের গ্রাম নিশ্চিন্দিপুরে যে যাত্রার আয়োজন হয়, গোটা গ্রাম সমাজই তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে। শুধু চাঁদা তোলা বা যাত্রা শোনার ব্যাপার নয়। যাত্রা গানের শিল্পী, কর্মচারীদের গ্রামের গৃহস্থ সংসারে তাদের সামর্থ অনুযায়ী একজন বা একাধিক জনকে আহার যোগানের পালা নিতে হয়েছে। সর্বজয়ার সংসারে আহারের ব্যবস্থা হয়েছিল যাত্রার এক ঢোল বাজিয়ের। অপুর সঙ্গে যাত্রার কিশোর শিল্পী অজয়ের বন্ধুত্ব হওয়ার পর বাদ্য করের পরিবর্তে অজয়ের আহারের দায়িত্ব সর্বজয়াকে নিতে হয়েছে অপুর একান্ত আগ্রহে। যাত্রার আসরে দর্শক হিসেবে গ্রামের মেয়েদের চিকের আড়ালে বসবার প্রথা, যাত্রার পুরুষদের

নারী সাজা, —এই সব বৈশিষ্ট্য বিভূতিভূষণ দেখিয়েছেন।

পূজার মানতও পল্লীজীবনের একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। পথের পাঁচালীতে সর্বজয়া 'গঙ্গা নন্দপুরের সিদ্ধেশ্বরী ঠাকুরবাড়িতে পূজা মানত করেছিল। নিশ্চিন্দিপুর ছেড়ে যাওয়ার আগে অপু সেই পুজো দিয়ে এসেছে।

পুজো পার্বণে গ্রামদেশে নিমন্ত্রণ বাড়ি থেকে ব্রাহ্মণের চাঁদা পাওয়ার প্রথা, বাড়ি বাড়ি ঘুরে ছোট ছেলে মেয়েদের খই মুড়কি নেওয়ার পরিচিত চিত্র বিভূতিভূষণ সরল রেখা চিত্রে এঁকেছেন। গ্রামের এক শ্রাদ্ধ বাড়ির নিমন্ত্রণে ব্রাহ্মণের ছাঁদা নিয়ে বাদানুবাদের বর্ণনা : ''ছাঁদার পরিমাণ লইয়া কর্ম্মকর্ত্তাদের সঙ্গে ব্রাহ্মণদের তুমুল বিবাদ। কে একজন চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল .... চাইনে 'তোমার ছাঁদা, কন্দর্প মজুমদার এমন জায়গায় কখনও—

কর্ম্মকর্ত্তা হাতে পায়ে ধরিয়া কন্দর্প মজুমদারকে প্রসন্ন করিলেন।' (পৃ. ১৬৬) এই হীন কটু কলহ চিত্র শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজে বহু বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে, বিভূতিভূষণ শুধু, এক আধটি রেখায় গ্রাম-সমাজের প্রবণতাটি যেন পাঠককে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

এখান থেকে ছাঁদা বেঁধে খাদ্যবস্তু এনেছে অপু, তার মা দরিদ্র গৃহিণী সর্বজয়া তাতে তৃপ্ত, কিন্তু নাগরিক জীবন যুক্ত তাদের জ্ঞাতি জ্যাঠাইমা ছাঁদা বেঁধে বাড়িতে নিয়ে আসবার জন্য ছেলে সুনীলের ওপর ক্রোধ প্রকাশ করেছেন।

ডাইনী বিশ্বাস একটি দৃঢ় মূল লৌকিক সংস্কার, এটি অদ্যবধি প্রচলিত। পথের পাঁচালীর নিশ্চিন্দিপুর গ্রামে ও 'আতুরা ডাইনী বিশ্বাস প্রচলিত ছিল। খেলতে গিয়ে পথ হারিয়ে একদিন অপু ও তার সঙ্গী নীলু সেই আতুরার কুটিরের সামনে পৌঁছোয়। " ...নীলু ভয়ের সুরে বলিয়া উঠিল আতুরা ডাইনীর বাড়ি!

''অপুর মুখ শুকাইয়া গেল ... কে না জানে যে ... ডাইনীটা জেলে পাড়ার কোন এক ছেলের প্রাণ কাড়িয়া লইয়া কচুর পাতায় বাঁধিয়া জলে ডুবাইয়া রাখিয়াছিল। ... কে না জানে সে ইচ্ছা করিলে চোখের চাহনিতে ছোট ছেলেদের রক্ত চুবিয়া খাইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিতে পারে," (পৃ. ৭৩) গ্রাম ছেড়ে চলে যাবার আগ দিয়ে এই বৃদ্ধা মারা যায়। অপু এতদিনে বুঝেছিল, আতুরী নিঃসঙ্গ দরিদ্র বৃদ্ধা মাত্র ছিল, ডাইনী ছিল না।

উপন্যাসের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে একটি লোকপ্রচলিত প্রায় কিম্বদন্তীর পর্যায়ে উন্নীত কাহিনীর উল্লেখ করেছেন। ঐতিহাসিক সত্যের সঙ্গে মানব জীবনের কাহিনী, তার সঙ্গে নিয়তিবাদ ও ঈশ্বরের অমোঘ ন্যায় বিচারে বিশ্বাস মিশ্রিত হয়ে এ কাহিনী গ্রাম জীবনে প্রচলিত ছিল। ইংরেজ আমলের সূত্রপাতে বাংলাদেশে এক রকম অরাজক অবস্থা ছিল। সে সময় বহু জমিদারের ডাকাতির সঙ্গে যোগ থাকত। তাছাড়া ছিল ঠেঙাড়ে ঠগীদের নৃশংস অত্যাচার। বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির মত হরিহরের পূর্বপুরুষ বীরু রায়ও ঠেঙাড়ে সর্দার ছিল। ঠেঙাড়েরা নৃশংসভাবে

পথিককে প্রথমেই হত্যা করে তার সর্বস্ব লুট করত। প্রচলিত কাহিনী এই যে, বীরু রায় একদা এক ব্রাহ্মণ ও তার বালক পুত্রের করুণ প্রাণ ভিক্ষার আবেদনে কান না দিয়ে হত্যা করে উভয়ের দেহ ঠাণ্ডা হেমন্ত রাতে ঠাকুরঝি পুকুরের জলে টোকাপানা ও শ্যামা ঘাসের দামের মধ্যে পুঁতিয়া ফেলিবার ব্যবস্থা করে। ঠিক পর বৎসর পুজোর আগে এই বীরু রায়ের একমাত্র পুত্রকে নদীচর থেকে কুমীর টেনে নিয়ে যায়। লোক বিশ্বাস ধ্বনিত হয়েছে বিভূতিভূষণের লেখায় "গত বৎসর দেশের ঠাকুরঝি পুকুরের মাঠে প্রায় একই সময়ে যে ঘটনা ঘটিয়েছিল যেন এক অদৃশ্য বিচারক এ বছর ইছামতীর নির্জন চরে তাহারা বিচার নিষ্পন্ন করিলেন।" (ঐ পৃ. ১০) বীরু রায়ের বংশলোপ হল এবং তাদের পরিবারে এর পর থেকে "বংশের জ্যেষ্ঠপুত্র সন্তান কখনও বাঁচিত না।" লোক বিশ্বাস এই যে "বংশে ব্রহ্ম শাপ ঢুকিয়াছে।" হরিহরের মা তারকেশ্বরের ' এক সন্ন্যাসীর কাছে কাঁদাকাটা করিয়া এক মাদুলি পান। হয়ত সেই মাদুলির গুনে কিংবা লেখকের ভাষায় ব্রহ্ম শাপের তেজ দুই পুরুষ পরে কর্পূরের মত উবিয়া যাওয়ার ফলেই হোক হরিহর দীর্ঘায়ু হয়েছে।

এইভাবেই বিভূতিভূষণের লেখায় বাংলার পল্লী সমাজের একটি প্রায় পূর্ণাঙ্গ চিত্রই ফুটে উঠেছে। পথের পাঁচালীর মূলভাবরস ভিন্ন বা অভিনব হলেও গ্রাম বাংলার চিরপরিচিত জীবন্ত এখানে রূপময় হয়ে উঠেছে একথা অনস্বীকার্য।

অপরাজিত উপন্যাসের প্রথমাংশে অপুর কৈশোরের কতকটা সময় কেটেছে মনসাপোতা গ্রামে। সর্বজয়া পুনশ্চ স্বাধীন সংসার পেতেছে। এই গ্রামের জীবন পরিবেশের বাস্তব রূপচিত্র বিভূতিভূষণ যথার্থই ফুটিয়েছেন। সর্বজয়া ও অপুকে নিয়ে চক্রবর্তী মশায় যখন গ্রামে ঢুকলেন তখন সাধারণ গ্রামবাসীদের স্বভাব সুলভ ভঙ্গীতেই এ গ্রামের লোকজনও কৌতূহলে তাকিয়েছে, তেলি বাড়ির গৃহিণি ও পুত্র কন্যারা বিকেলে তাদের দেখতে এসেছে। " একটা কাহাদের বাড়ি, বাহির বাটীর দাওয়ায় জনকয়েক লোক গল্প করিতেছিল, গোরুর গাড়িতে কাহারা আসিতেছে দেখিয়া চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল। .... তেলি গিন্নী পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিলে ছেলে মেয়ে ও পুত্রবধূরাও তাহাই করিল।" অপুদের এই গ্রামের গৃহচিত্র এরকম : "ছোট উঠানের সামনে একখানি মাঝারি গোছের চালা ঘর, দু-খানা দোচালা ঘর, উঠানে একটা পেয়ারা গাছ ও একপাশে একটা পাতকুয়া। বাড়ির পিছনে একটা তেঁতুল গাছ— তাহার ডালপালা বড় চালাঘরখানার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। সামনের উঠানটা বাঁশের জাফরি দিয়া ঘেরা।' (বিভূতি রচনাবলী ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩)

তেলি গিন্নী সাধারণ গ্রাম্য রমণীর মতই বামুন মা বলে সর্বজয়াকে সম্মান করে, নিজের সাংসারিক খুঁটিনাটি জানায়, পুরোনো ব্রাহ্মণ পূজারী গোয়ালিনীর সঙ্গে গৃহ ত্যাগের কেচ্ছাও সর্বজয়াকে জানায় এবং প্রসঙ্গে সর্বজয়া বিস্মিত হলেও

তেলি গিন্নীর বধু ও কন্যারা মজা পেয়ে হাসে। ব্রাহ্মণ এ গ্রামে মাত্র অপুরাই। তাই পূজারী হিসেবে অপুরই ডাক পড়ে। "গ্রামে ব্রাহ্মণ নাই, তাহারাই একঘর মোটে। চাষী, কৈবর্ত ও অন্যান্য জাতির বাস। তাহা ছাড়া এ-পাড়ার কুণ্ডুরাও ও-পাড়ার সরকারেরা। কাজেকর্মে ইহাদের সকলেরই বাড়ি অপুকে ষষ্ঠীপূজা মাকাল পূজা করিয়া বেড়াইতে হয়। সবাই মানে। জিনিসপত্র দেয়।" (ঐ পৃ. ১৭) কিন্তু অপু এখানে মানস মুক্তি পায় না। "অপুর কেমন মনে হয় নিশ্চিন্দিপুরের সে অপূর্ব মায়ারূপ এখানকার কিছুতেই নাই। তার মনে প্রশ্ন ওঠে ... এই ছোট্ট চাষা গাঁয়ের চিরকালই এরকম ষষ্ঠীপূজা মাকাল পূজা করিয়া কাটাইতে হইবে?" অপুর পার্থিব জীবন পিপাসু সত্তার যখনই জাগরণ হয়, এখনই আর এ কাহিনী সাধারণ পল্লীসমাজ জীবনের চিত্রময়তায় আবদ্ধ থাকে না -এর ব্যপ্তি ছাড়িয়ে যায় অফুরন্ত বিশ্ব পথ ধরে। তবুও বাংলাদেশের যে পল্লীজীবন এখানে যতটুকু স্পর্শ রেখেছে তার মূল্য ও কম নয়।

বিভূতিভূষণের 'বিপিনের সংসার' উপন্যাসের পটভূমি পল্লীবাংলা, এখানে বাংলার পল্লীসমাজ পরিবেশ কিছু পরিস্ফুট হলেও এটি মুখ্যত প্রেমের কাহিনী। লেখকের বিখ্যাত 'আরন্যক' উপন্যাসে যে পল্লী চেতনা উদ্ভাসিত তাও বঙ্গপল্লী নয়।

আবার কেদার রাজার পটভূমি মূলত পল্লী বাংলা এবং প্রধান চরিত্রগুলি বাংলার গ্রামীণ মানুষ হলেও এটিকে পল্লীসমাজের কাহিনী মাত্র নয়। সরল ও বাস্তব জ্ঞানবোধ- হীন কেদার রাজা ও তার তেজস্বিণী অথচ সরলা কন্যা শরতের সঙ্গে ভদ্র মুখোসধারী নীচাশয় লম্পট স্বভাব নাগরিক মানুষদের শঠতা ও অন্যায়ের চিত্র এবং সেই লম্পটদের হাত থেকে বুদ্ধি ও ভাগ্য বলে শরতের বেঁচে যাওয়ার কাহিনীই এখানে মুখ্য। দেড় বছর পরে তাঁদের ফিরে আসা এবং শেষ পর্যন্ত দুর্বৃত্ত নাগরিক গিরিশের শোচনীয় মৃত্যু, যা রহস্যময় অতিপ্রাকৃত দণ্ডবিধানের গূঢ় ইঙ্গিতবহ। ধর্মের জয় ও অধর্মের সমূহ বিনাস— এই বক্তব্য ও উপন্যাস কাহিনীতে লেখক রাখতে চেয়েছেন।

এই উপন্যাসে সরল কেদার রাজা ও তার কন্যা শরতকে পাকচক্রে কৌশল করে কলকাতার লম্পট প্রভাস, অরুণ, গিরিশ জাতীয় লোকেরা ফাঁদে ফেলেছে যখন, সেই সূত্রে কলকাতা শহরের টুকরো টুকরো বাস্তব চিত্র এসেছে। শরতের বিড়ম্বিত দীর্ঘ দেড় বছরের পিতৃ-বিচ্ছিন্ন হয়ে কাশীতে অপরের গৃহে রাধুনীর কাজ করার সূত্রে কাশীর জীবন পরিচয়, বাবা বিশ্বনাথ মন্দিরকে কেন্দ্র করে তার ধর্ম কর্ম, দরিদ্র ভোজন ইত্যাদির বাস্তব রূপছবিও এখানে খুঁটিনাটি বিবৃত হয়েছে।

শরত ও তার পিতা মূল গ্রাম জীবন থেকে দূরে ভগ্ন প্রাচীনগড়ের এক প্রান্তে বাস করায় সাধারণ গ্রাম জীবনের সঙ্গেও একটু দূরত্বই তাদের গড়ে উঠেছে।

একটু যেন তাঁরা বিচ্ছিন্ন। তবুও পল্লীবাংলার সমাজরূপের প্রত্যক্ষ ও বাস্তব আস্বাদ বেশ খানিকটা এখানে পাওয়া যায়। বাংলা পল্লীর সামাজিক বা অর্থনৈতিক রূপ পরিচয়, গ্রামবাংলার নানাবিধ সংস্কার প্রথা, আচার, লৌকিক ছড়া প্রবাদ কিম্বদন্তী এবং কিছু গ্রামীণ চরিত্র পিতা-পুত্রীর শান্ত, স্নিগ্ধ জীবনযাত্রাকে কেন্দ্রবিন্দু করে এই কাহিনীতে এসেছে।

উপন্যাসে ক্ষীয়মান সামন্ততন্ত্রের প্রতীক চরিত্র কেদার রাজা। সে অতীতের প্রতাপশীল রাজবংশজাত এক দরিদ্র অধস্তন প্রৌঢ় বয়স্ক আত্মভোলা গান-বাজনা পাগল সংসার বোধহীন সরল মানুষ। অর্থ সম্পত্তি না থাকলেও সে যেন ধ্বংস প্রায় সামন্ততন্ত্রের ক্ষীণ সূত্রধারী। কেদার সামান্য জমির সত্ত্বভোগী হিসেবে যৎকিঞ্চিৎ খাজনা পায়। কিন্তু তার প্রতি সম্মান বোধ গ্রামের মধ্যে এখনও রয়েছে। প্রমাণ হিসেবে বলা যায় উপন্যাসের সূত্রপাতে নীলমণি চাটুজ্জ্যে রাস্তার মধ্যে যখন তারা প্রাপ্য খাজনা কেদার উসুল করেছে; সেই অভিযোগে অর্থের দাবী জানিয়ে কটু কথা বলেছে, তখন কিন্তু নীলমণিকে গ্রামের মানুষরা সমর্থন করেনি বরং কেদারের প্রতিই পক্ষপাত দেখিয়েছে। "... দু-একজন লোকে বললে, পথের মধ্যে এরকম চেঁচামিচি কি ভাল? ছিঃ—সামান্য কয়েক আনা পয়সার জন্য— আর ওঁর সঙ্গে? ... (পৃ. ১৭০, ৩য় খণ্ড)। শরতের পিতৃকূলের প্রতি সম্ভ্রমবোধ প্রিয়পাত্রী প্রতিবেশিনী কন্যা তার রাজলক্ষ্মীর কথাতে ও প্রকাশিত : "তুমি যদি যাও লোকে কোনো কথা উঠাতে সাহস করেবে না শরৎদি। কিন্তু আমায় কেউ ছেড়ে কথা বলবে না। শেষকালে বাবা, মা মুশকিলে পড়ে যাবে বিয়ে দেবার সময়। ...তুমি থাকো গাঁয়ের বাইরে। তাছাড়া তুমি যে বংশের মেয়ে, তোমার নামে এ অঞ্চলের লোকে কিছু রটাতে সাহস করবে না। আমার বেলায় তা তো হবে না।" সামন্ততান্ত্রিক পল্লীসমাজে উঁচু বংশের তথা রাজা-জমিদার শ্রেণীর প্রতি এই মর্যাদাবোধ এ উপন্যাসের বিশেষ লক্ষণীয়।

কেদার রাজা দারিদ্র্য সত্ত্বেও সামন্ততান্ত্রিক আভিজাত্য ও আত্মসম্মানবোধে গড়ের ইঁট অর্থের বিনিময়ে বিক্রি করতে পারে না, বংশের প্রাচীন রীতি বজায় রাখবার জন্য গৃহে অন্ন সংস্থান না থাকা সত্ত্বেও, অতিথি শালায় নিয়ে আসে, প্রয়োজন সত্ত্বেও কলুর দোকান থেকে অপর লোকের উপস্থিতিতে ধারে তেল নিতে পারে না। শরৎ সুন্দরীর চরিত্রেও সম্ভ্রান্ত বংশ-সম্মত মর্যাদা ও আত্মসম্মানবোধ, তেজস্বীতা ও বুদ্ধিমত্তা, সরল ঔদার্য, দানশীলতা রয়েছে। সে নিজেকে রাজবংশের কন্যাসুলভ গরিমা যুক্তই মনে করে। রাজলক্ষ্মীর বিবাহে ভাল শাড়ী এবং সোনার দুল মুক্ত হাতে উপহার দিয়েছে। রসিকতা করলেও নিজের বংশ মর্যাদা সম্বন্ধে সচেতনতা প্রকাশিত হয়েছে এই সব উক্তিতে : (ক) "চুপ। বলিনি আমাদের রাজরাজড়ার কাণ্ড, হাত ঝাড়লে পর্বত—" (পৃ. ৩৪৭.

৩য় খণ্ড) (খ). 'না হলেও তুই যাবি আমাদের দেশে। মস্ত বড় অতিথিশালা আছে। রাজরাজড়ার কাণ্ড। সেখানে বারো মাস যাবি, রাজ কন্যার সখী হয়ে কি বলিস? শরৎ কলকাতা ও মুঙ্গের-কাশীর অভিজ্ঞতায় নতুন দৃষ্টি নতুন মন নিয়ে গ্রামে ফিরেছে। লেখকের ভাষায় : "পল্লীগ্রামের ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা যে শরৎ সুন্দরীর দৃষ্টি সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রেখেছিল, আজ বহির্জগতের আলো ও ছাপ, পাপ ও পুণ্যের সঙ্গে সংস্পর্শে এসে যেন শরতের মন উদারতর, দৃষ্টি নবতর দর্শনের ক্ষেত্রে প্রসারিত হয়েছে।' (পৃ. ৩২৭) কিন্তু তার প্রাণ বাঁধা পড়ে আছে তার গ্রাম, জন্ম ভিটার মাটি মানুষ আর প্রকৃতির সঙ্গে। সেই নিবিড় আত্মিক ভালবাসা তাকে নিজ ভূমিতে ফিরে আসার পর আকুলভাবে কাঁদিয়েছে : "শরৎ দুই হাতের মধ্যে মুখ গুঁজে নিঃশব্দে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল। তার বাবা তাদের বন-জঙ্গল ঘেরা এতবড় ঘর-বাড়ি, কত পুরানো ভাঙা মন্দির, উত্তর কেউল, বারাহী দেবীর ভগ্ন পাষানমূর্ত্তি, ওই ছায়া নিবিড় ছাতিম বন— এ সব ফেলে তাকে কোথায় চলে যেতে হয়েছিল ভাগ্যের বিপাকে। আর যদি সে না ফিরতো, আর যদি বাবাকে না দেখতো, গড়বাড়ির মাটির পুণ্যস্পর্শ লাভের সৌভাগ্য যদি আর না ঘটতো তার?"

জটিলতা কেদার বা শরৎ চরিত্রে নেই। রাজলক্ষ্মী সাদামিঠে গ্রাম্য তরুণী। তার মা, খুড়িমাও সাধারণ পল্লী নারী চরিত্র, গ্রামের ছিদ্রান্বেষী কুটিল চরিত্রের প্রতিনিধি জগন্নাথ চাটুজ্জ্যে।

পল্লীজীবনের বিশ্বাস সংস্কার, প্রথা এখানে স্বাভাবিকভাবেই এসেছে। শরৎ গড়ের দেউলে বংশানুক্রমিক ভাবে প্রতিদিন সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বালানোর নিয়ম রক্ষা করার জন্য রাজলক্ষ্মীকে নিযুক্ত করে। শরৎদের গড়বাড়ীর কালো পায়রার দীঘি, রাণী দীঘি, চাল ধোয়া দীঘি কিম্বা ভগ্ন পাষান স্তূপ ঘিরে ছড়ানো আছে নানা কিম্বদন্তী। কিছু ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা, লোকশ্রুতি বা প্রচলিত ছড়ার মধ্যে রক্ষিত আছে কেদারের অতীত ঐতিহ্যশালী বংশ মর্যাদা। কোনো পূর্বপুরুষের সঙ্গে অতীতে নাকি এক মুসলমান ফৌজদারের দ্বন্দ্ব বাধে। "চাকদহের দহের নিকট হাট জলদলের যে যুদ্ধের প্রবাদ আজও ছড়ার আকারে এই সব গ্রাম অঞ্চলে প্রচলিত, কেদার শুনেছেন সে ছড়ার মধ্যে উল্লিখিত রাজা দেবরায় ও ভূমিপাল তারই বংশের পূর্বপুরুষ। ·

হাট জগদলে পানি পালাম না
তীর খেয়ে ভিরমি নেগেচে
দেবরায়ের সেপাই যে ভাই যমদূতের চ্যালা
ভুঁই পালের তীরন্দাজ দেয় বড় ঠ্যালা—
(ও ভাই) হাট জগদলে পানি প্যালাম না

তীর যেথা, ভিরমি নেগেচে—

বিপদে পড়ে রাজা দেব রায় দৌড়ে যান দরবার করতে, বাড়িতে বলে গিয়েছিলেন যদি মঙ্গলের সংবাদ থাকে তবে সঙ্গের শ্বেত পারাবত উড়িয়ে দেবেন, কিন্তু যদি অশুভ কিছু ঘটে, তবে কৃতি পারাবত উড়িয়ে দেওয়া হয়। মহারানী অন্তঃপুরিকার দিয়া গতের মধ্যের বড় দীঘির জলে আত্মবিসর্জন করে বংশের সম্মান রক্ষা করেন। (৩য় খণ্ড, পৃঃ১৯০-১৯১)। "এ অঞ্চলে প্রবাদ, উত্তর দেউলে এক বিশালকান্তি পুরুষকে কখনো কখনো নাকি দেখা গিয়েছে – হাতে তাঁর বেত্রদণ্ড, মুখে তর্জ্জনী স্থাপন করে তিনি চিত্রার্পিতের মত উত্তর দেউলির দ্বারদেশে দাঁড়িয়ে।" (ঐ পৃঃ১৯১) গিরীশের মৃতদেহ পড়ে আছে উত্তর দেউলের কাছাকাছি। বীভৎস ও রহস্যময় এই মৃত্যু। কেননা মৃতের ঘাড়টি মোচড়ানো; পাশে হাতির পায়ের ছাপের মত গোল গোল দাগ। নাস্তিক কেদারও এ ব্যাপারটিকে দেবী বারাহীয় সতী শরতের প্রতি কুদৃষ্টি দানকারী, লম্পটের শাস্তিদান বলে সোদ নিয়েছে ও দেবীমূর্ত্তির কাছে নতজানু হয়ে প্রণাম জানিয়েছে।

যদিও এ উপন্যাস অধিকাংশ সমালোচকের মতে বিভূতিভূষণের বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ রচনা নয়। তবুও শান্ত স্নিগ্ধ বঙ্গ পল্লীসমাজের ছায়ায় ইতিহাস কিম্বদন্তী-বিশ্বাসে-সংস্কারে, ভরা সরল কেদার রাজা ও তার সরলা সাত্তিক 'বিধবা সেবায় শরতের জীবন কাহিনীটি লেখকের পল্লীসমাজমুখী মনকে তুলে ধরেছে একথা বলা যায়।

ইছামতী (১৯৫০) ঃ বিভূতিভূষণের শেষ পর্বের উপন্যাস 'ইছামতী'তে অতীতকালের বাংলাদেশের গ্রামজীবনের কাহিনী লেখা হয়েছে। সমালোচকের ভাষায় ঃ "ইছামতী অতিপ্রাকৃত বা মৃত্যুজগতের কাহিনী নয়। মর্ত্যধূলিরই জীবনকথা।" (বিভূতিভূষণের মন ও শিল্প, পৃঃ৭২ "নভেম্বর ১৯৭৮ দেজস্করণ) দিনলিপিতে বিভূতিভূষণের বহুদিন পূর্বে লিখেছিলেন ইছামতির তীরের প্রকৃতি ও নরনারীদের নিয়ে তিনি "ইছামতী" নামে একটি উপন্যাস লিখবেন। (স্মৃতির রেখা, ১লা মার্চ ১৯২৮ তারিখের দিনলিপি) 'পথের পাঁচালী' এবং 'ইছামতী' প্রথম ও শেষ এই দুই উপন্যাসের পটভূমি এই ইছামতী তীরবর্ত্তী গ্রাম। চব্বিশ পরগণার উত্তরাংশ, নদীয়া আর যশোহর জেলায় কতকাংশের গ্রামবাংলা তথা ইছামতী নদীর কাছের গ্রাম-প্রকৃতি তাঁর লেখার প্রেরণা যুগিয়েছে। তাঁর নিজের কথায় ঃ "কেউ জানে না কত ভালবাসি আমি আমার গ্রামকে – আমার ইছামতী নদীকে, ...ছায়া, সে স্নিগ্ধ স্নেহ আমার গ্রামের, যে সব অপরাহ্ন – আমার জীবনের চিরসম্পদ হয়ে আছে যে। ...." (স্মৃতির রেখা, বিভূতিভূষণ, ১৮ নভেম্বর, ১৯২৭ তারিখের

দিনলিপি)।

দিনলিপিতে বহুবার ইছামতী নদীর প্রসঙ্গ এনেছেন। এই নদীতীরবর্ত্তী নিজ জন্ম-ভূমি গ্রামের কথাও তিনি সর্বদা স্মরণ করেছেন। "......কালের লীলাভূমি সেই ইছামতীর তীরে যেমন মনকে দোলা দেয়, এমন কোথাও পেলাম না আর। (হে অরণ্য কথা কও) 'ইছামতীর প্রকাশকের বিজ্ঞপ্তিতে আছে যে বিভূতিভূষণের ইচ্ছা ছিল "ইছামতীর দুট তীরের শান্ত পল্লীজীবনের, পটভূমিকায় নীলকরদের আমল হইতে বর্তমানকাল পর্যন্ত প্রায় একশত বৎসর ব্যাপী কালের চিত্র অঙ্কিত করিবেন, পল্লীবাসীদের ছোটোখাটো সুখ-দুঃখের মধ্যে যুগ পরিবর্তনের একটা বিরাট ইতিহাসকে ধরিয়া রাখিবেন।' (মূদ্রঃকালের প্রতিমা, অরুন কুমার মুখোপাধ্যায়, পৃঃ৬৬ বৈশাখ ১৩৮১ সং)

বিভূতিভূষণ ইছামতীতে একশ বছর পূর্বের গ্রামবাংলাকে পটভূমিকায় সাধারণ পল্লীমানুষের জীবন কথা, সমাজের গতিচিত্র অঙ্কন করেছে। নীলচাষের, আসলের নীলকুঠির সাহেবদের প্রতাপের যুগের কাহিনী এটি। 'ইছামতীর তীরে তীরে আজ যেখানে কুঠির মাঠ খাঁ খাঁ করছে, পুরনো নীলকুঠিগুলির ভগ্নাবশেষ কঙ্কালের মতো মাঠের মধ্যে ছড়িয়ে আছে, একদিন সেখানে জনপদ ছিল, জন্ম-মৃত্যু, হাসি-কান্না, আশা-নিরাশার ঢেউয়ে, ঢেউয়ে তখনও সহজ মানুষের স্বচ্ছন্দ জীবনস্রোত বয়ে চলতো — সেই বিগতদিনের অনাড়ম্বর চলমান জীবনের ছবি লেখক তুলে ধরেছেন এক সুদীর্ঘ উপন্যাসে। অতীত দিনের পটভূমিতে এমন বৃহৎ উপন্যাস বিভূতিভূষণ আর একটিও রচনা করেন নি।" (বিভূতিভূষণঃ মন ও শিল্প ঃ গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, পৃঃ৭২ নভেম্বর ১৯৭৮ সং)। কিন্তু একথাও সত্য "বিভূতিভূষণ ইতিহাসের সচেতন শিল্পী নন, পরিবর্তমান কালের নানা তরঙ্গ বিক্ষোভের শিল্পী নন, যুগবিক্ষোভ বা বাস্তবতায় রূপকার নন।... প্রকৃতি-প্রেমিক, দরিদ্র সংসার প্রেমিক, ঈশ্বর-বিশ্বাসী বিভূতিভূষণের পরিচয়ই 'ইছামতীতে ব্যক্ত হয়েছে।" (কালের প্রতিমা ঃ অরুন কুমার মুখোপাধ্যায়, পৃঃ৩৬) অপর সমালোচকও লিখেছেন ঃ "এই উপন্যাসে একদিকে যেমন পাই অতীতের এক অনতিস্পষ্ট কাল খণ্ডের ছবি, অন্যদিকে তারই প্রেক্ষাপট চোখে পড়ে লৈখকের নিসর্গ, মানব ও অধ্যাত্ম চেতনার সহজ অথচ গভীর উন্মোচনের চিত্ররূপ" (বিভূতিভূষণ ঃ মন ও শিল্প, পৃঃ৭২ ১৯৭৮ সং) তথাপি একথাও অনস্বীকার্য অতীত বাংলার পটে সাধারণ পল্লীবাসী নরনারীর সুখ-দুঃখের জীবনধারা এখানে প্রবাহিত হয়েছে। "তিনি সাধারণ গরীব মানুষের অলিখিত ইতিহাস লিখতে চেয়েছিলেন তা তিনি পেরেছেন।" (কালের প্রতিমা, ঐ পৃঃ৬৬, ১৩৮১ সং) চন্দ্র চাটুজ্জে, রূপচাঁদ মুখুজ্জে, আমীন প্রসন্ন চক্রবর্ত্তী,

ফনি চক্কত্তি, রামকানাই কবিরাজ, নীলমনি সমাদ্দার, হরকালী সুরের ছবি যেমন পাই তেমনি পাই নফরমুচি, বরদা বাগদিনী, গয়াবাগদিনী ওরফে গয়া মেম, নালু পাল, হলা পেকে, রামু লেঠেল, তিনকড়ি কাওয়া, হজরৎ নিকিমির ছবি, নীলকুঠির বড়ো সাহেব শিপটন, ছোট সাহেব ডেভিড বা দেওয়ান রাজারাম রায় চরিত্র বাস্তবানুমোদিত। বিভূতিভূষণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন গ্রামের গরীব মানুষের চরিত্র-চিত্রণে। মধ্যবিত্ত চরিত্র-চিত্রণে তত নয়।

উপন্যাসের নায়ক ভবানী বাঁড়ুয্যে যেন ইছামতী তীরের এই অষ্টাদশ শতকীয় গ্রাম জীবনে বিবৃত কাহিনীর সাক্ষী। তিনি এই উপন্যাসের কেন্দ্রস্থলে দাঁড়িয়ে নেই। তাঁর জীবনের উপলব্ধি উপন্যাসের প্রধান কথা হয়নি। পরিব্রাজক থেকে গৃহী হয়ে ভবানী, তিলু, বিলু, নীলু তিন বোনকে বিবাহ করেছেন। সে সময়ের পুরুষের বহু-বিববাহের বা কৌলীন্য প্রথার পরিচায়ক এই ঘটনাটি স্বাভাবিক-ভাবেই ঘটেছে। এই তিন বোনের মধ্যে সপত্নী বিরোধের পরিবর্তে একাতনতা ও গভীর ভালবাসার সম্পর্ক দেখা যায়। আধুনিক কালের স্বাতন্ত্র্যবোধ বিলু, নীলুর নেই। তারা তিলুর প্রতি ভবানীর অধিক টানের জন্য কোনো বিরূপতা রাখে না, বরং ভবানীর সঙ্গে শ্যালিকা সুলভ পত্নীর রসরসিকতা করে। জ্যেষ্ঠ পত্নী বিলুকে নিয়ে ভবানীর ইছামতীতে স্নানে যাওয়ার দৃশ্য গার্হস্থ্য জীবন রসের মাধুর্য রচনা করেছে। কিন্তু ভবানী বাস্তব গ্রামীন গৃহস্থ সংসারীর প্রতি রূপ মাত্র নয়। তার আধ্যাত্মিক পিপাসা নষ্ট হয়নি। নিজের শিশু সন্তানের মধ্যে জ্ঞানী ভবানী বাঁড়ুয্যে ঐশী প্রেম আর সৌন্দর্য্যের আভাস পেয়েছেন। ভবানীর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন ঘটনার নানা চিত্রাবলী এ উপন্যাসে আঁকা হলেও তিনি আসলে যেন সেই সময়ের পল্লীবাংলার সেই বিশেষ অঞ্চলের "বৃহৎ চলমান জীবনকাহিনীর একটি খণ্ড উপাদান মাত্র।" ইছামতী নদীর দুই তীরবর্তী গ্রামাঞ্চলের জীবন কথাকে বিভূতিভূষণ যেন চারণ কবির মতই ব্যক্তি নিরপেক্ষ অবজেকটিভ ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছেন।

বিভূতিভূষণের কলমে বাংলার পল্লী প্রাণ পেয়েছে। তার দুঃখ-দারিদ্র্য বঞ্চনা শোষনের সমস্ত তাপ মুছে গেছে বিভূতিভূষণের সৌন্দর্য রসের চেতনায়। বিভূতিভূষণ তাঁর মুগ্ধ দৃষ্টিপাতে বাংলার গ্রাম প্রকৃতিকে দেখেছেন, তাকে আস্বাদন করেছেন সাগ্রহ আনন্দে। তারই ফলে সামান্য গুল্ম লতার দুলুনিতে এক একটা বিকেল যখন তাঁর বর্ণনায় অপরূপ হয়ে ওঠে, জীবনের মহাগতি ছন্দে যখন রেললাইন ধরে বাষ্পীয় ইঞ্জিনের চাকা শব্দ বাজাতে থাকে, তখন জীবনের সমস্ত দুঃখ তুচ্ছ হয়ে যায়, পল্লীগ্রামের সমস্ত তুচ্ছতা ও হীনতা ছাপিয়ে মাধুর্য বোধে অন্তঃস্থল প্লাবিত হয়ে যায়। কিন্তু এই অনাবিল সৌন্দর্য আর আনন্দ বোধের ফাঁক দিয়ে যতখানি বাংলার পল্লীসমাজ নিজেকে তুলে ধরে, সেটুকুও যথার্থই সত্যমূলক।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা কথা সাহিত্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এক বিরল প্রতিভার অধিকারী। বাস্তব সচেতন যুক্তিবাদ, বিশ্লেষণধর্মী মনন তাঁর লেখার প্রধান দিক। অতি সূক্ষ্ম ও জটিল মানব মনের অন্ধকার দিক, ফ্রয়েডীয় দর্শনের ভিত্তিতে মানিক বার বার উদঘাটনে সচেষ্ট হয়েছেন। এরই পাশাপাশি তিনি বাংলার পল্লীঅঞ্চলের সাধারণ মানুষের জীবন-যাপনের ধারা, পল্লীসমাজের বৈচিত্র্য ও পল্লীপ্রকৃতির রূপচ্ছবি উপন্যাসে অনবদ্য ভাবে চিত্রিত করেছেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় যে জটিল আঞ্চলিকতার চিহ্ন উপন্যাসে নিয়ে আসেন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সেটি তাঁর আগে 'পদ্মানদীর মাঝি'তে এনেছেন। বাংলার গ্রাম-জীবন, তার মধ্যবিত্ত সাধারণ দিক এবং নিম্ন জীবন, তার মধ্যবিত্ত সাধারণ দিক এবং নিম্ন শ্রেণীভুক্ত মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত জীবনধারার ছবি দুটিই এই কথাশিল্পী আশ্চর্য দক্ষতার ফোটাতে পেরেছেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ফ্রয়েডীয় মনোদর্শনের ভিত্তিতে মানুষের জটিল ও গহন অন্তঃস্থলের মধ্যে বার বার পরিভ্রমণ করেছেন একরকম বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণী নির্মোহ ভঙ্গিতে, তাঁর অধিকাংশ লেখায় এই দিকটিই বিশেষ প্রকট। তথাপি 'পুতুল নাচের ইতিকথা' বা 'পদ্মানদীর মাঝি'তে পাঠক বাংলা দেশের পল্লীজীবনের ভিন্ন পটভূমি, ভিন্ন রূপরেখার' মধ্যে একটি ভিন্ন রসাস্বাদ লাভ করে। মানিক বন্দ্যেপাধ্যায়ের এই দুটি উপন্যাস বাংলার পল্লীসমাজ ও মানুষকে কিভাবে তুলে ধরেছে, সে বিষয়ে আলোকপাত করা এ প্রবন্ধের লক্ষ্য।

একথা ঠিক আধুনিক জীবনসমস্যা ও যুগযন্ত্রণার রূপকার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। 'জীবনের সাংকেতিকতা ও উদ্ভট সমস্যা' অর্থাৎ গহন জটিল মনো-বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত মানুষের বিচিত্র অনুভূতির বিসর্পিত প্রকাশ এই লেখককে 'কল্লোল গোষ্ঠী'র সাহিত্যিকদের গোত্রীয় করে তুলেছে, কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন দৃষ্টি যে এঁদের থেকে ভিন্ন সে কথা তাঁর উপন্যাস পাঠে স্পষ্টই অনুভব করা যায়। আবার তারাশঙ্কর বাংলার পল্লীসমাজ ও জীবনের এক বিশেষ রূপরেখা তাঁর উপন্যাসে নির্মাণ করেছেন, বিশেষত রাঢ় ভূমির মাটি ও মানুষ তাঁর লেখায় স্ব-মহিমায় ফুটে উঠেছে তা সত্ত্বেও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পল্লী-জীবন চিত্রন থেকে তাঁর পল্লী-রূপ অনেকাংশে পৃথক। শরৎচন্দ্র বাংলার যে সাধারণ গ্রাম-জীবনের সরসী আলেখ্য রচনা করেছিলেন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রাম-জীবন সেই পথ থেকেও বহু দূরবর্ত্তী। এক সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিপাতে তিনি পল্লীবাংলার সাধারণ মানুষ ও জীবনধারাকে প্রস্ফুট করেছেন, গ্রামের নিম্নবর্গীয় মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের বিশেষ জীবনরূপকে প্রতিফলিত করেছেন। তাঁর সঙ্গে শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর বা বিভূতিভূষণের জীবন দৃষ্টির পার্থক্য অনেকখানি।

এক কথায় সম্পূর্ণ নগরমনস্ক ও যুক্তিবাদী, বিশ্লেষণমুখী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

অন্তরের গোপন কেন্দ্রে হয়ত বা দেশজ তথা লৌকিক ঐতিহ্যের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট ছিলেন। ফলে সচেতন নাগরিকতার দ্বারা আবিষ্ট হয়েও, সেই লৌকিক জীবন চেতনাকে প্রকাশ করেছেন, নাগরিক বিদগ্ধ চেতনার মধ্যে লৌকিক মানসিকতা মুক্তি পেয়েছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাল্যজীবন ও কৈশোরের কিছু অভিজ্ঞতাও হয়ত তাঁর মনোজগতে গ্রাম বাংলার প্রতি সচেতন দৃষ্টিপাতের জন্য ঈষৎ দায়িত্ব নিয়েছে।

পিতার কর্মোপলক্ষে বিভিন্ন স্থানে ঘুরবার সূত্রে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও বাল্য কৈশোরে ঘুরেছেন 'দুমকা, মহিষাদল, টাঙ্গাইল, ব্রাহ্মণবেড়িয়া, মেদিনীপুর কাঁথি, বাঁকুড়া' প্রমুখ স্থান। বাড়ি ছিল ঢাকা জেলার মালপদিয়া গ্রামে। মাতুলালয় নিকটবর্ত্তী গাওদিয়াগ্রাম (পুতুল মাচের ইতিকথায় এই গ্রামটির নাম আছে)। এভাবে লেখক দেশ দেখেছেন, পল্লীবাংলার সঙ্গেও পরিচিত হয়েছেন। গ্রামবাংলার সঙ্গে পরিচয় সূত্রে, কিছু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাঁর মানস লোকে রসপুষ্টি ঘটিয়ে ছিল, শুধুমাত্র নগর জীবনের কেন্দ্রচারী হয়ে দূর থেকে দেখে গ্রামকে তিনি সাহিত্যে আনেননি। 'কল্লোল গোষ্ঠী'র অধিকাংশ লেখকের সঙ্গে মানিকের এইখানেও প্রভেদ। ব্রাত্য পতিত নীচুতলার বাঙালী জীবন নিয়ে, তাদের সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষার চিত্ররূপ এঁরাই বাস্তবসম্মতভাবে প্রথম চিত্রিত করেছিলেন, কিন্তু "শরৎচন্দ্রের রোমান্টিক প্রভাব তাঁরা কাটাতে পারেননি।" (কালের প্রতিমা, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, পৃ. ৭৩, ১৩৮১ বৈশাখ) এবং বলতেই হয়, তাঁরা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে দেশজ মৃত্তিকার মানুষ ও সমাজকে তুলে আনতে পারেননি। এ বিষয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কল্লোল গোষ্ঠীর অন্যতম লেখক, বাংলা সাহিত্যে কয়লাখনি অঞ্চলের জীবন কথা লিখে যিনি এখানে প্রথম আঞ্চলিকতার উদ্বোধন ঘটান, তাঁর সম্বন্ধেও অভিযোগ করেছেন। "শৈলজানন্দের গ্রাম্যজীবন ও কয়লাখনির জীবনের ছবি হয়েছে অপরূপ— কিন্তু শুধু ছবিই হয়েছে। বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে এর বাস্তব সংঘাত আসেনি।..." (লেখকের কথা। ১৯৫৭। সূত্র : কালের প্রতিমা, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, পৃ. ৭৪, ১৩৮১ বৈশাখ সং)।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বিশ বছরের সাহিত্য সৃষ্টিকালে (১৯৩৫-১৯৫৬) ভারতবর্ষ তথা বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক— অর্থনৈতিক বিরাট পরিবর্ত্তনের চিত্র প্রত্যক্ষ করেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগতকালে তাঁর যৌবন চেতনা দেখেছে ক্ষয়ে যাওয়া গ্রামীণ অর্থনৈতিক ও সামাজিক চিত্র, দেশের জটিল ও কঠিন সমস্যা ও সংকট, নগর ও গ্রামের ব্যবধান, তাঁর সময়ে দূর থেকে আরও দূরে চলে যাচ্ছে। গ্রামে থাকার জন্য শিক্ষিত মানসও প্রস্তুত নয়। এই জীবন পটভূমিতে বুদ্ধি ও যুক্তিনিষ্ঠ মনোবিশ্লেষক ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় খাঁটি বঙ্গপল্লীর পটভূমিতে 'পুতুল মাচের ইতিকথা' বচনা করেছেন। গ্রাম বাংলার রেখাচিত্র, গ্রাম সমাজের সামগ্রিক রূপ ও পরিচয় প্রদান তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল

না, মানব জীবনের অন্তঃগূঢ় জীবন-বাসনা, চেতনার বিসর্পিতরূপ, এক নির্মোহ দৃষ্টিপাতে তিনি বিশ্লেষণ করেছেন এখানে, সেই সঙ্গে মানবজীবন প্রবাহের অনিবার্য বেগ ও গতি, অনির্দেশ্য ভাসমানতা তিনি পরিস্ফুট করেছেন এই উপন্যাসে প্রধানভাবে। কিন্তু মানবজীবন ক্রীড়ার রূপ চিত্রিত করতে বসে তিনি এঁকেছেন গোটা 'গাওদিয়া গ্রামের রূপ পরিচয়। এ গ্রামের প্রকৃতি-পরিচয়, জীবনধারা, বিচিত্র সমস্যা যথাক্রমে পরিবারিক এবং সামগ্রিক পল্লীবাসের — তিনি দেখাতে পেরেছেন। অতি সন্নিকট থেকে এখানে উঠে এসেছে ভূমিজ মানুষ, সাধারণ মধ্যবিত্ত জীবন।

'পুতুল নাচের ইতিকথা'র (১৯৩৬) সূত্রপাত হয়েছে গ্রামের এক ব্যক্তির বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যুবরণের নির্মম দৃশ্য দিয়ে। গ্রাম-প্রকৃতি বজ্রপাতে হারু ঘোষের মৃত্যু দিয়েছে। সে আশ্রয়ের জন্য সম্ভবত "খালের ধারে প্রকাণ্ড বটগাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়া" দাঁড়িয়ে ছিল, কিন্তু "আকাশের দেবতা, সেইখানে তাহার দিকে চাহিয়া কটাক্ষ করিলেন।"

হারুর মাথায় কাঁচা পাকা চুল আর মুখে বসন্তের দাগভরা রুক্ষ চামড়া ঝলসিয়া পুড়িয়া গেল। সে কিন্তু কিছুই টের পাইল না। শতাব্দীর পুরাতন তরুটির মূক অবচেতনার সঙ্গে একান্ন বছরের আত্মমমতায় গড়িয়া তোলা চিন্ময় জগৎটি তাহার চোখের পলকে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।" হারু ঘোষের বজ্রপাতে মৃত্যু সম্পর্কে মন্তব্য 'আকাশের দেবতা কটাক্ষ করিলেন' লেখক করেছেন যেন পল্লীসমাজের চেতনা দিয়ে। এই অপঘাত মৃত্যুর মূলে গ্রামবাসীর অনুরূপ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ স্বাভাবিক। লেখকের পরবর্ত্তী বক্তব্যেও এ ধারণা স্পষ্ট হয়। "হারুকে সহজে এখানে কেহ আবিষ্কার করিবে এরূপ সম্ভাবনা কম। এ দিকে মানুষের বসতি নাই। এদিকে আসিবার প্রয়োজন কাহারো বড় একটা হয় না, সহজে কেহ আসিতেও চায় না। গ্রামের লোক ভয় করিতে ভালবাসে। গ্রামের বাহিরে খালের এপারে ঘন জঙ্গল ও গভীর নির্জনতাকে তাহারা ওই কাজে লাগাইয়াছে। ভূত-প্রেতের অস্তিত্ব হয়তো গ্রামবাসীরই ভীরু কল্পনায় কিন্তু স্থানটি যে সাপের রাজ্য তাহাতে আর সন্দেহ নাই।" (পুতুল নাচের ইতিকথা)

উপন্যাসের নায়ক শশী ডাক্তার শহর থেকে ফেরার পথে গাছে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা হারুর মৃতদেহ দেখতে পায় উদ্ধার করে। শশী গ্রামের ছেলে হলেও শহর থেকে ডাক্তারী পাস করা, তাই ভূতের ভয় তার নেই। তার নৌকো চালক গোবর্ধনের প্রবল আপত্তিকে সে উড়িয়ে দিয়েছে, "ভূত যদি হয় তো বেঁধে এনে পোষ মানাবো গোবর্ধন, নৌকা ফেরা।'

শশী কিন্তু গ্রামীণ সংস্কারকে তুচ্ছ করতে পারেনি। গ্রামের জাত-বর্ণের ভেদ-বিচার হারুর মৃতদেহ নামানোর প্রসঙ্গে লেখক ব্যক্ত করেছেন। শশীর মত মানুষকেও এই সব গ্রাম সংস্কার মানতে হয়। গোবর্ধন, নিম্নবর্ণের মানুষ, তাকে

হারু ঘোষের মড়া ছুঁতে নেই। "গোবর্ধন বলিল, আপনি লায়ে বসবে এসো বাবু, আমি লাবাচ্ছি।

শশী বলিল, দূর হতভাগা, তোকে ছুঁতে নেই।" গোবর্ধন, তার ছোঁয়া কেউ দেখতে পাচ্ছে না যুক্তি দিলে শশী যে কথা ভেবেছে তার মধ্যেও গ্রাম্য হিন্দু সমাজের সংস্কার প্রস্ফুট হয়েছে। "শশী ভাবিয়া দেখিল ... গোবর্ধন ছুঁইলে শবের আর এমন কি বেশি অপমান? অপঘাতে মৃত্যু হইয়াছে,— মুক্তি হারুর গোবর্ধন ছুঁইলেও নাই, না ছুঁইলেও নাই।" গোবর্ধন, মুর্খ গ্রাম্য পুরুষ, সে শশীকে এই সংস্কার বশতঃই প্রশ্ন করে, 'একটা কথা কও ছোট বাবু। উহার মুক্তি নাই তো?' অতিপ্রাকৃতের প্রতি বিশ্বাস বা ধর্মীয় সংস্কার ছাড়াও আরও গ্রাম্য কুসংস্কারের পরিচয় উপন্যাসে ছড়িয়ে আছে। গ্রামবাংলার সাবেক চেতনা যে আধুনিক যুগেও জাগ্রত আছে, এই সব বিবরণের মাধ্যমে তা স্পষ্ট হয়। গ্রামীন জীবন চেতনার খুব পরিবর্তন হয়নি। সে তার নিজস্ব লৌকিক সংস্কার, কুসংস্কার আচার আচরণ নিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলেছে, শশী তার নবীন যুগচেতনা দিয়ে তা অনুভব করেছে। যাদবের মিথ্যা রটনা রথের দিনে তার ইচ্ছামৃত্যুর আগাম জানান গ্রামবাসীরা বিশ্বাস করেছে। তাই শশীর দেশত্যাগের প্রস্তাবে যাদব পত্নী পাগল দিদি বলেন "তীর্থে যাবার কথা তো বলে এলি ভাই, গিয়ে কি হবে? ... এত লোক পাহারা দিচ্ছে, সকলের নজর এড়িয়ে পালাব কোথা?' গ্রামের মেয়েরা 'তেল-সিঁদুর' নিয়ে এসে তাঁর কাছে ভিড় করে। রথের আগের দিন সন্ধ্যা থেকে অপ্রাকৃতে বিশ্বাসী গ্রামের লোকেরা এই অভাবনীয় অলৌকিক ব্যাপার প্রত্যক্ষ করার জন্য বিপুল আয়োজন করেছে। " আগের দিন সন্ধ্যা হইতে সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছিল, সারারাত্রি এক মুহূর্ত্ত বিরাম হয় নাই। সকালবেলা নূতন নূতন লোক আসিয়া দল ভারী করিয়াছে, কীর্ত্তন আরও জাঁকিয়া উঠিয়াছে। যাদব স্নান করিয়া পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়াছেন, সকলে ফুলের মালায় তাঁহাকে সাজাইয়াছে। পাগল দিদিও আজ রেহাই পান নাই, তার গলাতেও উঠিয়াছে অনেকগুলি ফুলের মালা। ... বেলা পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে যাদবের বাড়ির সামনে আর কায়েত পাড়ার পথে লোকে লোকারণ্য হইয়া উঠিল। গাওদিয়া, মাতগাঁ আর উখাব গ্রামের একদল ছেলে ভলান্টিয়ার হইয়া কাজ করিতেছে, ... বাঁশ বাঁধিয়া দর্শনার্থী মেয়ে, পুরুষের পথ পৃথক করিয়া দেওয়া হইয়াছে ... অঙ্গনে ... গ্রামের মাতব্বরেরা বসিয়াছেন। তাদের হুঁকা টানা ও আলাপ আলোচনার ভঙ্গি উৎসব বাড়ির মতো।" . . . .যাদব এবং পাগল দিদি আফিম খেয়ে এই মৃত্যুবরণ করে লোকের কাছে ইচ্ছামৃত্যু ব্যাপারটি সত্য করে তুলেছে। শশী ডাক্তার হিসেবে সব বুঝেছে। কিন্তু অলৌকিকের প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাসী এই পল্লীসমাজ প্রকৃত সত্যকে জানতেই চায় না। উভয়ের মৃত্যু হচ্ছে জানতে পেয়ে দর্শনার্থীদের আর শৃঙ্খলাবদ্ধ করা গেল না, 'যাদব আর পাগলা দিদি বুঝি পিষিয়াই যান ভিড়ে। পাগল দিদির পা দুটি

ঢাকিয়া গেল সিঁদুরে।' গ্রাম্য হিন্দু-সমাজে বিশ্বাস স্বামীর সঙ্গে সমকালে যার মৃত্যু ঘটে তার মত সতী নারী জগতে দুর্লভ এবং তাঁর স্পর্শ পাওয়া সিঁদুর বিবাহিত সধবা রমণী ধারণ করলে তারও সধবা অবস্থায় মৃত্যু হবে। হিন্দু নারী স্বামীর আগেই মারা যেতে আগ্রহী। লেখক দেখিয়েছেন, শশী প্রকৃত সত্য জেনেও জনচেতনাকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেনি তার কারণ অবশ্য যাদব সম্বন্ধে শশীর সম্ভ্রমবোধ।

গ্রামের লোকেরা আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রতি তখনও বিশ্বাসী হয়নি, হাসপাতালে রুগী পাঠাতে তাদের প্রবল আপত্তি হত— এ উপন্যাসে সেই সমাজ মনস্কতা ক্রিড়ণকের ইচ্ছাতেই শশী 'গাওদিয়া' ছেড়ে শহরে যেতে পারে না, বিলাতে আরও লেখাপড়া করার আগ্রহ তার পূর্ণ হয় না। এই কাহিনীর মধ্যে পল্লীসমাজের জীবন প্রবাহ, খুঁটিনাটি এসে গেছে, যেহেতু 'গাওদিয়া' গ্রামই শশীর অবস্থান ভূমি। শশীর দৃষ্টির সামনে গ্রামজীবনের নানা ঘটনা প্রবাহিত হচ্ছে, বিচিত্র চরিত্র ফুটে উঠছে— শশী কখনো তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, কখনো দূর থেকে পর্যবেক্ষকের মত নিরীক্ষণ করেছে।

'গাওদিয়া' বাংলাদেশের এক পরিচিত পল্লীগ্রাম। পল্লীসমাজের স্বাভাবিক ও সাধারণ প্রবনতা এখানে সহজ বাস্তব চিত্রে লিপিবদ্ধ করেছেন লেখক। "গাওদিয়া ছোট গ্রাম। ব্যবসা-বাণিজ্যের ধার বিশেষ ধারে না।" এই ছোট গ্রামটি বাংলাদেশের আর পাঁচটা গ্রামের মতই বর্ষায় ম্যালেরিয়ায় ভোগে, পূজার পরে স্বাস্থ্য ভাল হয়, গ্রীষ্মে শুষ্ক হয়, জলকষ্ট বাড়ে। শীতলবাবুর মত গ্রামের ধনী প্রতিপত্তিশালী মানুষের দীঘি সাধারণ মানুষ যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করতে পারে না সূক্ষ্মভাবে এই ধনী ও সাধারণ মানুষের দূরত্ব লেখক লিখে জানিয়েছেন। এখানে বিমলবাবু মোটর গাড়ীতে বেড়াতে এসে গ্রামবাসীরা বিস্মিত হয়। শীতকালে চিত্রিত হয়েছে বাসুদেব বাড়ুজ্যের ছেলে ভূতোর অসুস্থতার প্রসঙ্গে। গাছ থেকে পড়ে তার হাত-পা ভাঙে জ্বর বিকার হয়। কিন্তু তার মা হাসপাতালের নামে "ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছিল"। শশীর চিকিৎসাতেও ভূতো ভাল হয়নি। কুসংস্কারাচ্ছন্ন পল্লীসমাজে ভূতোর মৃত্যুর অনৈসর্গিক কারণ খুঁজে বার করা হয়েছে। শ্রীনাথ দাসের মুদির দোকানের জটলারত পঞ্চানন চক্রবর্তীর গলায় এই অতিপ্রাকৃত বিশ্বাস শোনা যায়। 'ভূতো যেদিন পড়ল আছাড় খেয়ে, দিনটা ছিল বিষ্যুদবার। ... বাড়ি গিয়ে দেখলাম পাঁজি, — যা ভেবেছিলাম। ছেলেটাও পড়েছে, বারবেলাও খতম্। লোকে বলে বারবেলা, বারবেলা কি সবটাই সর্বনেশে বাপু? বিপদ যত ওই খতম হবার বেলা।" পুনশ্চ আর একটি প্রসঙ্গ টেনে তিনি জানান, নবীন জেলের ছেলেকেও যেদিন কুমীরে নিয়েছিল, সেই সময়টাতেই ঠিক "বারবেলা" ছেড়ে যায়। তাঁর যুক্তি : "গাওদিয়ার খালে নইলে কুমীর আসে?"

শশী ডাক্তারের জীবন কাহিনীর মাধ্যমে এ উপন্যাসে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকৃতপক্ষে দেখিয়েছেন এক অজানা শক্তিলীলা যা জীবন স্রোতকে নিত্য চালনা করছে, তার কাছেই মানুষের নিত্য পরাজয়। কাহিনী এভাবেই শেষ হয়েছে। মানবিক চরিত্রগুলি সব নাচিয়ে পুতুল। নিজের বলে চলবার শক্তি তাদের নেই। এই অদৃশ্য গ্রামের লোক সুখে কাটায়। প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। — লেখক বাংলার পল্লীসমাজের উৎসব পার্বনেরও চমৎকার চিত্র এঁকেছেন জীবন- বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে। "শীত জমিয়া আসে। পৌষ পার্বণ আসিয়া পড়িতে আর দেরি নাই। গ্রামে অনবরত ঢেঁকি পাড় দিবার শব্দ শোনা যায়। আকাশে রবির তেজ কমিয়াছে। মাঠে রবিশস্য মতেন। মানুষের গা ফাটিতে আরম্ভ করিয়াছে। গায়ে যাহার মাটি বেশি ঘষা লাগিলেই খড়ি উঠিয়া যায়। পেল কাঁথা খোলা হইয়াছে, বেড়ার ফাঁকগুলিতে ন্যাকড়া ও কাগজ গোঁজা হইতেছে। মতি একবার জ্বরে পড়ি পড়ি করিয়া পড়ে নাই। কুসুমের আর একবার পেট ব্যাথা হইয়া গিয়াছে। পরান একদফা গুড় চালান দিয়াছে। ... শশীর কাছে টাকা ধার করিয়া সে আরও প্রায় চল্লিশটা খেজুর গাছ লইয়াছে।"

গ্রামের পরিবেশ ও অনুদার মানসিকতা শশীর ভাল লাগে না। যেমন : গ্রামের মেয়েদের সন্তান প্রসবের সময় সাময়িকভাবে অতি কম খরচে বানানো একটি অস্বাস্থ্যকর ঘরে রাখা হয়, কেননা, সন্তান জন্মের জন্য ঘরটি অশুচি হয় এবং পরবর্তীকালে গৃহস্থের কাজে লাগে না। সেটি নষ্ট করে ফেলা হয়। এই অবৈজ্ঞানিক ও অস্বাস্থ্যকর ব্যাপারে বহু জননী মারা যায়। শশীর বাড়িতেও অনুরূপ ঘটনায় শশীর সম্পর্কিতা এক ভাইঝি মারা যাওয়ায় সে ঘটনা শশীকে দুঃখ দিয়েচে। কিন্তু গ্রামবাংলার একটি চিরকালীন সামাজিক প্রথা শশী পাল্টাতে পারে না। সুস্থ পরিচ্ছন্ন আহার, নিদ্রা পরিচ্ছদ কিম্বা স্বাস্থ্য রক্ষার প্রাথমিক নিয়মগুলি যেমন দাঁত মাজা ইত্যাদি ব্যাপারে শশীর পরামর্শ তার পরিবারের লোকজনই মানতে চায় না। এইরকমভাবে শশীর মনে গ্রাম সম্পর্কে বিরূপতা জন্মায়।

বাংলাদেশের পল্লীসমাজের একান্নবর্তী সংসারের প্রথা শশীর পিতৃগৃহের সংসার ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে এ কাহিনীতে প্রতিফলিত। শশীর পিতা গোপাল অর্থবান ব্যক্তি, জটিল স্বার্থ বুদ্ধি সম্পন্ন হলেও শশীর ভাগনী পিসীর মেয়ে এবং আরও এই রকম সম্পর্কিত আত্মীয় পরিজন তার গৃহে আশ্রিত। শশীর প্রতিবেশী মৃত হারু ঘোষের বাড়িও বৃহৎ পরিবার।

গ্রামের স্বভাবযুক্ত নর-নারী চরিত্র শশীর চারপাশ ঘিরেই দেখা যায়। তার পিতা গোপাল গ্রাম্য নীচতা যুক্ত মানুষ। সে মেয়েকে হীন কৌশলে সুপাত্রস্থ করে, শশীর মহত্ত্বকে ঈর্ষা করে। অর্থের প্রতি তার প্রবল লোভ এবং সেই সঙ্গে যামিনী কবিরাজের স্ত্রী সেন দিদির সঙ্গে তার গুপ্ত প্রণয়। এই প্রণয়জাত সন্তানকে নিয়ে তার সঙ্গে শশীর মানসিক দূরত্ব বেড়েছে। কিন্তু ধূর্ত গোপাল সুকৌশলে শশীকে

গ্রামে থাকতে বাধ্য করে নিজে দেশ ত্যাগ করে। তার কষ্টার্জিত ঘরবাড়ি, টাকা-কড়ি বিষয় সম্পদের উত্তর-দায় চাপিয়ে যায় শশীর ওপর। এখানে নগর সংস্কৃতির মানসিকতার অধিকারী শশীর মত শিক্ষিত মানুষ পরাস্ত হয় গ্রাম্য ধূর্ত্ত সংসার বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ গোপালের কাছে।

পরাণের মা মোক্ষদা, সেন দিদি, পরানের পিসী, যামিনী কবিরাজ, শশীর পিসতুতো বোন কুন্দ সকলেই পল্লীসমাজের প্রতিনিধি নর-নারী চরিত্র। মতিও পল্লীবালিকা, কিন্তু তার সরলতার সঙ্গে মিশেছে বন্য আবেগ। উদ্দাম গতিময় ভবঘুরে জীবন-যাত্রার প্রতীক কুমুদকে ভালবেসে সেও ঐ ভাবকে আত্মস্থ করে ফেলেছে।

গ্রামের সংস্কৃতি হিসেবে লক্ষ্য করা যায় পুরোনো গাথা কাহিনীর উদ্ধৃতি কুসুমের মুখে। শশীর প্রতি গোপন অনুরাগে সে 'মহুয়া' পালার রোমান্টিক প্রেমানুভূতির সঙ্গে যেন একাত্মতা অনুভব করে —

"ভিনদেশী পুরুষ দেখি চাঁদের মতন
লাজরক্ত হইলা কন্যার পরাথম যৌবন।

শহর বাসে সুখী তৃপ্ত মতি গ্রামে শেখা গানের কলি গেয়ে শোনায় কুমুদকে

'বিন্দে শুধায় আজকে তুমি এমন কেন রাই,
অধর কোণে দেখছি হাসি শ্যামতো কাছে নাই?"— ইত্যাদি।

যাত্রা-গানের বিপুল প্রভাব পল্লীবাংলার মাটিতে দৃঢ় হয়ে প্রোথিত আছে বহুকাল ধরে। শশীদের গ্রামেও যাত্রা আসে। সে যাত্রাকে কেন্দ্র করে গোটা গ্রাম যেন উৎসবে মেতে ওঠে। 'পথের পাঁচালী'তে এই যাত্রার যে দীর্ঘ বিবরণ ছিল এখানে অবশ্য তা নেই। বাস্তবধর্মী ভাবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বর্ণনা করেছেন যাত্রাভিনেতা কুমুদকে দেখে গ্রাম বালিকা মতির প্রণয়ানুভূতি। তাদের দুজনের হৃদয় সম্পর্ক এখানে থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। যাত্রা দেখতে গিয়ে কুসুম মুখরা গ্রাম্য স্ত্রীলোক হিসেবেই বসবার স্থান নিয়ে দত্ত গৃহিণীর সঙ্গে ঝগড়া করে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেখবার চোখ বিভূতিভূষণ বা তারাশঙ্করের থেকে যে পৃথক, —এই সব ঘটনার সামান্য রেখাচিত্রে তা স্পষ্ট হয়ে যায়।

গ্রামবাংলার সমাজে বাতাসে বাতাসে কুৎসা নিন্দা মিশে থাকে। সেন দিদির সঙ্গে শশীর পিতা গোপালকে জড়িয়ে এই কুৎসা প্রচলিত ছিল। ঈর্ষান্ধ সেন দিদির স্বামী যামিনী কবিরাজ শশীর চিকিৎসা বিদ্যার কুৎসা ছড়িয়েছে। এমনকি গোপাল ও পুত্র শশীর সঙ্গে সেন দিদির মেলামেশা নিয়ে কুৎসিত ইঙ্গিত দিতে ছাড়েনি। কুন্দ, শশী ও গোপালের মধ্যে সেন দিদির পুত্রকে নিয়ে মনোমালিন্যের ব্যাপারটি অনুমান করে মেয়ে মহলে তাকে রঙ ছড়িয়ে প্রচার করতে ছাড়ে না।

ব্রাহ্মণ যাদব, নির্লোভ, সদাচারী, শান্তিপূর্ণ নিরীহ মানুষ কিন্তু কি এক মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠার লোভে 'সূর্য বিজ্ঞান' নামে এক অলীক বিদ্যার কথা দৃঢ় বিশ্বাসে শশীকে

জানায়। শশী বোঝে সূর্যের কিরণে নয়, কাচবার ফলেই তার পৈতে পরিষ্কার হয়েছে—তবুও অলৌকিক শক্তিকে সে বিশ্বাস না করলেও যাদবকে ভালবাসে। এই মানুষটি উপন্যাসে এক আশ্চর্য সৃষ্টি নিজের মুখ থেকে হঠাৎ ইচ্ছামৃত্যুর কথা উচ্চারণ করে সে। শেষ পর্যন্ত আফিং খেয়ে স্ত্রীসহ মৃত্যুকে বেছে নিয়েছে।

গ্রামের জটিল ও দমবন্ধ করা পরিবেশে যাদবের স্ত্রী একঝলক মুক্ত বাতাসের মত শশীর মন-প্রাণকে স্নিগ্ধ করে দেয়। সেন দিদির ভালবাসার থেকে পাগলদিদির স্নেহ পৃথক। গ্রামীন সম্পর্কের সূত্রে পাগলদিদি শশীকে নাতি ভেবে রসিকতা করে। কিন্তু স্বামীর সত্য স্বরূপ সে জানে। তাই তার ইচ্ছামৃত্যুর ঘোষণায় এবং শশীর দ্বারা সেকথা গ্রামে রটনা হওয়ায় সে বাস্তব নারীর মতই মৃত্যু ভয়ে কেঁদে ওঠে এবং শশীর দ্বারা সে কথা গ্রামে রটনা হওয়ায় সে বাস্তব নারীর মতই মৃত্যু ভয়ে কেঁদে ওঠে "ও শশী এমন সর্বনাশ কেন করলি আমার, কেন রটালি ওকথা?" গ্রামজীবনের চিত্রায়ন 'পুতুল নাচের ইতিকথা'র মূল অবলম্বন নয়, কিন্তু পল্লীবাংলার সমাজ ও প্রকৃতি পটে চিত্রিত এ উপন্যাসে নায়ক শশীকে যেমন অমোঘ ভাবে গ্রামজীবন সহস্র বন্ধনে বেঁধেছে, এই পল্লী সীমা ছেড়ে সে বাইরের জগতে পা ফেলতে পারেনি, অনুরূপভাবে উপন্যাসের মূলভাবপ্রবাহকে ও ঘিরে রেখেছে বাংলার পল্লীসমাজের সামান্য জীবন, সামান্য আশা, আকাঙ্ক্ষা, ভাল-মন্দ বোধ মিশ্রিত চরিত্র এবং গ্রাম সমাজের রীতি-নিয়ম, আচার, সংস্কার, আধুনিক ও অনাধুনিক জীবনবোধের দ্বন্দ্বময়তা।

পদ্মা নদীর মাঝি (১৯৩৬)

বাংলার লোকায়ত স্তরের পরিচিত মানুষের কাহিনী 'পুতুলনাচের ইতিকথা'য় ঠিক পাওয়া যায় না। এই জীবন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম সার্থকভাবে তুলে ধরলেন 'পদ্মা নদীর মাঝি' নামের উপন্যাসে। পূর্ববঙ্গের 'নিম্নশ্রেণী অধ্যুষিত গ্রামজীবনের এক সত্য রূপায়ন হল এখানে। নদীর তীরে বাসাবাঁধা অতি সাধারণ মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত জীবন, তাদের প্রাত্যহিক জীবনের সুখ-দুঃখ ও আশা-আকাঙ্ক্ষার সামান্য চিত্র কথা লেখকের অকৃত্রিম আন্তরিকতায়, ঐ মানুষগুলির নিজস্ব পূর্ববঙ্গীয় কথ্য ভাষারীতিতে অসাধারণ হয়ে বাংলা সাহিত্য পাঠককে মুগ্ধ ও বিস্মিত করে দিল। বাংলার রাঢ় অঞ্চল তথা বীরভূমের গ্রাম জীবনের কথকতা করেছেন তারাশঙ্কর; পূর্ববর্তী শৈলজানন্দ ও কয়লাখনি অঞ্চলের জীবন ভাষ্যকার; মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্ববঙ্গের লোকজীবনকে এক আশ্চর্য প্রাণময় ছন্দে তুলে ধরলেন বাংলা সাহিত্যে। এ উপন্যাসকে আঞ্চলিক উপন্যাস বললে ভুল হয় না।

পদ্মা নদীর মাঝিরা, যারা মৎস্য শিকারের জীবিকা নিয়ে রাতের পর রাত,

দিনের পর দিন, অকূল দরিয়ায় ভেসে থাকে, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, সংসার পরিজন ছেড়ে প্রাণ হাতে নিয়ে ঘর ছেড়ে বাইরে বের হয় তাদের কথা, তাদের সংসার জীবনের কথা, রঙে, রূপে, দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে এই উপন্যাসে। পদ্মা নদীর মাঝি শুধু একজন নয়, এ এক বিপুল জনজীবন। যাদের দুঃখ-কষ্টের জীবন ও জীবনধারণের কঠোর সংগ্রাম, তাদের পারস্পরিক প্রীতি ও সখ্য আবার বিদ্বেষ ও কলহ, স্বার্থপরতা আর হৃদয়বত্তা—সমস্ত কিছু সেই সঙ্গে এই জনজীবনের বিপুল প্রাণাবেগ, জীবনীশক্তি পদ্মা নদীর অফুরন্ত দুর্বার গতির মতই প্রবাহিত হয়ে চলেছে এই উপন্যাসে।

নদী-মাতৃক পূর্ববঙ্গের সঙ্গে আবাল্য পরিচিত ছিলেন লেখক। প্রকৃতি ও প্রকৃতির সন্তানদের প্রত্যক্ষভাবে জেনেছেন, ঘনিষ্ঠভাবে বুঝেছেন পদ্মা তীরের মাঝিদের জীবন। সেই জানাকে সাহিত্যে প্রকাশ করেছেন সার্থকভাবে। উপন্যাসের সূচনায় এই জীবনের পূর্ণায়ত পরিচয় দিবালোকের মত স্পষ্ট ছড়িয়ে দিয়েছেন লেখক। "বর্ষার মাঝামাঝি। পদ্মায় ইলিশ মাছ ধরিবার মরশুম চলিতেছে। দিবারাত্র কোন সময়েই মাছ ধরিবার কামাই নাই। সন্ধ্যার সময়ে জাহাজ ঘাটে দাঁড়াইলে দেখা যায় নদীর বুকে শত শত আলো অনির্বাণ জোনাকির মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে জেলে নৌকার আলোগুলি। ... এক সময় মাঝরাত্রি পার হইয়া যায়। ... জেলে নৌকার আলোগুলি তখনো নেভে না। নৌকার খোল ভরিয়া জমিতে থাকে মৃত সাদা ইলিশ মাছ। ..." এই মৎস্যজীবীদের একজন কুবের। "কুবের মাঝি আজ মাছ ধরিতে ছিল দেবীগঞ্জের মাইল দেড়েক উজানে। নৌকায় আরও দুজন লোক আছে। ধনঞ্জয় এবং গণেশ। তিনজনের বাড়িই কেতুপুর গ্রামে।"

মাছ ধরার বিচিত্র কলা-কৌশল এরপর লেখক বর্ণনা করেছেন। "কুবের ও গণেশ হাতল ধরিয়া জালটা জলে নামায় এবং তোলে, মাছগুলি সঞ্চয় করে। পদ্মার ঢেউএ নৌকা টলমল করিতে থাকে, ... একহাতে একখানি কাপড়কে নেংটির মত কোমরে জড়াইয়া জলে ভিজিয়া শীতল জলোবাতাসে শীত বোধ করিয়া বিনিদ্র আরক্ত চোখে লণ্ঠনের মৃদু আলোয় নদীর অশান্ত জল রাশির দিকে চাহিয়া থাকিয়া কুবের ও গণেশ সমস্ত রাত মাছ ধরে।

জেলেদের এই ইলিশ মাছ ধরার ছবির পাশাপাশি আছে মাছ চালান দেওয়া, বাজারে বিক্রী, ফড়েদের অত্যাচার, মাঝিদের অর্থনৈতিক পরাধীনতা, তাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখ, তাদের নীচতা দারিদ্র্য পীড়িত বস্তি জীবন, তাদের রোগ ব্যাধির সঙ্গে আজীবন সংগ্রাম, জলের সঙ্গে সংগ্রামের ছবি। সংগ্রাম করেই তাদের বাঁচতে হয়। প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই জলে, মাটিতেও ঝড়, বৃষ্টি তাদের নিত্যসঙ্গী। সেই ঝড়-বৃষ্টির রাতে জেলেরা যায় দূর নদীতে, তাদের প্রাণ নিয়ে ফেরার আশা থাকে

না, জেলেদের গৃহ পরিজন, স্ত্রী কন্যার উদ্বেগ, আর্তি ঔপন্যাসিক নিখুঁত বাস্তবতায় উপস্থিত করেছেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগের বাস্তব রূপ বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে। "ভাদ্রের পর আশ্বিন। ... একদিন প্রবল ঝড় হইয়া গেল। ... বড় বড় গাছ মড় মড় শব্দে মটকাইয়া গেল, জেলে পাড়ার অর্ধেক কুটিরের চালা খসিয়া আসিল, সমুদ্রের মত বিপুল ঢেউ তুলিয়া পদ্মা আছড়াইয়া পড়িতে লাগিল তীরে। জেলে পাড়ার বৃদ্ধ ও রমণীরা হাহাকার করিয়া রাত কাটাইল, ছেলেমেয়েরা কেহ ভয়ে নিস্পন্দ হইয়া রহিল, কেহ গুমরাইয়া কাঁদিতে লাগিল। ... জেলেপাড়ার কোন ঘরে আজ বুঝি সমর্থদেহ পুরুষ নাই, পদ্মার বুকে নৌকা ভাসাইয়া ছাড়াইয়া গিয়াছে দূর-দূরান্তে। কেহ ফিরিবে প্রভাতে, কেহ ফিরিবে না। ... জেলে পাড়ার দিকে তাকানো যায় না, ঘন-সন্নিবিষ্ট কুটিরগুলিকে যেন আবর্জ্জনার মত নাড়িয়া চারিদিকে ছড়াইয়া দিয়াছে। ... ভীত বিবর্ণ মুখে কাঁদিতে কাঁদিতে জেলেপাড়ার নর-নারী পদ্মাতীরে গিয়া দাঁড়ায়, আরক্ত চোখে চাহিয়া থাকে উন্মত্ত জলরাশির দিকে। ... পদ্মাতীরে দাঁড়াইয়া থাকিয়া কোন লাভ নাই, চাহিয়া চাহিয়া চোখ ফাটিয়া গেলেও কাল যারা নদীতে পাড়ি দিয়াছিল তাদের দেখিতে পাওয়া যাইবে না। যে নদীতে ডুবিয়াছে সে তো গিয়াছেই —যারা ডাঙায় আশ্রয় পাইয়াছে পদ্মা শান্ত না হইলে তাহাদেরও ফিরিয়া আসা সম্ভব নয়।"

পদ্মা নদীতে জাল ফেলে জীবিকা অর্জ্জনের জন্য যারা প্রাণ হাতে করে নিয়ে ঘোরে তাদের জীবন সংগ্রামের অনবদ্য চিত্রময় উপন্যাস 'পদ্মা নদীর মাঝি'কে কোনো কোনো সমালোচক 'একান্তই আঞ্চলিক উপন্যাস বলতে অস্বীকার করেছেন। কেননা, এই একটি মাত্র উপন্যাস ছাড়া মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাদেশের একটি সুনির্দিষ্ট অঞ্চলের মাটি ও মানুষের সামগ্রিক রূপায়ণ তাঁর আর কোনো রচনায় ফুটিয়ে তুলবার চেষ্টা করেননি।" বস্তুত এই একখানি গ্রন্থ ছাড়া পদ্মা নদী বা পূর্ববঙ্গের এ ধরনের আঞ্চলিক পরিবেশ অবলম্বন করে লেখক আর কোনও উপন্যাস লেখেননি। এথেকেই অনুমান করা যায় যে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা কথা সাহিত্যে আঞ্চলিক উপন্যাসের কোন ধারা রচনা করতে চাননি। (দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাঙলা কথা সাহিত্য, ড. গোপিকানাথ রায়চৌধুরী। পৃ. ৩৪৮, ১৩৮০ সং)।

এই উপন্যাসের কাহিনী সম্পর্কে একথাও বলতে হবে, নায়ক কুবেরের ব্যক্তি চেতনার তীব্র আলোকপাত, কপিলার উচ্ছ্বাস প্রেম এ উপন্যাসকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক রচনাই করে তুলেছে। তবুও গোষ্ঠীকেন্দ্রিক আঞ্চলিক উপন্যাসের শর্ত এখানেও দৃশ্যমান। প্রকৃতি এখানে স্বতন্ত্র সত্তারূপে জীবন্ত হয়ে উঠেছে, পদ্মাতীরের ভূ-প্রকৃতি চরিত্রগুলির মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে, ভৌগোলিক সচেতনতাও

লেখকের গভীর। মুল চরিত্র কুবের যেন জেলে সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি, আর তাকে ঘিরে বা তার আশেপাশে গাঢ় বা গালকা টানে আঁকা হয়েছে গণেশ, রামু, পীতম, সিধু, আমিনুদ্দিন, হীরু প্রমুখ এইসব ধীবর পল্লীর মানুষদের বাস্তব রূপ ছবি। কোনো উঁচু আদর্শ এখানে নেই, রোমান্টিক দৃষ্টি দিয়ে না দেখে লেখক নির্মোহ বস্তুবাদী চোখে ধীবর পল্লীর দিকে তাকিয়েছেন। এই বিশেষ নদী তীর আশ্রয়ী জেলে জীবনের মান অভিমান, ঈর্ষা চক্রান্ত, দলাদলি কুটিলতা স্বার্থপরতা, আবার ভ্রাতৃত্ববোধ, প্রীতি-মমতার নিখুঁত এক সংকীর্ণ বৃত্ত পথে আবর্ত্তনের চিত্র এ উপন্যাসে যথার্থ ফুটেছে। সেখানে এক অজানা দূরত্বের আভাস এনে কাহিনীতে রোমান্টিক স্বপ্নাবেশ সৃষ্টি করেছে হোসেন মিয়া এবং তার আবিষ্কৃত বহু দূরবর্তী ময়না দ্বীপ। সমালোচকের মতে এই প্রসঙ্গ পদ্মা নদীর মাঝি উপন্যাসের আঞ্চলিকতাকে ক্ষুণ্ণ করেছে, "ঐ অপরিচিত দ্বীপে বসতি স্থাপনের দুঃসাধ্য প্রয়াসে রত হোসেন মিয়া পদ্মা তীরবর্তী জেলেদের জীবনের দিগন্তকে প্রসারিত করে দিয়ে উপন্যাসের আঞ্চলিক সীমা-সংহতিকে শিথিল করে দিয়েছে। জেলে মাঝিরা যেখানে পদ্মার কাছে, প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই দিয়েছে। এই ইঙ্গিতটি একেবারে অগ্রাহ্যের নয়।" (কালের প্রতিমা, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় পৃ ৮৬, এপ্রিল ১৯৭৪, সংস্করণ)।

কিন্তু ভিন্ন দৃষ্টিপাতেও বলা যায় পদ্মা নদীর তীরে বাসকারী জেলের দল একটি ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ জীবন পরিবেশে থাকতে পারে, কিন্তু তাদের জীবন পরিবেশকে আবেষ্টন করে আছে যে পদ্মানদী, সেই পদ্মানদীই পরম রহস্যময় এবং তার মাধ্যমেই দুর্লঙ্ঘ নিয়তির মত জেলেদের সামান্য জীবনে এসে পৌঁছায় নানা সম্ভাবনা-দুরন্ত উল্লাস ও দুঃসাহসী গতিময় জীবনাবেগ। সমালোচকের মতে হোসেন মিয়ার ময়না দ্বীপ ঠিক যেন বাস্তব দ্বীপ নয়, "... কুবের ও তার মত অনেক দুঃখ প্রহৃত মানুষের অবচেতন আকাঙ্ক্ষার এক সাঙ্কেতিক চরিতার্থতার প্রতীক বুঝি।" (দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাঙলা কথা সাহিত্য, ড. গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, পৃ. ৩৪৯, ১৩৮০ সংস্করণ) পদ্মা নদীর মাঝিদের আশা-আকাঙ্ক্ষার স্বপ্ন নিয়েই যেন এই দ্বীপটি গড়ে উঠেছে। প্রধান সমালোচকও অভিমত দিয়েছেন : "উপন্যাসে গ্রাম্য সমাজের যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে ক্ষুদ্র কর্মশীলতা, ক্ষুদ্র আশা আকাঙ্ক্ষা, ক্ষুদ্র ঈর্ষা দ্বন্দ্ব, ক্ষুদ্র উচ্ছ্বাস আবেগ—হোসেন মিয়া ও তাহার দ্বীপ যেন তাহারই উর্দ্ধতন চূড়া, তাহার শীর্ষদেশে সূর্যালোক ঝলকিত জ্যোতির্বিন্দু।" (ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃ. ৫১২, ৪র্থ সং)। সাহিত্যের বিষয় নির্বাচনে এবং পরিবেশ সৃষ্টির জন্য বাস্তববাদী কথা সাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় দারিদ্র দুঃখ —লাঞ্ছিত ঈর্ষা-কলহ মথিত

ক্ষুদ্রতা নীচতাপূর্ণ সামান্য ধীবর পল্লীর জীবন ইতিবৃত্তকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেছেন। তাঁর প্রত্যক্ষ বাস্তব অভিজ্ঞতা দিয়ে তিনি এই পল্লীর প্রতিদিনকার সুখ-দুঃখের ও আশা-আকাঙ্খা ব্যর্থতা নৈরাশ্যের জীবন কাহিনী যেমন রচনা করেছেন, তেমনই ঐ প্রত্যক্ষ জীবন সংযোগের ফলেই এই লোকায়ত জীবনধারার আচার- সংস্কার, রীতিনীতি, বিশ্বাস, সংস্কৃতি প্রায় নিটোল ভাবেই উপস্থিত করেছেন উপন্যাসের স্বল্প বিষয়ের মধ্যে।

পদ্মাতীরের ধীবর পল্লীর যারা মাছ ধরে বা মাঝিগিরি করে তাদের জীবনের স্বাদ শুধু ক্ষিধে এবং পিপাসায় যেন সীমাবদ্ধ। কাম ও সংকীর্ণ স্বার্থ তাদের গ্রাস করেছে। তবুও তাদের লৌকিক ঐতিহ্য ঝিলিক দিয়ে উঠছে কঠিন জীবনধারায় ফাঁকে ফাঁকে। গ্রামের আচার সংস্কারের মধ্যে নারীর প্রসবকালে স্বতন্ত্র আতুড় ঘরের আবশ্যকতা একটি অপরিহার্য রীতি। কুবেরের স্ত্রী মালার সন্তান প্রসবের জন্য তাদের চরম দরিদ্র অবস্থার মধ্যেও একটি স্বতন্ত্র আশ্রয়স্থান প্রসুতি ও নবজাত শিশুর জন্য কুবের তৈরি করতে বাধ্য। আঁতুড় ঘরের আবশ্যকার উপাদানগুলিতে তাকে যথাসাধ্য জোটাতে হয়েছে। "... অন্য পাশে মালার আঁতুড়। নীচু দাওয়ার মাটি জল শুষিয়া শুষিয়া ওখানটা বাসের অযোগ্য করিয়া দিয়াছে, তবু ওখানেই ভিজা স্যাঁতসেঁতে বিছানায় নবজাত শিশুকে লইয়া মালা দিনরাত্রি যাপন করিবে। উপায় কি? যে নোংরা মানুষের জন্মলাভের প্রক্রিয়া! ... ভদ্রলোকেরা উঠানে অস্থায়ী টিনের ঘর তুলিয়া দেয় চৌকির ব্যবস্থা করে। যারা আরও বেশী ভদ্রলোক তাদের থাকে শুকনো খট খটে স্থায়ী আঁতুড় ঘর। কুবেরের তো সে ক্ষমতা নাই। তার যতখানি সাধ্য সে তো করিয়াছে। ভাল করিয়া বেড়া দিয়া বৃষ্টির ছাঁট আঁটকাইয়াছে, ঘর ছাইবার শনগুলি বিছানার তলে পাতিয়া দিয়াছে, দেবীগঞ্জের রেল কোম্পানীর কয়লা চুরি করিয়া আগুনের ব্যবস্থা করিয়াছে। ..."

এই জেলে মাঝি পল্লীতে আবার মুসলমান মাঝিদের ঈষৎ-ভিন্ন আচার-সংস্কারের চিত্রটিও ঔপন্যাসিকের দৃষ্টি এড়ায়নি। জহর আমিনুদ্দি ও অন্যান্য মুসলমান ধীবরদের ঘর-বাড়ির আব্রু বর্ণনা, তাদের রীতি-নিয়মের সামান্য পরিচয় তিনি দিয়েছেন। " .. এরাই কেতুপুরের মুসলমান সমাজ ....। জেলেপাড়ার পূর্বদিকে এদের একত্র সন্নিবেশিত বাড়িগুলিতে বেড়ার বাহুল্য দেখিয়া সহজেই চিনিতে পারা যায়। যতই জীর্ণ হইয়া আসুক ছেঁড়া চট দিয়া সুপারি গাছের পাতা দিয়া মেরামত করিয়া বেড়াগুলিকে এরা খাড়া করিয়া রাখে। অথচ খুব যে কঠোরভাবে পর্দা-প্রথা মানিয়া চলে তা বলা যায় না। মেয়েদের বাহিরে না আসিলে চলে না। ... বেড়াগুলি পর্দা রাখে শুধু অন্দরে। এমন বৌ-ঝি বাড়িতে

যদি কেহ থাকে যাহার বয়স খুব কাঁচা তাহার। লেখক, দেশ-বিভাগ পূর্বকালীন পল্লীসমাজের দরিদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতির কথা নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে উচ্চারণ করেছেন। "এরা এবং জেলে পাড়ার অমুসলমান অধিবাসীরা সদ্ভাবে দিন কাটায়। ধর্ম যতই পৃথক হক দিন-যাপনের মধ্যে তাহাদের বিশেষ পার্থক্য নাই। ... বিবাদ যদি কখনও বাধে সে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বিবাদ, মিটিয়েও যায় অল্পেই।" প্রকৃতপক্ষে এই দুঃখী লোকসমাজের লড়াই দারিদ্র্যের সঙ্গে। সে কথা লেখক স্পষ্ট করেই বলেছেন : সকলেই তাহারা সমভাবে ধর্মের চেয়ে এক বড় অধর্ম পালন করে, দারিদ্র্য।"

মুসলমান সমাজের এই পর্দা প্রথার মত হিন্দু জেলে সমাজের কন্যা বিবাহ এবং পণ-প্রথার দিকটি বিস্তৃতভাবে ফুটে উঠেছে এই কাহিনীতে। বর্ণ-হিন্দু সমাজে কন্যাপক্ষকে পণ দিতে হয়। পাত্রপক্ষ পণের দাবী করে, এইটিই প্রথা। কিন্তু পদ্মানদীর মাঝিদের সমাজে কন্যা পণ প্রথা অমোঘভাবে প্রচলিত। কুবেরের মেয়ে গোপীর জন্য রামুর কাছে বা যুগলের কাছে মোটা পণ আদায়ের কথা কুবের ভেবেছে। যুগলের আগ্রহে কুবের "বহুগুন ধরিয়া মেয়ের প্রশংসা কীর্ত্তন করিয়া শুধু একটু আভাস দিয়াছে দু-কুড়ি তিন-কুড়ি টাকার "। আবার মেয়ের পায়ে খুঁত হলে তার দর কিছু কমে যায়। রামুকে কুবের "দেড়-কুড়ি টাকা পণ আর দুকুড়ি টাকার গহনা"র দাবী জানিয়েছে। শেষ পর্যন্ত হোসেন মিয়ার মধ্যস্থতায় বঙ্কু "পাঁচ-কুড়ি টাকা পণ দিবে কুবেরকে, গোপীকে গহনা দিবে তিন-কুড়ি টাকার, আর একদিন জেলে পাড়ার সকলকে দিবে ভোজ।—এইরকম কথা ঠিক হয়ে যায়।

'রথ' বা 'দোল' উচ্চ-বর্ণের ধর্ম-সংস্কৃতির অঙ্গ হলেও পল্লীজীবনে এই দুটি ধর্মীয় উৎসবকে ঘিরে আপামর জনসাধারণের অংশগ্রহণের চিত্র তারাশঙ্করের গণদেবতা, পঞ্চগ্রাম উপন্যাসে দেখানো হয়েছে। গ্রামজীবনের এই আনন্দ উৎসব 'পদ্মা নদীর মাঝি' উপন্যাসের জেলে-পল্লীতেও উপস্থাপিত হয়েছে। 'রথ' উপলক্ষে গ্রাম্য মেলার বাস্তব রেখাচিত্র যেমন ফুটেছে, তেমনি, তাকে কেন্দ্র করে এই দরিদ্র মানুষগুলির হীনতা ক্ষুদ্রতা ধূর্তামীও দেখিয়েছেন লেখক তাঁর নির্মোহ বাস্তবমুখী লেখনীতে। গ্রাম্য মেলার বর্ণনা : 'পদ্মার ওপারে আছে সোনাখালি গ্রাম, রথের উৎসব হয় সেখানে। সোনাখালির জমিদারের ছোট একটি রথ বাহির হয়। ... রথের দিনে এই মাঠে প্রকাণ্ড মেলা বসে, উলটা-রথ পর্যন্ত স্থায়ী হয়। .. ভিড় বেশী হয় প্রথম এবং শেষ দিন, ..। গ্রামবাসীর প্রয়োজনীয় ও শখের পণ্য সমস্ত মেলায় আমদানি হয়। ... কাপড়ের দোকান, মনোহারী দোকান, মাটির খেলনার দোকান, খাবারের দোকান ... সংখ্যা নাই। গরু ছাগল বিক্রয় হয়,

কাঁঠাল ও আনারসে মেলার একটা দিক ছাইয়া যায়। বড় বড় নৌকায় মালদহ ও ত্রিহুতের আম আসে।... মেয়েরা সাধ মিটাইয়া শাঁখা ও কাঁচের চুড়ি পরে ছেলেদের কোমরে বাঁধিয়া দেয় নূতন ঘুনসি। কয়েকটি স্থানে গভর্নমেন্ট হইতে লাইসেন্সপ্রাপ্ত জুয়াখেলা চলে। ... সবচেয়ে বেশী ভিড় হয় বালাখেলার কাছে।' এই মেলা জেলেপাড়ার নিরানন্দ জীবনকে স্বল্প সময়ের জন্য হলেও সুখ আর আনন্দ দেয়। "সন্ধ্যার সময় জেলেপাড়ার ঘরে ঘরে আজিকার সন্ধ্যাটি নামে সানন্দে। বৌ-রা হাসিমুখে লাল পাছাপাড় শাড়ি পড়িয়া দেখে, নূতন কাঁচের চুড়ির বাহারে মুগ্ধ হয়, কাঁচ ও কাঠের পুঁতির মালা সযত্নে কুলুঙ্গিতে তুলিয়া রাখে, ছেলেমেয়েরা বাঁশি বাজায় আর মাটির পুতুল বুকে জড়াইয়া ধরে।" যে সব দরিদ্র কুটিরে এই সামান্য উপকরণও জোটে না, সেখানেও আনন্দ এসে পৌঁছোয়, লেখক জানিয়েছেন, "একটি কাঁঠাল, দুটি আনারস, আধ সের বাতাসা ... খুশী হইয়া উঠিতে আর তাহাদের অধিক প্রয়োজন কিসের?"

কুবেরের প্রতিবেশী বুড়া সিধুদাস একটি পয়সা সম্বল করে মেলায় যায়, পয়সাটি খরচ না করে সে ছল-চাতুরিতে সংগ্রহ করে এনেছে "তিনটি দাগধরা প্রকাণ্ড কজলী আম, একটা তুলতুলে পাকা আস্ত খাজা কাঁঠাল, সের তিনেক একত্র মেশানো চাল-ডাল খুদ আর খাসির একটা মাথা। গরীবের উৎসবের আর কি চাই?" —সিধুর ধূর্ত্ত ছলনায় কুবের তাকে প্রয়োজনীয় রন্ধনে উপকরণ দিয়েছে, কিন্তু খাসীর মাথার তরকারী চাইতে গেলে প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও সিধু মিথ্যা অজুহাতে কুবেরের মেয়ে গোপীকে ফিরিয়ে দিয়েছে। বলেছে "... বিড়ালে সব খাইয়া গেছে গা।" কুবের রাগে গালাগাল করে। কিন্তু দরিদ্র ধীবর পল্লীর মানুষগুলির জীবনবোধ এই রকমই। এই তাদেব সত্য রূপ। গ্রামেব মেলার বর্ণনা প্রসঙ্গে তাদের স্বভাব পরিচয়ও ঔপন্যাসিক এভাবে চিত্রিত করেছেন।

'দোলযাত্রা' উৎসবের ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য নয়, তার লঘু আমোদের দিকটি এই জেলে পল্লীর জীবনে সত্য। এই আমোদের স্থূল চিত্র বর্ণিত হয়েছে উপন্যাসে এইভাবে - 'রঙ ও কাদা নিয়া গ্রামে দোলের উৎসব চলিয়াছে, রঙের চেয়ে কাদার পরিমাণটাই এ পাড়ায় বেশী। চাষা-ভূষা জেলে মাঝির পাড়া এটা, এখানে রঙের বড় অনটন। অনেক বেলায় কাদামাখা মূর্তিসমূহের একটা শোভাযাত্রা পাড়া হইতে গ্রাম প্রদক্ষিণ করিতে বাহির হইল। গাধার মত ক্ষুদ্রকায় একটা ঘোড়ার উপরে বিচিত্র সাজে দোলের রাজা অতি কষ্টে বসিয়া আছে, গলায় তাহার ছেঁড়া জুতোর মালা, গায়ে গোটা দশেক ছিন্নভিন্ন জামা, চারিদিকে লড়বড় করিয়া ঝুলিতেছে অনেকগুলি ছেঁড়া ন্যাকড়া। সামনে দিয়া যাওয়ার সময় শোভাযাত্রার লোকেরা কুবের, বৈকুণ্ঠ ও অধরকে কাদা মাখাইয়া দিয়া গেল। অধর ভিড়িয়া

গেল দলে। তাথৈ নাচ ছুটাছুটি হৈ চৈ, ডোবা পুকুরের পাঁক তুলিয়া যাকে খুশি ছুঁড়িয়া মারা—আনন্দ বটে দোলের!" গ্রাম্য সংস্কার, বিশ্বাসও এই উপন্যাসে একাধিক বার লক্ষিত হয়। হোসেন মিয়া সম্পর্কে জেলেপল্লীর মানুষদের সরল ভীতি— তাদের মনে হয়, ঝড় নয়, হোসেন মিয়াই গাছ ফেলে আমিনুদ্দির ঘর-বাড়ি ভেঙে চুরমার করেছে, তার সংসার ধ্বংস করে দিয়েছে, তাকে ময়নাদ্বীপে নিয়ে যাওয়ার জন্য বন্ধনমুক্ত করতে।

লোকজীবনের এক বিশেষ অঙ্গ সঙ্গীত। পূর্ববঙ্গের নদী বক্ষে, খাল-বিলে মাঝি-মাল্লারাও নৌকা ভাসিয়ে দিয়ে প্রাণাবেগে গান গেয়ে ওঠে। ভাটিয়ালি, সারি গান পূর্ববাংলার লোকজীবনের সম্পদ। পদ্মা নদীর মাঝিতে যারা ঝড়-তুফান, শীত-গ্রীষ্ম তুচ্ছ করে মাছ মারতে বিশাল নদী পাড়ি দেয়, তাদের শত কষ্টেও প্রাণে গানের রস পিপাসা জেগে থাকতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় দেখিয়েছেন। উপন্যাসের শুরুতে কঠিন পরিশ্রমে জাল ফেলে মাছ ধরবার পর স্বল্প অবকাশেও গণেশ নামের অন্যতম মাঝি, আর এক মাঝি, এ উপন্যাসে নায়ক কুবেরের কাছে অনুনয় করেছে— "একখান গীত ক দেখি কুবির।" হোসেন মিয়ার কণ্ঠে অসাধারণ এক লোকগীতি সৃষ্টি করেছেন লেখক। কাহিনীর তৃতীয় পরিচ্ছেদে, কুবেরের ঘরে ঘুম ভাঙার পর আনন্দিত হোসেনের অনুভূতির বর্ণনা প্রসঙ্গে জেলে জীবনের এই বিশেষত্ব সম্বন্ধে খোলাখুলি কিছু কথা বলেছেন। 'হোসেনের মনের কোণে একটু স্বাভাবিক কবিত্ব ছিল, জীবনে ভিন্ন অবস্থায় পড়িলে সে কয়েকটি গীতিকা রচনা করিত, তার মধ্যে দুটি-একটি মুখে মুখে প্রচারিত হইয়া স্থান পাইত শতাব্দীর ফলিত গ্রাম্যগীতিকার অমর অলিখিত কাব্যে—মাঠে, ঘাটে, মশালের আলোয় আলোকিত উঠানে গীত হইয়া ভনিতায় হোসেনের নাম দূর দূরান্তরে ছড়াইয়া পড়িত, লোকে বলিত হোসেন ফকির। ... অনেক দিন আগে কুবেরের মত ছেঁড়া কাপড় পরিয়া আধপেটা খাইয়া জলে কাদায় সে যখন দিন কাটাইত, সকাল সন্ধ্যায় তখন মনে তাহার ভাসিয়া আসিত গানের চরণ। ফুটা চালার নীচে ময়লা চাটাইয়ের বিছানায় উদরে উপবাস লইয়া তেমনিভাবে কাল রাতটা কাটাইয়া আজ আবার হোসেনের মনে গান ভাসিয়া আসিতেছে।

কুবের, গাহান বাইন্ধবার পারি?' কুবের জানায় 'আমাদের যুগইল্লা পারে। মুখে মুখে ছড়া বাইন্ধ্যা দেয়। হোসেন মিয়া নিজের বাঁধা গান তখন কুবেরকে শোনায় "আঁধার রাইতে আশমান জমিন ফারাক কইরা নোও

বোনধু কত ঘুমাইবা।

বাঁয়ে বিবি ডাইনে পোলা অকাল ক্রমশ রোও

মিয়া কত ঘুমাই বা।

মানের পাতে রাইতের পানি হইল রুপার কুপি,
উঠা দেখবা না। ...
চিরা মেঘের বাদাম তুইলা বন্ধু কনে যাও?
—জিগায় তারে খাচার চিড়িয়া।
নিদ ভাঙ্গে না, দিল জাগে না, বিবিব বুকের শির
পাড়ি দিবার সময় গেল, মাঝি তবু থির
মাঝি কত ঘুমাই বা।'

গভীর ভাবের এই লোকসঙ্গীতের পাশে লঘু-চটুল, ক্ষণিক আনন্দ বিনোদনের উপকরণ ঝুমুর চটকা ধরনের লোক-গানও এই উপন্যাসে লেখক কয়েক ছত্র উপস্থিত করেছেন গণেশের মুখে :

পিরীত কইরা জ্বইলা মলাম সই,
আ লো সই।
আগুন যাওন সমান মোনার, জউলা চুকা দৈ।
আ লো সই।
থাকিল ঘরে ছ্যাচন কেমন, ঢেঁকির তলে চিড়া যেমন,
বিদেশ গেলি, মনের পোড়ান, ভাইজা করে খৈ।
আ লো সই।

খাঁটি লোকজীবনের অন্তরঙ্গ পরিচয় নিয়ে 'পদ্মা নদীর মাঝি' পল্লীবাংলার একটি বিশেষ সমাজে জেলে বা মাঝি সম্প্রদায়ের জীবনবেদ হয়ে দাঁড়িয়েছে এইভাবে।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে শরৎ পরবর্ত্তী বাংলা উপন্যাস ক্ষেত্রে বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামই সর্বাগ্রে স্থান পায়। এই তিনজনের উপন্যাসেই পল্লীবাংলার সমাজজীবন এসেছে গাঢ় বা স্বল্প রেখায়। বিভূতিভূষণ ও তারাশঙ্করের লেখায় গ্রাম বাংলাই প্রধান্য নিয়েছে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুইটি উপন্যাসে পল্লীবাংলা প্রত্যক্ষ হয়েছে। পরবর্ত্তীকালে বাঙালী ঔপন্যাসিকদের একাধিক জন পল্লীবাংলাকে তাঁদের লেখার পটভূমি করলেও নগরজীবন কথাই সেখানে মুখ্য হয়ে উঠেছে। ব্যতিক্রম থাকলেও নগর মুখীনতাই বাঙলা উপন্যাসের বর্ত্তমানে প্রধান কথা।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮—১৯৭১)

মুখ্যত পল্লীজীবনের রূপকার তারাশঙ্কর তাঁর রচনার উপকরণ সংগ্রহ করেছেন নিজের প্রত্যক্ষ বাস্তব অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র থেকে। বীরভূম জেলার

লাভপুর গ্রামের এক ক্ষয়িষ্ণু জমিদার বংশের সন্তান তারাশঙ্কর নগর জীবনের দূরবর্ত্তী এই গ্রাম অঞ্চলের মৃত্তিকায় বর্দ্ধিত হয়েছেন যৌবন সূচনা পর্যন্ত। উচ্চ-শিক্ষার জন্য কলকাতায় এলেও ১৯২১খ্রীঃ অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেন এবং মুক্তি পেয়ে গান্ধীজীর গ্রামোন্নয়ন আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে গ্রামে ফিরে এসেছেন এবং কলেরা বিধ্বস্ত এ জেলার গ্রামে গ্রামে সেবাব্রতীর ভূমিকা নিয়ে ফিরেছেন। রাঢ়ের গ্রামাঞ্চলের সাধারণ জনজীবন এইভাবে তাঁর কাছে আরও প্রত্যক্ষ আরও নিকট হয়ে ওঠে। তাঁর রচনার উপকরণ তাই সম্পূর্ণ নিজেরই জীবন দিয়ে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতার অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে, অপরের চোখ থেকে তিনি দেখেননি। তারাশঙ্করের স্বক্ষেত্র এই গ্রামবাংলার সমাজ ও মানুষ। এর মাটি ও প্রকৃতি, স্বভাব ও সৌন্দর্য। 'চৈতালী ঘূর্ণি, ধাত্রীদেবতা, কালিন্দী, কবি, গণদেবতা, পঞ্চগ্রাম, হাঁসুলীবাঁকের উপকথা, আরোগ্য নিকেতন, পঞ্চপুত্তলী, রাধা—প্রভৃতি উপন্যাসে রাঢ়ের গ্রামজীবনের ভিত্তিতে, গ্রামের জনজীবনের যে সত্য চিত্র তিনি পরিস্ফুট করেছেন, বাংলা উপন্যাসের শরৎ পরবর্ত্তী ধারায় তা এক মহৎ সৃষ্টি রূপে বিরাজ করছে।

শরৎচন্দ্রও পল্লীর রূপকার, হুগলীর গ্রাম-জীবনের অনেকাংশ তাঁর উপন্যাসের পটভূমি হয়েছে, তথাপি তিনি আঞ্চলিক উপন্যাস সৃষ্টি করেননি। তাঁর সাহিত্যে হুগলী জেলার গ্রামাঞ্চলের পটভূমিতে সমস্ত বাংলাদেশ ও বাঙালী জীবনের সমস্যা প্রতিবিম্বিত হয়েছে, কিন্তু তারাশঙ্করের উপন্যাসে রাঢ় অঞ্চলের গ্রাম-প্রকৃতি, মানুষ-সমাজ ও সংস্কৃতি তার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় নিয়ে উপস্থিত। কাহিনীর প্রাণমূলে তা গভীর রসসঞ্চার করেছে। সমালোচক লিখেছেন : "তাঁর এই স্বগ্রাম ও তাঁর চারপাশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল অর্থাৎ দক্ষিণপূর্ব বীরভূম তাঁর সাহিত্যের ... তাঁর প্রায় সমস্ত রচনার পটভূমি। এই রাঢ় অঞ্চলের জল-হাওয়া, এখানকার সমাজ-সংস্কৃতির অন্নে তাঁর চেতনা পুষ্টি ও পরিণতি লাভ করেছে। রাঢ় অঞ্চলের দেহে মনে একটি আশ্চর্য কঠিন, ঋজু পৌরুষের সংস্পর্শ আছে। এখানকার মাটি যেমন রুক্ষ কঠিন বন্ধুর, এখানকার ধর্ম ও সাংস্কৃতিক জীবনের গভীরেও তেমনি তন্ত্রসাধনার কঠিন মন্ত্রবীজ নিহিত। আবার রাঢ় কেবল তন্ত্র-সাধনার পীঠভূমি নয়, অনার্য লোকায়ত প্রাচ্য-সংস্কৃতির বহু বিচিত্র শাখা বিস্মৃত যুগ থেকে এখানে অস্তিত্ব রক্ষা করে এসেছে। ডোম, বাউরী বীরবংশী, সাঁওতাল, সাপুড়ে, বেদে ইত্যাদি অজস্র লোক সংস্কৃতির সঞ্চরণ ক্ষেত্র এই রাঢ়ভূমি। শুধু তাই নয়, রাঢ়ের এই রাঙা মাটির পথের ধূলায় মিশে আছে সহজিয়া বৈষ্ণব বাউলেরও পুণ্য পদরজ। ... এই সংস্কৃতি এই জীবন পরিবেশের মধ্যে তারাশঙ্করের শিল্পীসত্তা ক্রমশ গড়ে উঠেছে। উত্তরকালে এই রাঢ় অঞ্চলের জীবনভাষ্য তিনি রচনা করেছেন। এই দক্ষিণ-পূর্ব বীরভূমের সমাজ, সংস্কৃতি, এখানকার বিচিত্র নরনারী, এই অঞ্চলের বিচিত্র জনশ্রুতি, গাথা কাহিনী ও অন্ধসংস্কার বহু বিচিত্র উপকরণের সমবায়ে

এক আঞ্চলিক সাহিত্যের স্রষ্টা তারাশঙ্কর।" (ড. গোপিকানাথ রায় চৌধুরী, দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাঙলা কথা সাহিত্য পৃ. ৩৫৮, (১৩৮০সং) কল্লোল যুগের লেখক কল্লোলপন্থী শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়কে বাংলা কথা সাহিত্যের প্রকৃত আঞ্চলিকতার প্রবর্তক বলা হয়। তারাশঙ্কর তাঁর উত্তরসূরী। "তারাশঙ্করকে শৈলজানন্দের পন্থী বলিতে পারি। শৈলজানন্দ কয়লাকুঠির সাঁওতাল জীবন লইয়া সীমাবদ্ধ অঞ্চলেব কাহিনী রচনাব পথ প্রদর্শন করিয়া ছিলেন। তারাশঙ্কর লইলেন তাঁহার দেশ দক্ষিণ-পূর্ব বীরভূমের সাধারণ লোকের জীবন।" (বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ড. সুকুমার সেন, ৩৪২ পৃ. (১৯৬৩ সং) (৪র্থ খণ্ড)

তারাশঙ্কর বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবনের মৃত্তিকা সংলগ্ন যে মানুষগুলিকে নির্মাণ করেছেন, যাদের কাহিনী বিবৃত করেছেন, যে সমাজলিপি লিখেছেন সেই মানবজীবন ও সমাজ শুধুমাত্র অনভিজাত লোকায়ত জীবন নয়, বৈষ্ণব, বাউল, বেদে, ডোম, বাউরীর জৈবচেতনা-চঞ্চল জীবন নয়, তাঁর নিগূঢ় আকর্ষণ ছিল পরিবর্তনশীল যুগের প্রেক্ষাপটে ক্ষয়ে যাওয়া অভিজাত সামন্ততান্ত্রিক রূপ রচনার দিকে। তিনি জন্মেছিলেন গ্রামবাংলার এই অভিজাত সামন্ততান্ত্রিক এক ক্ষয়প্রাপ্ত জমিদার পরিবারে। বাংলার সামন্ততন্ত্রের ধ্বংস ও নতূন ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের উত্থানের দ্বন্দ্বময় যুগমুহূর্তে তারাশঙ্করের চেতনা জাগরিত হতে শুরু করেছিল। তাঁর চতুস্পার্শ্বস্থ সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধ, পরিবেশ তার অর্থনৈতিক সংকট ও মর্যাদা নষ্টের ইঙ্গিত— সমস্তই তারাশঙ্কর বাল্য কৈশোর থেকে অল্প অল্প করে উপলব্ধি করেছেন। ফলে তাঁর উপন্যাসে এই ব্যাপারটি একান্ত বাস্তব হয়ে ফুটে উঠেছে। তারাশঙ্করের নিজের কথায় শোনা যায় তাঁর কালের কথা, জন্মভূমি লাভপুরের প্রসঙ্গে। "লাভপুর গ্রামখানি অদ্ভুত। ... কালের লীলা, কালান্তরের রূপমহিমা এখানে এত সুস্পষ্ট যে বিস্ময় না মেনে পারি না। ... ১৮৯৮ সালে লাভপুরের সমাজে তখন দুই বিরোধী শক্তির দ্বন্দ্ব চলেছে। জমিদার প্রধান গ্রাম। ... লাভপুর সমাজের নেতৃত্বের আসন নিয়ে এই বিচিত্র বিরোধ সমাজ জীবনের নানা স্তরে বিস্তৃত হয়েছে। কীর্তির প্রতিযোগিতা চলছে মহাসমারোহের প্রকাশের মধ্যে; দ্বন্দ্ব চলছে সৌজন্য প্রকাশ নিয়ে, প্রতিযোগিতা চলছে জ্ঞানমার্গের অধিকার নিয়ে, আবার পরস্পরের মধ্যে কলঙ্ককালি ছিটানো নিয়েও চলছে জমিদার ব্যবসায়ীর মধ্যে বিচিত্র বিরোধ! " (তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, আমার কালের কথা)

তারাশঙ্কর একদিকে দেখেছেন স্বচ্ছল জমিদারি—বিস্তীর্ণ কৃষিক্ষেত্র, প্রাচীনকালের শিক্ষা ও আভিজাত্য সম্পন্ন পরিবার অন্যদিকে সমগ্র ভারতে সম্প্রসারিত কয়লার ব্যবসায় প্রচুর অর্থ সম্পন্ন ধনী পরিবার" দুই বিপরীত মুখী শ্রেণীর দ্বন্দ্বে জমিদার তথা সামন্তশ্রেণীর পরাভব ঘটেছে, ও নতূন পুঁজিবাদী ব্যবসায়ী শ্রেণীর বিজয় হয়েছে। এই ঐতিহাসিক ঘটনা অনিবার্যতায় পল্লীবাংলার

গ্রামীণ কৃষি নির্ভর অর্থনীতির পতন হয়ে প্রতিষ্ঠা হয়েছে কলকারখানা শিল্প-কেন্দ্রিক শহরে অর্থনীতি— তারাশঙ্কর কৈশোর যৌবনেই এই অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। এই সত্য তিনি স্বয়ং স্বীকার করেছেন : "সামন্ততন্ত্র বা জমিদারতন্ত্রের সঙ্গে ব্যবসায়ীদের দ্বন্দ্ব আমি দুচোখ ভরে দেখেছি। সে দ্বন্দ্বের ধাক্কা খেয়েছি। আমরাও ছিলাম ক্ষুদে জমিদার। সে দ্বন্দ্বে আমাদেরও অংশ ছিল।" (আমার কালের কথা, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ১২পৃ. ২য় সং)। তারাশঙ্করের কালিন্দী, পঞ্চগ্রাম, গণদেবতায় এই দুই শ্রেণীর দ্বন্দ্ব ও পরিণাম চিহ্ন, লুপ্তপ্রায় সামন্ততন্ত্রের দীর্ঘশ্বাস, অভিজাত্য ও মর্যাদাবোধের গর্ব অহঙ্কারের শূন্যগর্ভ বহিরাবরণ প্রস্ফুট হল 'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসে। রক্তে সামন্ততান্ত্রিক উত্তরাধিকার তারাশঙ্করের চেতনায় এই ক্ষীয়মান সমাজ পদ্ধতির প্রতি একটা নিগূঢ় টান সৃষ্টি করেছিল। সামন্ততন্ত্রের ঐশ্বর্যদীপ্ত পৌরুষময় অভিজাত্যের সুউচ্চ ইমারতের ভিত্তিতলে ক্ষয় চূড়া, গম্বুজ, দুর্লভ কারুকাজ অঙ্কিত প্রস্তর খণ্ডগুলি। এই করুণ অবসান তারাশঙ্করের চেতনায় গভীর বেদনাবিদ্ধ এক শোকবিন্দুর নিটোল মুক্তার জন্ম দিয়েছে। সামন্ততন্ত্রের ধ্বংসোন্মুখ রূপটি ও বণিকতন্ত্রের নবসভ্যতার উদ্ভব যেমন তারাশঙ্কর দেখিয়েছেন তেমনি জীবন অভিজ্ঞতা থেকে সৃষ্টি করেছেন প্রথম উপন্যাস দুটি 'চৈতালী ঘূর্ণি'। (১৯৩১) ও 'নীলকণ্ঠ' (১৯৩৫), যেখানে চিত্রিত হয়েছে পল্লীবাংলার কর্ষণজীবী মানুষের জমিদারের অত্যাচারে গ্রাম ছেড়ে শহরে পালিয়ে শ্রমিকবৃত্তি গ্রহণ করার ঐতিহাসিক সত্য। কৃষক সমাজের দুর্গতির বাস্তব রূপ এখানে পরিস্ফুট হয়েছে 'গোষ্ঠী' চরিত্রের মাধ্যমে। সে জমিদারের নিষ্ঠুর আর্থিক পীড়নে ঘটনাচক্রে জমিদারের খোট্টা চাপরাসীকে খুন করে গ্রাম ছেড়ে শহরে পালিয়ে কারখানায় শ্রমিক হয়। প্রসঙ্গত বলা যায় শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' গল্পেও জমিদার কর্তৃক অত্যাচারিত মুসলমান কৃষক প্রজা গফুর ভিটেমাটি ছেড়ে মেয়ের হাত ধরে 'ফুলবেড়ের চটকলে কাজ করতে' গভীর রাতে পথে নেমেছিল। তারাশঙ্করের উপন্যাসের গোষ্ঠ শহরে কারখানার ধর্মঘটে যোগদান করে শেষপর্যন্ত প্রাণ হারায়। বাংলার কৃষক জীবনের বিপর্যয়ের করুণ চিত্র এই কাহিনী। এখানে গোষ্ঠের স্ত্রীকেও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের কারণে নৈতিক সংকটেও পড়তে হয়েছে। সেই কঠিন সংকট ও দ্বন্দ্ব চৈতালী ঘূর্ণিতে জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে। 'নীলকণ্ঠে'র শ্রীমন্তও ঘটনার চাপে কৃষিবৃত্তি থেকে স্খলিত হয়ে স্ত্রীপুত্রসহ ছিন্নমূল হতভাগ্য যাযাবরের মত পথে ভেসেছে। স্ত্রী গিরিকে নারীত্বের অপমান সহ্য করে শোচনীয় মৃত্যু বরণ করতে হয়। ছেলে 'নীলকণ্ঠে'র পিতৃ পরিচয় পৃথিবীতে কেউ জানেনি।

পল্লীভিত্তিক বাংলায় লক্ষ লক্ষ সাধারণ কৃষকের এই অবস্থা দাঁড়িয়ে গিয়েছিল বিংশ শতাব্দীর সূচনা থেকেই। অথচ, ভারতবর্ষ তথা বাংলায় কৃষিকর্ম কেবলমাত্র একটি বিশেষ জীবিকা অবলম্বন মাত্র ছিল না। অতীতের গ্রামভিত্তিক বাঙালী

সমাজে কৃষিকাজ সমস্ত গ্রামীণ পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের কল্যাণবোধ, ধর্মচেতনা ও সংস্কৃতির সঙ্গে কৃষির ছিল নিবিড় একাত্মতা। "কৃষিকর্ম ছিল ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির অচ্ছেদ্য অঙ্গ। Trevelyan এর উক্তিটি এখানে স্মরণীয় : ' Agriculture is not one industry among many, but is a way of life, unique and irreplaceable in its human and spiritual values.'

কিন্তু সেই জীবনবোধ থেকে আধুনিক কাল সরে এসেছে। কৃষির ভিত্তি আজ শিথিল হয়ে গেছে। ... " এই বিনষ্ট কৃষি সভ্যতার ধ্বংসাবশেষের সাক্ষী গোষ্ঠ এবং শ্রীমন্ত তথা তাদের পরিবার।

'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসে সামন্ততন্ত্র ও দেশপ্রেম জনসেবার প্রগতিশীল চিন্তার বিরুদ্ধমুখী শক্তির দ্বন্দ্ব পরিস্ফুট হয়েছে জমিদার বংশের সন্তান শিবনাথের জীবনে ও মানসে। পিসীমা প্রাচীনতা ও মা প্রগতিশীলতার প্রতীক। দুই এর দ্বন্দ্বে শিবনাথের মাধ্যমে বন্দী অবস্থায় পিসীমাকে দেখে তাঁকে প্রণাম জানিয়েছে গভীর স্বীকৃতি দিয়ে।

'ধাত্রীদেবতা'য় পল্লীসমাজের বাস্তব চিত্র রূপায়িত হয়েছে কলেরার আক্রমণে গ্রামবাসীদের ত্রস্ত কাতরতায়। রোগ-মহামারীর প্রাদুর্ভাবে, কি অতিবৃষ্টি— অনাবৃষ্টির জন্য গ্রাম জীবনে যে বিপদ ঘটে কিম্বা বলা যায় তাদের যে অস্থিরতা সৃষ্টি হয়, তার হুবহু দাগ রয়েছে ধাত্রীদেবতায়। পুরোন ধর্মসংস্কারে আবদ্ধ প্রাণ গ্রামবাসীরা কেউ পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন করেছে, কেউ অন্ধ বিশ্বাসের কাছে আত্ম সমর্পিত এবং তাদের ভীতসন্ত্রস্ত মানস লোকে বিচিত্র অনৈসর্গিক-প্রায় রূপ-কল্পনা— সব মিলে এক অদ্ভুত ভীতি শিহরণকারী, পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। লেখক, অমাবস্যার রাতে রক্ষাকালী পূজার বর্ণনায় কিম্বা অনাবৃষ্টি ও খরায় শুষ্ক শস্যক্ষেত্র জুড়ে যে সোঁ সোঁ ধ্বনির বর্ণনা করেছেন, তার মধ্যে লোকজীবনের অতি-প্রাকৃতের বিশ্বাস জীবন্ত হয়ে উঠেছে। জমিদার গোষ্ঠীর প্রাত্যহিক সমস্যা দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টিতে খাজনা না পাওয়ায় তাদের অর্থভাণ্ডারে টান, এসব দিকও ধাত্রী দেবতার পল্লীসমাজ চেতনার বিশিষ্ট প্রকাশ।

কালিন্দী (১৯৪০) উপন্যাসেও জমিদারের সমস্যা দেখানো হয়েছে। সামন্ততন্ত্রের অবক্ষয়ের চিহ্ন রূপে জমিদারদের 'জ্ঞাতিবিরোধ, প্রজাবিদ্রোহ, নবোদ্ভিন্ন চরের স্বত্ব লইয়া মামলা মোকদ্দমা, আধুনিক যন্ত্র সভ্যতার প্রবলতর ও অধিকতর সুনিয়ন্ত্রিত শক্তির সহিত সংঘর্ষ ... " (ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃ. ৫৫২. ১৩৭২) চিত্রিত করেছেন তারাশঙ্কর। নদী বক্ষে নতুন চরের উদগমে তার ওপর অধিকারের দাবীতে দাঙ্গা, রক্তপাত সামন্ততন্ত্রের অভিজাত্য বা মর্যাদাবোধের লক্ষণ হিসেবে গণ্য হত। রায় ও চক্রবর্তী বংশের বহু কালের বিবাদ আবার এই চরকে কেন্দ্র করে নতুন করে সৃষ্টি

হয়েছে। আবার এই চরকে গ্রাস করেছে কলওয়ালা মিঃ মুখার্জীর লৌহ শাসন। যান্ত্রিক সভ্যতার কাছে আদিম গ্রাম জীবন হেরে যাচ্ছে, আত্মসর্ম্পণে বাধ্য হচ্ছে- এই অনুভব উপন্যাসে ছড়িয়ে থাকে। বাংলার খাঁটি পল্লীসমাজ অবলম্বনে লেখা 'গণদেবতা' ও 'পঞ্চগ্রামে' তারাশঙ্কর বাংলার পল্লীর ক্রম পরিবর্ত্তনশীল রূপটিকে তুলে ধরেছেন বিশাল জনমণ্ডলীর পটভূমিতে তাদের বিচিত্র সমস্যার অজস্র শাখায়িত ঘটনাজালের বর্ণনায়, চাষী-কৃষকের ভালমন্দ, তাদের চাষ সমস্যা, জমিদার মহাজন সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক চিত্রণে, সনাতন পল্লীব্যবস্থার সঙ্গে আধুনিক যুগ-ভাবনার বিরোধ রূপায়ণের মাধ্যমে।

এই দুটি উপন্যাসে বাংলার পল্লীসমাজের উঁচু-নীচু সমস্ত শ্রেণীর মানুষ সমবেত হয়েছে। এখানে তারাশঙ্কর শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজের তুলনায় জীবন পটভূমিকে বিস্তৃততর করে এঁকেছেন। "পল্লীসমাজের পটভূমি সংকীর্ণ; গ্রাম্য দলাদলি, সামাজিক ঘোঁট, স্বার্থপর হীন চক্রান্তের মাঝে রমেশ রমার প্রেমের ফল্গু ধারা প্রবাহিত। ... গণদেবতা ও পঞ্চগ্রাম উপন্যাসের পটভূমি অনেক ব্যাপক বিস্তীর্ণ। এখানেই তারাশঙ্কর শরৎচন্দ্রকে ছাড়িয়ে গেছেন। দেবু ঘোষ এই দুই উপন্যাসের নায়ক বটে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে পরিবর্ত্তনশীল গ্রামীণ সমাজই নায়ক।" (কালের প্রতিমা, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়। পৃ. ২০ ১৩৮১ সংস্করণ)

শরৎচন্দ্রকে ছাড়িয়ে গেছেন, এ বিতর্কে যোগ না দিয়েও বলা যায় গ্রামসমাজের বিশাল পটভূমি, বিস্তৃততর সমস্যা এ দুটি উপন্যাসকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কালীন পল্লীবাংলার এক নির্ভরযোগ্য দলিলে পরিণত করেছে। গ্রামীণ সমাজের দ্রুত পরিবর্ত্তন এখন ঘটে যাচ্ছে। যন্ত্রনির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থা, আধুনিক কল-কারখানা, শিল্প প্রতিষ্ঠা পুরানো গ্রাম সমাজের সুনির্দিষ্ট রীতি, প্রথা ও শাসনকে অগ্রাহ্য করতে শিখিয়েছে। নাগরিক জীবনের আধুনিক সুখস্বাচ্ছন্দ, মুক্তি চেতনা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য গ্রামের সাধারণ নর-নারীকে প্রলুব্ধ করেছে, তারা গ্রাম ছেড়ে শহরে যাচ্ছে, পুরুষানুক্রমে গৃহীত কর্মধারার পরিবর্ত্তে সম্পূর্ণ ভিন্ন জীবিকায় চলে যাচ্ছে। এমনকি ভীরু গ্রাম্য বধুও সমাজ বন্ধন ভেঙে সুখী হওয়ার অধিকার খুঁজে নিচ্ছে। একদিকে এই পুরানো গ্রাম ভেঙে নগর মুখী হওয়া। অন্যদিকে প্রগতিশীল চিন্তাধারার প্রেরণায় গ্রামের মানুষের জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত হওয়া, নতুনভাবে গ্রাম সম্বন্ধে চিন্তা করা আগামী ভেদহীন পৃথিবীর স্বপ্ন দেখা— গণদেবতা, পঞ্চগ্রাম উপন্যাসের মূল উপজীব্য হয়েছে। দেবু ঘোষ, দুটি উপন্যাসে কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে এসেছে। সে চাষী ঘরের সন্তান, সামান্য শিক্ষা নিয়েই সে গ্রামে নতুন জীবনাধিকার আনতে চেষ্টা করে চলেছে। অথচ, তার চেতনাতেও দ্বন্দ্ব দেখিয়েছেন লেখক। প্রথমতঃ মহাগ্রামের নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পণ্ডিত শিবশেখর ন্যায়রত্নের পৌত্র বিশ্বনাথ সাম্যবাদে বিশ্বাসী হয়ে ব্রাহ্মণত্বের চিহ্ন পৈতা ত্যাগ করায় যে নির্বাচার জাতিভেদ প্রথার বর্জনে খৃষ্টান, মুসলমান, হাড়ি বা ডোমের

সঙ্গে একত্রে আহার গ্রহণ করার বা পার্টির কমরেডশিপ হিসেবে তরুণী কর্মী নারীকে সঙ্গে রাখায়, বিচলিত ও বিভ্রান্ত হয়েছে। সে এই বিস্ফোরক প্রগতিশীল চেতনাকে আত্মস্থ করতে পারেনি। তাই বিশ্বনাথের সংস্পর্শ ত্যাগ করেছে। দ্বিতীয়ত : গ্রামের নিরুদ্দেশ অনিরুদ্ধ কামারের গৃহত্যাগিনী স্ত্রী পদ্মকামারনীকে আকস্মিকভাবে জোসেফ নগেন্দ্র রায়ের স্ত্রী হিসেবে দেখে ও তার মাতৃত্বের উজ্জ্বল পরিচয় পেয়ে হতচকিত হয়েছে। অনিরুদ্ধব গৃহে অবহেলিত পদ্ম স্বামীর নিরুদ্দেশ হওয়ায় গ্রামের জোতদার মহাজন ছিরু ঘোষের কুনজরে পড়ে, বাঁচবার তাগিদে সেও গৃহত্যাগী হয় এবং ঘটনা চক্রে সে স্বামী সংসার ও পুত্র সুখ পায়। এখন অনিরুদ্ধ তার কাছে মৃত অধ্যায়। পদ্মর এই দুঃসাহসী জীবন নির্মাণ দেবুকে হতচকিত করলেও সে কিন্তু পদ্মকে দোষ দিতে পারে না। — এই দ্বন্দ্ব সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা নিহত মানুষের। দুনিয়া পাল্টানোর তীব্র চেতনার বেগ সে সহজে ধারণ করতে পারেনি। এই দুটি উপন্যাসে গ্রামের নতুন ও পুরাতন উভয় জীবন চেতনার প্রতিনিধিরা আছেন। তাঁদের মধ্যে পঞ্চগ্রামের মুখ্য ব্যক্তিত্ব মহামহোপাধ্যায় শিবশেখর ন্যায়রত্ন মহাশয়। খাঁটি ব্রাহ্মণত্বের তেজদীপ্ত ব্যক্তিত্ব ও নিজস্ব আদর্শবাদের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা নিয়ে তিনি উপন্যাসে অতীতের শেষ উন্নতশীর্ষ সম্মানিত প্রতিনিধি। হৃতমান প্রাক্তন জমিদার দ্বারিক চৌধুরী তার দারিদ্র্য সত্ত্বেও আত্মমর্যাদা রক্ষায় সচেষ্ট— প্রাচীন সামন্ততন্ত্রের বিগত শ্রী প্রতিনিধি হয়ে এখনও জীবিত। উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে মহাজন ছিরু পাল। অর্থ কৌলিন্যে সে শ্রীহরি ঘোষ নাম নিয়ে গ্রামে মর্যাদা ও প্রতিপত্তি কামনা করে। তার নিষ্ঠুরতা কুটিলতা ও লাম্পট্য নতুন আভিজাত্যলোভী এক ধনী সম্প্রদায়কে চিহ্নিত করেছে। এ উপন্যাসে হিন্দু, মুসলমান নির্বিশেষে চাষীদের সুখ-দুঃখের, আশা-আকাঙ্ক্ষার ছবি আঁকা হয়েছে। এখানে উপস্থিত হয়েছে রহম চাচা, স্বর্ণের পিতা তিনকড়ি মণ্ডল, সতীশ মণ্ডল, পাতু মুচি, গ্রামসমাজের শাসন বিরোধী অনিরুদ্ধ কামার, স্বৈরিণী অথচ অন্যায় প্রতিবাদী দুর্গা। কঙ্কণার জমিদারদের মত ধনী মুসলমান চাষী দৌলত শেখ—এবং আরও অজস্র পল্লীর নর-নারীর সঙ্গে তিনকড়ি মণ্ডল রামভল্লার মত বাগ্দীর দল।

উপন্যাস দুটিতে তারাশঙ্কর দেখিয়েছেন গ্রামের দুঃখী দরিদ্র ভল্লা বাগ্দীরা পেটের দায়ে ডাকাতি শুরু করেছে। রাঢ়ের এই বাগদীর দল অশেষ স্বাস্থ্যপূর্ণ শক্তিময় জাতি। উদ্ধত স্বাধীনতা প্রিয় এই শ্রেণী বন্যায় সর্বস্বান্ত হয়ে গেছে। লুকিয়ে লুকিয়ে গৃহসামগ্রী বিক্রী করেছে, কিন্তু সাহায্যের অন্ন নিতে তাদের আত্মসম্মানে বেধেছে। তিনকড়িকে রামা বলেছে ... বাগ্দী-লাঠিয়াল, আমরা ডাকাত, চিরকাল জোর করে খেয়েছি আর ভিক্ষে নিতে পারব না। ... বরং যার বেশি আছে তার কেড়ে লিই—এস...'' (পঞ্চগ্রাম)। এই রাঢ় ভূমির পল্লীসমাজ চিত্র তারাশঙ্কর অনবদ্যভাবে এঁকেছেন, যেখানে রুক্ষ মাটির মতই কঠোর বাগদী

পুরুষ একরাত্রে কয়েক মাইল দূরবর্ত্তী গ্রামে ডাকাতি করে রাতারাতি ফিরে আসে, ঘন অন্ধকারে ডাকাতের সংকেত ধ্বনি শোনা যায়, আগুন জ্বালিয়ে "জমাট বস্তি" অর্থাৎ ডাকাতেরা জমায়েত হয়। আবার এখানেই শ্যামল শস্যে মাঠ ভরে ওঠে চাষীরা ধানের মুখ দেখে, নবান্ন হয় ঘরে ঘরে। বধুরা আলপনা দেয়। চাল গুঁড়ো করে পিঠা করে। নবান্ন উৎসবের ঢাকের শব্দ শোনা যায়। গ্রামে মনসার ভাসান কিম্বা ফুল্লরার বারমাস্যার গান সাধারণ জনসমাজের প্রিয় গান। রাত জেগে তারা এই গান শোনে। বাংলার কৃষি জীবনে হিন্দু ও মুসলমান চাষী একসঙ্গে সুখ, দুঃখ আনন্দ বেদনার সম অংশীদার। কৃষি বিষয়ক রীতি-নীতি আচার প্রথা তারা প্রায় একরকম ভাবেই মানে। উপন্যাস দুটিতে তাই দেখা যায়। "বর্ষার মেঘকে আবাহন করিয়া হিন্দু মুসলমান কৃষক প্রায় একই গান গায়।" (ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃ. ৫৪৮, ১৩৭২)।

"মাঠে পড়িয়াই রহম উচ্চকণ্ঠে গান ধরিয়া দিল—

কালো বরণ মেঘ রে, পানি নিয়ে আয়
আমার জান জুড়ায়ে দে।"

হাসিয়া দেবু বলিল— আর জল নিয়ে করাব কি চাচা? মাঠ যে ভেসে গেল। রহম একটু অপ্রস্তুত হইল। চাষের সময় মাঠের মধ্যে তাহার এই গানটাই মনে আসিয়া গিয়াছে। বলিল ব্যাঙের সাদীর গান চাচা! বলিয়াই আবার দ্বিতীয় ছত্র ধরিল—

'বেঙীর সাদী দিব রে মেঘ, ব্যাঙের সাদী দিব হুড় হুড়ায়ে নে রে জল হুড় হুড়ায়ে দে। আমার জান জুড়ায়ে দে।" (পঞ্চগ্রাম, পৃ. ৩৯, প্রাইমা পাবলিকেশনস্ ১৯৮১ সং)

আষাঢ় শ্রাবণে অনাবৃষ্টি হলে ব্যাঙের বিয়ে দেবার প্রথা কৃষকদের মধ্যে আছে। তাতে নাকি বৃষ্টি নামে। কৃষক জীবনের এই বিশ্বাস তারাশঙ্কর জানতেন। উপন্যাসে এভাবে রাঢ়ের কৃষক জীবন অবিকল উঠে এসেছে। গ্রাম সংস্কৃতির অজস্র দিকগুলি ফুটেছে স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে।

সরল চাষী লুকোছাপা না করে মনের কথাটুকু পরিষ্কার করে সামনা সামনি জানিয়ে দিতে পারে। রহম, বিশ্বনাথের সামনেই দেবুকে জানায় যে বিশুকে সঙ্গে নিলে তাদের সম্প্রদায় আপত্তি জানাবে। একথা জানিয়ে সে মনের আনন্দে লাঙল ঠেলতে ঠেলতে গান গেয়ে উঠেছে :

"হোসেন হাসান দুটি ভাই- এই দুনিয়ায় পয়দ্ধা হয়,
তাদের মত খাস বান্দা, এই দুনিয়ায় নাই।
ফতেমা মা মা জননী—তাঁর কাহিনী বলি আমি,
তাহার স্বামী হজরত আলি বলিয়া জানাই।"
(পঞ্চগ্রাম, প্রাইমা পাবলিকেশনস, মার্চ ১৯৮১ সং, পৃ. ২৪)

এই রকম ভাবে তারাশঙ্কর পল্লীজীবনের মর্মমূলে প্রবেশ করে, তাদের সত্য স্বরূপটি আবিষ্কার করেছেন, তিনি কৃষক সমাজের সামগ্রিক ছবিটিই তুলে ধরতে পেরেছেন। এই কৃষকরা জমির খাজনার বৃদ্ধি নিয়ে যেমন লড়াই করতে পিছপা হয় না, সরল বিশ্বাসে আঘাত পড়লে ক্রোধ প্রকাশেও বিলম্ব করে না "রহম... বলিল,— যে হারামী বেইমানী করবে তার নলীটা আমি দু ফাঁক করে ময়ূরাকীর পানীতে ভাসায়ে দিব হাঁ। যা থাকে আমার নসীবে।" (ঐ, পূর্ববৎ পৃ. ৩৮), আবার এই ঘোঁয়ার চাষীই নিজের ভুল বুঝে দেবুকে বাড়ি পর্যন্ত পৌছে দিয়ে আসে, তখন আর নিজের পদমর্যাদা বোধ থাকে না। গণদেবতা পঞ্চগ্রামে এই রকম রহম শেখ কিম্বা তিনকড়ি মণ্ডলের মত চরিত্র নির্মাণ করে তারাশঙ্কর পাঠককে গ্রামের সরল সত্যনিষ্ঠা, অথচ তেজস্বী ও একগুঁয়ে স্বভাবের সাধারণ মানুষগুলিকে চেনাতে চেয়েছেন।

গ্রামে মহাজন, ধনী ভূ-সম্পদের মালিকের কুটিলতা, অত্যাচার যেমন শ্রীহরি ঘোষ বা ছিরে ঘোষের মাধ্যমে কিম্বা মুসলমান ধনী ভূস্বামী দৌলত শেখ বা কঙ্কনার জমিদারদের প্রসঙ্গে সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন, জমিদার কৃষকের লড়াই-এর চেহারাটা দেখিয়েছেন, তেমনি, তাঁর চোখ এড়িয়ে যায়নি বাউড়ি কবি সতীশকে। সে গান বাঁধে, নানা বিষয় নিয়ে। এই লোক কবি, লোক গান গ্রাম সমাজের প্রাণের বস্তু। সতীশ, দেবুর মহত্ত নিয়ে গান বাঁধে, পাঁচালীর মত গায়, আবার, চাষের ব্যাপার নিয়েও সে তাৎক্ষণিক সঙ্গীত লিখে ফেলে। তার গান জনপ্রিয় হয় ভীষণ ভাবে। লেখক এই গানগুলি প্রায় গোটা গোটা উদ্ধৃত করেছেন উপন্যাসে। এই সব গানে একটা বিশেষ সময় ও ঘটনাবলী সত্যমূলকভাবে চিত্রিত হয়ে থাকে। যেমন পঞ্চগ্রামে চাষীরা দেবুর নেতৃত্বে জমিদার মহাজনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েও তাদের কূট চক্রান্তে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে একটা ফাটল ধরিয়ে তার সুযোগ নিয়ে আন্দোলন স্তব্ধ করে দিয়েছিল, গরীব চাষীরা কেউ দৌলত শেখ, কেউ শ্রীহরি ঘোষের দয়ার দান গ্রহণ করে ইরসাদ এবং দেবু দুজনকেই বর্জন করেছিল। সেই পটভূমিকায় সতীশ বাউড়ির চাষের সময় মহোৎসাহে লেখা গান খানি কৃষকদের আশা উৎসাহের রঙীন ছবির মত ফুটে ছিল।

'কলিকাল ঘুচল অকালে।

. . . .

কারুর ভুঁয়ে কেউ জল না কাটে, মাঠের জল রইচে মাঠে

. . . .

ভুলল লোকে গালা গালি, ভাই বেরাদর গলাগলি
অঘটনের ঘটন খালি কলিতে কে ঘটালে।
দীন সতীশ বলে কর-জোড়ে তেরশো ছত্রিশ সালে"

পল্লী কবির সরল শিল্প সৃষ্টির মুল্য ছাড়াও এই গানের উদ্ধৃতির পটে ঐ

উৎসাহিত জোট বাঁধা কৃষকদের জমিদার মহাজনের কূটচালে (দেবু সম্পর্কে অপবাদ, পদ্ম কামারনীকে নিয়ে) ছত্রভঙ্গ হয়ে যাওয়া এবং হিন্দু মুসলমান কুচক্রীদের অর্থ-প্রতিপত্তির কাছে মাথা নীচু করার ছবিটিও স্পষ্ট হয়ে ওঠায় এর তাৎপর্য গভীরতর হয়েছে।

কুৎসা রটানো, পরস্পরের বিরুদ্ধে কানাকানি পল্লীসমাজের এ সমস্ত ক্ষুদ্রতা তুচ্ছতা লেখক আঁকতে দ্বিধাগ্রস্ত হননি। কারণ পল্লীমানুষের তথা সমাজের এটি একটি প্রধান প্রবনতা। এর ফলে গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে পাঁচজনকে ডেকে 'গণদেবতা'য় অনিরুদ্ধ কামারকে এক ঘরে করার মত 'পঞ্চগ্রামে'ও শ্রীহরি ঘোষ দেবুর নামের সঙ্গে পদ্ম ও দুর্গাকে জড়িয়ে জঘন্য কলঙ্ক রটনা করে তাকে 'পতিত' করার জন্য পঞ্চায়েতের বৈঠক বসানোর চেষ্টা করছে এই ব্যাপারটি প্রাঞ্জল ভাষাতেই লেখক বর্ণনা করেছেন।

পল্লীসমাজের সাধারণ মানুষগুলির মানস প্রবনতা তারাশঙ্কর পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লক্ষ্য করেছিলেন। এরা গরীব দুঃখী মানুষ; সহজেই লোভের বশবর্তী হতে পারে। শ্রীহরি ঘোষের কাছ থেকে প্রচুর সাহায্যের লোভে তারা দেবুকে বর্জন করেছে ঠিকই, কিন্তু তার পথ ছেড়ে দিলেও, মনে মনে দেবুর প্রতি অগাধ ভালবাসা শ্রীহরি বা দৌলত শেখ বিনষ্ট করতে পারেনি। বন্যার জলে দেবু ভেসে গেছে শুনে সেই গ্রামবাসীরাই দলে দলে ছুটে এসেছে, ঈশ্বরের কাছে তার আরোগ্যের প্রার্থনা করেছে। "স্তব্ধ মানুষগুলির মধ্য হইতে আত্ম প্রার্থনার গুঞ্জন উঠিল মা! মা! বাঁচাও। মা—কালী! মেয়েরা বার বার চোখ মুছিতে ছিল।" হরেন উত্তেজিত ভাবে এই মানুষগুলিকে তিরস্কার করেছিল এই বলে যে, দেবুর ভালমন্দের খবর জেনে তারা কি করবে? "হোয়াট ইজ দ্যাট টু ইউ? সে খবরে তোমাদের কি দরকার। সেলফিশ পিপ্‌ল সব।" স্বার্থপর বটে, কিন্তু স্বার্থসর্বস্ব আত্মপরায়ণ মাত্র তারা নয়। আসলে অর্থনৈতিক দুর্বলতায়; মহাজন জমিদারের কাছে তারা মাথা নুইয়ে ফেলে; পেটের জ্বালায় গ্রামের দরিদ্র সম্প্রদায়ের মেয়ে দুর্গাকে যেমন স্বৈরিণী বানিয়েছিল তার মা, যেমন পাতু মুচির বৌ ঐ পথে পা পাড়ানোর অবস্থায় পড়েছে, সেই ক্ষুধার দাবীতে অধিকাংশ সাধারণ পল্লীবাসী দেবুর রাস্তা থেকে সরে এসেছিল; এই লোভ, এই ভীরুতা, তাদের অনিবার্য স্বভাব লক্ষণ। কিন্তু তারা প্রকৃতপক্ষে দেবুর পরম শুভাকাঙ্ক্ষী।

গ্রামীণ সমাজের এই সব বিচিত্র ধরনের মানুষের মিছিল যেমন তারাশঙ্কর চিত্রিত করেছেন, সেই রকমই গ্রাম-সমাজের সমস্ত রীতি, সংস্কার, বিশ্বাসও আচার আচরণের বৈশিষ্ট্য নিখুঁত বর্ণনায় লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি গ্রাম জীবনের ধর্মবিশ্বাস, ধর্মীয় আচরণ, পূজা-পদ্ধতি, উৎসবের যথাযথ বর্ণনা দিয়েছেন। রথ

যাত্রার উৎসব বিবরণ দিয়ে "পঞ্চগ্রামে"র সূচনা। "আষাঢ় মাস। শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে জগন্নাথের রথযাত্রা পর্ব; দ্বাদশ মাসে বিষ্ণুর দ্বাদশ যাত্রার মধ্যে আষাঢ়ে রথযাত্রা হিন্দুর সার্বজনীন উৎসব। ... উচ্চ-বর্ণের হিন্দু গৃহে আজ জগন্নাথদেবের উদ্দেশ্যে পঞ্চগব্য ও পঞ্চামৃতের সহযোগে পায়সান্নের বিশেষ ভোগ নিবেদন করা হইবে। ... ধনী জমিদারদের অনেকেরই ঘরে প্রতিষ্ঠিত রথ আছে, ... বৈষ্ণবদের মঠে রথযাত্রা উপলক্ষে মহোৎসব সংকীর্ত্তন হয়, মেলা বসিয়া থাকে। বাংলার চাষীদের অধিকাংশই বৈষ্ণব ধর্মাশ্রয়ী, তাহারা এই পর্বটি বিশেষ আগ্রহে পালন করে; হল কর্ষন নিষিদ্ধ করিয়া তাহারা পর্বটিকে আপনাদের জীবনের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠভাবে জড়াইয়া লইয়াছে। ...." 'মহাগ্রামের ন্যায়রত্নের বাড়ীতে রথযাত্রার অনুষ্ঠান অনেক দিনের; ... গৃহদেবতা লক্ষীজনার্দন ঠাকুর রথারোহন করেন; ... একটি মেলাও বসে। ... কয়েকখানা গ্রামের মাতব্বর লোকেরা আজও সসম্ভ্রমে ন্যায়রত্নের বাড়িতে ঠাকুরের রথযাত্রা উপলক্ষ্যে আসিয়া উপস্থিত হয়। ... মহাগ্রাম আজ নামেই মহাগ্রাম, কেবলমাত্র ন্যায়রত্নের বংশের অস্তিত্বের লুপ্তভাব প্রভাবের অবশিষ্টাংশ আঁকড়াইয়া ধরিয়া মহৎ বিশেষণে কোন মতে টিকিয়া আছে ... রথযাত্রা, দুর্গাপূজা বাসন্তীপূজা— এই তিনটি পর্ব এখনও ন্যায়রত্নের বাড়িতে বেশ একটু সমারোহের সঙ্গেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। " আজ ন্যায়রত্নের বাড়িতে রথযাত্রার উৎসব। ন্যায়রত্ন নিজে হোম করিতেছেন। টোলের ছাত্ররা কাজকর্ম করিয়া ফিরিতেছে। কয়েকটি গ্রামের মাতব্বরেরা আটচালায় সতরঞ্চির আসনে আসরে বসিয়া আছে। গ্রাম্য চৌকিদার এবং আরও কয়েকজন তামাক সাজিয়া দিতেছে। মেলার মধ্যেও লোকজনের ভীড় ধীরে ধীরে বাড়িয়া চলিতেছে। একটা ঢাকী ঢাক বাজাইয়া দোকানে দোকানে পয়সা মাগিয়া ফিরিতেছে। . . . ঢাকের বাজনা শূন্য লোকের মেঘস্তরের বুকে প্রতিহত হইয়া দিগ্‌-দিগন্তরে ছড়াইয়া পড়িতেছে"। (পঞ্চগ্রাম, ঐ, পৃষ্ঠা ৯-১১)।

ঝুলন যাত্রার প্রসঙ্গ :

"আগামীকল্য ঝুলন যাত্রা আরম্ভ। ... একাদশীতে আরম্ভ হইয়া পূর্ণিমায় বিষ্ণুর দ্বাদশযাত্রার অন্যতম "হিন্দোল যাত্রা" শেষ হইবে। সাধারণ গৃহস্থের বাড়িতে ঝুলনের বিশেষ উৎসব নাই। শুধু পূর্ণিমার দিন হল কর্ষণ নিষিদ্ধ।"

(ঐ, পৃষ্ঠা; ৮৫-৮৬)। ঝুলনের জন্য ন্যায়রত্ন মশায়ের পুত্রবধূ জয়ার গোবিন্দজী ও রাধারাণীর জন্য পরিচ্ছদ নির্মাণের বর্ণনা :

"চমৎকার একফালি গরদ। গরদের ফালিটির চারিপাশে সোনালী পাড় বসাইয়া চাদর তৈয়ারি হইতেছে। ... জয়া বলিল— আপনার নাতি এনেছিল ...

আমি বললাম ... এতে গোবিন্দজীর চাদর হবে। জরি এনে দিয়ো। আর খানিকটা নীলরং-এর খুব পাতলা ফিনফিনে বেনারসী সিল্কের টুকরো। রাধারাণীর ওড়না করে দেব। গোবিন্দজীর চাদর হল এইবার রাধারাণীর ওড়না করব।" (ঐ, পৃ. ২২৭)। দেবুর চোখ দিয়ে তারাশঙ্কর পঞ্চগ্রামের শেষ পর্বে শারদীয় দুর্গাপূজার প্রাক্কালে পল্লী-প্রকৃতি আর পল্লীজীবনের রূপ ও অবস্থা বিবৃত করেছেন : "শিউলিতলার রৌদ্রম্লান করা শিউলিগুলি হইতে একটি অতি সকরুণ মৃদু গন্ধ আসিতেছে। শরতের দ্বিপ্রহরে রৌদ্র ঝলমল করিতেছে। সামনে পূজা। দুর্বল দেহেও মানুষ পূজা উপলক্ষে ঘর দুয়ার মেরামতের কাজে লাগিয়াছে। বর্ষার জলের দাগের উপর গোবরমাটির ঘন প্রলেপ বুলাইতেছে। জগন তাহাকে বলিয়াছিল— সব শেষ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু না। ... তাহারা বাঁচিয়া আছে। বাঁচিতে চায়। তাহারা মরিবে না। ..." (ঐ, পৃ. ৩০৫)

উপন্যাসের শেষে লেখক দেখছেন প্রভাতী গ্রামখানির কর্মব্যস্ত রূপ। শারদীয় পূজা বাংলার পল্লীসমাজে যে গভীর প্রভাব রাখে তার পরিচয় এই বর্ণনায়: "আশ্বিনের প্রথমে মাঠে চাষীদের অনেক কাজ —নিড়ানের কাজ, অনেকের ক্ষেতে আউশ পাকিয়াছে— ধান কাটার কাজ রহিয়াছে—এই ভোরেই চাষীরা মাঠে যাইবে, মেয়েরা ঘর-দুয়ারে মাড়ুলী দিতেছে, তাহাদের এখন সমস্ত ঘরগুলিকে ঝাড়িয়া, কলি ফেরানোর মত নিকানোর কাজ তাহার উপর আলপনা আঁকার কাজ, পূজায় মুড়ি ভাজার কাজ, ছোলা পিসিয়া সিউই ভাজার কাজ, নাড়ু তৈয়ারীর কাজ— অনেক রহিয়াছে। এমনি করিয়' পালে— পার্বণে—ঘর নিকাইয়া আলপনা দিয়া ঘরগুলিকে শ্রীসম্পন্ন করিতে হয়। সম্মুখে মহাপূজা আসিতেছে।" ঐ পৃষ্ঠা : ৩১১)। 'গণদেবতা' বা 'পঞ্চগ্রামে' বিভিন্ন চরিত্রের কথাবার্ত্তা, আচার-আচরণের মধ্য দিয়ে গ্রামীণ সংস্কৃতির উপস্থিতি প্রতিটি পদক্ষেপেই মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে হিন্দু মুসলমান কৃষক নির্বিশেষে কৃষি বিষয়ক বা জীবন বিষয়ক প্রবাদ প্রবচন কথায় কথায় স্মরণ করেছে।

কৃষক রহম শেখ : "রহম বলিল, আর বুলিস কেনে ভাই। আল্লার দুনিয়া শয়তানে দখল কর‍্যা নিলে। 'যে করবে ধরম করম তার মাথাতেই বাঁশ মারণ'। (পঞ্চগ্রাম)।

তিনকড়ি মণ্ডলের ভাবনা সূত্রে এসেছে কৃষি বিষয়ক প্রবচন ঃ (ক) শাওনের পুরো, ভাদ্রের বারো, এরমধ্যে যত পারো।'

(খ) থোর তিরিশে, ফুলোয় বিশে, ঘোড়ামুখ
তেরদিনে জান
বুঝে কাট ধান। (ঐ)

কৃষি বিষয়ক আরও প্রবচন

(ক) 'বচনে আছে কর্কট ছরকট, সিংহ (অর্থাৎ ভাদ্রে) শুকা, কন্যা (অর্থাৎ আশ্বিনে) কানে কান,

বিনা বায়ে তুলা (অর্থাৎ কার্তিকে বর্ষা)

কোথায় রাখবি ধান (ঐ)।

(খ) ধান কন্যা কানে কান— বিনা বায়ে তুলা বর্ষে / কোথায় রাখবি। দেবু ঘোষ পল্লীর কৃষকের দুরবস্থার চিত্র (ঐ) বেদনার সঙ্গে লক্ষ্য করে পুরোনো লৌকিক ছেলে ভুলানো ছড়া স্মরণ করেছে :

"চাঁদো চাঁদো, পাত ঘুমের ফাঁদো
গাই বিয়োলে দুধ দেবো,
ভাত খেতে থালা দেবো।"

কিন্তু সে দুঃখের সঙ্গে ভেবেছে : "ভাত না থাকলে খাইবার থালা দিবে কোন হিসাবে?" জীবনের সঙ্গে এইভাবে মিশে গেছে ছড়া, গান।

পুরোনো দিনের পল্লীজীবনের সচ্ছলতার চিত্র অঙ্কিত এই লৌকিক ছড়াটি বা প্রবচনটি দেবু স্মরণ করেছে : "গোলাভরা ধান, গোয়াল ভরা গাই, পুকুর ভরা মাছ, বাড়ির পাঁদাড়ে গাছা, বউ বেটির কোলে বাছা, গাই-এর কোলে নই লক্ষ্মী বলেন ওখানেই রই।"

দেবুর চেতনায় লৌকিক লক্ষ্মী ব্রতের কাহিনী তার চোখের সামনে প্রকট কৃষক জীবনের অন্নহীনতার চিত্রের সঙ্গে কিভাবে যেন একটা আশ্চর্য যোগসূত্রে সাদৃশ্য পেয়েছে মনে হয়। বাংলা দেশে ধান্য দেবী তথা অন্নের দেবী লক্ষ্মী। শষ্যক্ষেতে লক্ষ্মীর আসন পাতা। লক্ষ্মীর আর্বিভাব না হলে দেশ অন্নহীন হয়। দেবুর চোখের সামনে কৃষকের গৃহে ধান নেই, অন্ন নেই, লক্ষ্মী সেখানে নেই। অথচ মিলের মালিকরা লক্ষ্মীর প্রতীক রাশি রাশি ধান জোড়া করে পায়ে মাড়িয়ে তাকে পরীক্ষা করেন। অমাবস্যা, পূর্ণিমা তিথি না মেনে লক্ষ্মীবার বৃহস্পতি বারটিতেও অক্ষণে গ্রামসমাজের নীতি নির্দেশ না মেনে ধান বিক্রী হয়। দেবুর মনে হয় যেন লক্ষ্মী সেই লৌকিক পুরোনো ব্রত কাহিনী অনুযায়ী সেখানে দাসীবৃত্তি করছেন। "চৈত্রলক্ষ্মীর ব্রতকথায় আছে লক্ষ্মী একবার এক ব্রাহ্মণের জমি হইতে দুইটি তিলফুল তুলিয়া কানে পরিয়া ছিলেন, ইহার জন্য তাহাকে তিলসুনা খাটিতে হইয়াছিল ব্রাহ্মণের ঘরে। এই গদীওয়ালা কলওয়ালাদের কি ঋণ লক্ষ্মী করিয়াছেন কে জানে।" (ঐ) মনসামঙ্গলেব গান, চণ্ডীমঙ্গলের গান পল্লীর সাধারণ কৃষিজীবী মানুষগুলির গভীর আনন্দে রাত ভরে উপভোগ করার দৃশ্য একাধিকবার এ দুটি উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে। লেখক সেই কাহিনীগুলির সত্য আস্বাদ লোকজীবনের মধ্যে আনবার জন্য পংক্তির পর পংক্তি উদ্ধৃত করেছেন।

দেখা যায় জীবন সংগ্রামে ক্রমশঃ বিরুদ্ধশক্তির কাছে হেরে যাওয়া তিনকড়ি মণ্ডল চাঁদ সদাগরের সঙ্গে নিজেকে তুলনা করেছে মনে মনে। মনসার অজস্র উৎপীড়ন সত্ত্বেও চাঁদ মনসাকে পূজো দেবে না। তিনকড়িও জমিতে 'বৃদ্ধি' না দেওয়ার জন্য বিদ্রোহ করেছে। পুরোনো দিনের প্রবল শক্তিমান এই বাগদী সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষটি নতুন ধনী শ্রীহরিকে গাল দিয়েছে। তার ভৃত্য ভূপালকে বলেছে "ছুঁচোর গোলাপ চামচিকে।" গ্রামের মানুষের 'বৃদ্ধি' দেওয়ার প্রস্তাব মেনে নেওয়ার জন্য সে তাদেরও প্রাণভরে গাল দেয়। "ব্যাটা ছিরে পাল, শুধু ছিরে পাল, ক্যানে কঙ্কনার বাবুরা পর্যন্ত ধূর্ত্ত শেয়াল। আর এ বেটারা হল সব ভেড়া।"—এর পর সে কন্যা স্বর্ণকে বলে মনসা মঙ্গলের সেই জায়গাটা পাঠ করে শোনাতে, যেখানে পৌরুষময় চন্দ্রবণিক মনসাকে প্রবলভাবে অস্বীকাব করছে। সে একদা চাঁদবেনে সেজে এইভাবেই বীর রসের প্রকাশ ঘটাতো—

"যদিরে কালির লাইগ পাই এই একবার—-
কাটিয়া সুদিব আমি মরা পুত্রের ধার।"

নারায়ণদেবের রচনা পংক্তিগুলি তিনকড়ির চরিত্ররূপের সঙ্গে যেন মিলে যায়।

'ফুল্লরার বারমাস্যা'র পালা যেন বাংলার পল্লীসমাজের সব নিরন্ন নারীদেরই জীবন পালা। এই পালা গান শুনতে শুনতে দুর্গাও তন্ময় হয়ে ফুল্লরার সঙ্গে নিজের সমপ্রানতা খুঁজে পায়।—

"গান চলিতেছে। ভাদ্রের পর আশ্বিন। দেশে দুর্গাপূজা। সকলের পরণে নূতন কাপড়।

"অভাগী ফুল্লরা করে উদরের চিন্তা।" আশ্বিনের পর কার্ত্তিক। হিম পড়িতেছে; ফুল্লরার গায়ে কাপড় নাই।

"দুর্গা হাসিয়া বলিল,—তা আমাদের চেয়ে ভাল ছিল ফুল্লরা। মালোয়ারী ছিল না।"

লোকশ্রুতি :

'গণদেবতা' উপন্যাসে লোকশ্রুতির চমৎকার সংযোজন হয়েছে। ধর্মঠাকুর গ্রামবাংলায় বিশেষত রাঢ় অঞ্চলের অতি পরিচিতি গ্রাম দেবতা। এই লোক দেবতার অধিষ্ঠান পল্লীবাংলার স্থানে স্থানে ছড়িয়ে রয়েছে। তার সঙ্গে যুক্ত আছে বহু লৌকিক কাহিনী, লোকশ্রুতির অসংখ্য পরিচয়। গণদেবতায় এই ধর্মঠাকুরের অধিষ্ঠান হরিজন পল্লীর বকুলতলায়। সেখানে পল্লীর মজলিশ বসে। "বহুদিনের প্রাচীন বকুল গাছটি পত্রপল্লবে পরিধিতে বিশাল। কাণ্ডটার অনেকাংশ শূন্য গর্ভ এবং বহুকাল পূর্বে কোন প্রচণ্ড ঝড়ে অর্ধোৎপাটিত ও প্রায় ভূমিশায়ী হইয়া

পড়িয়া আছে, কিন্তু বিস্ময়ের কথা সেই গাছ আজও বাঁচিয়া আছে। ইহা নাকি ধর্মরাজের অসীম মহিমা। এমন শায়িত অবস্থায় কোথাও কোন গাছকে কেউ জীবিত দেখিয়াছে! ইহা নাকি ধর্মরাজের অসীম মহিমা। গাছের গোড়ায় স্তূপীকৃত মাটির ঘোড়া মানত করিয়া লোকে ধর্মরাজকে ঘোড়া দিয়া যায়, বাবা বাত ভাল করিয়া থাকেন। ... পল্লীর প্রত্যেকে প্রতি প্রভাতে একটি করিয়া মাড় ুলী দিয়া যায়, সেই মাড় ুলীগুলি পরস্পরের সহিত যুক্ত হইয়া গোটা স্থানটাই নিকানো হয়।" (গণদেবতা)

ধর্মঠাকুরের এই পীঠস্থানে কোনো জাতিধর্মের বেড়া নিষেধ নেই। হামদু শেখ সেইখানে বসিয়া পল্লীর লোকজনের সঙ্গে গরু, ছাগল সওদার দর-দস্তুর করে, হিন্দু-মুসলমান অস্পৃশ্য সকলের প্রবেশাধিকার আছে। লোকিক ধর্মের এই সমন্বয় ও মিলনের বাণী বহণ করেছে 'গণদেবতা'।

গ্রাম সমাজে প্রচলিত 'শস্য পরবর্ত্তী উৎসব (Post harvesting festival) বা নবান্ন নামে পরিচিত সেটি বাংলা গ্রামের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ লোকউৎসব 'নবান্ন'। কৃষিপ্রধান বাংলা দেশের শ্রেষ্ঠ উৎসব 'নবান্ন'। 'গণদেবতায় কৃষিজীবী পল্লী বাঙালীর সেই 'নবান্ন' উৎসবের আয়োজন উদ্যোগের বিস্তৃত পরিচয় আছে। "নবান্নের দিনে দুই জনে পরামর্শ করিয়া একটা উৎসবেরও ব্যবস্থা করিল, সন্ধ্যায় চণ্ডীমণ্ডপে মনসার ভাসান গান হইবে। ভাসান গানের দলকে এখানে বেহুলার দল বলিয়া থাকে। বাউড়ীদের একটি বেহুলার দল আছে, সেই দলের গান হইবে।" (গণদেবতা)

গ্রামবাংলার লোকজীবন এইভাবেই তারাশঙ্করের 'গণদেবতা' ও 'পঞ্চগ্রাম' এ দুটি উপন্যাসে বিপুল ভূমিকা নিয়েছে। রাঢ় বাংলার পল্লীসমাজ তার আর্থ-সামাজিক ও সংস্কৃতি-কৃষ্টির সম্পূর্ণ পরিচয় নিয়ে এক অভিনব রসাস্বাদ এনেছে কাহিনীতে। দুটি উপন্যাসে পল্লীর কৃষক সমাজের মূল সমস্যা তথা তাদের ভূমি সমস্যাকে প্রধান বিষয়বস্তু করেছেন তারাশঙ্কর। কৃষিনির্ভর পল্লীবাংলার কৃষিজীবী মানুষ ক্রমশ নগরমুখী হচ্ছে, গ্রামের কৃষি অর্থনীতি ভেঙে পড়ে গ্রামগুলি শ্রীভ্রষ্ট হচ্ছে। গ্রামের সরল আত্মনির্ভর সমাজ জীবন ছেড়ে দলে দলে কৃষিজীবী মানুষ ভূমিহীন হয়ে শহরের কলে কারখানায় খাটতে চলে যাচ্ছে—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কালেই বাংলাদেশের এই গ্রামজীবনের এই পরিবর্ত্তন সম্পূর্ণভাবেই ঘটে গেল। সেই পরিবর্ত্তিত বাংলা পল্লীসমাজের নির্মম ও অনিবার্য সত্য রূপচিত্র এঁকে পঞ্চগ্রাম উপন্যাস সমাপ্ত। " সম্মুখে মহাপূজা আসিতেছে। ময়ূরাক্ষীর ওপারে জংশনে শহরে কলের দশ-বারোটা বাঁশী বাজিতেছে একসঙ্গে। সতীশদের পাড়ায় সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। কলের কাছে যাইতে হইবে। কত কাজ। কত কাজ। কত কাজ।"

হাঁসুলী বাঁকের উপকথা (১৯৪৭)

'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'কে তারাশঙ্করের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলা হয়েছে। সমালোচকের বক্তব্য : " একটা সমগ্র গোষ্ঠীর প্রাণস্পন্দন ও মর্মরহস্য, সমগ্র সমাজবিন্যাসের মূলতত্ত্ব ও অন্তঃপ্রেরণা এই যুগান্তকারী উপন্যাসে স্বচ্ছ দর্পনের ন্যায় প্রতিবিম্বিত হইয়াছে।" (ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃ. ৫৬৪, ১৩৭২ সং) এই 'টৈলধর্মী' কাহিনীতে বাংলাদেশের বীরভূম জেলার একটি বিশেষ অঞ্চলের কাহার নর-গোষ্ঠীর আদিম বিশ্বাস সংস্কার ধর্মভাবনা প্রাণবন্ত হয়ে প্রকাশ হয়েছে, এ উপন্যাস নিঃসন্দেহে আঞ্চলিক উপন্যাস হিসেবে গণ্য।

এই কাহিনীতে বাংলা দেশের সাধারণ পল্লীসমাজের চিত্র নয়, বিশেষ অঞ্চলের বিশেষ নরগোষ্ঠীর সামগ্রিক পরিচয় উদঘাটিত হয়েছে, তাই সাধারণ পল্লী সমাজ-ভিত্তিক উপন্যাসগুলির থেকে এই উপকথা'র আস্বাদ স্বতন্ত্র। সমালোচকদের মতে উপন্যাসে চিত্রিত ভৌগোলিক পরিবেশ এখানে পটভূমিকা মাত্র হয়নি, জীবন্ত স্বাধীন এক প্রবল পরাক্রান্ত সত্ত্বায় পরিণত হয়েছে। কোন ব্যক্তিবিশেষ এই উপন্যাসের নায়ক নয়, হাঁসুলী বাঁকের প্রাকৃতিক পরিবেশে, তার বিশেষ জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক জীবন ও ভাব পরিমণ্ডল যেন কাহিনীর প্রধান চরিত্র।

কোপাই দহের বেড় দিয়ে ঘেরা কাহারদের এই নিজস্ব গ্রামটি প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় ও অন্তরঙ্গভাবে যুক্ত। এই জনগোষ্ঠীর বদ্ধমূল আবহমানকাল আশ্রিত অপ্রাকৃত সংস্কার, চিরকাল চলে আসা বিচিত্র কিম্বদন্তী ও লোক কল্পনা উপন্যাসে এক আশ্চর্য বসানুভূতির সৃষ্টি করেছে। শিমূল, বেল, শ্যাওড়া বনে দেবত্ব আরোপিত হয়েছে এখানে, চন্দ্রবোড়া সাপও এই জনগোষ্ঠীর কাছে দেবতা স্বরূপ। "অন্ত্যজ জনগোষ্ঠীর লৌকিক ও অপ্রাকৃত সংস্কার ও বিশ্বাস এই কাহার গোষ্ঠীর জীবনযাত্রাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে।" (কালের প্রতিমা, অরুণকুমার মজুমদার, পৃ. ২৫, ১৩৮১ সং) আকাশবিহারী 'কালারুদ্দুর' ও 'বিল্ববৃক্ষ সঞ্চারী কর্ত্তাবাবা' এই কাহারদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রক। কালারুদ্দুর এই গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রা, তিনিই এই সমাজকে চালনা করেন। কোপাই এর দহ, বাঁধ, বেল গাছ, বাঁশঝাড় শিমূল বন, শ্যাওড়া বন, অতীতের বন্যা, বর্ত্তমানের যুদ্ধ— সমস্ত কিছু এই সমাজ জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে। প্রকৃতির সঙ্গে কাহারদের সমাজব্যবস্থারও অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক। এদের সমাজ যেন এক অখণ্ড, অভিন্ন প্রাণসত্ত্বা, কিছুতেই কেউ ব্যক্তি স্বাধীনতা নিয়ে তথা আত্মস্বাতন্ত্র্য বোধ নিয়ে এর বাইরে যেতে পারবে না। সমাজপতি বা যুথপতি বনোয়ারী লালের কথাই শেষ কথা। প্রাকৃত যৌনাকাঙ্ক্ষার স্পষ্ট নীলা, তার

অনিবার্য প্রবল হৃদয়াবেগ এই উপন্যাসের প্রাণমূলে স্থিত হয়ে রয়েছে।

কিন্তু এই সমাজেও পরিবর্ত্তনের ছায়া গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়ে শেষ পর্যন্ত নতুন যুগের কাছে পুরোনো যুগকে হার মানিয়েছে। বনোয়ারী লাল পরাভূত হয় করালীর কাছে। দেবতারূপে পূজিত চন্দ্রবোড়া সাপকে পুড়িয়ে মেরেছে, অথচ তার বিনাশ হল না। ভদ্র বাবুসমাজের অপমান মাথা পেতে গ্রহণে অস্বীকার করলেও তার ধ্বংস হয়নি, পালকী বেহারার কাজ বা নিজ জাত ব্যবসা ছেড়ে রেলস্টেশনে কাজ করে অর্থ উপার্জ্জনের দম্ভ প্রকাশ করলেও সে বিনষ্ট হয় না— এভাবেই যুগ-যুগান্তর থেকে সৃষ্টি হওয়া স্থির বদ্ধ জলাশয়ের মত নিজস্ব জীবন প্রকৃতি নিয়ে নির্জ্জনে নিভৃতে বসে থাকা হাঁসুলী বাঁকের মানব জীবন চলমান যুগের যাত্রাধ্বনি শুনতে পেয়েছে।

অর্থনৈতিক কারণেই মূলত এই আদিম স্থির বদ্ধ সমাজটি ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। অতীতে নীলকর সাহেবদের সহায়তায় তাদের অর্থনৈতিক সংকট ঘনীভূত হয়নি। বন্যা দুর্ভিক্ষের আঘাত কাটিয়ে তারা প্রাচীন ঐতিহ্য এবং মানসিকতায় স্থির ছিল। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে চতুস্পার্শ্বস্থ বিপুল পরিবর্ত্তনের ঝড় এই সমাজকেও বিধ্বস্ত করেছে। বাংলার সাধারণ পল্লীসমাজ যেমন সামগ্রিকভাবে এই যুগের দাবীতে নিজস্ব ধ্যান-ধারণা, রীতি-নীতি এবং জীবন-ধারাকে আমুল বদলে দিতে বাধ্য হয়েছে, অনুরূপভাবে কাহার সমাজেও মহাযুদ্ধের আহ্বান শোনা গেছে, জীবিকার্জ্জনের দুর্দম প্রেরণায় তারা বহু যুগসঞ্চিত আদিম জীবন ভাবনা থেকে অব্যাহতি পেতে আগ্রহী হয়েছে। দেখা গেল, তাদের জীবন পরিচালনা কেন্দ্র কর্ত্তাবাবা ও কালীরুদ্রর দেবস্থান যুদ্ধের গুদামে পরিণত করা হচ্ছে, কোপাই নদীর তীরবর্তী এই ঘন বাঁশ ছায়াকীর্ণ ও বৃক্ষরাজি ভরা বনাঞ্চল নির্মুলিত হল। তাদের মানসলোকে আধিদৈবিক আশ্রয় থেকে বিছিন্ন হয়ে গেল। একটা নির্দিষ্ট জীবনধারা, নির্দিষ্ট সমাজ-গঠন ভেঙে পড়ল মুহূর্ত্তেই। সাধারণ জনজীবন থেকে এই কাহার সমাজ রীতি প্রকৃতিতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রায় হলেও তাদের ধ্বংস রূপ সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের যুগ পরিবর্ত্তনে উন্মিলীত গ্রামের কৃষিজীবনের কথা স্মরণ করায়। কাহার সমাজ একমুহূর্ত্তে যেন অন্ধকার মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যন্ত্র সভ্যতার কেন্দ্র ভূমিতে এসে পৌছল। এইভাবে তারাশঙ্কর এই ভূ-ভাগ ও তৎমধ্যবর্ত্তী বাসকারী আদিম জনসমাজকে দেখিয়েছেন।

তারাশঙ্কর এইভাবেই বাংলার গণ চৈতন্যকে উপন্যাসে মূল্যবান করে তুলেছেন, তাদের জীবনাচরন, সুখ, দুঃখে চিত্র। পল্লী-মৃত্তিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার পূর্ণ পরিচয় যথাসম্ভব সত্যমূলকভাবে পরিস্ফুট করেছেন। বাংলার পল্লীসমাজ ও তার মানুষ; চিরাচরিত বৈশিষ্ট্যসহ তারাশঙ্করের উপন্যাসগুলিতে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। এই জন্যই তিনি শরৎ পরবর্ত্তী বাংলা কথা সাহিত্যেব পুরোধা ব্যক্তিত্ব।

গ্রন্থপঞ্জী

- অমিতাভ মুখোপাধ্যায়—উনিশ শতকের সমাজ ও সংস্কৃতি কলকাতা, ১৯৭১, প্রথম সং।
- অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়— কালের প্রতিমা— বাংলা উপন্যাসের পঞ্চাশ বছর ১৯২৩-১৯৭২, কলকাতা, ১৯৭৪।
- অশোককুমার দে— বাংলা উপন্যাসের উৎস সন্ধানে, কলকাতা, ১৯৭৪।
- অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়— বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ২য় খণ্ড কলকাতা, ১৯৮৩।
- ঐ— বাংলা সাহিত্যের বিদ্যাসাগর, কলকাতা, ১৩৭৭।
- ঐ— বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, ১৩৭৫।
- ঐ— উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ ও বাঙলা সাহিত্য, ১৯৬৫।
- আলেকজাণ্ডার ডাও— দি হিস্ট্রি অব হিন্দুস্তান, তিন খণ্ড, ১৭৭০।
- আশুতোষ ভট্টাচার্য— বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ১৩৭১।
- উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য— রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প ও উপন্যাস, কলকাতা, ১৩৭২।
- করম আলি, মুজাফফরনামা— ইং অনুবাদ যদুনাথ সরকার বেঙ্গল নবাব।
- কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায়— ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিত, কলকাতা, ১৯০২।
- কার্তিক লাহিড়ী— বাস্তবতা ও বাংলা উপন্যাস, সরস্বতী লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৯৭৪।
- ক্ষেত্রগুপ্ত— বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, গ্রন্থনিলয়, কলকাতা।
- গোপাল হালদার— বাঙলা সাহিত্য ও মানব স্বীকৃতি, কলকাতা, ১৯৫৬।
- গোপিকানাথ রায়চৌধুরী— বিভূতিভূষণ, মন ও শিল্প, কলকাতা, ১৯৭৮।
- ঐ— দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথা সাহিত্য, কলকাতা, ১৩৮০।
- John Phlipps-- A Serics of the Principal Products of Bengal, No.1, Indigo, Cal-1832, Ch.-II Tabb XXIV, 59.
- জ্যোতির্ময় ঘোষ— রবীন্দ্র উপন্যাসের প্রথম পর্যায়/১৯৬৯, কলকাতা, ১৯৮৪।
- ডব্লিউ. ডব্লিউ. হান্টার— দি এ্যানালস অব রুর‍্যাল বেঙ্গল, ১ম খণ্ড, ১৮৮৩।
- দেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত— রেভারেণ্ড লালবিহারী দত্ত চন্দ্রমুখী উপাখ্যান।
- নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়— কথা কবি রবীন্দ্রনাথ, ১৩৭৩।

- নিমাইসাধন বসু— মুঘল আমলে বাংলার জমিদার। বেতার বক্তৃতা, ১৯৮৯।
- বিনয় ঘোষ— সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র, কলকাতা, চার খণ্ড।
- ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়— সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড, ২য় খণ্ড, ১৩৫৬ সন।
- ভূদেব চৌধুরী— বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রযুগের ইতিকথা, কলকাতা, ১৮৯২ শকাব্দ।
- সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী— বঙ্কিমচন্দ্রের জমিদার ও কৃষক, কলকাতা ১৯৮৮।
- সুবোধ চন্দ্র সেনগুপ্ত— শরৎচন্দ্র, ১০ম সং ১৩৭৬, কলকাতা।
- শিবনাথ শাস্ত্রী— রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ কলকাতা, ৪র্থ মুদ্রণ, ১৯৮৩।
- ঐ— বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, কলকাতা, ১৩৭২।
- যোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত রমেশ রচনাবলী, (সাহিত্য সংসদ, ফেব্রুয়ারী ১৯৮২।)
- বাংলা উপন্যাসের উৎস সন্ধানে, অশোককুমার দে, জুলাই ১৯৭৪।
- ড. সুকুমার সেন, বাঙ্গালী সাহিত্যের ইতিহাস, ১৩৭৭, দ্বিতীয় খণ্ড, উনবিংশ শতাব্দ।
- ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গসাহিত্যের উপন্যাসের ধারা, পঞ্চম, ১৩৭২।
- অমিতাভ মুখোপাধ্যায়; উনিশ শতকের সমাজ ও সংস্কৃতি, ১৯৭১।
- রমেশ চন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড, (আধুনিক যুগ) মাঘ, ১৩৮১।
- বিনয় ঘোষ, বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা, ১৮৩০—১৯০০, 'সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র' গ্রন্থমালার শেষ (পঞ্চম) খণ্ড। জুন, ১৯৭০।
- ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত স্বর্ণলতা, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ১৩৭০, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।
- ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্যসাধক চরিতমালা, ১৯৪৬।